সম্পাদনা

ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রয়াত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্মৃতির উদ্দেশে—

যে সব গল্প আছে

ভূমিকা

অলঙ্কারতত্ত্বে বিভিন্ন রসের ক্ষেত্রে 'হাস্যরসকে'ও যথাযথ মূল্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট রস মানুষের মানসিক লীলার সংগে এমনভাবে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে যে, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার চেয়েও অনুভূতির সংগে জড়িত রসগত দিকটিই বড় কথা। হাস্যরসের আলোচনা করতে গিয়ে গবেষকের দৃষ্টি মন ও মননের আশ্রয়ে হাসির শারীর ও মানসতত্ত্ব, হাসির উৎস, প্রকাশ-বৈচিত্র্য—হাসির বিশিষ্ট সমাজ-পরিবেশ, হাসির উৎস ইত্যাদি নানা প্রসংগকে ঘিরে বিচারশীল হয়ে ওঠে। ভাবনার ফসলকেও হাস্যরসের কলা-নিপুণতার নানা শ্রেণীরূপের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেন। শিশুর হাসি, বিভিন্ন বয়স ও রুচির হাসির স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় করে গবেষণালব্ধ রীতিতে হাস্যরস সম্পর্কে নানা পথ ও মতের ব্যাখ্যাও করা হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে একাল পর্যন্ত মানুষের ও সমাজজীবনের পরিবর্তমান মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে হাস্যরসের ধারা নিয়ে রচিত সার্থক গবেষণাগ্রন্থেরও অভাব নেই। রসের শাস্ত্রীয় বিচারের দিকটিকে গুরুত্ব না দিয়েও আমরা জীবনে হাস্যরসের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। কারণ, কান্নার মতো হাসিও মানুষের সহজাত বৃত্তি। জীবনে হাসি আর কান্না বিচিত্র টানা-পোড়েনে সমসূত্রে জড়িয়ে আছে। বাহ্যিক ঘটনা বা মানসিক ভাবান্তরের স্বাভাবিক লীলা রূপে 'হাসি' মানুষের সমাজে ও জীবনে মুখর হয়ে আছে। সাহিত্য-সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই অকারণে হেসে মানুষ তার প্রসন্নতা-প্রসূত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে—'কেউ জানে না হাসছি কেন, পাচ্ছে হাসি—হাসছি তাই।' আবার কান্নার মধ্য দিয়ে আপনার অন্তরের ক্লেশের ভারকে মুক্তি দিতেও চেয়েছে। তবে পার্থক্য এই যে, সূচনা-মুখে এই সহজাত-স্বতঃস্ফূর্ত মানসবৃত্তিটির পরিচয় নিতান্ত শারীরিক ক্রিয়ামাত্র। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে, মানুষের সমাজ-সামাজিকতার নানা জটিলতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই নিতান্ত জৈব-ব্যাপারটির উত্তরণ ঘটেছে মানসিক রসের রাজ্যে। হাস্যরসের সাম্রাজ্যে হাস্যরস বিতরণের ক্ষেত্রে একান্ত স্বৈরতন্ত্রবাদী মানুষও পরম বন্ধু। সেই একান্ত আত্মকেন্দ্রিক হাসি যখন স্বতোৎসারে ছড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ে, মানুষের মনকে নির্ভার ও স্বচ্ছ করে দেয়—তখন তা আর আত্মকেন্দ্রিক থাকে না। অপরের উপভোগ্য হয়ে ওঠে। হাস্যরসের স্রষ্টা নানা মানুষের বিচিত্র মন ও হৃদয়কে নির্বিশেষে অধিকার করেন। হাস্যরস-স্রষ্টার তাই মানুষের হৃদয়ের সাম্রাজ্যে অবাধ বিস্তৃত অধিকার। এ ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও পাঠক-পাঠিকা একান্তরূপেই পরস্পর আত্মিক সূত্রে বাঁধা পড়ে যান। হৃদয়ের বন্ধন বলেই তা অটুট। পাঠক-পাঠিকার মনের সাম্রাজ্যে এই যে দিগ্বিজয়—তা অপরপক্ষকে কোন প্রতিহিংসায় টানে না। প্রতিপক্ষের মন হাস্যরস স্রষ্টার

মনের সংগে নিজের অজ্ঞাতেই কখন নিবিড় গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। সরস গল্পের লেখকের তাই পাঠক-পাঠিকার বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অনুভূতি-তীব্র মনের সাম্রাজ্য জয়ের অনন্য ক্ষমতা থাকে। এই দিক দিয়ে সরস-গল্পের লেখককে যদি সাম্রাজ্যবাদী বলি—সেখানেও কিন্তু তিনি বিপুল শক্তিতেই গণতান্ত্রিক, অত্যাশ্চর্য রূপে সার্বভৌম। এ-কথা সকল দেশের সকল হাস্যরসিক ও রসস্রষ্টাদের ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রযোজ্য।

বুদ্ধিগত ভারসাম্যে স্থিত মনই শুধু বিশ্ব ব্যাপারের মধ্য দিয়ে হাসির নানা উপাদানের সন্ধান লাভ করে। ব্যঙ্গ-নকশাকে কখনও হাসির গল্প বলে ভুল হলেও সেখানে রূপে ও স্বাদে মৌলিক পার্থক্য আছে। আবেগ-আলোড়িত মানুষের হৃদয়ের যিনি ভাষ্যকার কিংবা অনুভূতির রূপকার—হাস্যরসকে কম বেশী উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেও তিনি তাঁর কাম্য লক্ষ্যে পেঁছুতে পারেন। তবে জাত কৌতুকশিল্পীর ক্ষেত্রে বা হাস্যরসের সাহিত্যিক ভিত্তিতে আবেগের চেয়েও চিন্তাযোগ্য বুদ্ধির অনুশীলন এবং তার প্রতিষ্ঠা বড় কথা। অসংগতির আপাত মিশ্ররূপের মধ্য দিয়েও সরস গল্পে নিতান্ত জল্পনা-কল্পনা ও মনকে মাতিয়ে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসার বা আত্মবিশ্লেষণের পীড়ন একই সংগে ব্যক্তিমুখী ও সমাজমুখী হতে পারে। আর নিতান্ত কৌতুকের জল্পনা-কল্পনাও তো মানুষের মন নামক বিচিত্র পদার্থটিকে সজীব ও সচল রাখবার জন্য প্রয়োজন। আবার এ-কথাও স্বীকার্য—সচল, সক্রিয়, জীবন ও মন ছাড়া মননের চর্চা সম্ভবপর নয়। ব্যক্তিজীবন-পরিক্রমায় কিংবা সামাজিক সমষ্টিগত সার্বিকতার প্রশ্নের ক্ষেত্রে মননের প্রয়োজন অস্বীকার করবার নয়। কাজেই কৌতুক ও রসের জল্পনায় যা আপাত অর্থহীন—অথচ অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধির পর সেই কৌতুক-কল্পনা পাঠকের দরবারে যৌতুক-জল্পনা রূপে আনন্দ দেয়, মনোরাজ্যে ঢুকে পড়ে আসর জাঁকিয়ে বসে। মন স্বাধীন বলেই সেখানে কৌতুক-কল্পনার প্রবেশ-দ্বার অবারিত। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এই কৌতুক-কল্পনার স্থান রয়েছে। আপেক্ষিক গুরুত্বে যেখানে তারতম্যের কথাও সংগতিপূর্ণ অর্থেই স্বাভাবিক। শিল্পে-সাহিত্যে-সমাজে ইতিহাসে যাঁদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত—সেইসব মানুষের কৌতুক-কল্পনা বা অঘটন-জল্পনার বিবৃতির মধ্যে কিছু সচেতন উদ্দেশ্য থেকে যায়, বঙ্কিম কটাক্ষের রসঘন বিবৃতির ইংগিতের মধ্যেও এমন কিছু তাৎপর্য থেকে যায়—যার প্রতিক্রিয়া সমকাল বহন করে এবং উত্তরকালেও যা সংক্রামিত হয়। ভিন্ন পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত হাস্যরস ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে জীবনবোধকে প্রভাবিত করে সরস গল্পের মহলেও ভাববিস্তার কিংবা শিল্পরীতির প্রতিষ্ঠায় প্রার্থিত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। এক দেশের এককালের ভাব-ভাবনা অন্য দেশের অন্যকালের ভাব-ভাবনার মধ্যে পূর্ণতা এবং ঐশ্বর্য এনে দিতে পারে। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসমূলক গল্পগুলির ক্ষেত্রেও বিদেশী অনুরূপ গল্প ধারার রস নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে এবং জোগাতে পারে। সরস গল্পের কল্পনা-জল্পনায়

আমরা বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তাই শিল্পরূপের ব্যাপ্তির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমুখীন হলেও সরস গল্পের কল্পনা-জল্পনা বিশেষ মুহূর্তের মানসিক বিনোদন রূপে দেখা দেয়। কল্পনার মধ্যে হয়তো উৎকেন্দ্রিকতা থাকে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যমুখীন উৎকেন্দ্রিকতার খোলসটুকু ছাড়িয়ে ফেললেই এক যুগের ভাব-ভাবনার রূপক, কাজ ও তার রূপায়ণের স্পষ্ট ইংগিত ভাবী-যুগকেও প্রেরণা জোগাবে। সাহিত্যের সরস গল্পের ধারার মধ্যেও অনুকূল মন্তব্যের স্নিগ্ধতা এবং প্রতিকূল স্বেচ্ছা-বক্তব্য গল্পের চরিত্র, ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। ঘটনার সম্ভাব্যতার মধ্য দিয়ে নির্দোষ জ্বালাহীন কৌতুক যেমন ব্যক্ত হয়—তেমনি তীব্র ব্যঙ্গের প্রদাহ সমস্ত অসংগতির ভ্রষ্টতা থেকে ব্যক্তি-মনকে মুক্তি দান করে, সমাজের সামগ্রিক রূপকে সঞ্জীবিত করে। সরস গল্প তাই শুধুমাত্র কল্পনার সুদ-খাওয়া সুখবিলাস নয়—সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের তাৎপর্যও তা বহন করে!

পশ্চিমের সাহিত্যে হাস্যরসকে উইট-হিউমার-স্যাটায়ার ইত্যাদি প্রকরণগত বর্গে ভাগ করবার রীতি আছে। সে রীতিকে আমরা বাংলা সরস গল্পের ক্ষেত্রেও মেনে নিয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে বহু সাহিত্যিক স্বরূপত কৌতুক-শিল্পী না হয়েও প্রাসঙ্গিক রস হিসেবে হাস্যরসের ব্যবহার করে থাকেন। হাস্যরসের সুমিত ব্যবহার চরিত্র-নির্মিতিতে বা পরিস্থিতি রচনায় পৃথক রসের সংযোগে তাই সাহিত্যে বাড়তি মাত্রা যোগ করে দিতে সমর্থ হয়। হাস্যরসের এই সূক্ষ্ম সাহিত্যিক প্রকৃতি উপলব্ধি করতে গেলে পাশ্চাত্য রসগল্পের কিছু কিছু বিশেষ রচনা, রচয়িতাদের সৃষ্টির অভিপ্রায় ও প্রণালীর সংগে পরিচয় প্রয়োজন। সরস সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তুর প্রয়োগ বা প্রয়োগ-রীতি বিষয়ে শিল্পরসগত ইংগিত রয়েছে, এখনও তার অনেক কিছুই হয়তো ভারতীয় ভাষায় লেখা হয়নি। সম্প্রতি ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা পরিকল্পনাগত রীতির অধীন। ইংরেজী ভাষাশিক্ষা কমে আসছে, কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং কালে বাতিল হবার প্রশ্নাধীন। এ-সবের বিচার মহাকালের উপর ছেড়ে দিলেও ইদানীং বাংলা সাহিত্যে ভাষান্তর ও অনুবাদের কর্মকাণ্ড নিতান্ত অবহেলাযোগ্য নয়। বিদেশী মসলাদার 'চপ-কাট্‌লেট' 'স্বদেশীয় বাংলা ভাষার কলাপাতায়' খাবার চেষ্টা আমাদের মধ্যে অপ্রচুর নয়। সার্থক অনুবাদ এখন আমাদের কাছে আশীর্বাদ-ভরসা দুই-ই। তথাপি বাংলা সরস গল্পের ধারা অনুজ্জ্বল নয়। দীপ্ত প্রত্যয়ে তা ভাস্বর। এই সরস গল্পের ধারা আমাদের মনঃক্ষোভ থেকে অবশ্যই মুক্ত করে। বাংলা সরস গল্পের ইতিহাস ও ধারার সচেতন সহানুভূতিপূর্ণ বিশ্লেষণে প্রমাণিত হবে যে—এই জাতীয় গল্পের ধারা আমাদের মানসিক প্রশান্তিতে পৌঁছে দিয়েছে, অট্টহাসির মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি, ভয় কিংবা শঙ্কার অবসান ঘটিয়েছি। বাংলা সরস গল্পেও আমরা র‍্যাবলের 'পাঁতা গ্রুয়েলিজম্'-এর মতো নির্বিকার দার্শনিক হাসির মন্ত্রেও দীক্ষা নিয়েছি ব্যক্তিগত-সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যর্থতার ক্ষতকে বা ক্রোধ-কান্নার

অভিলাষকে বাংলা সরস গল্পও অদ্ভুত হাসিতে রূপায়িত করেছি—রক্তের মধ্যে জ্বালা-ধরানো সে হাসি সাপের বিষের মত। জোনাথন সুইফ্‌ট, চার্লস ল্যামের সেই হাসির প্রকৃতিকে আমরা বিষবৎ পরিত্যাগ করিনি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই হাসির ঔজ্জ্বল্য রেখে গেছেন 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মধ্যে। অসহ্য ঘৃণা এবং অকৃত্রিম সহানুভূতি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলে গেছে। ব্যক্তি জীবনের নৈরাশ্য আর ব্যর্থতার হাসির আবরণের তলায় 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ লুকিয়ে রয়েছে নিবিড় কান্নার নিটোল মুক্তোবিন্দু। বাংলা সাহিত্যে সরস গল্পের ধারায় আমরা বহন করছি ব্যক্তিগত-সামাজিক-রাষ্ট্রিক যন্ত্রণা—কিন্তু জীবনের ছন্দকে ভারগ্রস্ত করতে আমরা চাইনি। কথার বা মনের ভুল বা যে কোন ধরনের আতিশয্যের রূপকে উৎসারিত হাসির মধ্য দিয়ে সেই যন্ত্রণা ভুলতে চেয়েছি। কখন চতুর কৌতুকের দীপ্তিতে, কখনও বা 'প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে অক্সিজেন' টেনে নেওয়ার মতো হাসির মধ্য দিয়ে দিন যাপনের ক্লান্তি থেকে মুক্ত হতে চেয়েছি। উতরোল রঙ্গরসে মত্ত হয়েও সোচ্চারে প্রমাণ করতে চেয়েছি—জীবনের সব কিছুই ফুরিয়ে যায়নি। সেই বিশ্বাসের রক্ষা-কবচেও পুরে নিয়েছি—আশা, ভাষা, ভালোবাসা। আর তা দিয়েই নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছি স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ।

আমাদের সরস গল্প-সংকলনে বাঙালীর সামাজিক দ্বন্দ্বের সংগতি-অসংগতির কোলাহল পর্বের সেকালীন সংরক্ষণপন্থী নায়ক, 'ধর্মসভা' এবং 'সমাচার পত্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত আখ্যান প্রথমেই বিধৃত। সমাজের পক্ষে যিনি ধৃতাস্ত্র যোদ্ধা। কিন্তু সদিচ্ছা সত্ত্বেও ধনিকতন্ত্রের কুরুচি, সামাজিক বিকৃতির নির্মম নিন্দাবাদ তিনি করেছেন। কুরুচির বিরুদ্ধে অভিযান করতে গিয়ে কুরুচির দ্বার নিজেই উন্মোচন করলেও বাংলা সরস গল্পে ভবানীচরণের ভূমিকা ঐতিহাসিক। নব্যকালের সন্ধিলগ্নের বিমূঢ়তা তাঁর মধ্য দিয়ে সংরক্ষণপন্থী শিবিরে কৌতুক ও ব্যঙ্গের দ্বার যেমন মুক্ত করে দিয়েছে—তেমনি একই সমাজ-পটভূমি থেকে নতুন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র নীতি প্রচারের সংগে সংগে জীবনের প্রতিবাদের সকৌতুক স্বরূপও তুলে ধরেছেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ-রসিকতার ধারা বাংলা সরস গল্পকে কিভাবে পুষ্ট করেছে, কিভাবে তা পরিবর্তিত যুগ ও কালের রুচির পরিবর্তন এনেছে, পালা-বদলের সংগে সংগে কিভাবে গল্পের আঙ্গিকের মধ্যেও অনিবার্য ও কাম্য সার্থক শিল্পাদর্শের পরিবর্তন এসেছে—তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপও পরিবেশিত সরস গল্পগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। নকশা আর রহস্য ছাড়িয়ে সরস গল্প যথার্থ শিল্পমূল্যে কিভাবে পরিণতি লাভ করেছে—সংকলন গ্রন্থখানি সেই পরিচয়েরও নিদর্শন।

এ-কালের ভূয়োদর্শী অভিজ্ঞতা জীবনের ঘটকে যে ভাবে ভরে দিয়েছে, তাতে সরস গল্পের মজলিসী বৈঠক স্তব্ধ হয়ে গেছে, চুটকি তালের গালগল্প থেমে গেছে। অথচ এককালে সে গল্পের ধারা ছিল আকাটা হীরের মতো। একটু মাজাঘষা করে নিলেই যার সূচীমুখ থেকে বিদ্যুতের কণা বিচ্ছুরিত হত।

আমরা আজ জীবনযাত্রায় জর্জরিত। কৃষক-শ্রমজীবীর সমস্যা কিংবা 'লিবিডো'-প্রধান নরনারীর চিত্ততলের গহীন গাঙ্গে 'ডুইব্যা' মরবার সংকেতে ইংগিতে গম্ভীর-ভাবে হাসিকে ছুটি দিয়ে আমরা সাহিত্যসৃষ্টিতে কিংবা পাঠে মগ্ন হয়েছি। বিস্ময় হার-মানানো নিরাবলম্ব শূন্যতায় আজ জীবন যে রকম—সেই বাস্তব-ভিত্তিক ছবি আঁকতে গিয়ে জীবনব্যাধিজর্জর স্বাস্থ্যহীন মনের চিত্র তুলে ধরতে চাইছি। যেখানে জীবনের অস্তিত্ব একটুখানি প্রাপ্তির কারণে সোচ্চারশোভাযাত্রায় পা ফেলে চলেছে, অহরহ যখন পৃথিবীটা পালটাচ্ছে, জীবনে হারাবার হাহাকার যখন প্রতিমুহূর্ত অন্তরে বিচ্ছিন্নতার তীব্র জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে, যখন নীল আকাশটা অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে কিংবা একমাঠ প্রসারিত কাশফুলের ওড়াউড়ির মধ্যে স্বতন্ত্র আনন্দের স্বাদ পাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি—তখন এই মানসিক স্বাস্থ্যহানির জন্য প্রয়োজন হাসির এবং তা এনে দেবে বুকভরা স্বাস্থ্য। দুর্ভাগ্যকে জয় করবার সামর্থ্যে তখন আমরা সমর্থ হবো। গ্রন্থখানির মধ্যে সেই উদ্দেশ্যও রয়েছে—রসভোগের অগ্নিমান্দ্য কাটাবার সহায়ক হিসেবে গ্রন্থখানি হয়তো বড় মাপের 'গাইডবুকের' কাজও করবে।

গল্প সংকলনে আমরা প্রত্যেক লেখকদের কাছে কিংবা প্রয়াত লেখকদের আত্মীয়-পরিজনের কাছে ঋণী। তাঁরা গল্পগুলি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর গল্প দুটি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করবার অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থন বিভাগ আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রখ্যাত কবি-শিল্পী-চলচ্চিত্রকার পূর্ণেন্দু পত্রী গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপট রচনা ও অলঙ্করণ করে দিয়ে গ্রন্থখানির সৌকর্য বাড়িয়েছেন। তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

গ্রন্থটি পরিকল্পনার কাজে সহায়তা করবার ও উৎসাহ-দানের ক্ষেত্রে নেপথ্যে রয়েছেন—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নিমাইসাধন বসু, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয়া লীনা বসু, ডঃ শ্রীমতী জলি সেনগুপ্ত, ডঃ সুপ্রতীক বসু এবং শ্রীমান রাজর্ষি সেনগুপ্ত।

গ্রন্থটির প্রেস-কপি তৈরীর কাজে এবং প্রকাশনা-সংক্রান্ত নানা কাজে সহায়তা করেছেন কল্যাণীয় স্নেহের বিষ্ণুপদ বেরা, রাখাল পাল, শিবনাথ রায়, কল্যাণীয়া স্নেহের গৌরী গোস্বামী, মিতা দাস, রেখা চৌধুরী, শোভা সাহা, আলপনা দাস, মহুয়া ভৌমিক, সুচিস্মিতা মৈত্র।

'সরস গল্প' সমাদৃত হলে ধন্য হব।

বিনীত

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবুর উপাখ্যান

বাবু লেখাপড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্বশাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙালির ধারা ব্যবহার বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদনুযায়ি কর্মও সকল করা হইয়াছে। এইক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবংধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্মিকতা সৌজন্য বিচার বাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল। বিশেষ দেখ।

সাহেব লোকের ধারা একটা আছে সকালে বিকালে গাড়ীতে কিংবা ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়ান।

বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন, চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন। তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল। সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতে ছিলেন, দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এইক্ষণে যে

পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্য কোন পথে যাইতেছিলেন ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর আসন বিবেচনা করিয়া পিঠ হইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেক ; বাবু ছাই গাদায় পড়িয়া হাতে মুখে ছাই মাখিয়া সহীসের কান্ধে হাত দিয়া বাটী আইলেন। ঘোড়া দৌড়িয়া যাইতে-ছিল কোন সাহেব দেখিয়া আপন সহীসকে হুকুম দিয়া ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।

সাহেব লোকের ব্যবহার এই যে যাহার সঙ্গে যে কথা কহেন তাহা অন্যথা হয় না অর্থাৎ মিথ্যা কহেন না।

বাবুর নিকটে অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে যদি কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃ-মাতৃ বিয়োগাদি দুঃখ জানায় তাহাতে কহেন আমি কিছু দিব না যাও আর দিক করিও না ইহা শুনিয়া বাবুর কাছে মান্য কোন কোন লোক সুপারিশ করে তাহাতে উত্তর করেন তোমরা কি আমাকে বাঙ্গালির মত করিতে কহ ; একবার বলিয়াছি দিব না পুনরায় দিলে আমার কথা মিথ্যা হইবেক আমার প্রাণ থাকিতেও ইহা হইবেক না মানুষের একই কথা।

সাহেব লোক যদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন তবে প্রায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।

বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস দাসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে সেইপ্রকার ইংরাজী ঘুসা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিট্রুল লে আও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন তাহাতে ঐ দীন দুঃখীরা পলায়ন করে। বাবু সেই সময়ে আপন মনে পুরুষার্থ বিবেচনা করেন।

সাহেব লোক রবিবার রবিবার গির্জায় গিয়া থাকেন অন্যবারে বিষয় কর্ম করেন।

বাবু এই বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রবিবার বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান কখন শকের যাত্রা খেঁউড় গীত শুনিয়া থাকেন।

সাহেব লোক সৌজন্য প্রকাশ করেন—যদি কোন লোক আপদগ্রস্ত হয় তবে তাহার বাটীতে গিয়া নানা প্রকারে তাহার আপদুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

বাবুর নিকটে যদি কোন লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছুদিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানায় কেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানে পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রীলোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।

সাহেব লোক আদালত হইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।

বাবু শালিশ হইলেন প্রায় আদালত সকলি বুঝেন এবং ইংলিশ বুক দেখিয়া থাকেন শালিশ হইয়া চারি মাসেও একবার বৈঠক করেন না যদি অনেক উপাসনাতে দুই তিন বৎসরে বৈঠক হয় তবে যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।

সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে ত-কার দ-কার স্থানে ট-কার উচ্চারণ করেন।

বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ এই সকল ছাতারের নৃত্য কিনা বিবেচনা করিবেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র

বাবুরামবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের বিবরণ

সূর্য অস্ত হইতেছে—পশ্চিম দিকে আকাশ নানা রঙ্গে শোভিত! জলে স্থলে দিবাকরের চঞ্চল আভা যেন মৃদু মৃদু হাসিতেছে,—বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে। এমত সময়ে বাহিরে যাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বৈদ্যবাটীর সরে রাস্তায় কয়েক জন বাবু ভেয়ে হো হো মার মার ধর ধর শব্দে চলিয়াছে—কেহ কাহার ঘাড়ের উপর পড়িতেছে—কেহ কাহার ভার ভাঙ্গিয়া দিতেছে—কেহ কাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার ঝাঁকা ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার খাদ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতেছে—কেহ বা লম্বা সুরে গান হাঁকিয়া দিতেছে—কেহ বা কুকুর-ডাক ডাকিতেছে। রাস্তার দোধারি লোক পালাই পালাই ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে—সকলেই ভয়ে জড়সড় ও কেঁচো—মনে করিতেছে আজ বাঁচলে অনেক দিন বাঁচবো। যেমন ঝড় চারিদিগে তোলপাড় করিয়া হু হু শব্দে বেগে বয়, নববাবুদিগের দঙ্গল সেই মত চলিয়াছে। এ গুণ পুরুষেরা কে? আর কে! এঁরা সেই সকল পুণ্যশ্লোক—এঁরা মতিলাল, হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ ও অন্যান্য দ্বিতীয় নন্দরাজা ও যুধিষ্ঠির। কোন দিকেই দৃক্‌পাত নাই—একেবারে ফুল্লারবিন্দ—মত্ততায় মাথা ভারি—গুমরে যেন

গড়িয়া পড়েন। সকলে আপন মনেই চলিয়াছেন—এমন সময়ে গ্রামের বুড় মজুমদার, মাথায় শিক্কা ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে একহাতে লাঠি ও আর এক হাতে গোটা দুই বেগুন লইয়া ঠকর ঠকর করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল, অমনি সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রং জুড়ে দিল। মজুমদার কিছু কানে খাট—তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—আরে কও তোমার স্ত্রী কেমন আছেন? মজুমদার উত্তর করিলেন—পুড়িয়া খেতে হবে—অমনি তাহারা হাহা হাহা, হো হো, লিক লিক, ফিক ফিক হাসির গর্রায় ছেয়ে ফেলিল। মজুমদার মোহারা কাটিয়া চম্পট দিতে চান কিন্তু তাহার ছাড়ান নাই। নববাবুরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গঙ্গার ঘাটের নিকট বসাইল। এক ছিলিম গুড়ুক খাওয়াইয়া বলিল—মজুমদার! কর্তার বের নাকালটা বিস্তারিত করিয়া বল দেখি—তুমি কবি—তোমার মুখের কথা বড় মিষ্ট লাগে, না বল্‌লে ছেড়ে দিব না এবং তোমার স্ত্রীর কাছে এক্‌খুনি গিয়া বলিব তোমার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। মজুমদার দেখিল বিষম প্রমাদ; না বলিলে ছাড়ান নাই—লাচারে লাঠি ও বেগুন রাখিয়া কথা আরম্ভ করিল।

দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব? কর্তার সঙ্গে গিয়া ভাল আক্কেল পাইয়াছি। সন্ধ্যা হয় হয় এমত সময়ে বলাগড়ের ঘাটে নৌকা লাগ্‌লো। কতকগুলিন স্ত্রীলোক জল আনিতে আসিয়াছিল, কর্তাকে দেখিয়া তাহারা একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পরস্পর বলাবলি করতে লাগ্‌লো—আ মরি! কি চমৎকার বর। যার কপালে ইনি পড়বেন সে একেবারে এঁকে চাঁপাফুল করে খোঁপাতে রাখ্‌বে। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল—বুড়ো হউক ছুড় হউক তবু একে মেয়েমানুষটা চক্ষে দেখ্‌তে পাবে তো? সেও তো অনেক ভাল। আমার যেমন পোড়া কপাল এমন যেন আর কারো হয় না, ছয় বৎসরের সময় বে হয় কিন্তু স্বামী কেমন চক্ষে দেখনু না—শুনেছি তাঁর পঞ্চাশ ষাটটি বিয়ে, বয়েস আশী বচ্চরের উপর—থুরথুরে বুড় কিন্তু টাকা পেলে বে করতে আলেন না! বড় অধর্ম না হলে আর মেয়েমানুষের কুলীনের ঘরে জন্ম হয় না। আর একজন বলিল—ওগো জল তোলা হয়ো থাকে তো চলে চল—ঘাটে এসে আর বাক্‌চাতুরীতে কাজ নাই—তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে আমার যার সঙ্গে বে হয় তাঁর তখন অন্তর্জলী হচ্ছিল। কুলীন বামুনদের কি ধর্ম আছে না কর্ম আছে—এ সব কথা বললে কি হবে? পেটের কথা পেটে রাখাই ভাল। মেয়েগুলোর কথোপকথন শুনে আমার কিছু দুঃখ উপস্থিত হইল ও যাওন কালীন বেণীবাবুর কথা স্মরণ হইতে লাগিল। পরে বলাগড়ে উঠিয়া সওয়ারির অনেক চেষ্টা করা গেল কিন্তু একজন কাহারও পাওয়া গেল না। লগ্ন ভ্রষ্ট হয় এজন্য সকলকে চলিয়া যাইতে হইল। কাদাতে হেঁকোচ হোঁকোচ করিয়া কন্যাকর্তার বাটীতে উপস্থিত হওয়া গেল। দঁকে পড়িয়া আমাদিগের কর্তার যে বেশ হইয়াছিল তাহা কি বল্‌ব? একটা এঁড়ে গরুর উপর বসালেই সাক্ষাৎ মহাদেব হইতেন আর

ঠকচাচা ও বক্রেশ্বরকে নন্দীভৃঙ্গীর ন্যায় দেখাইত। শুনিয়াছিলাম যে দানসামগ্রী অনেক দিবে, দালানে উঠিয়া দেখিলাম সে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। আশা ভগ্ন হওয়াতে ঠকচাচা এদিক্ ওদিক্ চান—গুমরে গুমরে বেড়ান—আমি মুচ্‌কে মুচকে হাসি ও এক এক বার ভাবি এস্থলে সাটে হেঁ হুঁ দেওয়া ভাল। বর স্ত্রী আচার করতে গেল, ছোট বড় অনেক মেয়ে ঝুনুর ঝুনুর করিয়া চারিদিকে আসিয়া বর দেখিয়া আঁত্‌কে পড়িল, যখন চারি চক্ষে চাওয়াচায়ি হয় তখন কর্তাকে চস্‌মা নাকে দিতে হইয়াছিল—মেয়েগুলো খিল খিল করিয়া হাসিয়া ঠাট্টা জুড়ে দিল—কর্তা খেপে উঠে ঠকচাচা ২ বলিয়া ডাকেন—ঠকচাচা বাটীর ভিতর দৌড়ে যাইতে উদ্যত হন—অমনি কন্যাকর্তার লোকেরা তাহাকে আচ্ছা করে আল্‌গা ২ রকমে যেখানে শুইয়ে দেয়—বাঞ্ছারামবাবু তেরিয়া হইয়া উঠেন তাঁরও উত্তম মাধ্যম হয় বক্রেশ্বরও অর্ধচন্দ্রের দাপটে গলাফুলা পায়রা হন। এই সকল গোলযোগ দেখিয়া আমি বরযাত্রীদিগকে ছাড়িয়া কন্যাযাত্রীদিগের পালে মিশিয়া গেলুম, তার পরে কে কোথায় গেল তাহা কিছুই বলিতে পারি না কিন্তু ঠকচাচাকে ডুলি করিয়া আসিতে হইয়াছিল।—কথাই আছে লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। এক্ষণে যে কবিতা করিয়াছি তাহা শুন।

ঠকচাচা মহাশয়, সদা করি মহাশয়,
বাবুরামে দেন কানে মন্ত্র।
বাবুরাম অঘা অতি, হইয়াছে ভীমরথী,
ঠকবাক্য শ্রুতি স্মৃতি, তন্ত্র॥
ধনাশয়ে সদোন্মত্ত, ধর্মাধর্ম নাহি তত্ত্ব,
অর্থ কিসে থাকিবে বাড়িবে।
সদা এই আন্দোলন, সৎকর্মে নাহি মন,
মন হৈল করিবেন বিয়ে॥
সবে বলে ছিছি ছিছি, এ বয়সে মিছামিছি,
নালা কেটে কেন আন জল।
জাজ্বল্য যে পরিবার, পৌত্র হইবে আবার,
অভাব তোমার কিসে বল॥
কোন কথা নাহি শোনে, স্থির করে মনে মনে,
ভারি দাঁও মারিব বিয়েতে।
করিলেন নৌকাভাড়া, চলিলেন খাড়া খাড়া,
স্বজন ও লোকজন সাতে॥

বেণীবাবু মানা করে, কে তাঁহার কথা ধরে,
ঘরে গিয়া ভাত তিনি খান।
বেচারাম সদা চটা, ঠকে বলে ঠেঁটা বেটা,
দুঁর দুঁর করে তিনি যান ।।
গণ্ডগ্রাম বলাগোড়, রামা সবে পেতে গড়,
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে করে ঠাট্টা।
বাবুরাম ছট্‌ফট্‌, দেখে বড় সুসংকট,
ভয় পান পাছে লাগে বাট্টা ।।
দর্পণ সম্মুখে লয়ে, মুখ দেখে ভয়ে ভয়ে,
রামা সবে কেন দেয় বাধা।
চুলগুলি ঘন বাঁধে, হাত দিয়া ঠক কাঁধে,
হৃষ্ট মনে চলয়ে তাগাদা ।।
পিছলেতে লণ্ডভণ্ড, গড়ায় যেন কুষ্মাণ্ড,
উৎসাহে আহ্লাদে মন ভরা।
পরিজন লোকজন, দেখে বামন ভবন,
কাদা চেহলায় আদমরা ।।
যেমন বর পৌছিল, হাড়কাটে গলা দিল,
ঠক আশা আসা হল সার।
কোথায় বা রূপা সোনা, সোনা মাত্র হল শোনা,
কোথায় বা মুকুতার হার ।।
ঠক করে তেরিমেরি, স্বন্দোবাজ বাধায় ভারি,
মনে রাগ মনে সবে মারে।
স্ত্রী আচারে বর যায়, ঝুনু ঝুনু রামা ধায়,
বর দেখে হাক থুতে সারে ।।
ছি ছি ছি, এই ঢোস্কা কি ঐ মেয়েটির বর লো।
পেট্টা লেও, ফোগ্‌লারাম, ঠিক আহ্লাদে বুড় গো।
চুলগুলি কিবা কাল, মুখখানি তোবড়া ভাল, নাকেতে
চস্‌মা দিয়া, সাজালো জুজুবুড় গো।
মেয়েটি সোনার লতা, হায় কি হল বিধাতা, কুলীনের
কর্মকাণ্ডে, ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ লো।
বুড় বর জবর জবর, থর্‌ থর্‌ কাঁপিছে।
চক্ষু কট্‌ মট্‌মট্‌ সট্‌সট্‌ করিছে।
নাহি কথা ঊর্ধ্ব মাথা পেয়ে ব্যথা ডাকিছে।
ঠকচাচা একি ঢাঁচা মোকে বাঁচা বলিছে।

লম্ফঝম্প ভূমিকম্প ঠক লম্ফ দিতেছে।
দারোয়ান হান্‌হান্‌ সান্‌সান্‌ ধরিছে।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি গোঁফ দাড়ি ঢাকিছে।
নাথি কীল যেন শিল পিল্‌পিল্‌ পড়িছে।
এই পর্ব দেখে সর্ব হয়ে খর্ব ভাগিছে।
নমস্কার এ ব্যাপার বাঁচা ভার হইছে।
মজুমদার দেখে দ্বার আত্মসার করিছে।
মার্‌ মার্‌ ঘের্‌ঘার্‌ ধর্‌ ধর্‌ বাড়িছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুবর্ণ গোলক

কৈলাস-শিখরে, নবমুকুল শোভিত দেবদারু তলায় শার্দূল-চর্মাসনে বসিয়া হরপার্বতী পাশা খেলিতেছিলেন, বাজি একটি স্বর্ণ গোলক। মহাদেবের খেলার দোষ এই আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্র মন্থনের সময় বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু—প্রমাণ পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন পূজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অদ্বিতীয়া, কেননা, তিনিই আদ্যাশক্তি। মহাদেবের ভালো দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাধান—আপনার যদি পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোয়া বারো। হাঁকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ করেন—সে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেবের দান দেখিয়াও দেখিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্বতীকে স্বীকৃত কাঞ্চন গোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া পঞ্চানন ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন ?"

উমা কহিলেন, "প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোনো অপূর্ব শক্তি

বিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।"

গিরিশ বলিলেন, "ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু এবং আমি এই তিনজনে যে সকল নিয়ম নিবন্ধ করিয়া সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয় করিতেছি, তাহার ব্যতিক্রমে কখনো মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার, তাহা সেই সকল নিয়মাবলীর বলেই ঘটিবে। কাঞ্চন গোলকের কোনো প্রয়োজন নাই। যদি ইহার কোনো মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়মভঙ্গ দোষে লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য দর্শন করো।"

কালীকান্ত বসু বড়োবাবু। বয়স বৎসর পঁয়ত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল, পুণর্বার দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্তবাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিলেন। শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামে বাস। কালীকান্ত ঘাঠে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্ট মাণ্টো বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে কালীকান্তবাবু দেখিলেন, একটি স্বর্ণ গোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন; দেখিলেন, সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন, বলিলেন, "এটা সোনার দেখিতেছি, কেহ হারাইয়া থাকিবে। যদি কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ি লইয়া যাব। এখন রাখ।"

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে পথে পোর্ট মাণ্টো নামাইল। পরে কালীকান্তবাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। কিন্তু রামা আর পোর্ট মাণ্টো মাথায় তুলিল না। কালীকান্তবাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল, "ওরে রামা!"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা!" রামা বলিল, "তুই বড়ো বে-আদব, দেখিস্, যেন আমার শ্বশুরেবাড়ি গিয়া বে-আদবি করিস্ না। তাহারা ভদ্রলোক।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে তা কি পারি? আপনি হচ্ছেন মুনিব—আপনার কাছে কি বে-আদবি করিতে পারি?"

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, "প্রভো, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার স্বর্ণ গোলকের কি গুণ এ?"

মহাদেব বলিলেন, "গোলকের গুণ চিত্ত বিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি ভাবিব, আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু, কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর; কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা, রামাকে ভাবিতেছে কালীকান্তবাবু।"

কালীকান্তবাবু যখন শ্বশুরবাড়ি পৌঁছিলেন, তখন তাহার শ্বশুর অন্তঃপুরে। কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে, "আরে ও খানসামাজি, তোর হুঁয়া মত বইঠিও—তোম হামারা পাশ আও?" শুনিয়া রামা গরম হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে—"যা বেটা মেড়ুয়াবাদী, যা তোর আপনার কাজ করগে।"

দ্বারবান্ পোর্টমাণ্টো নামাইয়া দিল। কালীকান্ত বলিল, "দরওয়ানজি, বাবুকে অপমান করিও না, উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

দ্বারবান্ জামাই বাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল, যেখানে জামাইবাবু ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোনো ছদ্মবেশী বড়লোক হইবেন। দ্বারবান্ তখন ভক্তিভাবে রামাকে যুক্ত করে আশীর্বাদ করিয়া কহিল, "গোলাম কি কসুর মাপ কিজিয়ে।" রামা কহিল, "আচ্ছা তামাকু ভেজ দেও।"

শ্বশুর বাড়ির খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য। সে-ই বাঁধা হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিল, রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া কলিকায় তামাকু খাইতে লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া বলিল, "দাদা ঠাকুর, এ কি এ?" কালীকান্ত কহিল, "ওর সাক্ষাতে কি তামাক্ খাইতে পারি?"

উদ্ধব গিয়া অন্তঃপুরে কর্তাকে সংবাদ দিল, "জামাইবাবু আসিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাইবাবু তাঁকে বড়ো মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্যন্ত খান না।"

কর্তা নীলরতনবাবু শীঘ্র বহির্বাটীতে আসিলেন। কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া দূরে হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধুলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, "সঙ্গের লোকটা সভ্য ভব্য বটে তবে জামাই বাবাজীকে কেমন কেমন দেখিতেছি।"

নীলরতনবাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কথাবার্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকান্ত বলিল, "বাপরে, আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি? আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তারপর আমার হবে এখন। আমি, মা ঠাকরুন, আপনাদের খাচ্ছিই তো।"

মা ঠাকরুণ শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, "জামাইবাবু আমাকে একজন শ্বাশুড়ী টাশুড়ী মনে করিয়াছেন—না করবেন কেন, আমাকে ভালো মানুষের মেয়ে বইতো আর ছোটোলোকের মেয়ের মতো দেখায় না। ওঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিনতে পারেন—কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকই মানুষ চেনে না।'

মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দোষী রামার উপর প্রহার বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্ত্র মধ্য হইতে লুকানো স্বর্ণ গোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাকরাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতনবাবুর হস্তে দিল। বলিল, "ও মিন্‌সে চোর! দেখুন, ও একটা সোনার তাল চুরি করিয়া রাখিয়াছে।"

"দেখি" বলিয়া নীলরতনবাবু স্বর্ণ গোলক হস্তে লইলেন,—অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন; তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া কাঁচা করিয়া পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, "তুই মাগী আবার এর ভিতরে এলি কেন?"

তরঙ্গ বলিল, "কাকে মাগী বলিতেছিস্?"

উদ্ধব বলিল, "তোকে।"

"আমাকে ঠাট্টা?" এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া নীলরতনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন দেখি কর্তা মহাশয়, মাগীর কত বড় স্পর্ধা, আমাকে জুতা মারে!" কর্তা তখন একটুখানি ঘোমটা টানিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "তা মেরেছেন মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। মুনিব—মারতে পারেন।"

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ও আবার কিসের মুনিব-ও-ও চাকর, আমিও চাকর, আপনি এমনই আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি এমন চাকরি করি না!" শুনিয়া কর্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি, বুড়ো বয়সে মিন্‌সের রস দেখো? আমার চাকর আবার তুমি কিসের হতে গেলে?"

উদ্ধব অবাক হইল; মনে করিল, "আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি?" উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইল তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। এদিকে কর্তা মহাশয় গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন। গোবর্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "তুমি উহার ভিতর যাইও না।" গোবর্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল সে কথা তাহার কানে গেল না, সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। "নচ্ছার মাগী, তোর হায়া নেই" এই বলিয়া গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া তরঙ্গ বলিল, "গোবরা, তুইও কি পাগল হয়েছিস্ নাকি? যা, গোরুর জাব দি গে যা। শুনিয়া গোবর্দ্ধন তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া

নীলরতনবাবু বলিলেন, "যা। পোড়া-কপালে মিন্সে কর্তাকে ঠেঙাইয়া খুন করলে!" এদিকে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া "আমার গায়ে হাত তুলিস" বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড়ো গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা সুবর্ণ গোলক পড়িয়া আছে দেখিয়া, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয়, এটা কি?"

কৈলাসে পার্বতী বলিলেন, "প্রভো, আপনার গোলক সংবরণ করুন—ওই দেখুন। গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্যাকে পত্নী সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা তাহার আচরণ দেখিয়া তাকে সম্মার্জনী প্রহার করিতেছে। এদিকে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায় আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া তাহার অন্তঃপুরে গিয়া তাহার ভার্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মুহূর্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সংবরণ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে? কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সংবৃত করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে এবং যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না। তবে, লোক হিতার্থে আমার বরে বঙ্গ দর্শন এই কথা পৃথিবী মধ্যে প্রচারিত করিবে।"

কালীপ্রসন্ন সিংহ

তুমি রাধা, আমি শ্যাম

পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব-তন্ত্রের গুরু-প্রসাদি প্রথা প্রচলিত ছিল—নতুন বিবাহ হ'লে গুরু সেবা না ক'রে স্বামি-সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক! সুবর্ণ-রেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ী, সকল ঘরবাড়ী পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেওড়ীর সামনের বৈঠকখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ীর সামনে দুটি শিবের মন্দির, একটি শান-বাঁধানো পুষ্করিণী, তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিল। ক্রিয়েকর্মে চক্রবর্তীকে মাছের জন্য ভাবতে হতো না। এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী, চাষের জন্য পাঁচখানা লাঙ্গল, পাঁচজন রাখাল চাকর, পাঁচ জোড়া বলদ নিয়ত নিযুক্ত ছিল। চক্রবর্তীর উঠোনে দুটি বড় বড় ধানের মরাই ছিল, গ্রামস্থ ভদ্রলোক মাত্রেই চক্রবর্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেলতেন। চক্রবর্তীর ছেলেপুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যামাত্র; সহরের ব্রকভানু চাটুয্যের ছেলে হরহরি চাটুয্যের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় বর কনের বয়স ১০।১৫ বছরের বেশী ছিল না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া, কি মেয়ে আনা কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল। কেবল পাল-পার্বণে

পিঠে-সংক্রান্তি ও ষষ্ঠীবাটায় তত্ত্ব-তাবাস চলতো !

ক্রমে হরহরি-বাবু কালেজ ছাড়লেন, এদিকে বয়সও কুড়ি একুশ হলো, সুতরাং চক্রবর্তী জামাই নে যাবার জন্য স্বয়ং সহরে এসে ব্রকভানু-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। ব্রকভানু-বাবু চক্রবর্তীকে কয় দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়ীতে রাখলেন, শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরিরে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। একজন দরোয়ান, একজন সরকার ও একজন চাকর হরহরিবাবুর সঙ্গে গেল।

জামাই-বাবু তিন চার দিনে বেতালপুরে পৌঁছিলেন। গাঁয়ে সোর প'ড়ে গেল, চক্রবর্তীর সহুরে জামাই এসেছে ; গাঁয়ের মেয়েরা কাজ কর্ম ফেলে ছুটোছুটি—জামাই দেখতে এলো ! ছোঁড়ারা সহুরে লোক প্রায় দ্যাখেনি, সুতরাং পালে পালে এসে হরহরি-বাবুরে ঘিরে বোস্‌লো।...চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগলো ; একদিকে আশপাশ থেকে মেয়েরা উঁকি মাচ্চে ; এক পাশে কতকগুলো গোড়িমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েছে ; উঠানে বাজে-লোক ধরে না। শেষে জামাইবাবুকে জলযোগ করাবার জন্য বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্বে জলযোগের যোগাড় করা হয়েছে—পিঁড়ের নীচে চারিদিকে চারটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিল ; জামাইবাবু যেমন পিঁড়েয় পা দিয়ে বসতে যাবেন, অমনি পিঁড়ে গড়িয়ে গেল ; জামাইবাবু ধুপ ক'রে পড়ে গেলেন—শালী-শালাজ-মহলে হাসির গর্‌রা পড়লো ! জলযোগের সকল জিনিসগুলিই ঠাট্টাপোরা। মাটীর কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেশ, কাঠের আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে চাকুনি দেওয়া আরসুলা ও মাকোড়সা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাইবাবু অতি কষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দুচার শালা সম্পর্কের জুটে গেল ; সহরের গল্প তামাসা ও রঙ্গেই দিনটি কেটে গেল।

রজনী উপস্থিত—সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে—রাখালেরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। এক একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে ক'রে নদীতে জল নিতে আসচে—লম্পট শিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদের দেখবার জন্যই বাঁশ ঝাড়ে ও তালগাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্চেন। ঝিঁঝি পোকা ও উইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাকচে। ভাম, খটাস ও ভোঁদড়েরা ভাঙ্গা শিবের মন্দির ও পড়ো বাড়ীতে ঘুরে বেড়াচ্চে। চামচিকে ও বাদুড়েরা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে ; এমন সময় একদল শিয়াল ডেকে উঠলো—এক প্রহর রাত্রি হয়ে গেল। ছেলেরা জামাইবাবুরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল, পুনরায় নানারকম ঠাট্টা ও বাসল খেয়ে—জামাইবাবু নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুতে গেলেন।

বিবাহের পর পুনর্বিবাহের সময়েও জামাইবাবু শ্বশুরালয়ে যান নাই ; সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন দুই জনেই বালক-বালিকা ছিলেন। সুতরাং হরহরি-বাবুর নিদ্রা হবার বিষয়

কি ? আজ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, স্ত্রী মান ক'রে থাকলে তিনি কলেজী এড়ুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধ'রে মান ভাঙবেন এবং এর পর যাতে স্ত্রী লেখাপড়া শিখেন ও চিরহৃদয়-তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে থাকবেন। বাঙ্গালীর স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া 'মিস স্টো, মিস টমসন ও মিসেস বরকরলি ও লেডী বুলয়ার লিটন' হতে পারে না। বিলিতী স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীলা—তবে কেন বড়ী দিয়ে, পুতুল খেলে ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটায় ? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এক খনির মণি ? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল 'ফরনেসে' বন্ধ হ'য়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ-মা ও ভাতারবর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ত্রুটি মাত্র। বাঙ্গালী সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না ! বিদ্যাসাগরের স্ত্রীর হয়তো বর্ণ-পরিচয় হয় নাই ; গঙ্গাজলের ছড়া—সার্ফরিদের মাদুরী ও বালসির চন্নামেত্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ! এ ভিন্ন জামাইবাবুর মনে নানা রকম খেয়াল উঠলো, ক্রমে সেই সব ভাবতে ভাবতে ও পথের ক্লেশে অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময়ে মেয়েদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেখেন যে, বেলা হ'য়ে গিয়েচে—তিনি একলা বিছনায় শুয়ে আছেন।

এদিকে চক্রবর্তীর বাড়ীর গিন্নীরা বলাবলি কত্তে লাগলেন যে, 'তাই তো গা ! জামাই এসেচেন, মেয়েও যেটের কোলে বছর পোনের হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক।' সুতরাং চক্রবর্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির ক'রে, প্রভুর বাড়ী খবর দিলে—প্রভু তুরী, খুন্তি ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন ! গুরু-প্রসাদির আয়োজন হতে লাগলো।

হরহরিবাবু প্রকৃত রহস্য কিছুমাত্র জানতেন না, গোঁসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত, বাড়ীর সকলে শশব্যস্ত ! স্ত্রী নূতন কাপড় ও সর্বালঙ্কারে ভূষিত হয়ে বেড়াচে ! সুতরাং তিনি এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'ওহে, আজ বাড়ীতে কিসের ধূম ?' ছোকরা বল্লে, 'জামাইবাবু, তা জান না, আজ আমাদের গুরুপ্রসাদি হবে।'

'আমাদের গুরুপ্রসাদি হবে' শুনে হরহরিবাবু একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন ও কি প্রকারে কুৎসিত গুরুপ্রসাদি হতে স্ত্রী পরিত্রাণ পান, তারি তদ্বিরে ব্যস্ত রইলেন।

কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যথায় উপেক্ষা ক'রে অস্ত গেল্লেন। সন্ধ্যাবধূ শাঁক ঘণ্টা ও ঝিঁঝি পোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগলেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, নিশানাথকে সংবাদ দিতে গেলেন। নববধূর বাসরে আমোদ করবার জন্য তারাদল একে একে উদয় হ'লেন, কুমুদিনী

স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন—হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও, তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর তিনিই একমাত্র অনন্য গতি! এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেয়ালেরা যেন স্তব পাঠ কত্তে লাগলো—ফুল গাছেরা ফুলদল উপহার দিতে লাগলো দেখে আহ্লাদে প্রকৃতি সত্য হাসতে লাগলেন।

চক্রবর্তী বাড়ীর ভিতর বড় ধুম! গোস্বামী বরের মত সজ্জা ক'রে জামাইবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন। হরহরি-বাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুকলেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগলো।

হরহরি-বাবু ছোঁড়ার কাছে শুনে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন; এক্ষণে দেখলেন যে, স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম ক'রে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো; প্রভু খাট থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন; কন্যাটি কি কবে! বংশ পরম্পরানুগত 'ধর্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ' এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—শুড় শুড় ক'রে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, বল 'আমি রাধা তুমি শ্যাম'; কন্যাটিও অনুমতিমত 'আমি রাধা তুমি শ্যাম' তিনবার বলেছে, এমন সময় হরহরি-বাবু আর থাকলে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে 'এই কাঁদে বাড়ি বলরাম' ব'লে রুলসই কত্তে লাগলেন। ঘরের বাইরে ন্যাড়া বষ্টমেরা খোল-কত্তাল নিয়ে ছিল—গোস্বামীর রুলসইয়ের চীৎকারে তারা হরিবোল ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগলো; মেয়েরা উলু দিতে লাগলো; কাঁসের ঘণ্টা শাঁকের শব্দে হুলস্থুল পড়ে গেল। হরহরি-বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্লেন। দারোগা ভদ্রলোক ছিলেন, (অতি কম পাওয়া যায়); তাঁরে অভয় দিয়ে সে দিন যথা সমাদরে বাসায় রেখে, তার পরদিন বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে সকলের তাক্ লেগে গেল, ইনি কেমন ক'রে ঘরে গিয়েছিলেন। শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দেখে যে, গোস্বামীর দাঁতে দাঁতকপাটি লেগে গেচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে। সেই অবধি গুরু-প্রসাদি উঠে গেল, লোকের চৈতন্য হলো; প্রভুরাও ভয় পেলেন।

দা ৩৪৫৬

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ত্রী-স্বাধীনতা

কামিনীসুন্দরী বসু বিকাল বেলায় আপিস হইতে বাসায় আসিলেন। বৈঠকখানার বারান্দায় একখানা চেয়ারে পা ঝুলাইয়া বসিলেন। তামাক সাজা ছিল, মেনকা খানসামানী আলবোলার নলটা কামিনী বসুর হাতে তুলিয়া দিল; তিনি মৃদুমন্দ ভাবে টানিতে লাগিলেন। এদিকে মেনকা সেই অবসরে জুতা জোড়াটি, মোজা জোড়াটি খুলিয়া লইল, চটি জুতা পরাইয়া দিল, গাউনের বন্ধ-ছন্দ খুলিয়া দিল, দিয়া শাড়িখানি হাতে করিরা সসম্ভ্রমে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তামাকের আশ মিটিলে, কামিনীসুন্দরী বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শাড়িখানি মেনকা বাড়াইয়া দিল, তিনি গাউন ছাড়িয়া শাড়ি পরিলেন। অন্দরের এক ছোঁড়া চাকর সেই সময়ে সম্মুখের উঠান দিয়া পুকুরের ঘাটে একটা গেলাস ধুইতে যাইতেছিল, কামিনীসুন্দরীকে দেখিয়া কোঁচার আঁচলটা মাথায় টানিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই মুখ হাত ধুইয়া কামিনীসুন্দরী বসু অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কামিনীসুন্দরীর যৎসামান্য বাহির-ফটকা রোগ ছিল। তা থাকুক,

কিন্তু পরিবারের প্রতি তাহার অযত্ন ছিল না। আপিসের ফেরৎ রোজকারের টাকার অধিকাংশই বাটির ভিতর গিয়া দিতেন, আর সেই সময়ে দুটো খোস গল্প করিয়া দিবসের অবসাদ নষ্ট এবং অর্ধাঙ্গের মন তুষ্ট করিতেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ তাহাতেই আহ্লাদে অধীর।

কামিনীসুন্দরীর পরিবার একহারা, গৌরবর্ণ, দিব্য ফুটফুটে ছোকরাটি। তাঁহার সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফ রেখাঙ্কের অবস্থা ছাড়াইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও লতাইয়া পড়ে নাই। হরিতালের কল্যাণে গালপাট্টা প্রকট হইতে পারে নাই। মাথায় আলবার্ট কাটা টেড়ি, কোঁচার কাপড়ে অর্ধাবৃত। পরিবারের নাম ভৈরব দাস, কিন্তু কামিনীসুন্দরী আদর করিয়া তাহাকে ভয়ী বলিয়া ডাকেন। ভয়ী কামিনীসুন্দরী বসুর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার।

দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার সচরাচর যেমন প্রবল হয়, মুখর হয়, প্রগল্‌ভ হয়, ভৈরব সেরূপ নহেন। কামিনীসুন্দরী বসুর প্রথম পক্ষের এক কন্যা আছেন, কিন্তু ভৈরবের ব্যবহারে সেটি যে সপত্নীর কন্যা তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না.—ভৈরব এমনি শান্ত, এমনি সৎস্বভাব, এমনি স্নেহময়। এহেন ভৈরবকে কামিনীসুন্দরী বসু ভালবাসিবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি? অদ্য দশ আঙ্গুলে দশটা হীরার আংটি, হাতে চুড়ি, বালা, গলার চিক, কোমরে সোনার চন্দ্রহার, আরও (নাম জানি না) কত কি অলংকার সুকোমল শরীরের নানা অঙ্গে পরিয়া, জল খাবারের থালা সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া ভৈরব বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কামিনীসুন্দরী হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসনে বসিয়া কামিনীসুন্দরী বসু বলিলেন,—"কি ভয়ি! আজ যে বড়ো বাহার দেখচি! শরীরটে বাঁধা দিয়েছ, প্রাণটা কেড়ে নিয়েচ, এখন কি নেবে?"

ভৈরব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া, মৃদু হাস্যে ভুবন ভুলাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,— "প্রাণনাথিনি! আমার বাহার তো তোমারই নিমিত্তে। আমায় যতদিন তুমি ভালবাসিবে, যতদিন তোমার অনুগ্রহ থাকিবে, ততদিনই আমার বাহার। এখন সাহস আছে, ভালবাসো, তাই এ বাহারও আছে; বারণ করো, আর বাহারও করিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে ভৈরবের চক্ষু যেন ছল ছল করিয়া আসিল।

কামিনীসুন্দরী তখনও আহারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাড়াতাড়ি ভৈরবের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"ছি ছি ছি ভয়ি। আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিতে ও কথা বললাম? রোজ রোজ এমন সাজ গোজ দেখি না, সেই জন্যেই রহস্য করে একটা কথা বললাম। তুমি আমার উপর রাগ করলে?"

পত্নীর সোহাগে কোন্ সাধু পতির মন না গলিয়া যায়? ভৈরব পরিহাসের স্বর অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—"তোমার মন বুঝিবার জন্য অমন করিলাম, তাহাও বুঝিলে না। আজ ও বাড়ির দাদা একবার দেখা করতে চেয়েচেন, তাই

মনে করেছি যে, তুমি যদি বলো, তবে একবার তাঁর সঙ্গে দেখাটা করে আসি।"

কামিনীসুন্দরী বসুর ইচ্ছা নয় যে, এমন সময়ে ভৈরব কোথাও যান। তিনি ভৈরবকে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু সে ভালবাসায় ঈর্ষা ছিল না, এমন কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। ভৈরবের কথার উত্তর না দিয়া কামিনীসুন্দরী বসু বলিলেন,—"তোমাদের বৌয়ের স্বভাবটা বড়ো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেদিন মন্দাকিনীর বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়ে কি ঢলাঢলিটে না করলে? আবার শুনচি যে মেছো বাজারে জীবনকৃষ্ণের বাড়িও যাতায়াত আরম্ভ করেচে; কেউ কেউ বলে তাকে বাঁধা রেখেচে। সত্যি মিথ্যা ভগবান জানেন।" অদ্য সন্ধ্যার পর জীবন-কৃষ্ণের বাড়িতে কামিনীসুন্দরী বসু এবং তাঁহার ইয়ারিণীদের মজলিস হইবার কথা আছে, ভৈরবকে তাহা আর বলিলেন না। হয়তো পাছে ভৈরব আপন দাদার মুখে কিছু ইঙ্গিত পায়, সে ভয়েও তিনি কথা চাপিয়া গেলেন।

তাহাতে কিন্তু ভৈরব দাস বুঝিলেন না। দাদার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, কামিনীসুন্দরী বসুর মনে ঈর্ষা ছিল; কেন, বলা যায় না। কিন্তু আজ সেই ঈর্ষা সন্দেহে পরিণত হইল। ভালো করিয়া জল খাওয়াও হইল না, একটা বিশেষ কাজ আছে বলিয়া ওজর করিয়া কামিনীসুন্দরী বসু তাড়াতাড়ি বাহির বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবার সময়, ভৈরবের জলধারা ভৈরবের কপোল দেশ অভিষিক্ত করিতেছে, দেখিয়া আসিলেন, তাহাতে চিত্ত আরও উদ্‌ভ্রান্ত হইল।

পাঠ প্রকোষ্ঠে বসিয়া কামিনীসুন্দরী বসু অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিন্তার অবসান না হইয়া বাহুল্যই হইতে লাগিল। তখন সেই খানসামানী মেনকাকে ডাকিলেন। মেনকা মনের গতি জানিত, সুরাপূর্ণ ডিকান্টার, গেলাস, জল, বরফ সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কথাটি না কহিয়া—আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দুষ্ট লোকে বলে, মদ আনিবার সময়ে মেনকা এক গন্ডূষ আপন গলায় না দিয়া আনিত না এবং গন্ধের আশঙ্কাতেই কথা কহিত না। কিন্তু সে দুষ্ট লোকের কথা। সে কালে পুরুষেরা স্বাধীন ছিল, তখন বাবুদের খানসামারও ঐ অপবাদ শুনা যাইত।

দুই গেলাসে মদ ক্রমে ক্রমে কামিনীসুন্দরী বসুর উদরে পড়িল। তাহার পর নিজ গুণে নিজ মূর্তি ধরিয়া দুই গেলাসই তাঁহার মাথায় গিয়া উঠিল।

তখন কামিনীসুন্দরী বসু কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া, তাহার পর দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় "জীবনকৃষ্ণ নাচে ভালো" এই কথা কয়টি অর্ধস্ফুট স্বরে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

চল পাঠকে! কামিনীসুন্দরী বসুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাই—(উচ্ছন্নে?)।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাধরীর অরুচি

প্রথম অধ্যায়

গোলাপীর হিংসা।

গোলাপী ঝি বলিল—'দেখ বিদ্যাধরি! বাবুর মুখে তুমি আর চুণকালি দিও না। আমাদের বাবু একজন বড় উকীল। নীলাম্বর ঘোষের নাম কে না জানে? তাঁর বাড়ীর ঝি হইয়া তুমি মুদীর দোকানে একটু গুড়, উড়ের দোকানে একটি ফুলুরী, ময়রার দোকানে একটু চিনির রস, রায় বামনীর কাছে একটু মোচার ঘণ্ট, যার তার কাছে তো জিনিস মাগিয়া বেড়াইলে বাবুর অপমান হয়। বাবুর কথা দূরে থাক, আমাদের পর্যন্ত ঘাড় হেঁট হয়। তোমার মাগার জ্বালায় লোকের কাছে আমরা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না।'

বিদ্যাধরী ফোঁস করিয়া বলিল,—'তোমরা সকল তাতেই আমার ছল ধর। মা আমাকে একটু ভালবাসেন, তাই সকলে তোমরা ফাটিয়া মর। আমার অরুচি, মুখে কিছু ভাল লাগে না। চড়াই পাখীর আহার। না খাইয়া যেন দড়ি হইয়া যাইতেছি। গতর না থাকিলে পরের বাড়ী কাজ করিব কি করিয়া? তাই তেঁতুল দিয়া, গুড় দিয়া, যা দিয়া পারি এক মুঠা ভাত খাইতে চেষ্টা করি। আমি গরীব মানুষ। পয়সা কোথা পাইব যে, সন্দেশ রসগোল্লা কিনিব? মুদী আমাকে ভালবাসে, তাই সেদিন আমাকে একটু গুড়

দিয়াছিল। ময়রা আমাকে ভালবাসে, তাই সেদিন আমাকে শালপাতের ঠোঙা করিয়া রসগোল্লার খানিক রস দিয়াছিল। তাতে তোমরা হিংসায় ফাটিয়া মর কেন বল দেখি ?'

পিতেম বলিল,—'তোমার অরুচি! পাথরটি টই-টম্বর করিয়া বামুন ঠাকুর তোমাকে ভাত দেয়, তারপর দুইবার তিনবার তুমি ভাত চাহিয়া লও। এই ত তোমার অরুচি! এর উপর যদি রুচি থাকিত, তাহা হইলে ঘোড়াশালের ঘোড়া, হাতীশালের হাতী খাইতে। অনেক বাবুর বাড়ী চাকুরী করিয়াছি, অনেক ঝি দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত মাগন্তুড়ে বেহায়া ঝি কখনও দেখি নাই। বামুন ঠাকুব! তুমি বল দেখি, এ মাগী তিন জনের খোরাক একেলা খায় কি না।'

ছিদেম বলিল,—'দেখ বিদ্যাধরি! লোকের কাছে গিয়া যা তা বলা ভাল নয়, তাতে মনিবের অপমান হয়। আমি রসুই করি, নিজে আমি তোমাকে ভাত দিই। সকলের চেয়ে তোমাকে আমি বেশী তরকারী দিই। তোমার বাছা, আবার অরুচি কোথায় ?'

গোলাপী বলিল,—'নোলা যদি সামলাইতে না পার, সন্দেশ-রসগোল্লা যদি খাইতে সাধ হয়, তাহা হইলে পয়সা দিয়া কিনিয়া খাও না কেন ? তুমি গরীব, তোমার পয়সা নাই ? তোমার গলায় অমন মোটা সোনার দানা, হাতে অমন মোটা তাগা! আর কতবার তুমি আমাকে বলিয়াছ যে, তোমার খোলার ঘরে তক্তোপায়ের খুরোর নীচে তুমি ছয়শ টাকা হাঁড়ি করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছ। সর্বশুদ্ধ তোমার সেই যার নাম—হাজার টাকা আছে। বিধবা হইয়া পর্যন্ত আমি চাকরাণীগিরি করিতেছি। আমার হাজারটা কড়া-কড়ি নাই। এই পিতেম ছেলেবেলা হইতে খানসামাগিরি করিতেছে। কত টাকা সে করিয়াছে ? ছিদেম বামুনঠাকুর দেশে জমী বাঁধা দিয়া বে করিয়াছে। এখনও সে, সে দেনা শোধ করিতে পারে নাই। তবে তার মেয়েটি বড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই মেয়েটিকে বেচিয়া যদি সে কিছু সমস্থান করিতে পারে।'

বিদ্যাধরী বলিল,—'আমার পৃথিবীতে কে আছে ? একদিন এক মুঠা ভাত দেয়, এমন আর নাই। কাজেই মাহিনাটি যাহা পাই, সেটি আমাকে রাখিতে হয় ; ধার-ধোর দিয়া সেটিকে আমাকে বাড়াইতে হয়। তোমার ভাবনা কি বাছা! তোমার ভাই আছে, ভাই-পো আছে। অসময়ে তারা তোমার খোঁজ-খবর লইবে।'

ছিদেম বলিল,—'সকলের কাছে তুমি বল যে, তুমি না খাইয়া খাইয়া

রোগা হইয়া যাইতেছ। কিন্তু রোজ রোজ তুমি মোটা হইতেছ। গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।'

বিদ্যাধরী বলিল,—'তুমি আমায় খুঁড়িলে। তোমার মাগ মরুক, তোমার মেয়ে মরুক। মেয়ে বেচিয়া টাকা করিবার অহঙ্কার তোমার ঘুচুক।'

ছিদেম ব্রাহ্মণ বলিল,—দেখলে পিতেম। দেখলে গোলাপী! আমি এমন কি বলিয়াছি যে, মাগী আমাকে এমন শক্ত গালি দিল। গিন্নী মায়ের মাগিশো ঝি, তাই জন্য এত অহঙ্কার। গিন্নী-মা বলেন যে, আমার মাথা ঘোরে, আমার বুক ধড় ধড় করে, আমার তিনশ ষাটখানা ব্যায়রাম। বিদ্যাধরী সেই কথায় বাতাস দেয়। তাই গিন্নী-মা ইহাকে এত ভালবাসেন। কিন্তু সকল কথা যদি বলিয়া দিই, তাহা হইলে দুইদিন এখানে থাকিতে পারে না। হাঁরে মাগী! সেদিন গিন্নী-মায়ের জন্য চা করিবার সময় এক থাবা চিনি কে মুখে দিয়াছিল? কড়ার এক পাশে সরের উপর একটু ছেঁদা করিয়া দুধ খাইবার জন্য সকলে আমরা এক আধ ঢোক দুধ খাই-ই। কিন্তু সেদিন সমুদয় কড়া হইতে দুধের সরটুকু কে তুলিয়া খাইয়াছিল? সেদিন মাছ কুটিতে কুটিতে কে কই মাছের পেট থেকে ডিমটুকু বাহির করিয়া লইয়াছিল?

গোলাপী বলিল,—'পূর্বে চাউল, দাল, তেল যাহা কিছু আমরা বাঁচাইতাম, সকলে ভাগ করিয়া লইতাম। এখন তুমি সেগুলি সব নিজে লও। এ কি ভাল? আমরা কি চাকরী করিতে আসি নাই? সেদিন মোচার ঘণ্টের জন্য উপর হইতে ভিজে ছোলা আর নারিকেল-কোরা আসিয়াছিল। তাহার অর্ধেকগুলি তুমি নিজে খাইলে। তারপর, একদিন সকালবেলা গিন্নীর জন্য টাটকা গরম গরম জিলেপি আসিয়াছিল। তার পাশ হইতে পাপড়ি ভাঙ্গিয়া তুমি এতগুলি জমা করিলে। সবগুলি তুমি নিজে খাইলে। কেন বলিলে না যে, গোলাপী! তুইও দুই একটা পাপড়ি খা। কেন বাছা, আমাদের কি মুখ নাই? না—ভাল-মন্দ জিনিস খাইতে আমাদের সাধ হয় না?'

নীলাম্বর ঘোষের রান্নাঘরে চারিজনে এইরূপ তুমুল বাকযুদ্ধ বাধিয়া গেল। একদিকে ছিদেম ব্রাহ্মণ, পিতেম চাকর ও গোলাপী ঝি। একদিকে তিনজন, অন্যদিকে বিদ্যাধরী ঝি একা! সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যু কতক্ষণ বিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে? বিদ্যাধরীকে শীঘ্রই পরাভব মানিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুষোত্তমের সৌভাগ্য।

কাঁদিতে কাঁদিতে গিন্নীমায়ের নিকট গিয়া বিদ্যাধরী বলিল,—'মা! বামুন ঠাকুর বলে যে, তোমার কোন ব্যায়রাম নাই,—সব ঠাট! তোমার মাথা ঘোরে না, তোমার বুক ধড় ধড় করে না! সোহাগ করিয়া তুমি বাবুর টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছ। তোমার অরুচি নাই, তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।'

গিন্নী বলিলেন,···'বটে! বামুনের তো আস্পর্ধা কম নয়, ছোট মুখে বড় কথা।' বিদ্যাধরী বলিল,—'আমিও মা, সেই কথা বলি। আমি বলিলাম, দেখ বামুনঠাকুর, মনিবকে অমন কথা বলিতে নাই, মাকে আমি অষ্টপ্রহর দেখিতেছি। তাঁর যে কত অসুখ, সে কথা আর বলিব কি! কেবল আমার সেবার জোরে তিনি বাঁচিয়া আছেন। এই কথা মা,—আমি যেই বলিয়াছি, আর পোড়ারমুখো বামুন আমাকে কেবল ধরিয়া মারে নাই। কত গালি দিল, কত কুকথা সে যে আমাকে বলিল,—সে কথা মা, তোমাকে আমি আর কি বলিব! সে একা নয়। বাবুর সখের চাকর, পোড়ারমুখো পিতেম, আর আঁটকুড়ী গোলাপীও তার সঙ্গে যোগ দিল! তুমি আমার মা, একটু ভালবাসো, সেইজন্য সকলের হিংসা। তা আমি মা! আর তোমার কাছে থাকিতে চাই না। তুমি মা, অন্য ঝি দেখিয়া লও।'

পরদিন নীলাম্বর ছিদেম ব্রাহ্মণকে ডিসমিস করিলেন ও পিতেম এবং গোলাপীকে অনেক তিরস্কার করিলেন।

বিদ্যাধরী নিজে মনোনীত করিয়া আর একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিল। এ ব্রাহ্মণের যেরূপ মুখশ্রী লক্ষ লোকের মধ্যেও সেরূপ একটা মুখশ্রী হয় না। মুখমণ্ডলটি প্রকাণ্ড, কিন্তু যতটা দীর্ঘে, প্রস্থে ততটা নহে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু বসন্তের দাগে সমুদয় মুখখানি নানা আকারের গর্তে এত পূর্ণ হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের প্রকৃত বর্ণ কি, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। গণ্ডদেশের উপর হাড় দুইটি এত উচ্চ হইয়া আছে যে, দুই পার্শ্বে চক্ষু দুইটি যেন দুইটি কূপের মত বোধ হয়। দুই চক্ষুর মাঝখানে নাসিকা অতি দীর্ঘ ও উচ্চ। মুখের হাঁ বৃহৎ পুষ্করিণীর ন্যায় প্রশস্ত। সে মুখের হাসি

দেখিলে মানুষের আত্মা-প্রাণ শুকাইয়া যায়। ব্রাহ্মণের নাম পুরুষোত্তম, বাস উৎকল দেশ।

ঝগড়ার পর বিদ্যাধরী, কিছুদিন ধরিয়া মুদী ও ময়রা কাহার নিকট আর কিছু চায় নাই।

দুই দিন পরে সে পুরুষোত্তমকে বলিল,—'বামুনঠাকুর! আমাকে তুমি যেমন তেমন ঝি মনে করিও না। এই দেখ, গলায় আমার সোনার দানা; এই দেখ, হাতে আমার মোটা তাগা। আর আমার ঘরে হাঁড়ি করিয়া ছয়শ টাকা আমি পুতিয়া রাখিয়াছি। কোন কুলে আমার কেহ নাই। আমি অধিক দিন বাঁচিব না। আমার বড় অরুচি। বৈকাল বেলা রোজ চক্ষু জ্বালা করিয়া জ্বর হয়। বাঁচিতে আমার সাধ নাই। মরণ হইলেই বাঁচি! কিন্তু পোড়া যম আমাকে ভুলিয়া আছে। আত্মহত্যা করিলে অগতি হইবে, তা না হইলে আমি কোন কালে আফিম খাইয়া, কি গলায় দড়ি দিয়া, কি জলে ডুবিয়া মরিতাম। যাহা হউক, অধিক দিন আমি আর বাঁচিব না। আমার গহনা ও টাকাগুলি আমার মরণের পর তোমার মত কোন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে পায়, তাহাই আমার ইচ্ছা।'

পুরুষোত্তমের মুখ প্রফুল্ল হইল। সে বলিল—'না, না;—তুমি এখন অনেকদিন বাঁচিবে। তোমার ব্যায়রাম তত কঠিন নয়। টাকা পাই না পাই,—মায়ের মত আমি তোমার সেবা করিব। সময় অসময়ে আমি তোমাকে দেখিব।'

বিদ্যাধরী বলিল,—'সে আর অধিক দিন দেখিতে হইবে না। নিজের শরীর আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তা ছাড়া বাঁচিতে আর আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। টাকাগুলি তোমাকে আমি দিয়া যাব। বাবু উকীল; উইল কাহাকে বলে, তা আমি জানি। গিন্নীর নামে বাবু উইল করিয়াছেন। একখানা কাগজে লিখিলেই হইবে যে, অমুককে আমি আমার টাকা গহনা দিয়া যাইলাম! তা করিলেই তুমি সব পাইবে। কিন্তু একথা প্রকাশ করিও না।'

সেইদিন হইতে পুরুষোত্তম যত মাছ, যত তরকারী বিদ্যাধরীর পাতে চাপাইতে লাগিল। পিতেম ও গোলাপী কিছু পায় না। সে জন্য তাহারা ক্রমাগত গজ গজ করিতে লাগিল, কিন্তু বাবুর তিরস্কারের ভয়ে প্রকাশ্য ঝগড়া করিতে পারিল না।

চারি পাঁচ দিন পরে বিদ্যাধরী একখানা কাগজ আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিল। পুরুষোত্তম সেই কাগজ কোন লোককে দিয়া পড়াইয়া দেখিল।

বিদ্যাধরীর মৃত্যুর পর সমুদয় সম্পত্তি সে পাইবে, কাগজে এইরূপ লেখা ছিল। পুরুষোত্তম আরও জানিয়া দেখিল যে, এরূপ কাগজকে উইল বলে, এইরূপ উইল করিয়া লোক আপনার সম্পত্তি অন্য লোককে প্রদান করে।

পুরুষোত্তমের মন আনন্দে পরিপূর্ণ। সেই দিন হইতে গোয়ালিনীকে বলিয়া বিদ্যাধরীর জন্য সে এক পোয়া করিয়া দুধের রোজ করিয়া দিল। সেই দিন হইতে সে নিজের পয়সা দিয়া মেঠাই-মোণ্ডা প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস বিদ্যাধরীকে খাওয়াইতে লাগিল।

একদিন বিদ্যাধরী বলিল,—'আমার আর বিলম্ব নাই। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে,—বিদ্যাধরী! দিন দিন তুই যেন পাখী হইয়া যাইতেছিস। মুখে যেন তোর কালি মাড়িয়া দিয়াছে, বড় জোর আর তিন মাস।' আমি বলিলাম,—'কবিরাজ মহাশয়! বাঁচিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। রোগের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। নিজ হাতে বিষ খাইয়া মরিলে অগতি হইবে। ঔষধের সঙ্গে যদি একটু বিষ দিয়া আপনি আমাকে মারিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার বড় পুণ্য হয়।' কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—'না রে না! তা আর করিতে হইবে না। তোর নাড়ির গতিক যেরূপ, তাহাতে বড় জোর আর তিন মাস।'

পুরুষোত্তম বিদ্যাধরীর দিকে চাহিয়া দেখিল। পূর্বে যদি সে এক পাথর ভাত খাইত, এখন সে দুই পাথর ভাত খায়। রোগা হওয়া দূরে থাকুক, পুরুষোত্তমের নিকট হইতে ভাল ভাল আহারীয় দ্রব্য পাইয়া দিন দিন সে যেন ফুলিয়া উঠিতেছিল। আজ তিন মাস পুরুষোত্তম তাহার দেখাশুনা করিতেছিল। আজ তিন মাস সে আপনার মাহিনা দেশে পাঠায় নাই। সমুদয় টাকা বিদ্যাধরীর জন্য খরচ করিয়াছিল।

আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। বিদ্যাধরী মরে না! ভাল ভাল জিনিস খাইয়া তাহার শরীরে বরং কান্তি ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। এ পর্যন্ত বিদ্যাধরীর জন্য পুরুষোত্তমের পঁচিশ টাকা খরচ হইয়াছিল। পুরুষোত্তমের মনে খটকা জন্মিল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাণ মুগরো গাছের শিকড়।

এক দিকে পিতেম চাকর ও গোলাপী ঝি, অপর দিকে পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ও বিদ্যাধরী ঝি, ইহাদের মধ্যে সর্বদা ঝগড়া হইতে লাগিল। একদিন বিদ্যাধরীকে গোলাপী বলিল,—'তোমার কি বিবেচনা! আজ সকালবেলা বাবুর জন্য তুমি সন্দেশ কিনিয়া আনিলে। বাবুকে দিবার পূর্বে, বামুন-ঠাকুরকে তুমি দুইবার চাটিতে দিলে, তাহার পর সন্দেশটি তুমি নিজে দশবার চাটিলে। কেন বলিলে না যে, গোলাপী! তুই দুইবার চাট। কোন জিনিস পাইলে সকলকে ভাগ দিয়া খাইতে হয়। আমিও ঝি, তুমিও ঝি। আমাকে ভাগ দিয়া না খাইলে তোমার অধর্ম হয়, তা জান? মাথার উপর ভগবান আছেন, তিনি বিচার করিবেন। আর এই চাবড়া-মুখো বামুনের কি আক্কেল? আহা, মুখখানি তো নয়—যেন ডায়মনকাটা আড়াই হাত শীতলা। পোড়ার-মুখোরা আর ঠাকুর খুঁজিয়া পায় নাই, জগন্নাথকে ঠাকুর করা হইয়াছে; না আছে নাক, না আছে কান। যে হাতে বিদ্যাধরীকে সব জিনিস দিস জগন্নাথের মত তোর সেই হাত ঠুঁটো হউক। মরণ আর কি?'

গোলাপীর গালিতে পুরুষোত্তমের শরীর জ্বর জ্বর হইল। এ দিকে বিদ্যাধরীর অরুচি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বিদ্যাধরী বলে, 'বামুনঠাকুর, বড় অরুচি! যদি ক্ষীরমোহন পাই, তাহা হইলে বোধ হয় কষ্টে শ্রেষ্ঠে একটা খাইতে পারি।' আবার কোন কোন দিন সে বলে,—'সর-ভাজা বেচিতে আসিয়াছে। বড় অরুচি। একটু যদি সরভাজা পাই, তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখি, খাইতে পারি কিনা।' আবার কোন দিন বলে,—'বামুনঠাকুর, শুনিয়াছি বাগবাজারে এক রকম সন্দেশ আছে, তাহার নাম 'আবার খাব', যদি আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বোধ হয় একটু রুচি হয়।' এইরূপ নিত্য নিত্য বিদ্যাধরীর আবদার। পুরুষোত্তম কি করিতে পারে না। কাজেই সেই সমুদয় দ্রব্য তাহাকে আনিয়া দিতে হয়। কিন্তু বিদ্যাধরীর মরণ হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন সে তেলের কুপোর মত মোটা হইতে লাগিল। পুরুষোত্তম তাহার শরীরের দিকে চাহিয়া দেখে আর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। একদিন পুরুষোত্তম মুদীর দোকানে বসিয়া আছে। মুদী জিজ্ঞাসা

করিল,—'ব্রাহ্মণঠাকুর! তোমাদের বিদ্যাধরী ঝিয়ের অরুচি সারিয়াছে?'

পুরুষোত্তম উত্তর করিল,—'বিদ্যাধরীর অরুচি! আগে যদি সে এক পাথর ভাত খাইত, এখন সে দুই পাথর ভাত খায়।'

'বটে!' এই কথা বলিয়া মুদী একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মুদী বলিল,—"বিদ্যাধরীর ব্যায়রাম বাড়িতেছে? কবিরাজ মহাশয় তাহার নাড়ী ধরিয়া বলিয়াছেন যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না। সেই জন্য আমার নিকট হইতে প্রতিদিন সে এক ছটাক ঘি লইয়া যায়, আর পানা করিয়া খাইবার জন্য রোজ সে আধ পোয়া বাতাসা লইয়া যায়।'

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—'দাম দিয়া?'

মুদী উত্তর করিল,—'না, আমার ছেলেকে সে বড় ভালবাসে। বিদ্যাধরীর যাহা কিছু আছে, সে আমার ছেলেকে দিয়া যাবে। আমার ছেলের নামে সে উইল করিয়াছে।'

পুরুষোত্তমের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। মুদী তাহার সছিদ্র বাক্স হইতে উইল বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। পুরুষোত্তমও আপনার উইল আনিয়া মুদীকে দেখাইল। তখন ইহারা বুঝিল যে, সমুদয় বিদ্যাধরীর চালাকি! দানা, অনন্ত ও টাকার লোভ দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সে ফাঁকি দিয়া খাইতেছে। অনুসন্ধান করিতে করিতে আরও প্রকাশ পাইল যে, ময়রাকে একখানি সেইরূপ উইল দিয়া বিদ্যাধরী, অনেক টাকার সন্দেশ খাইয়াছে। গোয়ালাকে সেইরূপ একখানি উইল দিয়া সে দুধ, রাবড়ী ও মাখন খাইয়াছে। উড়ে দোকানদারকে উইল দিয়া, সে মুড়ির চাক্তি আর তেলেভাজা বেগুনি খাইয়াছে। এইরূপ সকলকে এক একখানি উইল দিয়া, অনেক লোকের নিকট হইতে সে অনেক দ্রব্য খাইয়াছে।

একটা সামান্য স্ত্রীলোক তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে—সেই লজ্জায় পুরুষোত্তম কাহাকেও কোন কথা বলিল না। বিশেষতঃ সে ভাবিল যে,—'মাগীর কাছ হইতে এ টাকা যেমন করিয়া হউক, আমায় আদায় করিতে হইবে। এ কথা লইয়া যদি আমি গোল করি, তাহা হইলে সকলে কেবল হাসিবে, আমার টাকা আদায় হইবে না।' কিন্তু কিরূপে সে টাকা আদায় করিবে? ঝগড়া করিলে কোন ফল হইবে না, ফাঁকি দিয়া আদায় করিতে হইবে।

পুরুষোত্তম ভাবিতে লাগিল। দুই তিন দিন চিন্তা করিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা বিদ্যাধরীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমার জন্য কাল আমি যে মাছের ঝোল রাখিয়াছিলাম, তাহা খাইয়া তুমি কেমন আছ? পেট

জ্বালা করিতেছে?'

বিদ্যাধরী বলিল,—'কেন, পেট-জ্বালা, বুক জ্বালা করিবে কেন? সে মাছের ঝোলে কি ছিল?'

পুরুষোত্তম উত্তর করিল, 'এমন কিছু নয়। তবে তুমি বলিয়াছিলে যে, মরণ হইলেই বাঁচি। তোমাকে যদি কেহ বিষ দিয়া মারে, তাহা হইলে তাহার অনেক পুণ্য হয়। মনে নাই? তুমি কবিরাজ মহাশয়ের কাছ হইতে সেইজন্য ঔষধ চাহিয়াছিলে? আমি ভাবিলাম যে,—'আহা। বিদ্যাধরী রোগের যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইতেছে, বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, তা আমি উহাকে একটু বিষ দিই, যাহাতে শীঘ্র উহার গঙ্গালাভ হয়। তাই আমাদের দেশের প্রাণমুগরো গাছের শিকড় বাটিয়া মাছের ঝোলের সহিত মিশাইয়া দিয়াছিলাম।'

বিদ্যাধরী যেন আকাশ হইতে পড়িল। শশব্যস্ত হইয়া সে বলিল,—'বলিস কি রে আঁটকুড়ীর বেটা! আমাকে বিষ দিয়েছিস! বলিস কি রে—উনুনমুখো ডেকরা বামুন!'

পুরুষোত্তম বলিল, 'তা তুমি তো নিজে আমাকে বার বার বলিয়াছ যে, এক তিল আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। এখন অমন কথা বলিলে চলিবে কেন?'

বিদ্যাধরী বলিল,—'ওরে সর্বনেশে। ওরে আঁটকুড়ো উড়ে বামুন! তোর মনে কি এই ছিল? ওঃ! আমার পেট জ্বলিয়া গেল, আমার বুক জ্বলিয়া গেল। প্রাণ যায়, ওমা! আমার প্রাণ যায়!'

এইরূপ বলিতে বলিতে বিদ্যাধরী সেইখানে ধড়াশ করিয়া শুইয়া পড়িল, আর কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমাগত বলিতে লাগিল, 'আমার পেট গেল, আমার বুক গেল, আমার প্রাণ যায়। ও গিন্নী-মা। তোমার বিদ্যাধরী ঝি যায়। শীঘ্র ডাক্তার লইয়া এস। ও পিতেম! ও গোলাপী! শীঘ্র আয় রে! সকলে মিলিয়া আমার প্রাণ বাঁচা রে। ওমা কালি! আমাকে বাঁচাও মা! তোমাকে জোড়া পাঁঠা দিব, মা! হে বাবা তারকনাথ! আমাকে বাঁচাও বাবা, গণ্ডি দিয়া আমি তোমার মন্দিরে গিয়া পুজো দিব বাবা!'

পাছে অধিক চীৎকার করে, সেজন্য হাত দিয়া পুরুষোত্তম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। পুরুষোত্তম বলিল—'চুপ চুপ।'

বিদ্যাধরী পুনরায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল,—আর বলিল, হাঁ রে আঁটকুড়ীর বেটা! কি গাছের শিকড় দিয়াছিস? চুপ করিব? এখনি আমি থানায় যাইব। তোর হাতে হাতকড়ি দিয়া তোকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইব। ও পিতেম! ওরে শীঘ্র পাহারাওলাকে ডাক! এই আঁটকুড়ীর বেটা আমাকে

বিষ দিয়াছে। আমার টাকা পাইবে, সেজন্য বেটা আমাকে খুন করিয়াছে। ওঃ! পেট আমার জ্বলিয়া গেল! হায় হায়! আমার কি হইল?'

পুরুষোত্তম বলিল, 'চুপ চুপ! যদি তুমি একান্তই মরিতে না ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বিষের কাটান করিতে আমি জানি। সে ঔষধ ডাক্তার বৈদ্য কেহই জানে না। পুলিশের লোকে যদি আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ঔষধ তোমাকে কে দিবে? তাহা হইলে বেঘোরে তুমি মারা যাইবে।'

পুরুষোত্তম বলিল,—সে ঔষধ আনিতে পাঁচ টাকা খরচ হইবে। আমার কাছে এখন একটি পয়সাও নাই! টাকা কোথায় পাইব যে, সে ঔষধ আনিব? আজ এক শিশি খাইলে আপাততঃ তোমার প্রাণটা বাঁচিবে। কিন্তু তাহার পর আরও পাঁচ ছয় শিশি খাইলে বিষটা নির্দোষ হইয়া তোমায় শরীর হইতে যাইবে। আমি গরীব মানুষ! ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা আমি কোথায় পাইব! আগে যদি বলিতে, আমার মরিতে ইচ্ছা নাই, তাহা হইলে মাছের ঝোলের সহিত আমি বিষ দিতাম না।'

বিদ্যাধরী বলিল,—'ওরে আঁটকুড়ীর বেটা! আমি তোকে টাকা দিতেছি। তুই আমার প্রাণ বাঁচা। তুই আমার বাবা! তুই আমার প্রাণ রক্ষা কর। ও মা, আমার পেট আর বুক জ্বলিয়া খাক হইয়া গেল।'

পেটে হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদ্যাধরী ছোট এক অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই ঘর হইতে পাঁচটি টাকা আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিয়া বলিল,—'যা বাবা, যা শীঘ্র যা। যা করিয়াছিস তা করিয়াছিস! এখন আমার প্রাণ বাঁচা।'

পুরুষোত্তম বলিল,—'কোন ভয় নাই! ঔষধ খাইলেই তুমি ভাল হইয়া যাইবে। কাহাকেও কোন কথা বলিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি। যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ খিড়কীর দিকে কলের নীচে বসিয়া মাথায় ও পেটে একটু একটু জল দিতে থাক।'

চতুর্থ অধ্যায়

গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ

এই কথা বলিয়া পুরুষোত্তম বাটী হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যাধরীকে প্রকৃত সে বিষ দেয় নাই। আপনার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত সে এইরূপ ফন্দি করিয়াছিল।

বাটী হইতে বাহির হইয়া সে চারি পয়সা দিয়া একটা শিশি কিনিল। রাস্তার কল হইতে শিশিটি জলে পরিপূর্ণ করিল। তাহার পর এক পয়সার সোডা কিনিয়া সেই জলের সহিত মিশ্রিত করিল। এইরূপে মিছামিছি একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সে বাটী প্রত্যাগমন করিল। মনে করিল যে, এবার পাঁচ টাকা আদায় হইল। আর পাঁচ ছয় শিশি এইরূপ ঔষধ দিতে পারিলেই তাহার সমুদয় টাকা আদায় হইবে।

পুরুষোত্তম যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছিল। সে দেখিল যে, রান্নাঘরের নিকট পিতেম ও গোলাপী বসিয়া সুড় বুড় করিয়া কথা কহিতেছে। কয় মাস ধরিয়া পুরুষোত্তম অন্য চাকর-চাকরাণীদিগকে বঞ্চিত করিয়া, বিদ্যাধরীকে অধিক মাছ ও তরকারী দিয়াছিল, সেজন্য তাহার উপর সকলের রাগ। বিষ প্রদানের কথা পাছে পিতেম কি গোলাপী শুনিয়া থাকে, সেই ভয়ে পুরুষোত্তমের প্রাণ উড়িয়া গেল।

তাহাকে অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না। পিতেম তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—'বামুনঠাকুর! সর্বনাশ করিয়াছ। বিদ্যাধরীকে বিষ দিয়াছ। পুলিশের লোক টের পাইলে এখনি তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর তোমার ফাঁসী হইবে।'

পুরুষোত্তমের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল,—'আমি সত্য সত্য তাহাকে বিষ দিই নাই। মিছামিছি করিয়া বলিয়াছি।'

পিতেম বলিল,—'সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? যদি বিষ দাও নাই, তবে ঔষধ আনিবার জন্য তাহার নিকট হইতে পাঁচ টাকা লইয়াছ কেন? তবে বিদ্যাধরী উন্মাদ, পাগল হইয়াছে কেন?'

আশ্চর্য হইয়া পুরুষোত্তম বলিল, 'উন্মাদ পাগল হইয়াছে? আমি সত্য বলিতেছি, তাহাকে আমি পাগল হইবার ঔষধ দিই নাই।'

পিতেম বলিল,—'সে ভয়ানক উম্মাদ হইয়াছে। আমরা দুইজনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। অনেক কষ্টে তাহাকে আমরা একটু সুস্থ করিয়াছি। কিন্তু সুস্থ হইয়া সে আর এক সর্বনাশ করিয়াছে। বরাবর উপরে গিয়া গিন্নী-মায়ের খাটে গিয়া শুইয়াছে। মা বাগানের কলতলায় কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। উপরে আসিয়া যদি তিনি দেখেন যে, বিদ্যাধরী তাঁহার বিছানায় শুইয়া আছে, তাহা হইলে আর রক্ষা রাখিবেন না। বাবুও এখনি বাড়ী আসিবেন। সকল কথা তখন প্রকাশ হইবে। তখন নিশ্চয় পুলিশ ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিবেন।'

পুরুষোত্তম ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—'দোহাই ভাই! আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা কর। এখন কি করিলে আমি রক্ষা পাই, তা বল ভাই।'

পিতেম উত্তর করিল,—'আমরা অনেক কষ্টে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিছুতেই তাহাকে গিন্নীর খাট হইতে উঠাইতে পারি নাই। তুমি যদি পাঁজা করিয়া কোনরূপে তাহাকে নীচে আনিতে পার, তাহা হইলে উপায় হইতে পারে। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। গিন্নী এখনি উপরে আসিবেন। নিজের বিছানায় বিদ্যাধরীকে দেখিলে তিনি আর রক্ষা রাখিবেন না।'

'পুরুষোত্তম বলিল,—'তবে আমি এখনি যাই।'

গোলাপী বলিল,—'না, অমনি গেলে হইবে না। তাহাকে পাঁজা করিয়া ধরিলেই চীৎকার করিয়া সে ফাটাইয়া দিবে। তাহার চীৎকারে গিন্নী দৌড়িয়া আসিবেন, তাহা হইলে সকল কথা প্রকাশ পাইবে।'

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—'তবে কি করি?'

গোলাপী ঘরের ভিতর হইতে একটি থলি আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিয়া বলিল,—'উপরে গিন্নীর ঘরে গিয়া টপ করিয়া বিদ্যাধরীর মুখে এই থলিটি পরাইয়া দিবে। তাহার পর দুই হাতে পাঁজা করিয়া তাহাকে ধরিবে। কিন্তু সাবধান! মুখ হইতে থলি যেন সে খুলিতে না পারে। তাহার পর জোর করিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া আনিবে। তাহাকে যদি আমাদের কাছে আনিতে পার, তখন আমরা তাহাকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিব।'

থলিটি হাতে লইয়া আর কোন কথা না বলিয়া পুরুষোত্তম তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল।

তাহার পর দ্রুতবেগে গিন্নীর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে, তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। গিন্নীর খাটের উপরে যে শুইয়া

ছিল, পুরুষোত্তম নিকটে গিয়া সহসা তাহার মুখে থলিটি পরাইয়া দিল। মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে, দুই হাতে, কোমর পর্যন্ত তাড়াতাড়ি থলিটি টানিয়া দিল। তাহার পর তাহাকে পাঁজা করিয়া ধরিয়া হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে ঘরের বাহির করিল। সে চিৎকার করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু থলির ভিতর হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না, থলির ভিতর হইতে ঘড় ঘড় আর গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার হাত দুইটি আবদ্ধ ছিল। যথাসাধ্য পা দিয়া সে পুরুষোত্তমকে লাথি মারিতে লাগিল, আর ছটফট করিয়া যথাসাধ্য আপনাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু উড়ে বামুন নাছোড়বন্দা। কতক টানিয়া কতক হিঁচড়াইয়া পুরুষোত্তম তাঁহাকে সিঁড়ির নিকট পর্যন্ত আনিল। এমন সময় সে থলির ভিতর হইতে আপনার দুই হাতের কতকটা বাহির করিয়া ফেলিল।

সেই দুই হাতে পুরুষোত্তমকে প্রাণপণে খিমচাইতে আর থলি ভেদ করিয়া ভিতর হইতে পুরুষোত্তমকে কামড়াইতে লাগিল, আর দুই পায়ে লাথি মারিতে লাগিল। সিঁড়ির উপরে যেন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। তাহার আঁচড়ানি কামড়ানিতে পুরুষোত্তম বড়ই বিব্রত হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে তাহাকে সিঁড়িতে নামাইতে পারিল না। দুই পা আগে যায়, আর এক পা পশ্চাতে গিয়া পড়ে। সিঁড়ির ঠিক উপরে তাহাকে লইয়া পুরুষোত্তম এইরূপ টানাটানি করিতেছে, এমন সময় সিঁড়ির একটু নিম্নে বাড়ীর কর্তাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একে উড়ে ব্রাহ্মণের সেই অদ্ভুত মূর্তি। সেই মূর্তি গুণ মোড়া আর একটা মূর্তিকে লইয়া টানা-হেঁচড়া করিতেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বাবু ভাবিলেন, এ ভূত, না, প্রেত, না পাগল, এ কি? ঘোরতর বিস্মিত হইয়া বাবু বলিলেন,—'এ কি! এ কি!'

চমকিত হইয়া পুরুষোত্তম বাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে দেখিল যে, দুইটা পৈঠার নীচে সিঁড়িতে স্বয়ং বাবু দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাঁহার ঠিক পশ্চাতে আলো হাতে করিয়া স্বয়ং বিদ্যাধরী ঝি দাঁড়াইয়া আছে।

বাবুর পশ্চাতে সিঁড়ির উপর বিদ্যাধরীকে দেখিয়া পুরুষোত্তমের প্রাণ উড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সে চটমোড়া সেই স্ত্রীলোককে সেই স্থানে ফেলিয়া দ্রুতবেগে বাবুর পাশ দিয়া সিঁড়ি হইতে নামিল। নীচে নামিয়া তৎক্ষণাৎ সে বাটী হইতে পলায়ন করিল। আপনার মাহিনা কি কাপড়-চোপড় লইতে আর সে ফিরিয়া আসিল না। সে পর্যন্ত পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণের আর কোন

সন্ধান কেহ পায় নাই। পুরুষোত্তম যখন চলিয়া গেল, তখন বিদ্যাধরী ঝি, গোলাপী ঝি ও পিতেম চাকর সকলেই হাবা সাজিল। তাহারা বলিল,—'ব্রাহ্মণ কেন এরূপ কাজ করিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমরা জানি না।' সেজন্য এ ব্যাপার কেন যে ঘটিয়াছিল, নীলাম্বরবাবু এখনও তাহার সবিশেষ কারণ জানিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা এই যে, উড়ে ব্রাহ্মণ হয় পাগল হইয়াছিল, আর না হয় তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল।

যাহা হউক, নীলাম্বরবাবু তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকের মাথা হইতে থলিটি খুলিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য যে, থলির ভিতর হইতে তাঁহার স্ত্রীর মুখ বাহির হইয়া পড়িল। গিন্নী তখন জ্ঞানশূন্য, মূর্চ্ছিত। অনেক কষ্টে পুনরায় তাঁহার চেতন হইল। তাহার পর, হিষ্টিরিয়া রোগ দ্বারা তিনি আক্রান্ত হইলেন। ছয় মাস কাল পর্যন্ত নানা রোগে তিনি কষ্ট পাইলেন। ডাক্তার বৈদ্য দেখাইয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া, নীলাম্বরবাবু এখন তাঁহাকে ভাল করিয়াছেন। সকলে এখন সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তির উপায়

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীর প্রকৃতি। বৃদ্ধ সমাজে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর, তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারিদিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ংকর উঁচুদরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফ দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুশি ভালোবাসে; এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয় সেও তেমনি নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু, স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত্‌ পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্‌গীতা শুনায়,

এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না। যেদিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাহির হয় সেদিন উক্ত লঘু-প্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হয়। একে নভেল পাঠ, তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা! যাহা হউক, অবিশ্রান্ত আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামী দেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড়ো গম্ভীর প্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্মের উমেদারিতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম জুটিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন সে মনে করিল, "বুদ্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিব।" এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

২

মধ্যে আর একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর একটি বিবাহ করে। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত শৌখিন এবং চপল প্রকৃতি। কোনোপ্রকার গুরুতর কর্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে তো ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিঁকা মারিতে লাগিল, তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল, তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখনো কখনো শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর একটি বিবাহ করিয়াছে; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ

করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

৩

কিছুদিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথ-পার্শ্ববর্তী এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। দারাপুত্র পরিজন কেউ কারও নয়। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।" বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিল।—

"শোন্ রে শোন্ অবোধ মন।
কোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে।"

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। "ও কে ও! বাবা দেখছি। সন্ধান পেয়েছেন বুঝি! তবে তো সর্বনাশ। আবার তো সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন। পালাতে হল।"

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী একগৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চুপচাপ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে হে তুমি।"

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এসো দেখি।

এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের পরে ঝুঁকিয়া বুড়ামানুষ বহু কষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল—

"এই তো আমার সেই মাখনলাল দেখছি। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদলেছে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।"

বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহে ফকিরের শ্মশ্রুল মুখে দুই-একবার হাত বুলাইয়া লইল এবং প্রকাশ্যে কহিল, "বাবা মাখন।"

বলা বাহুল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠীচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম তো মাখন নয়। পূর্বে আমার নাম যাই থাক্ এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী। ইচ্ছে হয় তো পরমানন্দও বলতে পার।

ষষ্ঠী। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল্ আর পরমান্নই বল্, তুই যে আমার মাখন বাবা, সে তো আমি ভুলতে পারব না। বাবা, তুই কোন্ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি। তোর কিসের অভাব। দুই স্ত্রী, বড়োটিকে না ভালবাসিস, ছোটোটি আছে। ছেলে-পিলের দুঃখ নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যা, একটি ছেলে। আর, আমি বুড়ো বাপ, ক-দিনই বা বাঁচব, তোর সংসার তোরই থাকবে।

ফকির একেবারে আঁৎকিয়া উঠিয়া কহিল, "কী সর্বনাশ। শুনলেও যে ভয় হয়।"

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, মন্দ কী, দিন-দুই বৃদ্ধের পুত্র ভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক্, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।

ফকিরকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয় গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল, সেই বটে। কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু, বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র যে সন্দিগ্ধ লোকেদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ায় চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে সতেরো অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোনোমতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াসুদ্ধ লোক আরাম পায়। তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না; আশ্চর্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু, ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত

হাস্যরসিকতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল।

ফকিরের অতি ভীষণ অটল গাম্ভীর্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েছেন, তপস্বী হয়েছেন—চিরটা কাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে, আজ, হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেছেন।"

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নিরুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে মাখন, তুই কুচকুচে কালো ছিলি, রঙটা এমন ফর্সা করলি কী করে।"

ফকির উত্তর দিল, "যোগ অভ্যাস করে।" সকলেই বলিল, "যোগের কী আশ্চর্য প্রভাব।" একজন উত্তর করিল, "আশ্চর্য আর কী। শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুলতে গেলেন কিছুতেই তুলতে পারলেন না। সে কী করে হল। সে তো যোগবলে।"

একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল। হেনকালে ষষ্ঠীচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল, "বাবা, একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্ছে।"

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই—হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল, 'বাবা, আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, আমি অন্তঃপুরে ঢুকতে পারব না।"

ষষ্ঠীচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, "তাহলে আপনাদের একবার গা তুলতে হচ্ছে। বউমাদের এইখানেই নিয়ে আসি।" তাঁরা বড়ো ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল, এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি। কিন্তু রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুক্কুরের মতো তাহার পশ্চাতে ছুটিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমনি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল, ফকির অমনি নতশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, আমি তোমাদের সন্তান।"

অমনি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্গের মতো খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, "ওরে ও পোড়াকপালে মিনসে, তুই মা বললি কাকে।"

অমনি আর একটি কণ্ঠ আরও দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝংকার দিয়া উঠিল, "চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস্ ! তোর মরণ হয় না !"

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাংলা শোনা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির জোড়হস্তে কহিল, "আপনারা ভুল বুঝছেন। আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্ছি, আমাকে একটু ঠাউরে দেখুন।"

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল, "ঢের দেখেছি। দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাওনি। তোমার দুধের দাঁত অনেকদিন ভেঙেছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে। তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরা ভুলব।"

এরূপ এক তরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না—কারণ, ফকির একেবারে বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ প্রবেশ করিল।

বলিল, "এতদিন আমার ঘর নিস্তব্ধ ছিল, একেবারে টুঁ শব্দ ছিল না। আজ মনে হচ্ছে বটে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

ফকির করজোড়ে কহিল, "মশায়, আপনার পুত্রবধূদের হাত থেকে আমাকে রক্ষে করুন।"

ষষ্ঠী। বাবা, অনেকদিন পরে এসেছ, তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্ছে। তা, মা, তোমরা এখন যাও। বাবা মাখন তো এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্ছিনে।

ললনাদ্বয় বিদায় হইলে ফকির ষষ্ঠীচরণকে বলিল, "মশায়, আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে গেছেন, তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারছি। মশায়, আমার প্রণাম জানবেন, আমি চললেম।"

বৃদ্ধ এমনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল, এমন ভণ্ড তপস্বীগিরি এখানে খাটিবে না। ভালো মানুষের ছেলের মতো কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল, "ইনি তো পরমহংস নন, পরম বক।"

গাম্ভীর্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন-সকল কুৎসিত কথা কখনো শুনিতে হয় নাই। যাহা হউক, লোকটা পাছে আবার পালায়, পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠীচরণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

৬

ফকির দেখিল এমনি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনমতে দিন কাটিত। কিন্তু, মাখনের আগমন সংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের এক ঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমত ফকিরের গোঁফদাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল— তাহারা বলিল, এতো সত্যকার গোঁফদাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবর্তী গুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল—প্রথমত মলিয়া, দ্বিতীয়ত এমন-সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন-সকল গান ফরমাশ করিতে লাগিল আধুনিক বড়ো বড়ো নূতন পণ্ডিতেরা যাহার কোনোরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার, নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বল্পাবশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালি মাখাইয়া দিল; আহারকালে কেসুরের পরিবর্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্তে হুঁকার জল, দুধের পরিবর্তে পিঠালি-গোলার আয়োজন করিল; পিঁড়ার নিচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল, লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অভ্রভেদী গাম্ভীর্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ঝাঁকিয়া-হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। কেবল সর্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিষ্ট কন্ঠের উপহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগুণ অধৈর্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠীচরণ কোনো এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ির দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে

কোনো-না-কোনো কুটুম্ব বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেকদিন পরে সে আমার বাড়ী আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরম কৌতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত, কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে এক দণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল, উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল—দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখচুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহাভিব্যক্তিকার্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্তস্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না। শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুত্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এইজন্য ফকির শিশুজাতির প্রতি তিলমাত্র অনুরক্ত ছিলেন না; তাহাদিগকে তিনি কীট-পতঙ্গের ন্যায় দেহ হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশু-পঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জইস অক্ষরের ছোটোবড়ো নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল এবং তাহারা সকলেই কিছু তাঁহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনোচিত ব্যবহার করিত না; শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা সুরে তাঁহাকে "বাবা বাবা" করিয়া ডাকিয়া আদর করিত তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশব শক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

৭

অবশেষে ফকির মহা চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে।"

তখন গ্রামের লোক এক উকিল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকিল আসিয়া কহিল, "জানেন আপনার দুই স্ত্রী?"

ফকির। আজ্ঞে, এখানে এসে প্রথম জানলুম।

উকিল। আর, আপনার সাত মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা।

ফকির। আজ্ঞে আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন, দেখতে পাচ্ছি।

উকিল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন, তবে আপনার অনাথিনী দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, পূর্ব হতে বলে রাখলুম।

ফকির সবচেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল, উকিলেরা জেরা করিবার সময় মহাপুরুষদিগের মানমর্যাদা গাম্ভীর্যকে খাতির করে না, প্রকাশ্যে অপমান করে এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট বাহির হয়। ফকির অশ্রুসিক্ত লোচনে উকিলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল। উকিল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিত বুদ্ধির, তাহার মিথ্যা গল্প রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়া ফকিরের আপন হস্তপদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া অজস্র গালি দিল, এবং উকিল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহার উপর যখন আটজন বালক-বালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারিদিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণবাবু আসিয়া উপস্থিত। পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকিল কিছুতেই দখল ছাড়ে না।

এ লোকটি যে ফকির নহে, মাখন, তাহারা তাহার সহস্র অকাট্য প্রমাণ

প্রয়োগ করিল—এমনকি, যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বুড়িকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল, তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলে কেবল দুই বাপ, ফকির এবং শিশুরা ঘরে রহিল।

দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।"

ফকির তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিন্তু ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোনো বিশেষ দ্বারের প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না; আপাতত যে কোনো একটা দ্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়।

তখন আর একটি রমণী-মূর্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল।

ফকির প্রথমে অবাক, তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল, "এ যে হৈমবতী!"

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল, মূর্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আর একটি লোক মুখের উপর শাল মুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল। অবশেষে হৈমবতীকে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিল; উক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভগ্নীপতি; তখন দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক।" দুই স্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, "এ আমারই দড়ি, আমারই কলসী।"

মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ত্ব ও বীরত্বে পাড়ার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোলানাথের উইল

১

পূর্বে ভাগলপুর বাংলার অন্তর্গত থাকায় সেখানে বহু বাঙালীর বাস, অনেকেই সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত। শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে ক্রমে উন্নতির সহজ উপায় সকল উদ্ভাসিত হওয়ায়, যেমন একান্নবর্তিতাকে বাহান্নবর্তিতায় রূপান্তরিত করে সত্বর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা ও স্বাতন্ত্র্যে সুখানুভব করা, সেইরূপ শিক্ষিত বিহারীরা বিহারকে বাংলা হতে বিচ্ছিন্ন করে স্বাতন্ত্র্য খোঁজায় বাংলাকে বন্ধুত্যাগ স্বীকার করে ক্ষীণ হতে হয়; ভাগলপুরকেও সেই হতে হারানো হয়। পথের ধারে প্রাচীন বাড়ী-ঘর বাগান আজও বাঙালীদের পূর্ব-সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়।

পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে ভোলানাথের পিতা ভবনাথবাবু চাকরিসূত্রে ভাগলপুরে এসে বাস করেন। বাঙালীর সময়টা তখন মোড় ফিরছে—গ্রহ রুস্ধগত হবার রাস্তা নিয়েছে। আমরা স্বরাজের আওয়াজ পেয়েছি, বঙ্গভঙ্গে সকলে বেজায় উত্তেজিত, 'বয়কটে' উৎকট প্রেম, বিলাতী নিবের বদলে কঞ্চি দিয়ে "your most obedient servant" লিখছি। এই তেরস্পর্শে মহাহর্ষে মেতে রয়েছি ও প্রভুদের শুভদৃষ্টি হতে হটে চলেছি—দিন দিন

তাঁদের বিষ নয়নের লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ছি।

এই অবস্থায় অনেক বাবুর মতো ভবনাথবাবুরও চাকরি সইল না। মতি তখন উলটো পথ ধরেছে। বাহবা সম্বলে বাহাদুরির হাসি হাসতে হাসতে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির শান্তি-কুঞ্জে আগুন লাগল, আলো দেখা দিল বাইরে আর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়,—ছাই পড়ল সংসারে, আঁধার হল প্রিয়ার মুখ, আবদার ও কান্না বাড়ল সন্তানদের।

বাড়িতে থাকা দায়, সেগুলো হল পাঁচিল-ঘেরা ছাদ-আঁটা গারদ—বেকারদের বনবাস। কেবল নাই নাই, চাল নাই, ডাল নাই, বাজারের পয়সা নিত্য চাই, ঘুম না ভাঙতেই ভুতো জিলিপি চায়, লিলির তরল আলতা জবাকুসুম ফুরিয়েছে, ছেলের ইস্কুলের মাইনে চাই। পুজো যত কাছাচ্ছে, ভবনাথ কুঁজো মারছেন। জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় প্রহরে চাওয়া বরং সহজ, কিন্তু মুখ তুলে পত্নীর মুখপানে চায় কার সাধ্য! আড়চোখে শশাঙ্ক তাঁর মেজাজটা যাচাই করতে গেলে হৃদ্‌কম্প হয়। চা-খাবার দু-চারিটি ডেলিপ্যাসেঞ্জার—সুধাংশু বিমল ডাক দিলে, ভবনাথের মুখ বুক শুকিয়ে যায়, লিলি গিয়ে বলে, "এখনো দুধ আসেনি।"

কেরানীদের চিরদিন ধারই লক্ষ্মী, মুদি কিন্তু হাত গুটিয়েছে। কেরানী কোনোদিন পয়সায় সচ্ছল নয়, সচ্ছল সে পোশাক-পরিচ্ছদে, সচ্ছল দেনায়। ভবনাথ কূল পাচ্ছে না, পাশের বাড়ির গ্রামোফোনটা কানে কেবল বিষ ঢালছে।

বেচারার অবস্থা শুনে পূর্ব পরিচিত মতিচাঁদ মাড়োয়ারী নিজের কারবার থেকে কাপড় প্রভৃতি কিছু মাল দিয়ে তাঁকে একখানি ছোট দোকান খুলে দিলে। ভবনাথবাবু বললেন, "বিলিতী কাপড় কিন্তু রাখব না মতিচাঁদ।" মতিচাঁদ একটু হেসে বললে, "ব্যবসায় ওসব বিচার রাখবেন না, খরিদ্দার সে বিচার করুক। আপনাকে তো বিলিতী মাল কিনতে হবে না; সে তো আমি দিব।"

তারপর বহু পরামর্শ, উপদেশ শর্ত ও ব্যবসার গূঢ় মন্ত্র দিয়ে কাজ শুরু করিয়ে দিলে, তিন মাস সংসার চালাবার মতোও কিছু দিলে, আর বললে, "যা যা বলেছি ঠিক ঠিক সেই মাফিক চললে তিনমাস পরে আপনে চালাতে পারবে, সেই হবে আপনকার বুদ্ধির যাঁচ (যাচাই)।"

কয় মাসেই ভবনাথবাবুর জীবনে বিতৃষ্ণা ও সংসারে বৈরাগ্য দাঁড়াচ্ছিল, অবশ্য অভাবে; এমন সময় মাড়োয়ারী বন্ধুর সাহায্য ও উপদেশ পেয়ে উৎসাহের সহিত তিনি সাধনায় মন দিলেন। একে মাড়োয়ারীর পরামর্শ, তার

ওপর ভবনাথবাবুর ঠেকে শেখার অবস্থা, দুয়ে মিলে অল্পদিনে ব্যবসার ওপর লক্ষ্মীর দৃষ্টি এনে দিলে। মতিচাঁদ খুশি হয়ে বললে, 'ব্যাস্, অব্ পাক্কা হো গিয়া। এর মধ্যে আর কিছু ঘুষিও না, রোজগারকে খেয়ালসে চৌবিশ ঘণ্টা লাগা রহনা সচ্চা আনন্দ ও-ই দেগা। আওর সব আনন্দ উসিকো গোলাম হয়, গোলাম কো গদ্দিমে ঘুষনে না দেও, ইয়াদ রখ্খো।"

গুরুমন্ত্রে শ্রদ্ধা রাখায় ভবনাথবাবু দিন দিন উন্নতি করতে লাগলেন এবং বিশ বাইশ বৎসরের সাধনায় অর্থ, বাড়ি, বাগান সম্পত্তি রেখে চলে গেলেন, যাবার সময় ছেলেকে সাধনায় দীক্ষা দিয়ে বললেন, "টাকা থাকলে তার মধ্যে সবই থাকে, মুখ্যানন্দ টাকাতেই, আর সব আনন্দ তার গোলাম—গৌণানন্দ। গোলামদের বাড়তে দিওনা, গদিতে ঢুকতে দিও না, তারা আসে ডোবাতে।" আর বলে গেলেন "আমাদের যেমন মোটা বিক্রির মরশুম আনন্দময়ীর আগমনে, সেইরূপ স্থানীয়দের মোটা খরিদের মরশুম 'দশেরা' পর্বে', অর্থাৎ দশমীতে। সেইটে মাল সাবাড়ের বিক্রি। সেইটাই আনন্দময়ীর নাম সার্থক করে থাকে। উপদেশমতো কাজ করলে সকলেই খুশি হবে, নিজেরাও কম আনন্দ পাবে না।" ইত্যাদি।

ছেলে ভোলানাথ ছিল পিতার বাধ্য ও যোগ্য পুত্র। কারবার পূর্বের মতোই চলতে লাগল, বরং নবোদ্যম যোগ হওয়ায়, দিন দিন উন্নতি হতে লাগল। আগমনীর সুর উঠতেই দোকানটিকে ভোলানাথ দর্শনরঞ্জন মালের প্রদর্শনীতে পরিণত করে রাখলে। মায়ের ছিল ঘোটকে আগমনের কথা, তিনিও সত্বর এসে পড়লেন।

বেপরোয়া বাঙালীরা বাড়ির তাগাদামতো আপিস যেতে আসতে দু'বেলা পুজার মালের খবর নিচ্ছিলেন। মহালয়ার (শ্রাদ্ধের) দিনে শো-কেসে শাণিত 'মদনবান' শাড়ি ঝুলতে দেখে তাঁরাও গলা বাড়িয়ে ঝুলে পড়লেন, ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। ভোলানাথবাবুকে নগদ কিছু দিলেই তিনি খুশি, বাকি পরে দিও, কড়া তাগাদা নেই। সপ্তমীর মধ্যে বাঙালীদের খরিদ একপ্রকার শেষ, কেবল মহাষ্টমীতে দেবীকে দেবার মতো সস্তা কস্তা পেড়ের জন্যে তেমন তাগাদা ছিল না। একজোড়া নিলেই ঝিয়েরও একখানা হবে, দুর্গারিও একখানা হবে।

২

পূজার 'সেল' ভোলানাথকে খুশির স্বর্গে পেঁছে দিয়েছে। এইবার সে দশমীর রেশমী মাল সাজাতে বসল, জাপানের পূর্বরাগরঞ্জিত সূর্যোদয় মার্কা পেনি ফ্রক আর ব্লাউজে স্টোর-হাউসে নানাবর্ণের প্রজাপতি উড়তে লাগল। আনন্দে তখন নিজের অজ্ঞাতেই ভোলানাথের গলায় গুনগুন স্বর ভর করেছে, অবিচ্ছেদে চলছে। যদিও ভোলানাথের বংশে কেউ কোনোদিন সঙ্গীত বা সুর চর্চা করেনি বা কেউ তা করতে শোনে নি, প্রকৃতই শত্রুতেও তাদের সে অপবাদ দিতে পারেনা, তবু এরূপ হয়। অত্যধিক আনন্দের চাপেই ওটা অজ্ঞাতেই বেরোয়। এটাও তাছাড়া আর কিছু ছিল না।

মহাষ্টমী থেকেই দশেরার বিক্রি শুরু হয়েছে। হেনকালে যেন দৈব প্রেরিতভাবে একটি যুবকের আবির্ভাব।

"এসো, এসো ভাই, বহুদিন দেখা নেই। কি করছ বলো?"

বিদ্যানন্দ ভোলানাথের সহপাঠী ছিল। বললে, "পঁচিশ-ত্রিশ টাকার চাকরি করতে প্রাণ চাইলে না। আমাদের গ্রামখানি গণ্ড গ্রাম, অনেকেই ইংরেজী সভ্যতার স্বাদ-পাওয়া লোক। ইস্কুল, গার্লস-ইস্কুল থাকায় কাপড়, জামা, শাড়ি, সেমিজ, ব্লাউজ আর এসেন্স, সাবান, পাউডার, কলিনসের কাটতিতেই আমার বেশ চলে যায়। লোক রেখে স্যাণ্ডেল ও শু'র (Shoe) ডিপার্টমেণ্টও খুলেছি। কাকেও আর টাউনে না আসতে হয়, ইত্যাদি। তোমার কারবারের নাম-যশই আমাকে এ পথে টেনেছে। আমি প্রায় হাজার খানেক টাকার সওদা করতে বেরিয়েছি ভাই। তোমার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই আমি মাল নিয়ে যাব। 'দশেরা'র কোন্ মালের কিরূপ কাট্তি, কোন্ ফ্যাশনের চাহিদা কিরূপ, তোমার নিশ্চয়ই ভালো জানা আছে। আমার এই ফর্দ নাও—তোমার ইচ্ছামতো কাট ছাঁট করে তোমার পছন্দমতো মাল দাও। আমি আজই নিয়ে যেতে চাই। বিকেলে পাঁচটার বাসে আমি রওনা হব ভাই।"

চা-পান দিয়ে আর একটি সিগারেটের টিন খুলে দিয়ে, ভোলানাথ মাল বাছাইয়ে মন দিলে ও কর্মচারীদের কাজে লাগিয়ে নিজে চেয়ার টেনে বসে দেখতে লাগল। বিদ্যানন্দ ও তাঁর সঙ্গীকে তাদের যাওয়ার আগে জল খাওয়ালেই হবে, লুচি তরকারি হালুয়ার অর্ডার বাড়িতে দেওয়া হয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যানন্দকে রকমফের মাল "অ্যাপ্রুভ" করানোও চলল।

বেলা প্রায় তিনটে, কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বিদ্যানন্দ ঈজিচেয়ার-খানায় চোখ বুজে একটু নিশ্চিন্তে আরাম করছে।

ভোলানাথ একদিনের জন্যেও পিতৃ-উপদেশ ভোলেনি। পরিবর্তনের মধ্যে স্ফূর্তি হলে নিজের অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠে গুণগুণানি আসত।

পাশের আপিস রুমে গিয়ে মালের দর দামের হিসাব লেখা চলছিল। শেষ হলে কর্মচারীদের বিদায় দিয়ে একা বসে হিসাবে চোখ বোলাতে বোলাতে, বাল্মীকির কণ্ঠে "মা নিষাদের" মতো, তার কণ্ঠ হতে সহসা—

"আজ বিদ্যানন্দকে গলে মে চাকু চালায়ি—ঈ-ঈ-ঈ—
মওকা পারে কেয়া চাকু চালায়ি—ঈ-ঈ-ঈ—
হুঁ হুঁ, আরে বিদ্যানন্দকে গলে মে—"

এই কথাগুলি সুরে শব্দিত হয়ে উঠল।

এটা ছিল সত্যই একটা অভাবনীয় ঘটনা, তাই তাড়াতাড়ি একজন কর্মচারী উঁকি মেরে দেখে, বাবুই তো বটে! তারা কেউ মুখ টিপে, কেউ চোখ টিপে হাসলে, যেহেতু কেউ কোনোদিন বাবুকে গাইতে শোনে নি।

যাক্, কথাটা হচ্ছে ঘটনার মাস কয়েক পূর্বে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে দুর্বৃত্তে হত্যা করে। চাকু চালিয়ে নয়, রিভলভার চালিয়ে। ভিক্ষুকেরা অতশত জানে না, তারা পথে পথে বোধ হয় ঐরূপ গাইত, অবশ্য শ্রদ্ধানন্দের নাম করে! ভোলানাথের কস্মিনকালে সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না—কোনোও গানও জানা ছিল না। শ্রদ্ধানন্দজীর হত্যায় সারা ভারত বিচলিত হয়। ভাগলপুরেও কম উত্তেজনা দেখা দেয় নি। তাই বোধহয় ভোলানাথের মস্তিষ্কে বিকৃতভাবে তার ভগ্নাংশ রয়ে গিয়ে থাকবে। শ্রদ্ধানন্দের স্থানে বিদ্যানন্দ যে কি করে এলেন, সেটা বোঝা কঠিন নয়, যেহেতু ভোলানাথের মাথায় সারাদিন আজ পূর্বসহপাঠী আগন্তুক 'বিদ্যানন্দ' ঢুকে ছিলেন। আসল কথা, জয়দেবের পুঁথিতে "দেহি পদপল্লবমুদারমে"র মতো ভোলানাথের মস্তিষ্কেও 'শ্রদ্ধানন্দ' বেমালুম 'বিদ্যানন্দ' হয়ে পড়েছিল। গান কখন আপনা আপনি থেমেছে, তার খেয়ালও নেই, কারণ সেটা ভোলানাথের চেষ্টাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ছিল না। ক্লক-ঘড়িটায় চারটে বাজতে শুনে সে চঞ্চল হয়ে মাল বিক্রির বিস্তারিত হিসাবের কাগজটা নিয়ে উঠে পড়ল।

দোকানে ঢুকে দেখে, ঈজি-চেয়ারে বিদ্যানন্দ নেই! চারিদিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "বিদ্যানন্দ কোথায় গেল?"

একজন কর্মচারী বললে, "তিনি তো কিছুক্ষণ হল উঠে গিয়েছেন, বোধহয় অন্যান্য কাজ সারতে। বাসের সময় হয়ে এল, এখুনি নিশ্চয় ফিরবেন।"

মুহূর্তে ভোলানাথের প্রাণটা দমে গেল, "তোমরা আমায় জানাওনি কেন ?"

"আজ্ঞে, তিনি কি করতে উঠলেন, সেটা তো তখন—"

ভোলানাথ মোটা টাকার হিসেব হাতে করে বসে পড়ল—"তাঁর জলখাবার প্রস্তুত, সে গেল কোথায় ?"

একজন কর্মচারী বললে, "তিনি তা হলে বোধ হয় খাবার কথা জানেন না।—একবার খাবারের দোকানগুলো দেখি। বোধ হয়—"

হ্যাঁ, (চঞ্চল হয়ে) "আর দেরি করছ কেন বিধু ? নিমাই, তুমি যে বড়ো দাঁড়িয়ে রইলে ? উঃ, এদিকে যে সাড়ে চারটে—! দেখো, দেখো—"

কর্মচারী দুজনেই বেরিয়ে পড়ল। মোড় ফিরেই দুজনের হো-হো হাসি। তারা সিগারেট বার করে ধরালে। কর্মচারীরা বিড়ি খায় না, দোকানের মর্যাদা মাটি করে না।

বিধু বললে, "আমিও বুঝতে পারতুম না, বাবু যদি না আপিস-ঘর থেকে বেরিয়ে ঈজি-চেয়ার খালি দেখে আনঈজি হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, "বিদ্যানন্দ গেল কোথায় ?"

বিধু বললে, "তাতে কি ?"

নিমাই বললে, "তাতে কি ? বাবুর গানটা শুনিস নি ? 'বিদ্যানন্দকে গলে মে'—"

বিধু চিৎকার স্বরে—"ওঃ হো," হেসে তিন তুড়ি লাফ মারলে।

নিমাই বললে, "ঠিক বলতে পারি না, তবে সন্দেহ হয়, ওই চাকুই সর্বনাশ করে থাকবে।"

বিধু। নো সন্দেহ স্যার,—নাউ আই ক্যান সোয়ার!

নিমাই। গ্রহ যে কোন পথ ধরে মূকংকে করোতি বাচালংআর ঘরে আসা টাকা করোতি হরণং, তা দেবা ন জানন্তি। যাক্, চলো চলো, এখন চলন্তি। (বলে বিধুর হাত ধরে টেনে নিয়ে) চলো, চারুর রেস্তোরাঁয় চা খাওয়া যাকগে। বিদ্যানন্দ আর এ-মুখো হচ্ছে না, নিশ্চয়ই সটকেছে—

দু-দিন নিলে ভোলানাথের বুদ্ধি থিতুতে। তারপর সোজা-পাকা প্রাচীন 'মুসুবিদা মাস্টার' অ্যাডভোকেট অটলবাবুর কাছে গিয়ে উইল লিখিয়ে বাড়ি ফিরল। সংক্ষেপে মর্ম—

"আমার বংশে যিনি গীত-বাদ্যাদির চর্চা করিবেন, আমার কারবারে বা দোকানের স্বত্বে বা অংশে তাঁহার কোনোও অধিকার বা দাবি থাকিবে না।

এই শর্ত পুত্রাদি ও অন্যান্য উত্তরাধিকারী হইতে জামাই, ভগ্নীপতি পর্যন্ত সমপ্রবল ও বলবান থাকিবে। গদিতে অস্ফুট গুণ-গুণ শব্দ পর্যন্ত উক্ত ধারার অন্তর্গত রহিল এবং গ্রামাফোনেরও প্রবেশ নিষেধ থাকিল।"

ভোলানাথ ফিরে এসে গম্ভীরভাবে বললে, "দাও, দু-কাপ চা দাও।"

প্রমথ চৌধুরী

ফরমায়েসি গল্প

মকদমপুরের জমিদার রায় মহাশয় সন্ধ্যা-আহ্নিক করে', সিকি ভরি অহিফেন সেবন করে', যখন বৈঠকখানায় এসে বসলেন, তখন রাত এক প্রহর। তিনি মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে' গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে ঝিমতে লাগলেন। সভাস্থ ইয়ারবক্সির দল সব চুপ করে রইল; পাছে হুজুরের ঝিমুনির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে কেউ টুঁ-শব্দও করলে না। খানিকক্ষণ বাদে রায় মহাশয় হঠাৎ জেগে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে বসে প্রথম কথা বললেন—"ঘোষাল! গল্প বল।"

রায় মহাশয়ের মুখ থেকে এ কথা পড়তে না পড়তে তাঁর ডানধার থেকে একটি গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেরিকাটা যুবক, হাসি-মুখে চাঁচা গলায়

—যে আজ্ঞে হুজুর, বলছি।

—আজ কিসের গল্প বলবি বলত?

—বর্ষার গল্প হুজুর।

—একে শ্রাবণ মাস, তায় আবার তেমনি মেঘ করেছে, তাই আজ ঘোষাল

বর্ষার গল্প বলবে। ওর রসবোধটা খুব আছে। কি বলেন, পণ্ডিত মহাশয় ?

একটি অস্থিচর্ম্মসার দীর্ঘাকৃতি পুরুষ একটিপ নস্য নিয়ে সানুনাসিক স্বরে উত্তর করিলেন—

—তার আর সন্দেহ কি ? তা না হলে কি মহাশয়ের মত গুণগ্রাহী লোক আর ওকে মাইনে করে চাকর রাখেন ? তবে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে ঘোষাল আজ কি রসের অবতারণা করবে ?

ঘোষাল তিলমাত্র দ্বিধা না করে বললে—

—মধুর রসের। বর্ষার রাত্তিরে আর কি রস ফোটান যায় ?

রায় মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন "কেন ভূতের গল্প চলবে না ? কি বলেন স্মৃতিরত্ন ?"

—আজ্ঞে চলবে না কেন, তবে তেমন জমবে না। ভয়ানক রসের অবতারণা শীতের রাত্রেই প্রশস্ত।

ঘোষাল পন্ডিত মহাশয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল—

—এক লাখ কথার এক কথা। কেননা মানুষের বাইরেটা যখন শীতে কাঁপছে, তখনি তার ভিতরটাও ভয়ে কাঁপানো সঙ্গত। এই দুই কাঁপুনীতে মিলে গেলে, গল্পের আর রস ভঙ্গ হয় না।

পণ্ডিত মহাশয় এ কথা শুনে মহা খুশি হয়ে বল্লেন—তা ত বটেই ! আর তা ছাড়া মধুর রসের মধ্যেই ত ভয়ানক প্রভৃতি সকল রসই বর্তমান, তাতেই না অলংকার শাস্ত্রে ওর নাম—আদিরস।

রায় মহাশয়ের মুখ দিয়ে এতক্ষণ শুধু অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ ধারা বেরুচ্ছিল, এইবার আবার কথা বেরল ; কিন্তু তার ধারা ক্ষীণ নয়—

—আপনার অলংকার শাস্ত্রে যা বলে বলুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার কথা হচ্ছে এই, আমি এখন বুড়ো হতে চল্লুম—বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হল। এ বয়েসে প্রেমের কথা কি আর ভাল লাগবে ? ও সব গল্প যাও ছেলেছোকরাদের শোনাও গিয়ে।

উপস্থিত সকলেই জানতেন যে, রায় মহাশয় তাঁর বয়েস থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণীর বয়েস—অর্থাৎ ঝাড়া পোনেরো বৎসর চুরি করেছেন, অতএব তাঁর কথার আর কেউ প্রতিবাদ করলেন না। শুধু ঘোষাল বললে—

হুজুর, ছেলে-ছোকরারা নিজেরা প্রেম করতে এত ব্যস্ত যে প্রেমের গল্প শোনার তাদের ফুরসৎ নেই। তাছাড়া আদিরসের কথা শোনায় ছেলেদের

নীতি খারাপ হয়ে যেতে পারে, হুজুরের তো আর সে ভয় নেই।

—দেখেছেন পণ্ডিতমশায়, ঘোষাল কেমন হিসেবি লোক! যাই বলুন, কার কাছে কোন কথা বলতে হয়, তা ও জানে।

—সে কথা আর বলতে! শাস্ত্রে বলে যৌবনে যার মনে বৈরাগ্য আসে সে যথার্থই বিরক্ত, আর বৃদ্ধ বয়সেও যার মনে রস থাকে সে যথার্থই রসিক। ঘোষাল কি আর না বুঝে-সুঝে কথা কয়? ও জানে আপনার প্রাণে এ বয়েসেও যে রস আছে, একালের যুবাদের মধ্যে হাজারে একজনেরও তা নেই।

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়। আমি সেদিন যখন সেই ভৈরবীর টপ্পাটাই গাইলুম, হুজুর শুনে কত বাহবা দিলেন; আর সেই গানটাই একটা পয়লা-নম্বরের M. A.-এর কাছে গাওয়াতে সে ভদ্রলোক কানে হাত দিলে। বললে অশ্লীল।

—কোন গানটা ঘোষাল?

—"গৌরী তুনে নয়না লাগাওয়ে যাদুডারা—"

—কি বলছিস ঘোষাল, ঐ গান শুনে ইন্টুপিট্ কানে হাত দিলে? অমন কান মলে দিতে পারলিনে? হতভাগাদের যেমন ধর্ম্মজ্ঞান তেমনি রসজ্ঞান। ইংরেজী পড়ে জাতটে একেবারে অধঃপাতে গেল!

এই কথা শুনে সে সভার সব চাইতে হৃষ্টপুষ্ট ও খর্বাকৃতি ব্যক্তিটি অতি মিহি অথচ অতি তীব্র গলায় এই মত প্রকাশ করলেন যে—

—অধঃপাতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার উঠছে।

—তুমি আবার কি তত্ত্ব বার করলে হে উজ্জ্বল নীলমণি?—

রায় মহাশয় যাঁকে সম্বোধন করে এই প্রশ্ন করলেন, তার নাম নীলমণি গোস্বামী। ঘোষাল তার পিছন থেকে গোস্বামীটি কেটে দিয়ে সুমুখে "উজ্জ্বল" শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল। তার এক কারণ, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণ ছিল, উজ্জ্বল নয়—ঘোরশ্যাম, আর এক কারণ, তিনি কথায় কথায় উজ্জ্বল-নীলমণির দোহাই দিতেন। এই নামকরণের পর সে রোগ তার সেরে গিয়েছিল।

জমিদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে গোসাইজি বললেন—আজ্ঞে, ইংরাজি-নবীশদের যে মতিগতি ফিরছে তা আমি জেনে শুনেই বলছি। আমারই জনকতক পাশকরা শিষ্য আছে, যাদের কাছে ঘোষাল যদি ও গানটা না গেয়ে গান ধরত—

গেলি কামিনী গজবরগামিনী
বিহসি পালটী নেহারি

তাহলে আমি হলপ করে বলতে পারি তারা ভাবে বিভোর হয়ে যেত।

—ও দুয়ের তফাৎটা কোথায় ?

—তফাৎটা কোথায় ?—বললেন ভাল পণ্ডিত মশায়। একটা টপ্পা আর একটা কীর্ত্তন।

অর্থাৎ তফাৎ যা তা নামে।

—অবাক করলেন! তাহলে শোরীমিয়ার সঙ্গে বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রভেদও শুধু নামে। নামের ভেদেই তো বস্তুর ভেদ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল প্রভেদ রসে। যাক্ আপনার সঙ্গে রসের বিচার করা বৃথা। রসজ্ঞান তো আর টোলে জন্মায় না।

—বটে! অমরুশতক থেকে সুরু করে নৈষধের অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যন্ত আলোচনা করে যদি রসজ্ঞান না জন্মায়, তাহলে মনু থেকে সুরু করে রঘুনন্দনের অষ্টাদশ তত্ত্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করেও ধর্ম্মজ্ঞান জন্মায় না।

—রাগ করবেন না পণ্ডিতমশায়, কিন্তু কথাটা এই যে, সংস্কৃতকাব্যের রস আর পদাবলীর রস এক বস্তু নয়—ও দুয়ের আকাশপাতাল প্রভেদ।

—আপনি ত দেখ্‌ছি এক কথারই বার বার পুনরুক্তি করছেন। মানলুম টপ্পা ও কীর্ত্তন এক বস্তু নয়, কাব্যরস ও পদাবলীর রস এক বস্তু নয়। কিন্তু পার্থক্য যে কোথায়, তা ত আপনি দেখিয়ে দিতে পারছেন না।

—তফাৎ আছে বৈকি। যেমন তালের রস ও তাড়ি এক বস্তু নয়—একটায় নেশা হয়, আর একটায় হয় না। সংস্কৃত কবিতা পড়ে কেউ কখন ধুলোয় গড়াগড়ি দেয় ?

ঘোষালের এই মন্তব্য শুনে স্মৃতিরত্ন সভাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। উজ্জ্বল-নীলমণি মহাক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

পণ্ডিত মহাশয়, আপনিও এই সব ইয়ারকির প্রশ্রয় দেন? আশ্চর্য্য! যেমন ঘোষালের বিদ্যে তেমনি তার বুদ্ধি।

রায় মহাশয় ঘোষালকে চব্বিশ ঘণ্টা ধমকের উপরেই রাখতেন; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অপর কাউকেও একটি কথা বলতে দিতেন না। "আমার পাঁঠা আমি লেজের দিকে কাটব, কিন্তু অপর কাউকে মুড়ির দিকেও কাটতে দেব না"—এই ছিল তাঁর motto, তিনি তাই একটু গরম হয়ে বললেন—

—কেন, ওর বুদ্ধির কমতিটে দেখলে কোথায় হে উজ্জ্বল-নীলমণি!

তোমাদের মত ওর পেটে বিদ্যে না থাকতে পারে, কিন্তু মগজে ঢের বেশী বুদ্ধি আছে। তাগমাফিক অমনি একটি যুতসই উপমা লাগাও তো দেখি।

—আজ্ঞে, ওর বুদ্ধি থাকতে পারে কিন্তু রসজ্ঞান নেই।

—রসজ্ঞান ওর নেই, আর তোমার আছে? করো তো অমনি একটা রসিকতা!

—আজ্ঞে ঐ রসিকতাই প্রমাণ, ওর মনে ভক্তির নামগন্ধও নেই।

যার ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তার আবার রসজ্ঞান!

স্মৃতিরত্ন এ কথা শুনে আর চুপ থাকতে পারলেন না। বল্লেন—

—এ আবার কি অদ্ভুত কথা! ঘোষালের ধর্ম্মজ্ঞান না থাকতে পারে, তাই বলে কি ওর রসজ্ঞান থাকতে নেই?

—অবশ্য না! ও দুইত আর পৃথক জ্ঞান নয়।

—আমাদের কাছে যা সামান্য, আপনার কাছে তা বিশেষ, আমাদের কাছে যা বিশেষ আপনার কাছে তা অবশ্য সামান্য; এ এক নব্য ন্যায় বটে!

—শুনুন পণ্ডিতমশায়। যার নাম রসজ্ঞান তারি নাম ধর্ম্মজ্ঞান; আর যার নাম ধর্ম্মজ্ঞান তারি নাম রসজ্ঞান। নামের প্রভেদে তো আর বস্তুর প্রভেদ হয় না।

—বলেন কি গোঁসাইজি! তাহলে আপনাদের মতে, যার নাম কাম তারি নাম ধর্ম্ম, আর যার নাম অর্থ তারি নাম মোক্ষ?

—আসলে ও সবই এক। রূপান্তরে শুধু নামান্তর হয়েছে।

—বুঝছেন না পণ্ডিত মশায়, কথা খুব সোজা। গোঁসাইজি বলছেন কি যে, যের নাম ভাজা চাল তারি নাম মুড়ি—নামান্তরে শুধু রূপান্তর হয়েছে।

মদের পিঠ পিঠ এই চাটের উপমা আসায়, রায় মহাশয়ের পাত্র-মিত্রগণ মহাখুশি হয়ে অট্টহাস্যে ঘোষালের এ টীপ্পনীর অনুমোদন করলেন। উজ্জ্বল-নীলমণি এর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হবামাত্র, তার মাথার উপর থেকে একটা টিকটিকি বলে উঠল "ঠিক ঠিক ঠিক"। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্ফুরিত ও বিস্ফারিত নাসিকারন্ধ্র হতে একটা প্রচণ্ড সহাস্য "হেঁচ্চ" ধ্বনি নির্গত হয়ে, উজ্জ্বল-নীলমণির বক্ষদেশ যুগপৎ হাস্য ও নস্যরসে সিক্ত করে দিলে। তিনি অমনি "রাধামাধব" বলে সরে বসলেন। রায় মহাশয় এই সব ব্যাপার দেখে শুনে ভারি চটে বললেন—

—তোমরা ক'টায় মিলে ভারি গণ্ডগোল বাধালে ত হে। আমি শুনতে চাইলুম গল্প আর এঁরা সুরু করে দিলেন তর্ক, আর সে তর্কের যদি কোনও মাথামুণ্ডু থাকে। ঘোষাল! গল্প বল।

—হুজুর, এই বল্লুম বলে।

—শীগগির, নইলে এরা আবার তর্ক জুড়ে দেবে। এ কি আমার শ্রাদ্ধের সভা যে, নাগাড় পণ্ডিতের বিচার চলবে?

উজ্জ্বল-নীলমণি বললেন—

—আজ্ঞে, সে ভয় নেই। যে সভায় ঘোষাল বক্তা, সে সভায় যদি আমি আর মুখ খুলি ত আমার নামই নয়—

—"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈঃ জলদাগমে।"

পণ্ডিত মশায়ের বচনটি খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। কাল যে বর্ষা, তা ত সকলেই জানেন। তার উপর গোঁসাইজির কোকিলের সঙ্গে যে এক বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে, সে ত প্রত্যক্ষ।

উজ্জ্বল-নীলমণির গায়ে এই কথার নখ বসিয়ে দিয়ে ঘোষাল আরম্ভ করলে—

—তবে বলি শ্রবণ করুন।

—দেখ্, মধুর রসের বলে গল্প যেন একদম চিনির পানা করে তুলিস নে। একটু নুনঝাল যেন থাকে।

—হুজুর যে অরুচিতে ভুগছেন তা কি আর জানিনে!

—আর দেখ্, একটু অলংকার দিয়ে বলিস, একেবারে যেন সাদা না হয়।

—অলংকারের সখই যে আজকাল হুজুরের প্রধান সখ, তা ত আর কারও জানতে বাকী নেই।

—কিন্তু সে অলংকার যেন ধারকরা কিম্বা চুরি করা না হয়।

—হুজুর, ভয় নেই। পরের সোনা এখানে কানে দেব না, তা হলে গোঁসাইজি তা হেঁচকাটানে কেড়ে নেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের জিনিষ ব্যবহার করলে সবাই সোনাকে বলবে পিতল, আর বড় অনুগ্রহ করে ত—গিল্টি।

অন্যে যে যা বলে তা বলুক; কিন্তু আসল ও নকলের প্রভেদ আমার চোখে ঠিক ধরা পড়বে।

—হুজুর জহুরি, সেই ত ভরসা। তবে শুনুন—

শ্রাবণ মাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর আবার তেমনি দুর্যোগ। চারিদিক একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুশ কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে; আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে পড়ছে তা জল নয়, —একদম আলকাতরা। আর তার এক একটা ফোঁটা কি মোটা, যেন তামাকের গুল।

—কাঠের কপাটের ভিতর দিয়ে জল কি করে গলে পড়বে বলত মূর্খ?

যখন বর্ণনা সুরু করে দিস, তখন আর তোর সম্ভব অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না। বল জল চুঁইয়ে পড়ছে!

—হুজুর বলতে চান আমি বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারি নে। আজ্ঞে তা নয়, আমি ঠিকই বলেছি। জল গলেই পড়ছে চুঁইয়ে নয়। কপাট বটে, কিন্তু—ফারফোরের কাজ, ভাষায় যাকে বলে জালির কাজ। সেই জালির ফুটো দিয়ে—

—দেখলেন স্মৃতিরত্ন, ঘোষালের ঠিকে ভুল হয় না। এই শুনে দেওয়ানজি বললেন—

—দেখলে ঘোষাল! ঠিকে ভুল কর্তার চোখ এড়িয়ে যায় না!

—সে আর বলতে। হুজুর হিসেব নিকেশে যদি অত পাকা না হতেন তাহলে তার বাড়িতে আর পাকা চণ্ডীমণ্ডপ হয়, আগে যাঁর চালে খড় ছিল না।

—তুমি কার কথা বলছ হে, আমার?

—যে নল চালায় সে কি জানে কার ঘরে গিয়ে নল ঢুকবে? যাক্ ওসব কথা। এখন গল্প শুনুন।

এই দুর্যোগের সময় একটি ব্রাহ্মণের ছেলে, বয়েস আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ, এক তেপান্তর মাঠের ভিতর এক বট গাছের তলায় একা দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছিল।

—কি বললি! ব্রাহ্মণের ছেলে রাত দুপুরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে আর তুই ঘরের ভিতর বসে মনের সুখে গল্প বলে যাচ্ছিস? ও হবে না ঘোষাল, ওকে ওখান থেকে উদ্ধার করতেই হবে!

—হুজুর অধীর হবেন না; উদ্ধার তো করবই। নইলে মধুর রসের গল্প হবে কি করে? কেউ তো আর নিজের সঙ্গে নিজে প্রেম করতে পারে না।

—তা ত জানি। কিন্তু তুই হয়ত ঐখানেই আর একটাকে এনে জোটাবি। গল্প সুরু করে দিলে তোর তো আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঘোষাল যদি তা করে, তাতেও অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসেবে কোনও দোষ হয় না। সংস্কৃত কবিরাও অভিসারিকাদের এমনি দুর্যোগের মধ্যেই বার করতেন।

—দেখুন পণ্ডিত মহাশয়, সেকালে তাদের হাড় মজবুত ছিল, একালের ছেলেমেয়েদের আধঘণ্টা জলে ভিজলে নির্ঘাৎ Pneumonia হবে। এ যে বাঙলাদেশ, তায় আবার কলিকাল।

এ কথা শুনে উজ্জ্বল-নীলমণি আর স্থির থাকতে পারলেন না, সবেগে বলে উঠলেন—

—তাতে কিছু যায় আসে না ম'শায়। পদাবলী পড়ে দেখবেন,—কি ঝড়-জলের মধ্যে অভিসারিকারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন, এবং তাতে করে তাঁদের কারও যে কখনও অপমৃত্যু ঘটেছে, এ কথা কোনও পদাবলীতে বলে না। আসল কথাটা কি জানেন, মনের ভিতর যার আগুন জ্বলছে, বাইরের জলে তার কি করবে ?

—হুজুর ত ঠিকই ভয় পেয়েছেন। অভিসারিকাদের চামড়া মোমজমা হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ব্রাহ্মণ সন্তানকে জলে ভেজালে যে ব্রহ্মহত্যা হবে না, কে বলতে পারে ? অভিসারক বলে ত আর কোনও জানোয়ার নেই। দেখুন হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে ভিজছিল বটে, কিন্তু তার গায়ে জল লাগছিল না। তার মাথায় ছিল ছাতা, গায়ে বর্ষাতি, আর পায়ে বুটজুতো। তারপর শুনুন—

শুধু ঝড়জল নয়। মাথার উপর বজ্র ধমকাচ্ছিল আর চোখের সুমুখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সে এক তুমুল ব্যাপার। লাখে লাখে তুবড়ি ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাউই উড়ছে, তারি ফাঁকে ফাঁকে বোমা ফুটছে—সেদিন স্বর্গে হচ্ছিল দেওয়ালি !

—কি বললি ঘোষাল, শ্রাবণ মাসে দেওয়ালি ?—তুই দেখছি পাঁজি মানিস নে !

—আজ্ঞে আমি মানি, কিন্তু দেবতারা মানেন না। স্বর্গে ত সমস্তক্ষণই শুভক্ষণ। কি বলেন পণ্ডিতমশায় ?

—তা ত ঠিকই। আমাদের পক্ষে যা নৈমিত্তিক দেবতাদের পক্ষে তা কাম্য। সুতরাং তাঁরা যখন যা খুসি, তখনই সেই উৎসব করতে পারেন।

—শুধু করতে পারেন না, করেও থাকেন। স্বর্গে ত আর উপবাস নেই, আছে শুধু উৎসব। স্বর্গে যদি একাদশী থাকত তাহলে কে আর সেখানে যেতে চাইত ? আমি ত নয়ই—

—উনি ত ননই। যেন উনি যেতে চাইলেই স্বর্গে যেতে পেতেন !

—হুজুর আমি কোথাও যেতে চাইনে, যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাই।

—যেখানে আছেন সেইখানেই থাকতে চান! যেন উনি থাকতে চাইলেই থাকতে পেলেন। তুই বেটা ঠিক নরকে যাবি !

—হুজুর যেখানে যাবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব !

—দেখছেন পণ্ডিত মশায়, ঘোষালের আর যাই দোষ থাক, লোকটা অনুগত

বটে। যাক ওসব বাজে কথা, যার কপালে যা আছে তাই হবে। তুই এখন বল, তারপর কি হল ?

তারপর দেবতারা একটা বিদ্যুতের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলেন। সেটা ঐ কপাটের ফাঁক দিয়ে গলে এসে অন্ধকারের বুক চিরে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের সুমুখ দিয়ে লাউডগা সাপের মত এঁকে বেঁকে গিয়ে সামনে পড়ল। তার আলোতে দেখা গেল যে দশহাত দূরে একটা পর্ব্বত-প্রমাণ মন্দির খাড়া রয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে অমনি "ব্যোম ভোলানাথ" বলে' হুংকার দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই মন্দিরের দুয়োরে ধাক্কা মারতে লাগল। একটু পরে ভিতর থেকে কে একজন হুড়কো খুলে দিলে। তারপর ব্রাহ্মণ সন্তান ঢোকবার আগেই ঝড়-জল হো হো করে মন্দিরে গিয়ে পড়ল আর এমনি বাতি গেল নিবে। এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মণের ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—মন্দিরে ঢুকে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে রইল ? আর পায়ের জুতো খুললে না, আচ্ছা ব্রাহ্মণের ছেলে ত !

—হুজুর, সে জুতোয় কিছু দোষ নেই, রবারের।

—এই যে বললি বুট ?

—বুট বটে কিন্তু রবারের বুট। হুজুর আমার গল্পের নায়ক কি এতই বোকা যে মন্দির অশুদ্ধ করে দেবে ?

তারপর অনেক ডাকাডাকিতে কেউ জবাব না করায় সে ভদ্রলোক অগত্যা হাতড়ে হাতড়ে কপাটের হুড়কো বন্ধ করে দিলে। তারপর পকেট থেকে দিয়াশিলাই বার করে জ্বালিয়ে দেখলে যে বাঁ দিকে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেক কষ্টে সেই লণ্ঠনটি জেবলে দেখতে পেলে ডান দিকে দেয়ালের গায়ে—খাড়া রয়েছে চিত্রপুত্তলিকার মত একটা মূর্ত্তি। আর সে কি মূর্ত্তি! একেবারে মারবেল পাথরের খোদা। ব্রাহ্মণ সন্তান একদৃষ্টে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। সে দেখবার মত জিনিষও বটে। নাকটি তিলফুলের মত, চোখ দুইটি পদ্মফুলের মত, গাল দুইটি গোলাপফুলের মত, ঠোঁট দুটি ডালিম ফুলের মত, কান দুটি—

—রাখ তোর রূপবর্ণনা। লোকটা দেখছি অতি হতভাগা! দেবতার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, প্রণাম করলে না ?

—আজ্ঞে তার দোষ নেই। মূর্ত্তিটি যে কোন দেবতার তা সে ঠাওর করতে পারছিল না। কালী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি কোন জানাশুনো দেবতা ত নয়।

—তা নাই হোক, দেবতা ত বটে। দেবতা ত তেত্রিশ কোটি।—মানুষে কি তাদের সবাইকে চেনে? আর চেনে না বলে প্রণাম করবে না?

—আজ্ঞে লোকটি সন্ন্যাসী। ওদের ত কোনও ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে নেই, ওরা যে সব স্বয়ংব্রহ্ম।

—দেখ ঘোষাল, মিথ্যে কথা তোর মুখে আর বাধে না দেখছি। এই মাত্র বলেছিস ব্রাহ্মণের ছেলে!

—আজ্ঞে মিথ্যে কথা নয়, তার গলা-ওল্টানো কোটের ভিতর দিয়ে পৈতা দেখা যাচ্ছিল।

—আবার বলছিস্ সন্ন্যাসী! দেখ্ যে কখনো সাধু-সন্ন্যাসী দেখে নি তার কাছে গিয়ে এই সব ফক্কুড়ি কর। পরমহংস বলো, অবধূত বলো, নাগা বলো, আকালি বলো, গিরি বলো, পুরি বলো, ভারতী বলো, বাবাজি বলো, আর কত নাম করব রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কাণফাটা ঊর্ধ্ববাহু, দাদুপন্থী, অঘোরপন্থী,—দেশে এমন সাধুসন্ন্যাসী নেই যে আমার পয়সা খায় নি, আর ওষুধ আমি খাই নি। কিন্তু কারও ত কখন পৈতা দেখি নি—এক দণ্ডী ছাড়া। তাদেরও ত বাবা পৈতা গলায় ঝোলানো থাকে না, দণ্ডে জড়ানো থাকে।

—হুজুর এ ছোকরা ও সব দলের নয়। এ হচ্ছে একজন স্বদেশী সন্ন্যাসী।

—সন্ন্যাসী ত বিদেশী হয়ে থাকে। তুই আবার স্বদেশী সন্ন্যাসী কোত্থেকে বার করলি? জানিসনে, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।

—হুজুর আমি বার করি নি, এরা নিজেরাই বেরিয়েছে। এরা ভিখ চায়ও না নেয়ও না। এদের পয়সার অভাব নেই। এরা আপনার ছাইমাখা কৌপিন-আঁটা টো টো কোম্পানীর দল নয়। এরা দীক্ষিত নয়, শিক্ষিত সন্ন্যাসী। এরা গেরুয়াও পরে, জুতা-মোজাও পরে, স্বামীও হয়, পৈতাও রাখে। এরা একসঙ্গে ভবঘুরে ও সহুরে, এক রকম গেরস্ত সন্ন্যাসী।

—এরা কিছু মানে টানে?

—আজ্ঞে এরা কিছুই মানে না, অথচ সবই মানে।

—কথাটা ভাল বুঝলুম না।

—বোঝা বড় শক্ত হুজুর। এরা হচ্ছে সব বৈদান্তিক শাক্ত।

—বৈদান্তিক শাক্ত আবার কি রে। এ বেখাপ্পা ধর্ম্মমত পয়দা করলে কে?

—হুজুর, জার্ম্মানরা। যার সঙ্গে যা একদম মেলে না, তার সঙ্গে তা বেমালুম মিলিয়ে দিতে ওদের মত ওস্তাদ দুনিয়ায় আর কে আছে? ওরা যেমন পাটে আর পশমে মিলিয়ে কাশ্মীরী শাল বুনে এদেশে চালান দেয়,

তেমনি ওরা শংকরের সঙ্গে শংকরী মিলিয়ে এ দেশে চালান দিয়েছে।

—চোর বেটারা যেন ভেক চালায়, কিন্তু দেশের লোক তা নেয় কেন?

—আজ্ঞে সস্তা বলে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা উজ্জ্বল-নীলমণির ধাতে ছিল না। তিনি বললেন—ঘোষাল যাদের কথা বলছে তারা সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আমার পাশ করা শিষ্যেরাই হচ্ছে খাঁটি বৈদান্তিক বৈষ্ণব।

—অর্থাৎ এঁদের কাছে সাকার ও নিরাকারের ভেদ শুধু উপসর্গে, এবং সে ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই, এরা খুশি মত 'সা'র জায়গায় 'নি' এবং 'নি'র জায়গায় 'সা' বসিয়ে দেন।

—রায় মহাশয়ের আর ধৈর্য্য থাকল না। তিনি বেজায় রেগে উঠে চীৎকার করে বললেন ঃ—

তোমার টীকা টিপ্পনি রাখো হে ঘোষাল। আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চলবে না। ইষ্টুপিটরা দু'পাতা ইংরেজি পড়ে সব সোহহং হয়ে উঠেছে। আমি জানি এরা সব কি—হয় বর্ণচোরা নাস্তিক, নয় বর্ণচোরা খৃষ্টান। ঐ অকাল-কুষ্মাণ্ডটা বৈদান্তিক শাক্তই হোক আর বৈদান্তিক বৈষ্ণবই হোক, গেরস্তই হোক, আর সন্ন্যাসীই হোক, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, তোমার ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের ঘাড় ধরে ঐ দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাও।

—হুজুর, ওকে দিয়ে যদি এখন প্রণাম করাই তাহ'লে আমার গল্প মারা যায়।

—আর যদি প্রণাম না করে ত কান ধরে মন্দির থেকে বার করে দে।

—হুজুর, তাহ'লেও আমার গল্প মারা যায়।

—যাক্ মারা। আমি ঐ সব গোঁয়ারগোবিন্দ লোকের যথেচ্ছাচারের কথা শুনতে চাইনে।

—হুজুর যদি জোর করেন ত আমি নাচার। গল্প তাহলে এইখানেই বন্ধ করলুম।

—বেশ! এ মাসের মাইনেও তাহলে এইখানেই বন্ধ হল।

এই কথা শুনে ঘোষাল শশব্যস্তে বলে উঠল—

—হুজুর, আপনি মিছে রাগ করছেন। মূর্ত্তিটে যদি দেবী না হয়ে মানবী হয়?

—এ আবার কি আজগুবি কথা বার করলি? এই ছিল দেবতা আর এই হয়ে গেল মানুষ।

—দেবতা যে মানুষ আর মানুষ যে দেবতা হয়, এ ত আর আজগুবি কথা নয়। এ কথা ত সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই আছে, তবে আমি ত আর পুরাণকার নই। এরকম ওলটপালট আমি করলে কেউ তা মানবে না, আপনিও বলবেন ওর ভিতর বস্তুতন্ত্রতা নেই। ব্যাপারখানা আসলে কি তা বলছি। হুজুর মনযোগ করবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে যখন মন্দিরের দরজা ঠেলছিল তখন ভিতরে যদি জনপ্রাণী না থাকত তাহলে হুড়কো খুলে দিলে কে? আর যখন দেখা গেল যে মন্দিরের মধ্যে অপর কোনও কিছু নেই, তখন আগে যাঁকে প্রতিমা বলে ভুল হয়েছিল, তিনিই যে ও দ্বার মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সেটি যখন দেখতে দেবীর মত নয় তখন অপ্সরা না হয়ে আর যায় না।

—খুব কথা উলটে নিতে শিখেছিস বটে।

—ব্রাহ্মণের ছেলে যখন দেখলে যে, সেই মূর্ত্তিটির চোখে পলক পড়ছে, নাকে নিঃশ্বাস পড়ছে, তখন আর তার বুঝতে বাকী থাকল না যে, স্বর্গের কোনও অপ্সরা অভিসারে বেরিয়েছিল, অন্ধকারে পথ ভুলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে, আর এই ঝড়বৃষ্টির ঠেলায় এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। দেবী হলে পুজা করতে পারত, মানবী হলে প্রণয় করতে পারত, কিন্তু অপ্সরাকে নিয়ে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার মনের ভিতর একদিক থেকে ভক্তি আর একদিক থেকে প্রীতি ঠেলে উঠে পরস্পর লড়াই করতে লাগল।

—কি বললি, ভক্তি আর প্রীতি পরস্পর লড়াই করতে লাগল? ও দুই ত এক সঙ্গেই থাকে।

—ও দুই শুধু এক সঙ্গে থাকে না, একই জিনিস। আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি আর প্রীতি অপরাভক্তি।

—মাপ করবেন গোঁসাইজি। ভক্তির জন্ম ভয়ে, আর প্রীতির জন্ম ভরসায়। ও দুই একসঙ্গে ঘর করে বটে। কিন্তু সে বোন-সতীনের মত।

—ব্রাহ্মণের ছেলেকে ওরকম অকণ্টবন্ধে ফেলে রাখা ঠিক নয়। অপ্সরাদের প্রতি ভক্তি! রাখো, সে ত হবারই জো নেই, তবে প্রণয়ে দোষ কি!

—হুজুর, দোষ কিছু নেই, সম্পর্কে বাধে না। তবে লোকে বলে অপ্সরার সঙ্গে প্রেম করলে মানুষ পাগল হয়।

—কথা ঠিক, কিন্তু সে হচ্ছে এক রকম সৌখীন পাগলামি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভালবাসায় পড়লে লোকে মাথায় মধ্যম নারায়ণ মাখে না, মাখে কুন্তলবৃষ্য

আর অপ্সরার টানে মানুষ হয় উন্মাদ পাগল। তখন স্বর্গে না গেলে আর মানুষের নিস্তার নেই, অথচ সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কি বলেন পণ্ডিত মশায় ?

প্রমাণ ত হাতেই রয়েছে,—বিক্রমোর্ব্বশী।

—শুনলেন হুজুর, পণ্ডিত মশায় কি বললেন ? এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে কি করে ভালবাসায় ফেলি ?

—তাহলে কি গল্প এইখানেই বন্ধ হল ?

—আজ্ঞে তাও কি হয়! যা হল তা শুনুন ঃ—

ব্রাহ্মণের ছেলেকে অমন উসখুস করতে দেখে, সেই মূর্ত্তিটিও একটু ভীত-ত্রস্ত হয়ে উঠল, অমনি তার কাঁধ থেকে অঞ্চল পড়ল খসে। ব্রাহ্মণের ছেলে দেখতে পেলে তার কাঁধে ডানা নেই, ব্যাপারটা যে কি তখন আর তার বুঝতে বাকি থাকল না। এখন বুঝেছেন হুজুর, ওকে দিয়ে প্রণাম করালে কি অনর্থটাই ঘটত ? একে তরুণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায় পড়ে-পাওয়া ডানাকাটা পরি! তার উপর আবার এই দুর্যোগের সুযোগ। এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না—ব্রাহ্মণের ছেলে ত মাত্র বাল-যোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। ব্রাহ্মণ যুবক সিধেভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চারচক্ষুর মিলন হবামাত্র সেই সুন্দরীর নয়ন-কোণ থেকে একটি উল্কাকণা খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে একেবারে সোলার মত চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বামাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল সে সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে সুরু হল। তার মনে হল যেন তার পাঁজরা সব ধ্বসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল। এক কথায় ম্যালেরিয়া-জ্বর আসবার সময় মানুষের যে অবস্থা হয় তার ঠিক সেই অবস্থা হল। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে তার বুকের ভিতর ভালবাসা জন্মাচ্ছে।

এই বর্ণনা শুনে উজ্জ্বল-নীলমণি অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন ঃ—

আহা! পূর্ব্বরাগের কি চমৎকার বর্ণনাই হল! রসশাস্ত্রে যাকে বলে সাত্ত্বিক ভাব তার উপমা হল কিনা ম্যালেরিয়া জ্বর। ঘোষাল যখন মধুর রসের

কথা পেড়েছিল, তখনই জানি ও শেষটা বীভৎস রস এনে ফেলবে। আর লোকে বলবে, ঘোষাল কি রসিক!

ঘোষাল এ সব কথার কোন উত্তর না করে স্মৃতিরত্নের দিকে চাইলে। সে চাউনির অর্থ—মশায় জবাব দিন। স্মৃতিরত্ন বললেন ঃ—

ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাতেই চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে। আর তুমি যাকে সাত্ত্বিক-ভাব বলছ, সেও ত একটা চিত্তবিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ও মনোভাবকে মনের জ্বর বলায় ঘোষাল কি অন্যায় কথা বলেছে?

—পণ্ডিত মশায়, শুধু তাই নয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ও জিনিসের আরও অনেক মিল আছে। দুয়ের চিকিৎসাও এক, মধুর রসেরও ওষুধ তিক্ত রস। তত্ত্বকথার কুইনিন্ খাওয়ালে ভালবাসা মানুষের মন থেকে পালাতে পথ পায় না।

দেওয়ানজি এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন—কুইনিনে বুঝি জ্বর ছাড়ে? শুধু আটকে দেয়। শিশি শিশি কুইনিন গিলেছি কিন্তু আমার পিলে—

রায় মহাশয় এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলেন। উজ্জ্বল-নীলমণিও স্মৃতিরত্নের কথায় তিনি কাণ দেন নি, কিন্তু দেওয়ানজির কথাটি তাঁর কাণে পেঁৗছেছিল। তিনি মহা গরম হয়ে বললেন ঃ—

চুপ করো হে দেওয়ানজি, তোমার পিলে কত বড় হয়ে উঠেছে, সে কথা শুনে শুনে আমার কাণ পচে গেল। ঘোষালের যে যকৃৎ শুকিয়ে যাচ্ছে, কৈ ও তো তা নিয়ে রাত নেই দিন নেই যার তার কাছে নাকে কাঁদতে বসে না। পিলে যকৃতের চাইতে যা দশগুণ বেশি সাংঘাতিক, তাই হয়েছে ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের,—হৃদরোগ। ও-যে কি ভয়ানক রোগ তা আমি ভুগে ভুগে টের পেয়েছি। সে যা হোক, ঘোষাল যে একটা ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাত দুপুরে একটা তেপান্তর মাঠের ভিতর একটা মন্দিরের মধ্যে একটা মেয়ের হাতে সঁপে দিলে, অথচ তার কে বাপ কে মা, কি জাত কি গোত্র জানা নেই; সে বিষয়ে দেখছি তোমাদের কারও খেয়াল নেই। হ্যাঁ দেখ্ ঘোষাল, তুই ব্রাহ্মণের ছেলের জাত মারবার আচ্ছা ফন্দি বার করেছিস! উজ্জ্বল-নীলমণি যে বলেছিল তোর ধর্ম্মজ্ঞান নেই, এখন দেখছি সে কথা ঠিক।

—আজ্ঞে সে কথা আমি অন্য সূত্রে বলেছিলুম। যা ঘটনা হয়েছে তাতে ঘোষালের দোষ নেই। পূর্ব্বরাগ তো আর জাত বিচার করে হয় না। এ বিষয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন "পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারি"—

—বটে! তবে যাও মুসলমানের ঘরে খাও পানি—বদনায় করে। তারপরে

এখানে একবার জাতবিচার করতে এসে দেখো কি হয়।

—হুজুর গোঁসাইজি কথা ঠিকই বলেছেন, শুধু একটা কথায় একটু ভুল করেছেন। "পানি" না বলে ব্রাণ্ডিপানি বললে আর কোনও গোলই হত না। জল অবশ্য যার তার হাতে খাওয়া যায় না, কিন্তু মদ সকলের হাতেই খাওয়া যায়। আর ভালবাসা জিনিসটে দুনিয়ার সেরা মদ।

—তোর দেখছি হতভাগা শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোথাও উপমা জোটে না। তোরা দুটোয় মিলেছিস ভাল। একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। একে ঘোষাল মুলে গায়েন তার উপর আবার উজ্জ্বল-নীলমণি দোহার। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত মহাশয়ের মত শুনতে চাই, তোদের কথা শুনতে চাইনে।

—অজ্ঞাত-কুলশীলার প্রতি ভালবাসার ঐরূপ আচাম্বিতে জন্মলাভটা স্মৃতির হিসেবে নিন্দনীয়, কিন্তু কাব্যের হিসেবে প্রশস্ত। শকুন্তলা, দময়ন্তী, মালবিকা, বাসবদত্তা, রত্নাবলী, মালতী প্রভৃতি সব নায়িকারই ত—

আজ্ঞে তা ত হবেই! স্মৃতির কারবার মানুষের জীবন নিয়ে আর কাব্যের কারবার তার মন নিয়ে।

—কাব্যের শিক্ষা আর স্মৃতির শিক্ষা যদি উলটো হয়, তাহলে মানুষে কোন্‌টা মেনে চলবে?

—দুটোই। কাজকর্ম্মে স্মৃতি আর লেখাপড়ায় কাব্য।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঐখানেই ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল। আমরা বলি রস এক—তা সে জীবনেরই হোক আর কাব্যেরই হোক।

—তাহলে আপনারা কি চান যে, গল্পটা হোক জীবনের মত আর জীবনটা হোক গল্পের মত?

—আজ্ঞে তা নয় হুজুর! ভট্টাচার্য্যের মতে, জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয় আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়; কিন্তু গোস্বামীর মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।

—তুমি থামো ঘোষাল, এ সব বিষয়ে বিচার করবার অধিকার তোমার নেই। পরিণামবাদ কাকে বলে যদি বুঝতে...

—ঘোষাল তা না বুঝতে পারে, কিন্তু অপরিণামবাদ কাকে বলে তা বুঝলে আপনি ও-সব বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। অলঙ্কার শাস্ত্র যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করে, তাহলে তার পরিণাম সমাজের পক্ষে কি ভীষণ হয় তা ভেবে দেখুন ত।

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়, উনি কাব্যে ও সমাজে ভেস্তে দিতে চান যে দুয়ের প্রভেদ আকাশ পাতাল। সমাজে হয় আগে বিয়ে, পরে সন্তান, তারপরে মৃত্যু ; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা, তারপর হয় বিয়ে, নয় মৃত্যু। এক কথায় মানুষের জীবনে যা হয় তার নাম প্রাণান্ত! কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত নয় বিয়োগান্ত ; হয় ঘটক নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।

—তাহলে তুই দেখছি ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের হয় জাত মারবি, নয় প্রাণ মারবি।

—আজ্ঞে প্রাণ মারতে পারি কিন্তু জাত কিছুতেই মারব না। হুজুরের কাছে গল্প বলছি আর আমার নিজের প্রাণের ভয় নেই ?

—দেখ্ তোকে আগে বলেছি ব্রহ্মহত্যা কিছুতেই হতে দেব না।

—আজ্ঞে যদি আখেরে মাথায় বাজ পড়ে লোকটা মারা যায় সেও কি আমার দোষ ?—এ দুর্যোগ কি আমি বানিয়েছি ?

—কি বললি ? ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু, মন্দিরের ভিতরে আর আমার সমুখে বেটা আজ গাঁজা টেনে এসেছিস বুঝি! যেমন করে পারিস মিলনান্ত করতেই হবে—বিয়োগান্ত কিছুতেই হতে দেব না।

—আজ্ঞে আমিও তো সেই চেষ্টায় আছি! তবে ঘটনাচক্রে কি হয় তা বলতে পারি নে। একটা কথা আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, যেমন করেই হোক আমি ওর জাত আর প্রাণ—দুই টিকিয়ে রাখব, তারপর যা হয়! হুজুর আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, যদি একটু ধৈর্য্য ধরে না থাকেন তাহলে গল্প এগুবে কি করে, আর যদি না এগোয় ত তার অন্তই বা হবে কি করে।

—আচ্ছা বলে যা।

—তবে শুনুন :—

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রথমটা যতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, শেষে আর ততটা থাকলো না। সব বিপদের মত ভালবাসার প্রথম ধাক্কাটা সামলানো মুস্কিল, তারপর তা সয়ে আসে। ক্রমে যখন তার জ্ঞানচৈতন্য ফিরে এল, তখন সে সেই মেয়েটিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। প্রথমেই তার চোখে পড়ল যে মেয়েটির মাথার চুল কপালের উপর চুড়ো করে বাঁধা, আমাদের মেয়েরা নেয়ে উঠে চুল যেমন করে বাঁধে তেমনি করে, বোধহয় চুল ভিজে গিয়েছিল বলে। তারপর চোখে এসে ঠেকল তার গড়ন। সে অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা আর কি বলব! তার দেহটি ছিল তার চোখের মত লম্বা, তার নাকের মত সোজা আর তার

ঠোঁটের মত পাতলা। কিন্তু বেচারি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। তার শাড়ী চুঁইয়ে দরবিগলিত ধারে জল পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার সর্ব্বাঙ্গ রোদন করছে। এই দেখে ব্রাহ্মণের ছেলের ভারি মায়া হল, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরও আত্মপ্রাণী কাঁদতে সুরু করে দিল।

"—চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—কি? কি? উজ্জ্বল-নীলমণি আবার কি বলে?

—হুজুর, গোঁসাইজির ভাব লেগেছে, তাই ইনি পদাবলী আওড়াচ্ছেন। উনি বলছেন—

"—চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—ঘোষাল! মেয়েটার পরণে কি রঙের শাড়ী ছিলরে?

—হুজুর লাল।

—আঃ! ঐ এক কথায় সব মাটি করলে হে!—

"—চলে লাল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

বললে ও কবিতার আর থাকে কি! আর যার তুল্য কবিতা ভূ-ভারতে কখনো হয়ও নি, হবেও না, তারই কি না জাত মেরে দিলে?

—গোঁসাইজি গোসা করছেন কেন? আমি যে রঙ-চড়িয়েছি তাতেই তো উপমা মেলে। মানুষের পরাণ যদি কেউ নিঙড়ায় তা হলে তা থেকে যা বেরোবে তার রঙ ত লাল। তবে বলতে পারিনে, হতে পারে যে কারও কারও রক্তের রঙ ও চামড়ার রঙ এক—ঘোর নীল।

—নাই পেয়ে পেয়ে এখন দেখছি তুমি ভদ্রলোকের মাথায় চড়ছ।

—রাগ করেন কেন মশায়। কোনও সাহেবকে যদি বলা যায় যে তোমার গায়ের রক্ত নীল, তাহলে ত সে না চাইতে চাকরি দেয়।

আবার একটা বকাবকির সূত্রপাত দেখে রায় মহাশয় হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,—

—যদি কথায় কথায় তর্ক তুলিস তাহলে রাত দুপুরেও গল্প শেষ হবে না —আর তুই ভেবেছিস এইখানেই আজ রাত কাটাব?

—হুজুর তর্ক আমি করি! আমি একজন গুণী লোক—নভেলিষ্ট।

কথায় বলে যাদের আর গুণ নেই তাদের ছার গুণ আছে। যারা গল্প করতে পারে না তারাই ত তর্ক করে।

—ভারি গুণী। কি চমৎকার গল্পই বলছেন।

—বটে। আমি এইখান থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি গোঁসাইজি, তারপর চালান দেখি ত কতক্ষণ চালাতে পারেন, হুজুরের এক প্রশ্নের ধাক্কাতেই উল্টে চিৎপাত হয়ে পড়বেন—

—ওরে ঘোষাল, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস্। আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, মেয়েটার বয়স কত?

—উনিশ কি বিশ।

—সধবা কি বিধবা?

—কুমারী। কাব্যে হুজুর কুমারী ছাড়া আর কিছু ত চলে না।

—আমাকে বোকা পেয়েছিস না খোকা পেয়েছিস। ছ-ছেলের মা'র বয়েসী, আর তিনি হলেন কুমারী? বাঙালীর ঘরে কোথায় অত বড় আইবুড়ো মেয়ে দেখেছিস বল ত?

—হুজুর, মেয়েটি ত বাঙালী নয়—হিন্দুস্থানী।

—যেই একটা মিথ্যা কথা ধরা পড়েছে অমনি আর একটা মিথ্যে কথা বানাচ্ছিস। কোথাও কিছু নেই, বলে দিলি হিন্দুস্থানী।

—হুজুর, তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা ওড়না, আর তার শাড়ীর সুমুখে ঝুলছিল কোঁচা।

—হোক না হিন্দুস্থানী, হিন্দুস্থানীও ত হিন্দু। আর তোদের চাইতে ঢের পাকা হিন্দু। জানিস দুধের দাঁত পড়বার আগে মেয়ের বিয়ে না হলে তাদের জাত যায়? কোন হিন্দুস্থানী হিঁদুর বাড়ীতে অত বড় মেয়ে আইবুড়ো দেখেছিস বলত গাধা।

—হুজুর, মেয়েটা হিঁদু নয়, মুসলমান।

—কি বললি? মুসলমান? হিন্দুর মন্দিরে যেখানে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ, সেইখানে রাসকেল মুসলমান ঢুকিয়েছিস। মন্দির অপবিত্র হবে, ব্রাহ্মণের ছেলের জাত যাবে, কি সর্ব্বনাশের কথা! লক্ষ্মীছাড়িকে এখনি মন্দির থেকে বার করে দে।

—হুজুর, এই দুর্যোগের মধ্যে—

—দুর্যোগ ফুর্যোগ জানি নে, এই মুহূর্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্দ্ধচন্দ্র।

—হুজুর, বাইরেও দেবতা অপ্রসন্ন আর ভেতরেও যদি দেবতা আশ্রয় না

দেন তো বেচারা যায় কোথায় ? হোক না মুসলমান, মানুষ ত বটে, আমাদের মত ওর-ও রক্ত ও মাংসের শরীর।

—খোপসুরতি দেখে বেটার ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে! আমার হুকুম মানবি কিনা বল্ ? হয় ওকে মন্দির থেকে বার কর্, নয় তোকে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছি,—এই জমাদার! ইস্‌কো গরদান পাকড়কে নিকাল দেও!

—হুজুর, একটু সবুর করুন। হুজুরের হুকুম তামিল না করতে হলে আমাকে কি আর এতটা বেগ পেতে হত ? ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি দিতে হবে না। মেয়েটি হিন্দুস্থানীও নয়, মুসলমানীও নয়, বাঙালী কুলিন ব্রাহ্মণের মেয়ে।

—আবার মিথ্যে কথা! কুলীনের মেয়ের গায়ে ওড়না ওড়ে আর সে কোঁচা দিয়ে শাড়ী পরে!

—হুজুর, ও আমার দেখবার ভুল। শাড়ীটে ভিজে সুমুখের দিকে জড় হয়ে গিয়েছিল, তাই দেখাচ্ছিল যেন কোঁচা, আর গায়ে ছিল চেলির চাদর তাই ওড়না বলে ভুল করেছিলুম।

—এই যে বললি সলমা চুমকির কাজ করা ?

—হুজুর, ঐ চাদরের উপর গোটাকতক জোনাকি বসেছিল তাই চুমকির মত দেখাচ্ছিল।

—তাই বল্। আঃ! বাঁচা গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!

—হুজুর, আপনার না হোক আমার ত তাই। জমাদারের নাম শুনে ভয়ে ত আমার পাঁচ-প্রাণ দশদিকে উড়ে গেছল। ভুল করে একটা কথা……।

—অমন ভুল করিস কেন ?

—হুজুর, অমন ভুল অনেক বড় বড় কবিরাও করেন, আমি ত কোন্ ছার, তবে তাঁদের বেলায় সে সব ছাপার ভুল বলে পার পেয়ে যায়।

—সে যাই হোক্! ঘোষাল এতক্ষণে গল্পটা বেশ গুছিয়ে এনেছে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে হয়নি, শেষটা ভগবানের অনুগ্রহে কেমন বর জুটে গেল। একেই ত বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। ঘোষাল, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। তুই যে খালি ব্রাহ্মণের ছেলের জাত বাঁচিয়েছিস্ তাই নয়—ব্রাহ্মণের মেয়ের বাপেরও জাত বাঁচিয়েছিস্। এখন নিশ্চিন্ত মনে গল্প বলে যা। কি খেয়ে গল্প বলিস্ বল্ ত ? এবার তোকে বিলেতি খাওয়াব।

—হুজুরের প্রসাদ চরণামৃত জ্ঞানে পান করব, তারপরে মুখ দিয়ে বেরবে অনর্গল বিলেতী গল্প। এখন যা হল শুনুন :—

ভালবাসা জিনিসটে অন্তত কাব্যে একটা সংক্রামক ব্যাধি। কবিরা এক-জনের মনের সিগারেট থেকে আর একজনের মনের সিগারেট ধরিয়ে নেন। কাব্যের এ হচ্ছে মামুলি দস্তুর। তাই আমাকে বলতেই হবে যে ব্রাহ্মণের ছেলের ভালবাসার ছোঁয়াচ লেগে সেই কুলীন কুমারীর মনে, স্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে ভালবাসার রং ধরতে সুরু করল।

—কি বললি? স্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! বিলেতির নাম শুনেই অজ্ঞান হয়েছিস্, আর বেফাঁস বকছিস্। বেটা খাঁটির খদ্দের স্যাম্পেনের গুণাগুণ তুই কি জানিস্! পোর্ট বল্—আমার ত আর কিছু জানতে বাকি নেই। শ্যাম্পেনের নেশা হয় ধরে না, নয় চট করে মাথায় চড়ে যায়। ভালবাসার নেশা যদি আস্তে আস্তে চড়াতে চাস্ ত সেরীর সঙ্গে তুলনা দে,—গেলাসের পর গেলাসে যা রক্তের গাঁথুনি গেঁথে যায়!—হুজুর ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষের মনে ভালবাসা আস্তে আস্তে বাড়ে বটে, কিন্তু তার বনেদ খুব পাকা হয়। ওদের মনে ও-বস্তু একবার শিকড় গাড়লে তা আর উপড়ে ফেলা যায় না, কেননা সে শিকড় শুধু ভিতরের দিকেই ডুব মারে। কিন্তু হুজুর এইখানে একটু মুস্কিলে পড়েছি। স্ত্রীলোকের ভালবাসা বর্ণনা করা যায় না; কেননা তার কোন বাইরের লক্ষণ দেখা যায় না; আর যদি দেখা যায়, তা হলেই বুঝতে হবে সে সব হাবভাব, ভিতরে ফাঁকা।

—তবে কি ওদের মনের কথা জানবার জো নেই?

—আমি ত তা বলিনি, আমি বলছি জানা দুঃসাধ্য কিন্তু অসাধ্য নয়। ওদের মুখ ওদের বুকের আয়না নয়। যেমন পুরুষের পান্ডুরোগ। তেমনি স্ত্রীলোকের হৃদ্‌রোগ ধরা পড়ে চোখে, এখানেও মেয়েটা ঐ চোখেই ধরা দিলে। কি হল শুনুন:—

তার চোখের ভিতর একটা অতি টিমে অতি ঠান্ডা আলো ফুটে উঠল। কিন্তু সে আলো বিদ্যুৎ, স্ত্রী-বিদ্যুৎ বলে অত ঠান্ডা। সেই স্ত্রী-বিদ্যুতের টানে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখ থেকে পুং-বিদ্যুৎ ছুটে বেরিয়ে এল, তারপর সেই দুই বিদ্যুৎ মিলে লুকোচুরি খেলতে লাগল।

"নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাস।"

—উজ্জ্বল-নীলমণি আবার কি বলে হে?

—আজ্ঞে ওঁর ভাবোল্লাস হয়েছে তাই উনি আখর দিচ্ছেন।

—আখরই দিন আর যাই দিন আমি বলে রাখছি যে আখেরে ঐ "নয়ন

ঢলাঢলি লহু লহু হাসের" বেশী আর আমি যেতে দেবো না।

—আজ্ঞে এর একটা তো আর একটার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

—রাখো হে তোমার পরিণামবাদ, অমন ঢের ঢের দর্শন দেখেছি।

—হুজুর, গোঁসাইজির কথা শুধু দর্শন নয়, বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কোন বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ সেঁদুলে তা আপনি হয়ে উঠে চুম্বক।

—বটে! হতভাগারা মরবার আর জায়গা পেলে না। দেবমন্দিরকে করে তুললে একটা কুঞ্জবন। যেমন আক্কেল ঘোষালের, তেমনি উজ্জ্বল-নীলমণির, এখন ত দেখছি এ দুটো মাসতুতো ভাই।

—হুজুর, বড় বড় কবিরাও এ কাজ পূর্ব্বে করে গিয়েছেন।

—সত্যি নাকি পণ্ডিত মশায়?

—আজ্ঞে আমি ত কোন সংস্কৃত কাব্যে দেখিনি যে দেবালয় হয়েছে প্রেমের রঙ্গালয়।

—আমাদের পদাবলীতেও ওসব ব্যাপার মন্দিরের বাইরেই ঘটে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন "যব গোধূলি সময় ভেলি ধনী মন্দির বাহির ভেলি"।

—ঘোষাল নিজে করবি কুকীর্ত্তি আর বড় বড় কবিদের ঘাড়ে চাপাবি দোষ।

—হুজুর, আমি মিথ্যে কথা বলিনি, বাঙলার বড় বড় লেখকেরা এ কাজ না করলে আমার কি সাহস যে আমি আগে ভাগেই তা করে বসব, আমি ত একজন ছোট গল্পকার। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" হিসেবেই আমি চলি।

—বাঙলা আবার ভাষা, তার আবার লেখক, তার আবার নজির। মন্দিরের ভিতর আমি মধুর রসের চর্চা আর বেশী করতে দেব না, কে জানে তোদের হাতে পড়ে সে রস কতদূর গড়াবে।

—তাহলে বলি হুজুর, ওটা আসল মন্দির নয়, ভোগের দালান।

—আবার মিথ্যে কথা? এই হাজার বার বলছিস মন্দির, আর এখন বলছিস ভোগের দালান।

—হুজুর, মন্দির হলে আর তার ভেতর ঠাকুর থাকত না? আগেই ত বলেছি যে সেখানে একটি ছাড়া দুটি মূর্ত্তি ছিল না।

—তাও ত বটে। খুব ডিগবাজি খেতে শিখেছিস্। তুই আর জন্মে ছিলি গেরবাজ।

—হুজুরের কৃপায় এখন লোটন না হলেই বাঁচি।

—আচ্ছা যাক্, এখন তুই গল্প বলে যা, এতক্ষণে জমেছে।

—হুজুর, তারপর ব্রাহ্মণ সন্তানটি এমনি স্নেহভরে ব্রাহ্মণ কন্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলে যে তার গায়ে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণগুলি সব ফুটে উঠল। তার কপাল বেয়ে ঘামের সঙ্গে সিঁথের সিঁদুর গলে তার ঠোঁটের উপর পড়ল আর তার অধর পান খাওয়া ঠোঁটের মত লাল টুকটুকে হয়ে উঠল।

—রোস্ রোস্ সিঁদুরের কথা কি বললি ?

—কই হুজুর, সিঁদুরের নামও ত ঠোঁটে আনি নি।

—উঃ, তুই কি ঘোর মিথ্যেবাদী। সিঁদুর শুধু নিজের ঠোঁটে আনিস নি, ওর ঠোঁটেও মাখিয়েছিস্।

—তাহলে হুজুর, ও মুখ ফস্কে গেছে।

—ও সব জুয়োচ্চুরি কথা আর শুনছি নে। একটা সধবাকে রাসকেল আমাকে ঠকিয়ে কুমারী বলে চালিয়ে দিচ্ছিল।

—আজ্ঞে সধবাই যদি হয় তাতেই বা ক্ষতি কি ?

—কি বল হে উজ্জ্বল-নীলমণি, ক্ষতি কি ?

—আজ্ঞে আমি বলছিলাম কি, নায়িকা ত পরকীয়াও হয়—

এ কথা শুনে সভাসুদ্ধ লোক একবাক্যে ছি ছি করে উঠল। উজ্জ্বল-নীলমণি তাতে ক্ষান্ত না হয়ে বললেন :—

হয় কি না হয় তা বিবর্ত্তবিলাস, মীরাবাইয়ের কড়চা প্রভৃতি পড়ে দেখুন, এমন কি কবিরাজ গোস্বামী পর্য্যন্ত……

এই কথায় একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল, সকলে এক সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলে—কেউ কারও কথায় কান দিতে রাজি হল না। উজ্জ্বল-নীলমণি তাঁর মিহি মেয়েলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন। "পিকোলোর" আওয়াজ যেমন ব্যাণ্ডের গোলমালকে ছাড়িয়ে ওঠে তাঁর আওয়াজও এই হৈ চৈ-এর উপরে উঠে গেল। সকলে শুনতে পেলে তিনি বলছেন :—

—আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন তারপর যত খুসি চেঁচামেচি করবেন। স্বকীয়া ত পদকর্ত্তাদের মতে "কর্ম্মনারী"—সে না হলে সংসার চলে না ; কিন্তু রস-সাহিত্যে তার স্থান কোথায় ? দেখান ত পদাবলীতে……

—রক্ষা করুন, গোঁসাইজি, থামুন, আপনার ওসব মত এখানে চলবে না, আপনার পাস করা শিষ্যেরা হলে ওর যা হয় তা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করতে পারত, কিন্তু দেখছেন না পণ্ডিতমশায় রাগ করে উঠে যাচ্ছেন। আপনার পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে নিতে আমি মোটেই রাজি নই। দাঁড়ান পণ্ডিত

মশায়। ব্যাপারটা কি তা না বুঝেই আপনারা সব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আসলে ঘটনা এই যে, মেয়েটি সধবা বটে কিন্তু পরকীয়া নয়।

—তুই দেখছি বেটা একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিস, যা মুখে আসছে তাই বলছিস। স্ত্রীলোকটা হল সধবা অথচ কারও স্ত্রী নয়। এমন অসম্ভব কাণ্ড মগের মুলুকেও হয় না।

—হুজুর, আমি মিছে কথা বলি নি। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল বটে কিন্তু দশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ। আর সে যখন স্বামীর পথ চেয়ে বসে বসে শেষটা হতাশ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে—তখন তাকে বে-ওয়ারিশ হিসেবেই ধরতে হবে।

—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে"—এ বচন শাস্ত্রে থাকলেও কাব্যে নেই। একালে ওসব কথা মুখে আনতে নেই, কেন না তা শুনে অর্ব্বাচীনদের মতিভ্রম হতে পারে। আজ যদি তোমরা ও সব কাব্যে চালাও, দুদিন পরে তা সমাজে চলবে, তারপর সব অধঃপাতে যাবে। দেখো ঘোষাল, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, পুত্রতুল্য, কেননা তোমার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আছে; কিন্তু রঙ্গরসের ভূত যখন তোমার ঘাড়ে চাপে, তখন তুমি এত প্রলাপ বকো যে প্রবীণ লোকের পক্ষে সে ক্ষেত্রে তিষ্ঠোনো ভার। আজ যে রকম উচ্ছৃংখলতার পরিচয় দিচ্ছ তাতে আমি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি।

এই বলে পণ্ডিতমশায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে তাঁর গতিরোধ হল। এই সুযোগে ঘোষাল তাঁর কাছে জোড়হস্তে নিবেদন করলে ঃ—

আপনি আমার ধর্ম্ম-বাপ। আপনার পায়ে ধরি আমাকে বিনা অপরাধে ত্যজ্যপুত্র করে চলে যাবেন না। এতটা উতলা হবার কোনই কারণ নেই। সিথেয় সিঁদুর থাকলেই যে সধবা হতেই হবে এমন ত কোনও কথা নেই। ও মেয়েটি ছিল ভৈরবী তাই না তার মাথায় ছিল সিঁদুর।

এ কথা শুনে সভা আবার শান্ত হল, স্মৃতিরত্ন তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। রায় মহাশয় কিন্তু খাড়া হয়ে বসে বজ্র-গম্ভীর স্বরে বললেন ঃ—

ঘোষাল, তোর গল্প বন্ধ কর, নইলে কত যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবি তার আর আদি অন্ত নেই। আজ তোর ঘাড়ে রসিকতার নয়, মিথ্যে কথার ভূত চেপেছে, ঝাঁটা দিয়ে না ঝাড়লে তা নামবে না।

—হুজুর, আমার একটি কথাও মিছে নয়। ভৈরবী না হলে কি গেরস্তর ঝি বউ লাল শাড়ী পরে, লাল দোপাট্টা ওড়ে, কাছা কোঁচা দেয়, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধে, এক কপাল সিঁদুর লেপে—

—হোক না ভৈরবী, তাতেই তুই বাঁচিস কি করে? ভৈরবীর আবার প্রেম কিরে—

—হুজুর এতক্ষণই যদি ধৈর্য্য ধরে থাকলেন, তবে আর একটু থাকুন। গল্পের শেষটা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই খুসি হবেন। শুনুন :—

ঐ ভৈরবীটি আর কেউ নয়, ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেরই স্ত্রী। ভদ্রলোক দশ বৎসর নিরুদ্দেশ হয়েছিল। দেশের লোক বললে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পতিপ্রাণা রমণী সে কথায় বিশ্বাস করলে না। "আমার সিঁথের সিঁদুরের যদি জোর থাকে, তবে আমার হাতের লোহা নিশ্চয়ই ক্ষয়ে যাবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমার স্বামী হয়েছেন স্বামীজি।" এই বলে সে স্বামীর সন্ধানে ভৈরবী সেজে বেরিয়ে পড়ল। ভগবানের ইচ্ছায় এই পুণ্যস্থানে দুজনের আবার মিলন হ'ল। স্ত্রী স্বামীকে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছিল, কারণ এই দশ বৎসর শয়নে স্বপনে সে ঐ মূর্ত্তিই ধ্যান করেছিল, কিন্তু স্বামী তাকে চিনতে পারেনি দেখে সে স্বামীকে একটু খেলিয়ে সন্ন্যাসের ঘোলাজল থেকে গার্হস্থ্যের শুকনো ডাঙ্গায় তোলবার মতলবে এতক্ষণ জড়সড় হয়ে ও মুড়িসুড়ি দিয়েছিল। তারপরে যখন সে চাদরখানি মাথা থেকে ফেলে দিয়ে সটান এসে স্বামীর সুমুখে দাঁড়াল, তখন ব্রাহ্মণ সন্তান বুঝতে পারল "এই সেই", অমনি সেই বৈদান্তিক-শাক্ত "তত্ত্বমসি" বলে ছুটে তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাতের মধ্যে কিছু পেলে না, শুধু দেয়ালে তার মাথা ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় মন্দিরের দুয়োর খুলে গেল আর তার ভিতরে ভোরের আলোয় দেখা গেল মন্দির একেবারে শূন্য।

—এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালি।

—হুজুর ভূতের গল্প শুনতে চেয়েছিলেন তাই শোনালুম।

বলা বাহুল্য ঘোষালের হাতে গল্পের এইরূপ অপমৃত্যু ঘটায়, সবচেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উজ্জ্বল-নীলমণি। তিনি দাঁত-খিঁচিয়ে বললেন :—

ভূতের গল্প না তোমার মাথা! পেত্নীর গল্প!

এই সময় বাড়ীর ভেতর থেকে খবর এলো যে মা-ঠাকুরাণীর মাথা ধরেছে। রায় মহাশয় অমনি হুড়মুড় করে উঠে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর পঁয়ষট্টি বৎসরের ভোগায়তন দেহের বোঝা কায়ক্লেশে অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাও সেদিনকার মত ভঙ্গ হল।

রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর

বিহারে বিহার

রসিকবাবু বয়সে ছোট। বাবু ঠাণ্ডিরাম বিজ্ঞ প্রবীণ ও সংসারাভিজ্ঞ। তিনি জানিয়াছিলেন যে সংসার মায়াময় এবং সুখদুঃখ মায়াময়। এখনো সংসারের সৃষ্টি হয় নাই। বাস্তবিক সংসার কেমন হওয়া উচিত এবং কবে হওয়া উচিত তাহারই পরীক্ষার্থ এখনকার সংসার-পাতা। সুতরাং সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, প্রভৃতি পরিবর্তনশীল পদার্থ আমরা যাহা ব্যবহারিকভাবে দেখি তাহা বিশাল একটা 'লেবোরেটরির' 'এক্স্‌পেরিমেণ্ট'। ইহার জন্য চটাচটি ও বকাবকি বেয়াকুবের কাজ। একথা ঠাণ্ডিরাম মহাশয় কাহাকেও বলিতেন না। এবং মধ্যে মধ্যে কড়া তামাকে দম দিয়া তাহা উপলব্ধি করিয়া লইতেন। তাহার কথার মূল্য ছিল, এবং তাহার জোরে রসিকবাবুর আগ্রহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। কলিকাতা সহরে অভিনয় করে অনেকে, তাহার মধ্যে বৈঠকখানায় বসিয়া, বালিসে মাথা ঘসিয়া, অনন্ত জীবনের একটা পরিচ্ছেদ নষ্ট করা মোটেই উচিত নয়, তাহা রসিকবাবু মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিলেন এবং পূর্ব্বে যে পঁয়ত্রিশ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দশ টাকা দিয়া একটা ছোট তানপুরা সংগ্রহ করিলেন। ঠাণ্ডিরাম পয়সাওয়ালা লোক, তাঁহার সে সব ত ছিলই,

উপরন্তু একটা হারমোনিয়ম সংগ্রহ করিয়া বন্ধুর সহিত পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

রসিকবাবু কিঞ্চিৎ বেসুরো। বন্ধু বলিলেন, শাদি না করিলে পুরুষ বেসুরো থাকে। কারণ আদ্‌চি (স্ত্রী) কান মোচড়াইয়া না দিলে পুরুষ-রূপী তম্বুরা সুরে পেঁছায় না। ইহার নজীর পাওয়া যায় সকল দেশেরই তোয়ারিখে (ইতিহাসে)। মিয়া আফ্‌তাবুদ্দিন পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে বিবাহ করেছিলেন এবং যদিও তাঁহার লেড়্‌কা হয় নাই, কিন্তু মরণের সময় বিহাগের ঠাটে গৌড়সারঙ্গ এত দরদের সঙ্গে পেয়ারা আওয়াজে গাইয়াছিলেন যে তাঁহার স্ত্রীর আঁখির আঁসু তিনদিন শুখায় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে তোমারও শাদি করা জরুরী কাজ। সেটা সেখানে গিয়া বন্দোবস্ত হবে। আগে নক্‌রিটা হইয়া যাক্‌। এখন বিছানা ঝাড়িয়া লও। একদেশের ছারপোকা অন্য দেশে লইয়া গেলে অমঙ্গল হয়। কাবাবের শিক্‌, গড়গড়ার নল, চিলম্‌চি, সরপোস্‌, সাবধানে ব্যাগে পুরিয়া লও। তুলসীদাসের দোঁহা ও রামায়ণ সংগ্রহ কর। দার্জিলিং-এর ভাল চা দুই তিন মাসের জন্য বাঁধ। বরষার মোসিম সম্মুখে। জীবজন্তু কেহ কাহাকে মদৎ দেবে না। নিজের সাহায্য নিজের হাতে, এবং তার সঙ্গে পরের সাহায্যের জন্য দুটো জিনিষের দরকার। একটা হৈমবতী ঔষধ, দ্বিতীয় চা ও তামাফ। তামাক আমি দিব।

রসিক। কিছু আনারস প্রভৃতি ?

ঠাণ্ডিরাম। বাহুল্য, বাহুল্য। ছাতু আমাদের মতো ইন্‌সানের প্রধান খাদ্য, বিশেষতঃ রাস্তাঘাটে। ছাতু ও শক্কর, গুড় ও ছাতু। বুটের দালের সাতু। তার সঙ্গে খাঁটি দুগ্ধ হইলে জীবনে মৌতে আর কিছুরই দরকার নাই। মল্‌ট কডলিভারের কাজ করে। পিত্ত রক্ষা হয়, দাস্ত খোলসা হয়, গলা সাফ্‌ রাখে। সে দেশে তিন কিস্‌মের ছাতু। প্রথম বুটের। দ্বিতীয় যবের। তৃতীয় ভুট্টার। প্রথমটাই শ্রেষ্ঠ এবং সঙ্গীন, এবং বাঙ্গালীর পক্ষে ফায়দাকারক। দ্বিতীয় কেবল পর্দানশীনের জন্য। তৃতীয় কিষাণদের প্রিয়। যদি চড়া সুরে খেয়াল গাইতে হয় তবে একটু লংকা মিশাইবে।

রসিকবাবু জিনিস গুছাইতে লাগিলেন, ঠাণ্ডিরাম সেতার লইয়া গুণ গুণ স্বরে ভজন গাইতেছিল। কলিকাতা ছাড়িতে মায়া হইয়াছিল নিশ্চয়। মা কালীর উদ্দেশে একটা নমস্কার করিয়া জীবনের বোঝা খানিকটা হাল্‌কা করিয়া, উভয় বন্ধু পশ্চিম যাত্রা করিলেন।

সুরথকেতু সিংহ সুলতানগঞ্জের বাটীতে বিরক্ত হইয়া বসিয়াছিলেন।

তাহার কারণ প্রত্যহ এক জিনিস ভাল লাগে না। ভাল না লাগিলেই বৈরাগ্যের সূত্রপাত। বৈরাগ্য হইলেই পরিবারবর্গের ত্রাস। অতএব সকলেই তাঁহার মনস্তত্ত্ব লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। কাহারও মতে হাওয়া পরিবর্তন। কেহ বলিলেন, পোষাক পরিবর্তন। কেহ খাদ্য পরিবর্তন। পরিবর্তনের মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা কলিকাতায় অধিক বলিয়া, সকলেরই মত হইল তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া। সূর্য্যকেতু তাহাই ভাবিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে রসিকবাবু, ঠাণ্ডিরামের সহিত তানপুরা লইয়া উপস্থিত। সিংহ মহাশয় মনে করিলেন যে উভয়েরই চেহারা খুব সভ্য ও নির্বিকার। জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনারা কুথাকার বাসিন্দা। হামি বাংলা কহিতে পারি। বোধ হচ্ছে আপনারা বাঙ্গালী?'

রসিক। হুজুরের অসাধারণ ধীশক্তি। আমি ও বন্ধু উভয়েই বাঙ্গালী। তবে বন্ধু ঠাণ্ডিরাম লক্ষ্নৌতে থাকেন। আমার নাম রসিক।

ঠাণ্ডিরাম। হামার দৌলতখানা ছিল গৌড়ে, গৌড় ধ্বংস হবার পর হামি কলকত্তা চলিয়া যাই।

সিংহ। গৌড়মল্লার রাগটা বোধ হয় গৌড়ের তৈয়ারি।

ঠাণ্ডি। গৌড়ে খুব বর্ষা হওয়াতে যে ভেক ডাকিয়াছিল তাহারই বাবদ গৌড়মল্লার।

সিংহ। তবে আপনারা গরীবের নিবাসে অতিথি হইয়া গৌড়মল্লার আলাপ করুন।

রসিকবাবু তানপুরা লইয়া ঠাণ্ডিরামের সেতারের সহযোগে গাইলেন—

গৌড়মল্লার—ঠুংরি

দেল্ দরিয়া রে দরিয়া
তার মাঝে ডুবে যাও, মরিয়া রে মরিয়া।
যদি দম বন্ধ হয়, নাকে মুখে পানি যায়,
আস্‌বে মাঝি কিস্তি লয়ে,
হাল ধরিয়া রে ধরিয়া।
যত্ন করে তুলে নেবে,
হরিনাম কানে দেবে,
যদি মর কিংবা বাঁচ, in any case,
তুমি যাবে ভবসিন্ধু পারে,
তরিয়া রে তরিয়া।

গান শেষ না হইতেই ঘোর বৃষ্টি। ইহাকে সকলেই মনে করিলেন মল্লার-মিশ্রিত বলিয়া। সিংহ মহাশয় অতিশয় প্রীত হইলেন। গানটি তাঁহার তখনকার মনের ভাবের সঙ্গে মিলিয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'আপনার গান গজব করিল। কলিকাতায় এমন গানের রেওয়াজ খুব ?'

রসিক। কলিকাতার লোকের তিনকাল গিয়া শেষকাল উপস্থিত, সুতরাং এই ধরনের গানই সকলে পছন্দ করে।

ঠাণ্ডিরাম। এবং ইহা চট্ করিয়া জমিয়া যায়। যেমন লক্ষ্ণৌ নগরীর আমিনাবাদের সরাইয়ের তামাকু। বন্দা, তামাকুর ব্যবসা করে।

সিংহ। বেশ, এক ছিলিম নমুনা দেন। আমার ধন-দৌলত কিছু জমা হওয়াতে মাহিস্ হয়েছে যে কলিকাতার ভ্রেনে ঢালিয়া দিই। সেখানে দুনিয়ার ময়লা সাফের বন্দোবস্ত খুব খুস্নুমা, এরূপ জনরব।

ঠাণ্ডিরাম। আলবৎ। কিন্তু এখন না গিয়া শীতকালে রওনা হইবেন। আপাততঃ কিছুদিন থোড়াবহুত গঙ্গাজীর বক্ষে কিস্তির উপর কিংবা স্টীমারে সয়ের করুন। কবি বলিয়াছেন—

বর্ষাকালে কিস্তী
শীতকালে পাল্কী,
গ্রীষ্মকালে এরোপ্লেন
বসন্তে হরিতকী।

সিংহ। ঠিক। রসিকবাবুর সঙ্গীতই পেশা ?

ঠাণ্ডিরাম। মোটেই না। লোকটা নেক্, শেখ্ সাজির মত খোদাভক্ত, তবে পেটের গুজারির জন্য যদি মালগুজারি আদায়ের তহসিলদারী জরুর হয়, তবে কাজটা শুরু করে দিতে পারেন। মুবাহিরা যা খুশি।

সিংহ। আমার খেয়াঘাটের ঠিকা আছে। তাহার মালগুজারি পারানি তহসিলের জন্য একজন তহসিলদার চাহি। কাজ সোজা, দরিয়ার তীরে থাসা বাসা, সেখানে গোশল করিয়া মাশুল ওশুল করিবেন, ও ভজন গাইবেন। ওশুলের শতকরা দুই টাকা উঁহার প্রাপ্য। মাসে পঞ্চাশ টাকা হইবে নিশ্চয়। সন্ধ্যার পরে আমার দেউড়িতে তস্রিফ এনে গান শুনাবেন আর আপনি ?

ঠাণ্ডিরাম সেলাম করিয়া নিবেদন করিলেন,—'আমি লক্ষ্ণৌ চলিতেছি, শীতের মৌসিমে আপনাকে লইয়া কলিকাতায় যাব।

অনেক পুণ্যের জোর না থাকিলে গঙ্গাতীরে বাস হয় না। পাপ-পুণ্যের

বহির্ভূত বলিয়া ভগবানকেও যমুনার তীরে বাস করিতে হইয়াছিল। গঙ্গাতীর লাভ হয় নাই। তাই কবি বলিয়াছেন—

'ধীর সমীরে যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী।'

গঙ্গা শ্বেত জটা-নিঃসৃতা, শুভ্রকায়া। যমুনা কৃষ্ণা। যমুনা প্রেমময়ী, গঙ্গা জ্ঞানময়ী। সঙ্গমে বৈরাগ্যের সঙ্গে প্রেম একত্র হইয়াছিল প্রয়াগতীর্থে। উভয়ে মিলিয়া কাণ্ডী, কাশী ও মগধ বাহিয়া, অবশেষে পদ্মাকে লইয়া সাগরে মিশিয়াছিল।

যুবা রসিকবাবুর গৃহখানি খড়ের। প্রশস্ত তক্তপোশ। জ্বরজ্বালা হইলে যত খুশি গড়াগড়ি দেওয়া যায়। সুপকার পাঁড়েজি তাঁহার সঙ্গীতমুগ্ধ। ঢোলক বাজাইতে সে অদ্বিতীয়। অদূরে সারি-সারি দোকান, কাষ্ঠের আড়ত। নির্ম্মল বায়ু। স্বাস্থ্যকর স্থান। সম্মুখে গঙ্গাগর্ভোত্থিত গৈবীনাথের শৈল ও তাহার শীর্ষে শিবের মন্দির। রসিকবাবুর সদ্ব্যবহারে সকলেই তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ দরিদ্র প্রতিবেশী। পারের কড়ি খেয়াঘাটের যাত্রী সকলেই দিয়া যায়, নিজের শতকরা দুই টাকা বিলাইয়া দিয়া বাকি সকলিই প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে জমিদারের দেউড়িতে দাখিল করিয়া আসেন। পূর্বাপেক্ষা খেয়ার মাশুল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিয়া সিংহ মহাশয় রসিকবাবুর বাঁধা মুসাহারা আশী টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উপরন্তু প্রত্যহের ছাতু, আটা ও ঘৃতের বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

রসিক। প্রভু, এত টাকা লইয়া করিব কি ?

সিংহ। শাদি করিয়া ফেল।

রসিক। পরিবার বাড়িয়া গেলে তাদের দিন কাটিবে কি করিয়া ?

সিংহ। দিন যে কোন কিসমে কাটে, তাহার জমাখরচ দেওয়া শক্ত। আমরা নিজের হাল্‌তের তুলনা করি, যাহারা সুখে আছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু, আমীর মধ্যেও গরীবের চেয়ে দুঃখী আছে। ও ফকিরের মধ্যেও আমীরের চেয়ে সুখী আছে। খান-দান বেড়ে গেলে, ভবসংসারে প্রাণদান ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই, তাহা বোধ হয় আপনার মতো হুঁশিয়ার ইয়ারকে বুঝানো বৃথা। রসিকবাবু ভাবিয়া দেখিলেন যে সুরথকেতু সিংহ একটা যে-সে লোক নয়। জনক ঋষির বংশ তাঁহারা। ভারতবর্ষের রাজর্ষির মহিমা এখনো ক্ষত্রিয়ের রক্তে রক্তে আছে। তাই পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 'আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য।'

গোটা দুই পূরবী রাগিণীর গান শুনাইয়া দিয়া রসিকবাবু গৈবীনাথের শৈলে চলিয়া গেলেন। সেখানে ভাবিতে লাগিলেন বিবাহ জিনিষটা কি?

আকাশ হইতে নদীর প্রান্তর পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কাহারো সঙ্গে মিলিয়া এক হয় না। চখার সহিত চখী উড়িয়া গেল। নদীর পাড়ের একটা অংশ ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া গেল। তরঙ্গের উপর খেয়ার তরী হেলিয়া দুলিয়া পরিশ্রান্ত। মাঠের শেষে ইন্দ্রধনু বক্ষে লইয়া আকাশ ঝুঁকিয়া। সমীরণ আনন্দ-স্পর্শে ঘাট-মাঠকে মাতাইবার জন্য ব্যস্ত। অস্তগামী সূর্যকর-বিম্বিত মেঘের বহুবর্ণ ক্রমে পরিবর্তিত হইতেছিল। কেহই কিন্তু কাহারো সঙ্গে মিশে না। কেবল আঁধারের মুখে ছুটিতেছে সবাই। আঁধার গ্রাস করিলে শেষে কাহারো চিহ্ন থাকিবে না। কিন্তু মরণের পরবর্তী ইতিহাস জানে কে? যতক্ষণ বাঁচিয়া ছিলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিলে, ততক্ষণ ত এক হইতে চাহ নাই। জগতে পরস্পরের মধ্যে কি কেবল আহার ও ঔষধের সম্বন্ধ। তবে প্রেমের স্থান কোথায়?

তবে কি দুঃখের মধ্যেই তাহার বিকাশ! তাহা যদি হয় তবে দুঃখ ও দারিদ্র্যই ভাল। সুখ খুঁজিলে হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া। ভ্রান্ত দম্পতি পরিণয়সূত্রে বন্ধ হইয়া সুখ অন্বেষণ করে।

কিন্তু আসে ত দুঃখ আবার। হয়ত তাহারই মধ্যে প্রেমাশ্রু দুই-একবিন্দু দেখা দেয়। সে বলে 'এই দুঃখের মধ্যে তুমি আমার'। সেই জন্যই কি বিবাহ?

ভাবিতে ভাবিতে রসিকবাবু অতিশয় ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। মোটা কাপড়ের পুঁটুলি হইতে খানিকটা ছাতু বাহির করিয়া গঙ্গোদকের সঙ্গে মিশাইলেন এবং তাহাতে শর্করা মিশ্রিত করিয়া লাড়ু পাকাইলেন। সবে মাত্র দুইটি লাড়ু উদরসাৎ করিয়াছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি বাঙ্গালী?'

তৃতীয় লাড়ু গলাধঃকরণ হইবার পূর্বে রসিকবাবু মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার দিকে একটি বালিকা কুঞ্চিত নাসিকা ও ওষ্ঠের তলে চতুষ্পাটি দন্তবিকাশ করিয়া স্মিতদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

৪

মুখ কালো হইলে হঠাৎ বানর বলিয়া ভ্রম হইত, কিন্তু সে মুখ কালো নয়। ভাবভঙ্গী অদ্ভুত। রসিকবাবু অতিশয় আশ্চর্য হইয়া বলিলেন,—

'বাঙ্গালী ত বটেই, কিন্তু সে কথা কেন ?'

বালিকা। বাঙ্গালী ছাতু খায় না, সন্দেশ খায়। পল্টনের একজন পাঞ্জাবী এসে এখানে ছাতু খে'ত, দিনকতক পরে সে যাকে-তাকে ধরে মাথা ফাটিয়ে দিত। তবে যদি লড়াইয়ে যান, তা হলে—

রসিক। তোমরা এখানে কর কি ?

বালিকা। আমরা আপনার বাসার কাছেই থাকি, ঢেঁকিতে পাড় দি, চর্খায় সুতো কাটি, আমার বাবার ক্যাঠের আড়ত আছে।

রসিক। এখানে ?

বালিকা। শিবমন্দিরে এসেছি।

রসিক। আমাকে দেখে সন্দেহ হ'ল কেন ?

বালিকা। আপনি মুরেঠা বেঁধে থাকেন, হিন্দুস্থানী ভজন গান, মোটা লাঠি হাতে ক'রে বেড়াতে যান, এই সব দেখে।

রসিক। আমি খেয়াঘাটের কড়ি আদায় করি, চোর ডাকাত না।

বালিকা। চোর ডাকাতকে আমরা ভয় করি নে। বাবার বন্দুক আছে। আমিও গুলি কর্ত্তে পারি।

রসিক। এমন কি, দরকার হ'লে লড়াইয়ে যেতে পার ? তুমি লাফ দিতে পার ?

বালিকা। খুব।

ইহা দেখাইবার জন্য সে একটা প্রস্তর হইতে আর একটা দূরবর্তী প্রস্তর-খণ্ডের উপর এক লাফে উপস্থিত হইল।

'আমি দু'বছর আগে ঠিক বানরের মত লাফ দিতে পারতেম।'

রসিক। তা আমি বুঝতে পাচ্ছি ; এই জন্য ভগবান রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য মানুষ নিয়ে যান-নি, কেবল বানর নিয়ে গিয়েছিলেন। মানুষগুলো অপদার্থ, বিশেষতঃ এদেশের।

বালিকা। বানরের মতো না হলে যুদ্ধ কর্ত্তে পারে না। আমি শুনেছি, কলকেতায় মানুষগুলো সভ্য হয়ে পড়েছে, তা হ'লে দেশ উদ্ধার হবে কি করে ?

রসিক। থিয়েটর আর বক্তৃতা করে। তারা বলে আমরা অপদার্থ হয়ে গিয়েছি, তোমরা দেশ উদ্ধার কর। শ্রোতা ও দর্শক বলে, 'আমরাও ক্রমে তোমাদের মতো মানুষ হচ্ছি, তারপর কি হবে, সেটা এখন বুঝা যাবে।'

বালিকা। আপনি কিন্তু সে দলের মধ্যে না।

রসিক। না, তবে তোমার মতো লাফ দিতে ও মুখ খিঁচুতে পারুব

কিনা, সেটা ঠিক্ বলতে পারি না।

বালিকা। আমি হাসতে গেলে মুখ খিঁচিয়ে ফেলি, যারা সে কথা জানে, তাদের সন্দেহ হয় না।

রসিক। একবার যথার্থ হাসতে যদি চেষ্টা কর, তবে আমার সে সন্দেহ দূর হয়।

বালিকা। আমার ঠিক হাসি কখনো পায় না।

রসিক। যদি কেহ ঘাটে পা পিছলে পড়ে যায়?

বালিকা। দুঃখ হয়। আমি যদি পাথরের উপর পা পিছলে পড়ে যেতাম, আপনি হয় ত হাসতেন।

রসিক। হাসতেম, কি রাগ কর্ত্তেম, তা ঠিক বলতে পারি না।

বালিকা। তারপর?

রসিক। হাত ধরে তুলতে চেষ্টা করতাম।

বালিকা। আমি কিন্তু তাতে রাগ করতাম, বিরক্ত হতাম—

রসিক। এবং উপরন্তু মুখ খিঁচুতে—এই রকম করে—রসিকবাবু বালিকার মুখভঙ্গীর নকল করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কি মনে করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—'বোধ হয় বুঝতে পারবে না, সূর্য একেবারে ডুবে গিয়েছে।'

উভয়ে নদীর পরপ্রান্তের আঁধারের দিকে তাকাইয়া ছিল। এমন সময় একটি ভদ্রলোক যষ্টি-হস্তে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মায়া, এখানে কি কচ্ছিস্?'

বালিকা পিতার নিকট দৌড়িয়া বলিল, 'ইনি ছাতু খাচ্ছিলেন, তাই দেখছিলেম।'

ভদ্রলোক। তুই এখনো আদব-কায়দা শিখ্‌লি-নে। (রসিকবাবুকে লক্ষ্য করিয়া)। মহাশয় কিছু মনে করবেন না, ওটা পাগলী, বুদ্ধি-শুদ্ধি কম। একটু লেখাপড়া শিখেছিল তাও ভুলে গিয়েছে। তবে কি জানেন, আমার ঐ একমাত্র সন্তান। বাড়ীর সকল কাজ অই করে। রান্না, আলপনা, সেবা-শুশ্রূষা,—

বালিকা বিরক্ত হইয়া বলিল,—'বাবা বাড়ী চল।'

রসিক। চলুন পার করিয়া দিই।

গৈবীনাথ শৈলের পদপ্রান্তে তহসিলদারের নাস কিস্তি ছিল। তিনজন পার হইয়া পরপারের তটে উত্তীর্ণ হইল।

বালিকা। এই দুজনের পায়ের দু'আনা পয়সা।

রসিক। দাঁড়াও গণিয়া লই।

বালিকা হস্তস্পর্শ করিতে দিল না। রসিকবাবু বলিলেন, 'আমার মুরেঠার কোণে বাঁধিয়া দেও, আমার থলিয়া নাই।'

বালিকা গণিল—এক-দুই-তিন—এই আট। এই তক্তার উপর রেখে গেলাম—মনে থাকে যেন।

রসিকবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, 'থাকবে'।

তার তিনদিন পরে সুরথকেতু সিংহ জমিদার কাঠের আড়তদার মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বিনোদবাবু, শুনেছি তোমার কারবার ফেল হইয়েছে, এখন হামার একটা সুপরামর্শ আছে। তোমার লেড়কির শাদি দিয়া ফেল।'

বিনোদবাবু। হুজুর আমার পয়সা কই? আর, ও পাগলীকে বিবাহ ক'রবে কে? আমার অবস্থা ত জানেন। আপনার কাছেই খাজনার বাবত দুশো টাকা বাকি।

সিংহ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—'খাজনার জন্য আন্দেশা করিতে হইবেক না। পাগলীকে শাদি করিবার জন্য একজন পাগল, আরও পাগল হইয়াছে। সে আমার খেয়াঘাটের তহসিলদার। সেও কায়স্থ-কুলীন—তোমাদের সঙ্গে তাদের গোত্র বাধে না। অমন সৎ, সুশীল, প্রেমিক হামি জীবনে দেখি নাই। এই মাসেই শাদির বন্দোবস্ত কর। যত টাকা লাগে হামি দিব।

বিনোদবাবু জমিদারের পদধূলি লইয়া বলিলেন, 'আপনি যাহাদের রাজা, তাহারা ধন্য। আমি গৃহিণীর সঙ্গে গিয়া পরামর্শ করি।'

সিংহ। পরামর্শ হামি বুঝিতে পারি না,—হুকুম তামিল বুঝিতে পারি। এই শাদিতে আমার জমিদারীর যত লোক নিমন্ত্রিত হবে, বিশেষতঃ গরিব-গুরবা। গঙ্গাতীরে বসবে সকলে। ছাতু, চুড়া, দহি, শক্কর, আঁটা, ঘি, তরকারি, মিঠাই যাহা লাগে, সব হুকুম এখনি জারি হবে। খাজাঞ্চিবাবু!—'

খাজাঞ্চি। হুজুর।

সিংহ। আমার শাদিতে যে ধুমধাম হয়েছিল, তার চেয়ে যেন কিছু কম না হয়। হামার লেড়কাবালা নাই, রসিকবাবু লেড়কার সমান। বিবাহের পর দুলহা ও দুলহিন, উভয়ে ঘোড়া চড়িয়া হামার সঙ্গে বৈবীনাথের মন্দিরে যাবে। শিউ-পূজার আয়োজন কর।

বিনোদবাবু ধীরে ধীরে বাটী চলিয়া গিয়া কন্যাকে ডাকিলেন—সে চর্খা কাটিতেছিল।

পিতা। পাগলি। তোর জন্য বর ঠিক করেছি।

কন্যা। আগে আগে যাদের ঠিক করেছিলে তাদের মধ্যে কে?

পিতা। তারা কেউ নয়।

এমন সময় জননী আসিয়া কন্যাকে ধরিয়া রন্ধনশালায় লইয়া গেল। সর ও হরিদ্রা দিয়া মুখ ঘষিয়া দিল, রুক্ষকেশ তৈলাক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল।

মায়া। এ সব কেন?

জননী। তোকে দেখবার জন্য একজন কলিকাতার বাবু আসবে।

মায়া। সে বিয়ে করবে না ত? আমি কোনো বাবুর সঙ্গে বিয়ে করব না।

জননী। তা করিস্‌-নে। একজন কাঠখোট্টা পাগল জুটে গিয়েছে, তারি জন্য সে আশীর্বাদ করতে আসবে।

মায়া চর্খা ঘুরাইয়া হাসিল। সুতার খেঁই ছিন্ন হইয়া গেল।

বাহিরের অতিথি রসিক ঘোষ দূর্বা হস্তে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। মায়া চক্ষু খুলিয়া চাহিল না।

জননী। তুই একবার চেয়ে দেখলি নে?

মায়া। কি দেখব মা? মানুষ না বানর?

জননী। বানর। তুই যেমন একটা!

মায়া। তাকে দেখেছি একবার। সেই এসেছিল নাকি?

জননী। তার কি সন্দেহ আছে?

মায়া। সে আমাকে চায়?

জননী। তার কি সন্দেহ আছে?

মায়া। সে এই দেশেই থাকবে?

জননী। তার কি সন্দেহ আছে?

মায়া। সে আমাদের বাড়ী আসবে?

জননী। এ-বাড়ী আর ও-বাড়ী। এ-দেশ আর ও-দেশ। আমরা যেখানে; সেও সেখানে। আর লড়াইয়ে যদি যায়, সে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাবে। তুই ত ছেলেবেলায় ঘোড়ার পিঠে চড়তিস। জমিদার বলেছেন যে, তোদের দুজনকে ঘোড়ায় চড়িয়ে গৈবীনাথের মন্দিরে নিয়ে যাবেন।

বালিকা আনন্দসহকারে হাসিয়া আবার চর্খায় নূতন সুতা বাঁধিয়া দিল। সেই হাসি বাতায়ন-পার্শ্ব হইতে রসিকবাবু লক্ষ্য করিয়া জীবনের সাধ মিটাইলেন। কে জানে ভবিষ্যতে কত দুঃখ আছে। কে জানে সেই হাসি

আর দেখা দেবে কি না ?

বিবাহে যে ধুমধাম হইয়া গেল সে রকম সেখানে আর কেহ দেখে নাই। রূপলাবণ্যময়ী পাগলী, পাগলের সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে গৈবীনাথের মন্দিরে প্রয়াণকালে শত-শত ফুলের মালা অনাথ আতুর বর্ষণ করিয়াছিল। ঠাণ্ডিরাম লক্ষ্ণৌ হইতে দশ মণ খাম্বিরা তামাকু আনিয়া দোকান বসাইয়া দিলেন।

সুরথকেতু সিংহ অতিশয় প্রীতি-সহকারে দুল্‌হা ও দুল্‌হিনকে লইয়া অন্দরমহলে স্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

রসিকবাবু বাহিরে আসিলে ঠাণ্ডিরাম বলিলেন, 'দোস্ত, দুনিয়াতে সবই ধ্বংস হইয়ে যায় না। তাই কবি বলিয়েছেন, 'এ জীবন সাহারার মতো, সহ-ধর্মিণী তাহার মধ্যে উষ্ট্র'। মরুভূমিতে যতক্ষণ, উষ্ট্র ততক্ষণ। দোস্ত, মরুভূমি ছেড় না। 'করীমা বরখ্‌শায় বর হাল্‌মা, কে হস্তম অসিরি কমন্দে হাতয়া'। অর্থাৎ "হে করীম ঈশ্বর, আমাদের হাল্‌তের উপর করুণা বর্ষণ কর, কারণ এই দুনিয়ার মরুময় প্রদেশে জ্বলন্ত বাতাসে বন্দী হইয়া আছি।"

রসিকবাবুর সহিত নববধূর নির্জনগৃহে দেখা হইবার সময়, সে খড়ের চালের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। রসিক সেই সুন্দর মুখখানি যত্নে বক্ষে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখছিলে ?'

মায়া। যেটা ঝুলছে সেটা দড়ি না সাপ ?

রসিক। প্রেমরজ্জু।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আম্র-তত্ত্ব

দানাপুর ষ্টেশনের অনতিদূরে, ইংরাজটোলায়, লাল টালি আচ্ছাদিত লম্বা ধরনের একখানি একতলা পাকা বাড়ী। ইহা রেলওয়ে গার্ডগণের জন্য নির্মিত 'রেষ্ট হাউস' বা বিশ্রামগৃহ। সারি সারি অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ—সম্মুখে ও পশ্চাতে লম্বা টানা বারান্দা। বাড়ীটির পশ্চাদ্ভাগে, দেশী খোলার ছাপ্পর যুক্ত কয়েকখানি ঘর—তাহার মধ্যে একটা বাবুর্চিখানা, অপর কয়েকখানি ভৃত্যগণের অবস্থান জন্য। সম্মুখভাগে খানিকটা খোলা জমির উপর ফুলের বাগান। দুইটি বড় বড় কৃষ্ণচূড়ার গাছ সর্বাঙ্গে ফুল ফুটাইয়া বাতাসে দুলিতেছে; বাকীগুলির অধিকাংশই বিলাতী ফুলের ছোট গাছ, দুই একটি দেশী ফুলও আছে।

আষাঢ় মাস। আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে। সম্মুখের বারান্দায় লোহার খাটে নেটের মশারির মধ্যে গার্ড ডিসুজা সাহেব নিদ্রিত। মাঝে মাঝে ফুরফুরে হাওয়ায় সে মশারি কাঁপিয়া উঠিতেছে। রাত্রি দুইটার সময় মোগলসরাই হইতে ২৬নং মালগাড়ী লইয়া ডিসুজা সাহেব দানাপুরে আসিয়াছিলেন। অদ্য বেলা ১০টার আবার ১৫নং লোকাল প্যাসেঞ্জার লইয়া

তাঁহাকে মোগলসরাই ফিরিতে হইবে।

বেলা ৮টা বাজিল। রৌদ্র নাই, তাই বেলা বুঝা যাইতেছে না। বাঙ্গলার খানসামা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আসিয়া সাহেবের শয্যার নিকট দাঁড়াইল। লাল ডোরাকাটা কানপুর টুইলের পায়জামা-সুট পরিয়া সাহেব গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কোটের বুকের অধিকাংশ বোতামই খোলা। খানসামা ডাকিল, "হুজুর।"

হুজুরের সাড়া নাই।

খানসামা আবার ডাকিল, "আঠ বাজ গিয়া সাহেব—জাগিয়ে।"

অবশেষে খানসামা মশারির ভিতর হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সাহেবের হাঁটু ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "জাগিয়ে হুজুর। আঠ বাজ গিয়া।"

সাহেব তখন উঃ করিয়া চক্ষু খুলিলেন। একটি হাই তুলিয়া, বালিসের নীচে হইতে নিজ বৃহদাকার সরকারী ওয়াচটি বাহির করিয়া দেখিলেন, আটটা বাজিয়া বারো মিনিট।

সাহেব বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "গোসল ঠিক করো।"

"ঠিক হায় হুজুর"—বলিয়া খানসামা চলিয়া গেল।

সাহেব শয্যা হইতে নামিয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হুক হইতে ঝুলানো নিজ কোটের পকেট হইতে পাইপ, দেশলাই ও তামাকের পাউচ বাহির করিয়া লইলেন। ভিতরের বুকপকেটে একখানি চিঠি ছিল, তাহাও বাহির করিলেন।

একখানি ঈজিচেয়ারে বসিয়া, পাইপ ধরাইয়া, পত্রখানি খুলিয়া সাহেব পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি মজঃফরপুর ষ্টেশন মাষ্টারের কন্যা, কুমারী বার্থা ক্যাম্বেল কর্তৃক লিখিত। বার্থার সহিত ডিসুজা সাহেব বিগত এপ্রিল মাস হইতে বিবাহপণে আবদ্ধ। অক্টোবর মাসে ডিসুজা সাহেবের একমাস ছুটি 'ডিউ' হইবে—ছুটি হইলেই বিবাহ, ও সিমলা-শৈলে গিয়া মধুচন্দ্র-যাপন স্থির হইয়া আছে।

পত্রখানি আজ তিনদিন হইতে সাহেবের পকেটে পকেটে ঘুরিতেছে। ফেরৎ ডাকে উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ ছিল, তাহা হইয়া উঠে নাই—আজ উত্তর দিয়া পত্রখানি ডাকে ফেলিতেই হইবে।

পাইপ শেষ করিয়া, ক্ষৌরকার্য ও স্নানাদি অন্তে সাহেব যখন বাহির হইলেন তখন ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। মোকামা-মোগলসরাই লোক্যালখানি ঠিক সাড়ে নয়টার সময় দানাপুরে পৌঁছিবে। সেই সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, ট্রেনের চার্জ বুঝিয়া লইতে হইবে—সুতরাং পত্র লেখার বাসনা পরিত্যাগ

করিয়া সাহেব "হাজরি" আনিবার হুকুম করিলেন। পত্রলেখার সময় হইল না বলিয়া সাহেবের মনটা কিছু অপ্রসন্ন, তাঁহার মুখভাব হইতে স্পষ্টই ইহা বুঝা যাইতেছিল।

খাদ্যদ্রব্যের প্রথম কিস্তি টেবিলে আসিল। দুইখানি টোস্ট, মাখন ও চা দুইটি "আন্ডা বাইল" ছিল—সাহেব প্রথম ডিম্বটি ভাঙ্গিয়া দেখিলেন—পচা। তাহা সরাইয়া রাখিয়া, দ্বিতীয়টি ভাঙ্গিয়া, মাখন ও টোস্ট সহযোগে ভক্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔর ক্যা হায় ?"

খানসামা উত্তর করিল, "মটন চাঁপ হায়, ঠান্ডা রোস হায়, কারি ভাত হায়।"—বলিতে বলিতে খানসামার সহকারী একটি ঢাকা পাত্রে মটন চপ আনিয়া টেবিলে রাখিল।

সাহেব ৩।৪ খানি চপ প্লেটে তুলিয়া লইয়া, ছুরি দিয়া কাটিয়া মুখে তুলিলেন। খানিক চর্বণ করিয়া বলিলেন, "বহুৎ কড়া হায়, মটন নেহি হায়।"

খানসামা বলিল, "গোট্-মটন হায় হুজুর—আসল মটন আজ মিলা নেহি।"

সাহেব দ্বিতীয় একখানি চপ কাটিয়া, চর্বণ করিবার বৃথা চেষ্টার পর রাগিয়া বলিলেন, "লে যাও। ফেঁক দেও। কুত্তাকো মৎ দেও—উস্কা দাঁত টুট যায়েগা।"

খানসামা প্লেট উঠাইয়া লইয়া সহকারীকে বলিল, "রোস লাও—কারি-ভাত লাও—জলদি।"

গত রাত্রে রোস্ট করা লেগ্-অব্-মটনের কিয়দংশ ছিল, তাহা হইতে টুকরা দুই কাটিয়া সাহেব ভক্ষণ করিলেন—ভাল লাগিল না।

সাহেব তখন কারি-ভাত চাহিলেন। মুর্গীর কারি—পাত্র হইতে হুহু করিয়া ধোঁয়া উঠিতেছে। প্লেটে লইয়া মুখে দিয়া দেখিলেন, চর্বণ করা তাঁহার কর্ম নয়।

সাহেব গর্জন করিয়া উঠিলেন, "ক্যা হুয়া!—ইয়ে ক্যা হায়! ইউ ড্যাম উল্লুকা বাচ্চা, হাম তুমারা উপর রিপোর্ট কর দেঙ্গে—সী ইফ্ আই ডোন্ট"—বলিয়া কাঁটা চামচ ফেলিয়া সাহেব উঠিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন—নয়টা বাজিয়া সাতাশ মিনিট। হ্যাট লইয়া বাহির হইয়া দ্রুতপদে ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

যথাসময়ে ট্রেন দানাপুর ছাড়িল। খান পাঁচ ছয় আরোহীগাড়ী, বাকী

সমস্তই মাল বোঝাই ওয়াগন। প্রত্যেক ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সন্ধ্যা নাগাদ গাড়ী মোগলসরাই পেঁছিবে।

গোটা দুই তিন ষ্টেশন পার হইলে, ডিসুজা ক্ষুধার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ট্রেনের চার্য লইবার সময় সে দেখিয়াছিল, ব্রেকভ্যানে মেঝে হইতে গাড়ীর ছাদ পর্যন্ত আমের ঝুড়ি বোঝাই করা আছে। এ সময় দ্বারভাঙ্গা অঞ্চল হইতে বিস্তর আম চারিদিকে চালান যাইয়া থাকে। সাহেব ভাবিল, গোটাকতক আম বাহির করিয়া ততক্ষণ খাওয়া যাউক।

এই ভাবিয়া সাহেব ব্রেকভ্যানের দ্বার খুলিল। পক্ক ফলের লোভনীয় সুমিষ্ট গন্ধ ক্ষুধার্তের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

সামনেই একটা বৃহৎ ঝুড়ি—মুখটার উপর আচ্ছাদনখণ্ড দড়ি দিয়া সেলাই করা, সেলায়ের ফাঁক দিয়া দিয়া কালো কালো আমপাতা উঁকি দিতেছে। ডিসুজা পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া সেলাই কাটিয়া, ভিতরে হাত ভরিয়া দিল। প্রথমটা কেবল পাতা, আরও নিম্নে হাত ঢুকাইয়া ডিসুজা একটি আম বাহির করিল। দেখিল, বৃহদাকার উৎকৃষ্ট ল্যাংড়া। আরও একটা আম বাহির করিয়া, ব্রেকভ্যানের দ্বার বন্ধ করিয়া স্বস্থানে আসিয়া বাক্স হইতে একখানি প্লেট বাহির করিল। সাহেব আম দুইটিকে সোরাইয়ের জলে উত্তমরূপে ধৌত করিল। তাহার পর আম দুইটি কাটিয়া, পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন আরম্ভ করিল।

ভোজন অর্ধ শেষ হইতেই, গাড়ী আসিয়া কৈলোয়ার ষ্টেশনে দাঁড়াইল। ষ্টেশন মাষ্টার রামতারণ মিত্র ধুতির উপর ছেঁড়া চাপকান পরিয়া 'গাড়ী পাস' করিতে আসিয়াছেন। ব্রেকভ্যানে আসিয়া বলিলেন, "গুড্ মর্ণিং মিষ্টার ডিসুজা—কিছু পার্শেল-টার্শেল নামিবে নাকি?"

সাহেব আম খাইতে খাইতে বলিল, "কুছ্‌না।"

"বাঃ—বেশ আম ত! খাসা গন্ধ বেরিয়েছে—পার্শেলের আম বুঝি?"

সাহেব শিরশ্চালনা করিয়া বলিল, "খাইবে?"

"দাও না সাহেব।"—বলিতে বলিতে রামতারণবাবু ব্রেকভ্যানে উঠিলেন।

সাহেব বলিল, "দরজা খোল। ঐ—ঐ সামনের বাস্কেট হইতে দুইটা লও।"

রামতারণবাবু ঝুড়ির আবরণ চাড়া দিয়া তুলিয়া ধরিয়া, এ পকেটে দুইটা ও পকেটে দুইটা এবং হাতে দুইটা আম লইয়া বাহির হইলেন।

সাহেব বলিল, "পান আছে?"

"আছে বইকি"—বলিয়া বাবু পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া, দুইটি পান সাহেবের "ভ্যানবুক" নামক বহিখানির উপর রাখিয়া দিলেন। নামিয়া, ঘণ্টা দিতে বলিলেন—গাড়ী ছাড়িল।

সাহেব হাত ধুইয়া, ড্রাইভারকে সবুজ ঝাণ্ডী দেখাইয়া পান দুইটি খাইতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার মনে হইল, ক্ষুধা এখনও ভাঙ্গে নাই, আর গোটা দুই আম খাইলে মন্দ হইত না। যেমন ভাবনা—কার্যও সেইরূপ। আহারান্তে মুখ হাত ধুইয়া পান খাইতে খাইতে, গাড়ী আরা স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল।

আরা অপেক্ষাকৃত বড় স্টেশন—স্টেশন মাস্টার গাড়ী পাস করিতে আসেন নাই—আসিয়াছেন জেনারেল এসিস্ট্যাণ্ট। বাবুটির বয়স হইয়াছে, চোখে রূপার ফ্রেমযুক্ত চশমা। ব্রেকভ্যানে উঠিয়া বলিলেন, "হ্যালো মিস্টার ডিসুজা—ম্যাঙ্গো স্মেলিং—বিউটিফুল।"

সাহেব হাসিয়া বলিল, "ফাইন ল্যাংড়াজ। খাইবে ?"

"দাও না সাহেব গোটাকতক।"

ডিসুজা সেই ঝুড়ি হইতে গোটা চারি আম বাহির করিয়া বাবুটিকে দিল। ব্রেকভ্যান বন্ধ করিয়া স্টেশনের আপিসে গেল—এখানে কয়েকখানা মালগাড়ী কাটিতেছে—দেরী হইবে। স্টেশন মাস্টার তখন বাড়ীতে, আহারান্তে নিদ্রাগত। তাঁহার পুত্র চারু ও কন্যা কমলা সেখানে খেলা করিতেছিল। জেনারেল বাবুর হাতে আম দেখিয়া এবং তাহা ডিসুজা সাহেব দিয়াছে শুনিয়া, চারু ও কমলা বাহানা ধরিয়া বসিল, "সাহেব, আমরাও আম খাব।"—বলিয়া তাহারা সাহেবের হাঁটু ধরিয়া লাফাইতে লাগিল।

সাহেব বলিল, "আচ্ছা, তুমিরা হামার জন্যে পান লইয়া আসে। হামি আম দিবে।"

চারু ও কমলা ডিসুজা সাহেবের জন্য পান আনিতে ছুটিল। তাহারা ইহাকে "পানখেকো সাহেব" বলিত। পূর্বেও কতবার সাহেবকে পান আনিয়া দিয়াছে।

পান লইয়া, সাহেব ইহাদিগকে ব্রেকভ্যানে লইয়া গিয়া, স্বহস্তে ঝুড়ি হইতে বাহির করিয়া আম দিল। ইহারাও "আরও দাও—আরও দাও" করিয়া, কোঁচড় ও অঞ্চল ভরিয়া আম লইয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

এইরূপে প্রতি স্টেশনে "দাতব্য" করিতে করিতে, এবং মাঝে মাঝে খাইতে

খাইতে, বেলা ৫টা নাগাইদ ঝুড়িটি প্রায় খালি হইয়া গেল। সকলডিহার ষ্টেশন মাষ্টারকে ঝুড়ির ইতিহাস বলিতে বলিতে দুইটি আম দিবার সময় ডিসুজা দেখিল, বড় জোর আর গুটি ১৫/১৬ আম নিম্নে পড়িয়া আছে। ষ্টেশন মাষ্টারবাবু বলিলেন, "তা সাহেব, দিলে দিলে, একটা ঝুড়ি থেকেই সব দিলে কেন ? এত ঝুড়ি ত রয়েছে। ভাগাভাগি করে নিলেই ত হ'ত!"

সাহেব বলিল, "এ আমগুলি খুব চমৎকার যে। অন্য ঝুড়ির আম কেমন হইত তাহার ঠিক কি ?"

বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে।—আর, পাঁচজনের অভিশাপ কুড়ানোর চেয়ে, একজনের অভিশাপই ভাল।"

সাহেব বলিল, "ঝুড়িটা একেবারেই খালি হইয়া গেল। এই খালাসী—লাইন-সে থোড়া পাত্থল উঠাও ত।"

খালাসী পাথর উঠাইয়া ব্রেকভ্যানের উপর রাখিতে লাগিল। অনেকগুলো জমিলে, সাহেবের আদেশ অনুসারে খালাসী উঠিয়া, আমের ঝুড়ি হইতে আমগুলো বাহির করিয়া, পাথর ভরিয়া তাহার উপর আম, তাহার উপর আমপাতা চাপাইয়া দিল। গাড়ী ছাড়িলে সাহেব স্বহস্তে ঝুড়ির মুখ আবার সেলাই করিয়া দিল। গুনছুঁচ, দড়ি প্রভৃতি গার্ডসাহেবদের বাক্সেই মজুদ থাকে।

সন্ধ্যার পূর্বেই ট্রেন মোগলসরাই পেঁছিল।

কাজকর্ম সারিয়া, বাড়ী যাইবার পূর্বে ডিসুজা কেলনারের হোটেলে গিয়া এক পেয়ালা চা হুকুম করিয়া, রুটিতে মাখন মাখাইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

চা পানান্তে বাহির হইয়া বাড়ী যাইতেছিল, পথে রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটুটের কাছে দুইজন বন্ধু তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। বলিল, "চল, এক হাত পোকর খেলা যাউক।"

ইন্‌ষ্টিটুটে 'পানীয়' মিলে, তাহার নগদ দামও দিতে হয় না। ডিসুজা সহজেই সম্মত হইল।

দুই বাজি পোকর খেলিতে ও কয়েক পাত্র হুইস্কি পান করিতে রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। ডিসুজা তখন বলিল, "বাড়ী যাই—আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।"—বাড়ীতে কেবল ডিসুজার বৃদ্ধা মাতা আছেন।

বাংলোয় পেঁছিয়া ডিসুজা দেখিল, তাহার মাতা রাগিয়া আগুন হইয়া বসিয়া আছেন। মেঝের উপর আমের একটি ঝুড়ি, আশেপাশে আমপাতা

ছড়ান, একস্থানে গুটি ১৫/১৬ আম, এবং এক বোঝা পাথরের টুকরা।

মত্ততার অবস্থায় ডিসুজা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না।

মিসেস ডিসুজা বলিলেন, "এই যে জন্—কোন্ ট্রেনে ফিরিলে?"

ডিসুজা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এ—বাস্কেট—কোথা হইতে আসিল?"

"মজঃফরপুর হইতে। আজ দ্বিপ্রহরে তোমার শ্বশুরের পত্র পাইলাম, ১৫০টা ভাল ল্যাংড়া আম পাঠাইতেছেন, খুব সম্ভব ১৫ নম্বরে তাহা এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। লিখিয়াছিলেন, রসিদ ডাকে আসিতে বিলম্ব হইতে পারে, ১৫ নম্বর আসিলে লোক পাঠাইয়া যেন ঝুড়িটা আনাইয়া লই। ট্রেন পৌঁছিবার আধ ঘণ্টা পরেই আমি স্টেশনে গিয়া বাস্কেট আনিলাম। আনিয়া খুলিয়া দেখি—আম সব চুরি গিয়াছে, আমের স্থানে পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। দেখ দেখি কাণ্ড। কি ভয়ানক কথা। ফিফ্‌টিন আপ-এ গার্ড কে ছিল খবর নাও ত!"

ডিসুজা বলিল, "ফিফ্‌টিন আপ—আমিই ত—লইয়া আসিয়াছি।"

"তুমি?—তুমি তবে এতক্ষণ ছিলে কোথা?—তুমি?—তবে আম কে লইল? বোধ হয় দীঘায়—অথবা বাঁকীপুরে—"

ডিসুজা বসিল—"না-না-ও-ও-আম-আ-আ-আমিই খাইয়াছি।"

বৃদ্ধা ইতিপূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পুত্র প্রকৃতিস্থ নাই। বলিলেন, "তুমি খাইয়াছ—এই এক ঝুড়ি আম? অসম্ভব!"

ডিসুজা নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া বলিল, "বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল—তাই খা-খা-খাইয়া ফেলিয়াছি।"

মাতা বলিলেন—"নন্‌সেন্স। একথা এখন তোমাকে বলিয়া কোনও ফল নাই। কল্য প্রাতে এসম্বন্ধে রীতিমত তদন্ত করিয়া, ব্যাপারটা উপরিওয়ালাদের জানাইতে হইবে। সহজে আমি ছাড়িতেছি না। এতগুলো আম!—রেলের কর্মচারীরা কি চোর! কি পাষণ্ড! ছি ছি ছি!"

পরশুরাম

জয়হরির জেব্রা

এই আখ্যানের নায়ক জয়হরি হাজরা, নায়িকা বেতসী চাকলাদার, উপনায়ক উপনায়িকা গুটিকতক জন্তু, যথা—একটি বিলাতী কুত্তা, একটি দেশী কুত্তী, একটি আরবী ঘোড়া এবং একটি ভারতীয় জেব্রা। লেডিজ ফার্স্ট—এই আধুনিক নীতি অনুসারে প্রথমে বেতসীর পরিচয় দেব, তারপর জয়হরির কথা বলব। জন্তুদের অবতারণা যথাস্থানে করলে চলবে।

বেতসী বিলাতে জন্মেছিল, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পাঁচ বৎসর পরে। তার বাপ মা ব্রিটিশভক্ত ছিলেন, সেজন্য মেয়ের নাম এলিজাবেথ রেখেছিলেন, সংক্ষেপে বেট্‌সি। কিন্তু সে নাম পরে বদলানো হয়। ভারতবর্ষে ফেরবার সময় জাহাজে একজন ইংরেজ স্ত্রীলোক বেট্‌সির মাকে ডার্টি নিগার বলেছিল, তাতেই রেগে গিয়ে তিনি তখনই মেয়ের বেট্‌সি নাম বদলে বেতসী করলেন।

বেতসীর বাবা প্রতাপ চাকলাদার ধনীর সন্তান। এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে সস্ত্রীক বিলাত গিয়েছিলেন এবং সেখানে পাঁচ-ছ বৎসর বাস করে কৃষি ও পশুপালন শিখেছিলেন। ফিরে এসে উলুবেড়ের কাছে তাঁর পৈতৃক জমিদারি হোগল-বেড়েতে তিন শ বিঘা জমির উপর ফুল ফল ফুলকপি

বাঁধাকপি বীট গাজর টমাটো ইত্যাদির বাগান এবং বিস্তর গরু রেখে ডেয়ারি ফার্ম করলেন, তা ছাড়া ভেড়া ছাগল শুয়োর মুরগি হাঁস পুষে তারও ব্যবসা চালাতে লাগলেন। একটি উত্তম বাগানবাড়ি বানিয়ে সপরিবারে সেখানেই বাস করতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেন। সতেরো বৎসর ধরে ব্যবসা ভালই চলল, লাভও প্রচুর হতে লাগল। তারপর প্রতাপ চাকলাদার মারা গেলেন। বেতসীর মা অতসী মুশকিলে পড়লেন। স্বামীর হাতে গড়া অত বড় ব্যবসাটি চালাবার ভার কাকে দেবেন? তাঁর ছেলে নেই, একমাত্র সন্তান বেতসী। নায়েব হরকালী মাইতি কাজের লোক বটে। কিন্তু অত্যন্ত বুড়ো হয়েছেন, তাঁর উপর নির্ভর করা চলে না। স্থির করলেন সব বেচে দিয়ে যাবেন। কিন্তু বেতসী বলল, কিছু ভেবো না মা, আমি চালাবো, বাবার কাছে সব শিখেছি। অতসী ভরসা পেলেন না, তবু মেয়ের তেজ দেখে ভাবলেন, দুবছর দেখাই যাক না। তারপর না হয় বেচে ফেলা যাবে। একটি উপযুক্ত জামাই যদি পাওয়া যায় তবে আর কোনও ভাবনা থাকে না। কিন্তু মেয়েটা যে বেয়াড়া, এত বয়েসেও তার কাণ্ডজ্ঞান হল না।

অতসী উঠে-পড়ে জামাই-এর খোঁজ করতে লাগলেন। মেয়েকে নিয়ে ঘন ঘন কলকাতায় গেলেন, পার্টি দিলেন, বহু পরিবারের সঙ্গে মিশলেন। বাছা বাছা পাত্রদের হোগলবেড়েতে নিমন্ত্রণ করে আনলেন, কিন্তু কিছুই ফল হল না। প্রতাপ চাকলাদারের সম্পত্তির লোভে অনেক সুপাত্র আর কুপাত্র এগিয়ে এসেছিল কিন্তু বেতসীর সঙ্গে দুদিন মেশার পরেই সরে পড়ল। তার গড়ন ভাল, রং খুব ফরসা, কিন্তু মুখে লাবণ্যের একটু অভাব আছে। সে মেমের মতন ব্রীচেস পরে ঘোড়ায় চড়ে তার তিন শ বিঘা ফার্ম পরিদর্শন করে। কর্মচারীদের উপর হুকুম চালায়, শাসনও করে। তার রূপ চিত্তাকর্ষক নয়, মেজাজও উগ্র, সেজন্য তার মায়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। বেতসী বলল, তোমার জামাই না জুটল তো বড় বয়েই গেল। আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না, বাবার ফার্ম একাই চালাব। কিন্তু অতসী দেখলেন, ফার্মের আয় আগের মতন হচ্ছে না। বেতসী তার মাকে আশ্বাস দিলে—কোন ভয় নেই, দু-দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

জয়হরি হাজরার নামটি সেকেলে, কিন্তু সেজন্য তার বাপ মাকে দায়ী করা যায় না, তার হরিভক্ত ঠাকুরদাদাই ওই নাম রেখেছিলেন। জয়হরি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, লেখাপড়ায় খুব ভাল, একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে বিলাত গিয়েছিল, সুতো আর কাপড় রঙানো শিখে তিন বছর পরে ফিরে

এল। এসেই আমেদাবাদের একটি বড় মিলে তার চাকরি জুটে গেল। দু বছর পরে তা ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটি ব্লীচিং অ্যান্ড ডাইং ফ্যাক্টরি খুলল। সে কারখানা খুব ভালই চলছিল, লাভও বেশ হচ্ছিল, তারপর এক দুর্ঘটনা হল। জয়হরির শিকারের শখ ছিল। গন্ডাল স্টেটের জঙ্গলে একটা বুনো শুয়োরের আক্রমণে তার পা জখম হল। ঘা সারল, কিন্তু জয়হরি একটু খোঁড়া হয়ে গেল, হাঁটবার সময় তাকে লাঠিতে ভর দিতে হয়। এর কিছু আগে তার বাপ মা মারা গিয়েছিলেন। সে তার কারখানা ভাল দামে বেচে দিয়ে পৈতৃক পুরনো বাস্তুভিটা খাগড়াডাঙায় চলে এল। এই গ্রামটি হোগলবেড়ের লাগাও।

জয়হরির অর্থলোভ নেই, বিবাহেরও ইচ্ছা নেই। সে হিসাব করে দেখেছে তার যা পুঁজি আছে তাতে স্বচ্ছন্দে, জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু যে বিদ্যা সে শিখেছে তার চর্চা একেবারে ছাড়তে পারল না। খাগড়া-ডাঙার পুরনো ছোট বাড়িটা মেরামত করে বাসের উপযুক্ত করে নিল, এবং সেখানেই নানা রকম পরীক্ষা করে শখ মেটাতে লাগল। কিন্তু সুতো আর কাপড় ছোবানো নয়, জীবন্ত গায়ে রং ধরানো।

জয়হরির জমির একদিকে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা, আর তিনদিকে ধানক্ষেত। রাস্তার দিকে সে কাঁটা তারের বেড়া লাগিয়েছে, আর সব দিকে ফণি মনসা বাগ ভেরেন্ডা ইত্যাদির পুরনো বেড়াই আছে। তার বাড়ির সামনে এখন আর জঙ্গল নেই, সুন্দর একটি মাঠ হয়েছে, তার মাঝে মাঝে কয়েকটি গাছ আছে। বাড়ির পিছন দিকে গোটাকতক চালা ঘর উঠেছে, তাতে তার পোষা জন্তু আর কয়েকজন চাকর থাকে। জয়হরি এখানে আসার কয়েক মাস পরেই দেখা গেল তার বাড়ির সামনের মাঠে হরেকরকম অদ্ভুত জানোয়ার চরে বেড়াচ্ছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু লোক এসে দেখে যেতে লাগল।

বেতসীর কাছে খবর পেঁছিুল, খাগড়াডাঙায় একজন খোঁড়াবাবু আজব চিড়িয়াখানা বানিয়েছে, পয়সা লাগে না, কলকাতা থেকেও লোকে দেখতে আসছে। বেতসীর একটু রাগ হল। চাকলাদার বংশ এই অঞ্চলের সবচেয়ে মান্যগণ্য জমিদার। একজন বাইরের লোক এসে চিড়িয়াখানা বানিয়েছে অথচ সেখানে একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্যে বেতসী আর তার মাকে অনুরোধ করা হয় নি কেন? বেতসী শুনেছে, লোকটার নাম জয়হরি হলেও সে নাকি বিলাত ফেরত, সুতরাং তাকে অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দিতে পারল না। কৌতূহল

দমন করতে না পেরে একদিন সকালবেলা সে তার প্রকাণ্ড কুকুর প্রিন্সকে সঙ্গে নিয়ে জয়হরির জন্তুর বাগান দেখতে গেল।

তারের বেড়ার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বেতসী অবাক হয়ে দেখতে লাগল। তিনটে নীল রঙের ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। একটা সবুজ মেনী বেড়ালের কাছে চারটে বেগুনী বাচ্চা লাফালাফি করছে। একটা অদ্ভুত জানোয়ার ঘাস খাচ্ছে, গায়ের রং হলদে, তার উপর ঘোর ব্রাউন রঙের ফোঁটা। বেতসী প্রথমে ভেবেছিল চিতাবাঘ, কিন্তু দাড়ি আর শিং দেখে বুঝল জন্তুটা আসলে ছাগল। একটু দূরে একটা ডোবার কাছে গোটা কতক ময়ূরকণ্ঠী রঙের রাজহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করছে। বাড়ির ছাদ থেকে হঠাৎ এক ঝাঁক লাল নারঙ্গী হলদে সবুজ নীল বেগুনী রঙের পায়রা উড়ে চক্কর দিতে লাগল, যেন কেউ রামধনু কুচি কুচি করে আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। বেতসী উপর দিকে চেয়ে দেখছিল, এমন সময় তার কানে এল—নমস্কার, দয়া করে ভিতরে আসবেন কি?

বেতসী মাথা নামিয়ে দেখল, একজন সুদর্শন যুবা বেড়ার ফটক খুলে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পায়জামা আর পাঞ্জাবি, হাতে একটা মোটা লাঠি। প্রতি-নমস্কার করে বেতসী বলল, আপনিই জয়হরিবাবু? আমার কুকুর নিয়ে ভিতরে যেতে পারি কি?…থ্যাংকস।

বেড়ার ভিতরের মাঠে এসে বেতসী বলল, অদ্ভুত সব জানোয়ার বানিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য কিছু আছে, না শুধুই ছেলেখেলা?

জয়হরি সহাস্যে বলল, আর্ট মাত্রই ছেলেখেলা। আমি এক নতুন রকমের আর্টের চর্চা করছি। লোকে কাগজ আর ক্যামবিসের উপর আঁকে, কাদা পাথর ধাতুর মূর্তি গড়ে। আমি তা না করে জীবন্ত প্রাণীর উপর রং লাগাচ্ছি। আমার মিডিয়ম আর টেকনিক একবারে নতুন।

—নীল ভেড়া, সবুজ বেড়াল, ছাগলের গায়ে বাঘের ছাপ, একে আর্ট বলতে চান নাকি?

—আজ্ঞে হাঁ। প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ হল নিকৃষ্ট আর্ট। যা আছে তার বৈচিত্র্যসাধন এবং তাকে আরও মনোরম করাই শ্রেষ্ঠ আর্ট। সুকুমার রায় লিখেছেন—লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ। কথাটা ঠাট্টা হলেও আর্টের মূল সূত্র এতেই আছে।

—আমি তা মনে করি না। শুনেছি আপনি সুতো আর কাপড় রঙানো শিখে এসেছেন। এখানে সময় নষ্ট না করে কোনও মিলে চাকরি নেন না কেন? জানোয়ারের গায়ে রং লাগানো একটা বদখেয়াল ছাড়া কিছু নয়।

—সকলের দৃষ্টিতে বদখেয়াল নয়। আমাদের কলামন্ত্রী রঙ্গবাহাদুর নাদান আমার কাজ দেখে খুব তারিফ করেছেন। বলেছেন, সোভিয়েট সরকারকে এক শ আটটি লাল ঘুঘু উপহার পাঠালে বড় ভাল হয়, তিনি নেহেরুজীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করবেন।

এই সময় বেতসীর পিছন দিকে এমন একটি ব্যাপার ঘটল যার ফল সুদূরপ্রসারী। একটি গোলাপী রঙের দেশী কুকুর জয়হরির কাছে আসছিল, তাকে দেখেই বোঝা যায় মাসখানিক আগে তার বাচ্চা হয়েছে। বেতসীর বিলাতী কুকুর প্রিন্স তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে বিস্তর বিদেশী আর ভারতীয় কুক্কুরী দেখেছে, কিন্তু এমন পদ্মকোরকবর্ণা সারমেয়ী পূর্বে তার নজরে পড়ে নি। প্রিন্স বারকতক সেই গোলাপী কুত্তীকে প্রদক্ষিণ করে তার গা শুঁকল, তারপর আর একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল। তখন গোলাপী হঠাৎ ঘ্যাঁক করে প্রিন্সের পায়ে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। কেঁউ কেঁউ করতে করতে প্রিন্স বেতসীর কাছে এল।

অগ্নিমূর্তি হয়ে বেতসী বলল, একি। আপনার নেড়ী কুত্তী আমার প্রিন্সকে কামড়ে দিল আর আপনি চুপ করে রইলেন!

জয়হরি বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমার কুকুরটার শরীরে রোগ নেই। কুকুররা এমন কামড়াকামড়ি করে থাকে, তাতে ক্ষতি হয় না। আপনি অনুমতি দেন তো আপনার কুকুরের পায়ে একটু টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিতে পারি।

—আপনার হাতুড়ে চিকিৎসা আমি চাই না। কেন আপনার কুকুরকে রুখলেন না? কত বড় বংশে আমার এই আলসেশ্যানের জন্ম তা জানেন? প্রিন্সের বাপ ফ্রেডরিক দি গ্রেট, মা মারাইয়া তেরেজা। আপনার নেড়ী কুত্তী একে কামড়াবে আর আপনি হাঁ করে দেখবেন!

—ঘটনাটা হঠাৎ হয়ে গেল, আগে টের পেলে আমি বাধা দিতাম। কিন্তু আসল দোষী আপনার কুকুর, ও কেন নেড়ী কুত্তীর কাছে গেল? উচ্চ কুলোদ্ভব হলেও আপনার প্রিন্সের নজর ছোট। অনেক বোকা লোক পেন্ট করা মেয়ে দেখলে ভুলে যায়। প্রিন্সও সেই রকম নেড়ী কুত্তীর গোলাপী রং দেখে ভুলেছে, জানে না যে ওটা বাংগো রেডের রং।

—কাছে গেছে বলেই প্রিন্সকে কামড়াবে?

—আপনি একটু স্থির হয়ে ব্যাপারটি বোঝবার চেষ্টা করুন। আমি যদি হঠাৎ আপনাকে অপমান করতাম। খবরের কাগজে যাকে বলে শ্লীলতাহানি,

তা হলে আপনি কি করতেন ? চুপ করে সইতেন কি ?

—আপনাকে লাথি মারতাম, হাতে চাবুক থাকলে আচ্ছা করে কষিয়ে দিতাম।

—ঠিক কথা, সেরকম করাই আপনার উচিত হত। নারীমাত্রেরই আত্মসম্মান রক্ষার অধিকার আছে। আমাদের এই ভারতবর্ষ বীরাঙ্গনা সতী নারীর দেশ। সেই ট্রাডিশন এ দেশের কুত্তীদের মধ্যেও একটু থাকবে তা আর বিচিত্র কি !

—ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। আপনি ওই নেড়ীটাকে গুলি করে মারবেন কিনা বলুন। আর আমার প্রিন্সের যে ইনফেকশন হল তার ড্যামেজ কি দেবেন বলুন।

—মাপ করবেন মিস চাকলাদার, কুত্তীটার বা আমার কিছুমাত্র অপরাধ হয় নি। শুধু শুধু দণ্ড দেব কেন ?

—বেশ। আমার উকিল আপনাকে চিঠি পাঠাবেন। আদালত আপনাকে রেহাই দেয় কিনা দেখব।

বাড়ি ফিরে এসে বেতসী স্থির হয়ে থাকতে পারল না, তখন মোটরে চড়ে উলুবেড়ে গেল। সেখানকার উকিল বিষ্ণু বাড়ুজ্যের সঙ্গে তার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাঁকে সব কথা উত্তেজিত ভাষায় তড়বড় করে জানিয়ে বেতসী বলল, ওই জয়হরি হাজরাকে সাজা দিতেই হবে জেঠামশাই, যত টাকা লাগে খরচ করব।

বিষ্ণুবাবু বললেন, আগে মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর। যদি মনে কর যে তোমার কুকুরের রোগ হবার ভয় আছে তবে আজই ওকে কলকাতায় পাঠাও, বেলগাছিয়া হাসপাতালে অ্যান্টিরাবিজ ইনজেকসন দিয়ে দেবে। কিন্তু মকদ্দমার খেয়াল ছাড়ো। জয়হরির কুকুরটা যদি খেপা হত আর তোমার কুকুরকে রাস্তায় কামড়ে দিত তা হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু তোমার কুকুর জয়হরির কম্পাউণ্ডে ঢুকে কামড় খেয়েছে, এতে কোনও ক্লেম আনা যায় না, মকদ্দমা করলে লোক হাসবে।

বিষ্ণুবাবু কিছুই করতে রাজী হলেন না। বেতসী তাঁর কাছ থেকে সোজা মহকুমা হাকিম অরুণ ঘোষের বাড়ি গেল। তাঁকে নিজের পরিচয় আর ব্যাপারটা জানিয়ে বলল, স্যার, আপনাকে এর প্রতিকার করতেই হবে, আপনি পুলিসকে অর্ডার দিন। জয়হরির খেঁকী কুকুরটা ডেঞ্জারস, তাকে এখনই মারা দরকার। আর জয়হরি একটা বুজরুক কারলাটান, নকল জানোয়ার

বানিয়ে লোক ঠকাচ্ছে। জন্তুর গায়ে রং ধরানো তো একরকম ক্রুয়েলটিও বটে। তাকে অর্ডার করুন যেন তিনদিনের মধ্যে তার চিড়িয়াখানা ভেঙে দেয়।

অরুণ ঘোষ একটু হেসে বললেন, আমি পুলিসকে বলে দিচ্ছি যেন জয়হরিবাবুর কুকুরটার খবর রোজ নেওয়া হয়। হাইড্রোফোবিয়ার লক্ষণ দেখলে অবশ্যই তাকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু জয়হরিবাবু যা করছেন তা তো বেআইনী নয়, সাধারণের অনিষ্টকরও নয়। তাঁকে তো আমি জব্দ করতে পারি না মিস চাকলাদার।

বেতসী অত্যন্ত রেগে গিয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এল। অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করল, সে নিজেই জয়হরিকে সাজা দেবে। আগে একটা আলটিমেটম দেবে, তা যদি না শোনে তবে মার লাগাবে। লোকটা খোঁড়া, বেশী মারা ঠিক হবে না, এক ঘা চাবুক লাগালেই যথেষ্ট। জনকতক লোক যাতে জয়হরির নিগ্রহ দেখে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। লোকে জানুক যে বেতসী চাকলাদার নিজেই বজ্জাতকে শাসন করতে পারে।

বেতসী তার ধোপা নিমাই দাস আর সর্দার-মালী গগন মণ্ডলকে ডেকে আনিয়ে বলল, ওহে, কাল সকালে আটটার সময় তোমরা জয়হরি হাজরার চিড়িয়াখানার সামনে হাজির থেকো।

নিমাই বলল, সেখানে গিয়ে কি করতে হবে দিদিসায়েব?

—কিছু করতে হবে না, শুধু একটা তামাসা দেখবে।

—যে আজ্ঞে, আমার ভাগ্নে নুটুকেও নিয়ে যাব।

গগন মণ্ডল বলল, আমার ছেলে দুটোকেও নিয়ে যাব দিদিসায়েব।

পরদিন সকালবেলা বেতসী তার আরবী ঘোড়ায় চড়ে একটা চাবুক হাতে নিয়ে জয়হরির মাঠের সামনে উপস্থিত হল। নিমাই ধোপা আর গগন মালী তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে আগেই সেখানে হাজির ছিল।

জয়হরি বেড়ার ধারে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে তার ভেড়া আর ছাগলের পরস্পর ঢু মারা দেখছিল। বেতসীকে দেখে স্মিতমুখে বলল, গুড মর্নিং মিস চাকলাদার, আপনার প্রিন্স ভাল আছে তো?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেতসী বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একবার বাইরে আসুন।

ফটকের বাইরে এসে জয়হরি বলল, হুকুম করুন। ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে বসে বেতসী বলল, দেখুন জয়হরিবাবু আপনাকে একটা আলটিমেটম দিচ্ছি। কাল আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে

ক্ষমা চাইবেন কিনা? আর সেই নেড়ী কুত্তীটাকে গুলি করবেন কিনা? নিতান্ত যদি মায়া তবে গঙ্গার ওপারে বিদায় করবেন কি না?

জয়হরি বলল, দুঃখপ্রকাশে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, আপনি অকারণে আমার উপর চটেছেন তাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু ক্ষমা চাইতে বা নেড়ী কুত্তীকে মারতে বা তাড়াতে পারব না।

চাবুক তুলে বেতসী বলল, তবে এই নিন।

বেতসীর চাবুক জয়হরির পিঠে পড়বার আগে একটু পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর বিবরণ আবশ্যক। মাঠের একটা কদম গাছের আড়াল থেকে একটি জেব্রা বেরিয়ে এল, কিন্তু বেতসীর নজর সেদিকে ছিল না। এই ভারতীয় জন্তুটি আফ্রিকার জেব্রার চাইতে কিছু ছোট, পেট একটু বেশী মোটা, কিন্তু গায়ের রং আর ডোরা দাগে কোনও তফাত নেই। অচেনা জানোয়ার দেখে নিমাই ধোপার ভাগনে নুটু বলল, মামা, ওটা কি গো?

নিমাই বলল, চিনতে পারছিস? ও তো আমাদের সৈরভী রে, সেই যে গাধীটার মাজায় বাত ধরেছিল, বোঁচকা বইতে লারত, তাই তো জয়হরিবাবুকে দশটাকায় বেচে দিনু। আহা, এখন ভাল খেয়ে আর জিরেন পেয়ে সৈরভীর কি যে রূপ হয়েছে দেখ! বাবু আবার চিত্তির বিচিত্তির করে বাহার বাড়িয়ে দিয়েছে। সৈরভী তার পুরনো মনিবকে চিনতে পেরে খুশী হয়ে এগিয়ে আসছিল। বেতসীর চাবুক যখন জয়হরির পিঠে পড়বার উপক্রম করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে সৈরভীর কণ্ঠ থেকে আনন্দধ্বনি নির্গত হল— ভুঁচী ভুঁচী। তার অদ্ভুত রূপ দেখে আর ডাক শুনে বেতসীর ঘোড়া সামনের দুপা তুলে চিঁ-হি-হি করে উঠল। বেতসী সামলাতে পারল না, ধুপ করে পড়ে গেল। পড়েই অজ্ঞান।

জ্ঞান ফিরে এলে বেতসী দেখল, একটা ছোট গেলাস তার মুখের কাছে ধরে জয়হরি বলছে, একটু খেয়ে ফেলুন, ভাল বোধ করবেন।

ক্ষীণ স্বরে বেতসী প্রশ্ন করল, কি ওটা?

—বিষ নয়, ব্রাণ্ডি। খেলে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

—আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

—এখন দেখছেন না, একটু আগে দেখেছিলেন বটে। আপনি যেন মহিষাসুর বধের জন্যে খাঁড়া উঁচিয়েছেন, কিন্তু আপনার বাহনটি হঠাৎ ভড়কে গিয়ে আপনাকে ফেলে দিল। তাতেই আপনার একটু চোট লেগেছে।

নিমাই আর গগনের বউ ধরাধরি করে আপনাকে আমার বাড়িতে এনে শুইয়েছে। ওকি করছেন? খবরদার ওঠবার চেষ্টা করবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার মায়ের কাছে লোক গেছে, ডাক্তার নাগকে আনবার জন্যে উলুবেড়েতে মোটর পাঠানো হয়েছে। তাঁরা এখনই এসে পড়বেন।

একটু পরে বেতসীর মা এসে পড়লেন। আরও কিছু পরে ডাক্তার নাগ তাঁর তাঁর ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বেতসীকে পরীক্ষা করে বললেন, হাতে আর কোমরে চোট লেগেছে, ও কিছু নয়, চার-পাঁচ দিনে সেরে যাবে। ডান পায়ের ফিবিউলা ভেঙেছে—সামনের সরু হাড়টা।...হাঁ হাঁ জোড়া লাগবে বইকি। ভয় নেই, খোঁড়া হয়ে যাবেন না, কিছুদিন পরেই আগের মতন হাঁটতে পারবেন।...আরে না না, জয়হরিবাবুর মতন লাঠি নেবার দরকার হবে না। আজ কাঠ দিয়ে বেঁধে দেব, তিন-চার দিন পরে সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করাব, তারপর প্লাস্টার ব্যাণ্ডেজ লাগাব। দরকার হয় তো একজন নার্স পাঠাতে পারি।

বেতসী নিজের বাড়িতে এলে ডাক্তার তার চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা করলেন। বিছানায় শুয়ে সে বিগত ঘটনাবলী ভাবতে লাগল।

নায়েব হরকালী মাইতি বহুদিনের পুরনো লোক। তাঁর স্ত্রী মাইতি-গিন্নী শয্যাগত বেতসীকে রোজ সন্ধ্যাবেলা দেখতে আসেন। বুড়ীর মুখের বাঁধন নেই, কিন্তু তাঁর এলোমেলো কথায় বেতসী চটে না, বরং মজা পায়। পড়ে যাবার দু সপ্তাহ পরে বেতসী অনেকটা ভাল বোধ করছে, বিছানা ছেড়ে ইজিচেয়ারে বসেছে।

মাইতি গিন্নী তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন—সবই গেরোর ফের দিদিমণি, কপালের লিখন। ভদ্দরলোকের ছেলের ওপর কেনই বা তোমার রাগ হল, কেনই বা মেমসায়েবের মত ঘোড়সওয়ার হয়ে তাকে মারতে গেলে? লাভের তার তো কিছুই হল না, মধ্যে তুমি ঠ্যাং ভাঙলে।

বেতসী বলল, তুমি দেখো মাইতি-দিদি, আমি সেরে উঠে তাকে চাবুক মেরে জব্দ করি কি না।

—হা রে দিদিমণি, চাবুক মেরে কি বেটাছেলে জব্দ করা যায়! ওদের একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে হয়, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটতে হয়। বেটাছেলে টিট করবার দাবাই হল আলাদা।

—দাবাইটা তুমি জান নাকি?

—ওমা তা আর জানি না! সাড়ে তিন কুড়ি বয়স হল, তিন কুড়ি বছর ধরে বুড়ো মাইতির কাঁধে চেপে রইছি। দাবাইটা বলছি শোন। আগে ভুলিয়ে ভুলিয়ে বশ করতে হয়, আশকারা দিয়ে যত্ন-আত্তি করে মাথাটি খেতে হয়। তারপর যখন খুব পোষ মানবে, তুমি না হলে তার চলবেই না, তখন নাকে দড়ি দিয়ে চরকি ঘোরাবে, নাজেহাল করবে, কড়া কড়া চোপা ছাড়বে, নাকানি চোবানি খাওয়াবে। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই দিদিমণি, আগেই চাবুক মারতে গিয়েছিলে। তাই তো গাধা ডেকে উঠল, ঘোড়া ভড়কাল, তুমি পড়ে গিয়ে পা ভাঙলে। জয়হরিবাবু মানুষটা তো মন্দ নয়, এখানে এসে তোমার খবর নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে শুনতে কথাবার্তায় ভালই, তোমারই মতন বিলেত দেখা আছে। সেও খোঁড়া, তুমিও খোঁড়া। বাধা তো কিছুই দেখছি না, কিন্তু তোমার মা যে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, অমন মারমুখো খাণ্ডার মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না, কিন্তু তাই বলে জয়হরির মতন পাত্র তো হাতছাড়া করতে পারি না, আমার ভাইঝি বেবির সঙ্গে তার সম্বন্ধের চেষ্টা করব, দাদাকে লিখব বেবিকে যেন এখানে পাঠিয়ে দেন।

মাইতি-গিন্নী চলে যাবার পর বেতসীর মনে নানারকম ভাবনা ঠেলাঠেলি করতে লাগল। সম্মুখসমরে তার পরাজয় হয়েছে, সে জখম হয়ে বাড়িতে আটকে আছে। ডাক্তারের মতন মিথ্যাবাদী দুটি নেই, এই সেদিন বলল, এক মাস, আবার এখন বলছে তিনমাস। ওদিকে শত্রু হাসছে, তার নেড়ী কুত্তী আর গাধাটাও বোধ হয় হাসছে। জয়হরির আস্পর্ধা কম নয়, এখানে এসে খোঁজ নিয়ে মহত্ত্ব দেখাচ্ছে। বেবিকে বিয়ে করবেন? ইস, করলেই হল! বেতসী শত্রুকে কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবে না, মাইতি-বুড়ীর দাবাই প্রয়োগ করবে। কূটযুদ্ধে শত্রুকে কাবু করে বশে আনাতেও তো বাহাদুরি আছে। জয়হরি গাধাকে জেব্রা বানিয়েছে, বেতসী কি জয়হরিকে ভেড়া বানাতে পারবে না? সারা রাত তার ঘুম হল না, মনের মধ্যে যেন ঝড় বইতে লাগল।

সকালে উঠেই বেতসী আরসিতে নিজের মুখখানা একবার দেখে নিল, তারপর মতি স্থির করে শত্রুর প্রতি প্রথম বোমা ছাড়ল, জয়হরিকে দু লাইন চিঠি লিখে পাঠাল—আপনার কুত্তী আর গাধাটাকে ক্ষমা করলুম। আপনিও আমাকে ক্ষমা করতে পারেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উট-রোগ

১

প্রায় হাজার বৎসর আগেকার কথা। তখন প্রতিহার-বংশের পতনের ফলে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে গেছে। সেই খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা সূর্যপাল খুব পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠে সাম্রাজ্য গঠন এবং প্রতিহার-বংশের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবার দিকে মন দিয়েছেন, এমন সময়ে সূর্যপালের শরীরে কঠিন ব্যাধি দেখা দিল।

ব্যাধি যে ঠিক কি, তা কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। দক্ষিণ পায়ের একটা শিরা টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করে, বুক ধড়ফড় করে, আর বাম চক্ষুটা থেকে থেকে জবাফুলের মতো লাল হ'য়ে ওঠে। রাজবৈদ্যগণের মধ্যে কেউ বললেন —বাতব্যাধি, কেউ বললেন—হৃদ্‌রোগ, কেউ বা বললেন—মস্তিষ্কের পীড়া। উপসর্গ তেমন কিছু সাংঘাতিক নয়, কিন্তু মহারাজা দিন দিন বলহীন এবং কৃশ হ'য়ে পড়তে লাগলেন। মুখ বিস্বাদ, মেজাজ খিটখিটে, আহারে রুচি নেই, আমোদ-প্রমোদে মন সাড়া দেয় না।

রাজবৈদ্যগণ একটা পরামর্শ-সভা ক'রে স্থির করলেন যে, এ ব্যাধি আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদিত কোন ব্যাধি নয়; এ নিশ্চয় এমন একটা চোরা ব্যাধি যার

উৎপত্তি-স্থল শরীরের বিশেষ কোন গুপ্ত প্রদেশে নিহিত। নিদানশাস্ত্র মথিত ক'রে যখন তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না, তখন তাঁরা রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না। মূলে কুঠারাঘাত না ক'রে শুধু শাখাচ্ছেদন করলে কি মহীরুহের বিনাশ সাধন করা যায়? রোগ বেড়েই চলল, মহারাজা সূর্যপাল ক্রমশ নির্জীব হ'য়ে পড়তে লাগলেন।

স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় মহারাণী চন্দ্রশীলা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছিলেন। মহারাজার আরোগ্য কামনায় তিনি কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কত যাগ-যজ্ঞ, কত গ্রহপূজা করালেন; মাদুলি এবং কবচে, নীলায় এবং পলায় মহারাজার কণ্ঠ ও বাহু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল; তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক কিছুই বাদ গেল না; কিন্তু রোগ বিন্দুমাত্র উপশমের দিকে না গিয়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। মনে হ'ল, দেবতাও বুঝি সূর্যপালের প্রতি বিরূপ!

রাজবৈদ্যগণের সকল চেষ্টা বিফল হ'লে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের অপরাপর খ্যাতনামা চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হ'ল। কিন্তু কেউই রাজাকে বিন্দুমাত্র সুস্থ করতে সমর্থ হলেন না; শুধু অর্থব্যয় এবং কালক্ষেপই সার হ'ল। সকলেই রাজার জীবনের বিষয়ে হতাশ হলেন; রাজা নিজেও বুঝলেন, তাঁর প্রাণপ্রদীপ নির্বাপিত হ'তে আর বেশি বিলম্ব নেই।

দুর্বল শরীরে সূর্যপাল চিকিৎসার তাড়নায় অস্থির হয়ে ছিলেন। অরিষ্ট, রসায়ন, তৈল, পাঁচন, বটিকা আর চূর্ণের উৎপীড়ন মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়ে কষ্টকর হ'য়ে উঠেছিল। রাজা মনে মনে একটা সংকল্প ক'রে তাঁর প্রধানমন্ত্রী বল্লভাচার্যকে ডেকে পাঠালেন।

বল্লভাচার্য উপস্থিত হ'লে রাজা বললেন, "মন্ত্রীমশায়, আজ থেকে আমি সকল চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দিলাম। বৈদ্যরা একেবারে অকর্মণ্য বাজে লোক, বিদ্যে বুদ্ধি কারও কিছু নেই। সহজ রোগ হ'লে তারা হয়ত সময়ে সময়ে সারাতে পারে, কিন্তু কঠিন রোগের তারা কেউ নয়। শুধু আমার রাজ্যে নয়, আপনি রাজ্যে রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দিন, যে-বৈদ্য আমাকে রোগমুক্ত করতে পারবে তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব, কিন্তু চিকিৎসারম্ভের তিন মাসের মধ্যে রোগ সারাতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে। এ শর্তে যদি কেউ আসে, তা হ'লে বুঝতে হবে সে যথার্থ শক্তিশালী চিকিৎসক। ঘোষণাপত্রে সবিস্তারে আমার রোগ-লক্ষণ বর্ণনা করবেন, যাতে যারা আসবে প্রস্তুত হ'য়েই যেন আসতে পারে।"

রাজার কথা শুনে বল্লভাচার্য অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে বললেন, "মহারাজ, এ কিন্তু বস্তুত চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেওয়াই হ'ল। কারণ অতিবড় ক্ষমতাশালী চিকিৎসকও প্রাণদণ্ডের ভয়ে আপনার চিকিৎসা করতে সাহস করবে না।"

রাজা তখন মরিয়া হয়েছেন; বললেন, "তা না করুক। এ রোগে আমার মৃত্যু অনিবার্য তা ত বুঝতেই পারছি,—দলন-মলন আর অরিষ্ট-রসায়নের হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রে কয়েক দিন একটু শান্তি ভোগ ক'রে মরতে চাই।"

এ সংকল্প থেকে রাজাকে নিরস্ত করবার জন্যে বল্লভাচার্য, মহারাণী চন্দ্রশীলা, অমাত্যবর্গ, এমন কি রাজগুরু পর্যন্ত অনেক অনুরোধ-উপরোধ সাধ্য-সাধনা করলেন; কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। রাজা একেবারে বদ্ধপরিকর।

অগত্যা বল্লভাচার্য চতুর্দিকে ঘোষণাপত্র জারি করলেন। উত্তরে গান্ধার, কাশ্মীর; পশ্চিমে সিন্ধুদেশ; দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, মহাকোশল, চালুক্য রাজ্য; পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, চম্পা রাজ্য—কোনো দেশই বাদ পড়ল না। কিন্তু কোনোও ফল হ'ল না। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট লোভনীয় পুরস্কার বটে, কিন্তু জীবনও ত তার চেয়ে কম লোভনীয় বস্তু নয়। বড় বড় চিকিৎসক পরাভূত হয়েছেন শুনে কোনো চিকিৎসাই সূর্যপালের চিকিৎসা করতে অগ্রসর হন না। এইরূপে বিনা চিকিৎসায় প্রায় ছ মাস কাল অতিবাহিত হ'ল। রাজার জীবনী-শক্তি আরও ক্ষীণ হ'য়ে এল।

২

সেই সময়ে মহারাজা সূর্যপালের রাজধানী সিংহগড় থেকে প'চিশ ক্রোশ দূরে চৈতসা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে অতিশয় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করত। অভাবের নিদারুণ তাড়নায় তাদের জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণের বিদ্যার দৌড় খুব বেশি ছিল না, কিন্তু কূটবুদ্ধিতে তার সমকক্ষ ব্যক্তি পাওয়া সত্যই কঠিন ছিল। সূর্যপালের চিকিৎসার পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতিরও শ্রুতিগোচর হ'ল।

ব্রাহ্মণের নাম দেবরাজ উপাধ্যায়। কয়েক দিন নিরবসর চিন্তার পর হঠাৎ একদিন দেবরাজ তার স্ত্রীকে বললে, "ব্রাহ্মণী, তুমি কিছুদিন ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কোনো রকমে সংসার চালাও, আমি সিংহগড়ে চললাম মহারাজা সূর্যপালের ঘোষিত এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করতে।"

দেবরাজের কথা শুনে তার স্ত্রী বিস্মিত কণ্ঠে বললেন "ও মা, সে কি কথা গো ! কত বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ হার মেনে গেল মহারাজের রোগ সারাতে, আর তুমি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জান না, তুমি চললে মহারাজকে সারিয়ে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করতে ?"

দেবরাজ বললে, "বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ যখন হার মেনে গেছে, তখন বুঝতেই পারছ—এ রোগ শাস্ত্রীয় চিকিৎসায় সারাবার নয়। অর্থের এই নিদারুণ অভাব আর সহ্য হয় না ব্রাহ্মণী, ভাগ্য পরীক্ষা করতে চললাম। অর্থ পাই ত হাসতে হাসতে ঘরে ফিরব, নইলে এ ঘৃণিত জীবন শেষ হওয়াই ভাল।"

ব্রাহ্মণী অনেক বোঝালে, অনেক কান্নাকাটি করলে ; বললে, "ওগো, এ ত তুমি আত্মহত্যাই করতে চলেছ !" কিন্তু দেবরাজ কোনো কথাই শুনলে না, একটি কঙ্কালসার মৃতকল্প টাট্টু ঘোড়া সংগ্রহ ক'রে তার পিঠে চ'ড়ে সিংহগড় অভিমুখে যাত্রা করলে। -

৩

পথে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে করতে চতুর্থ দিন দিবা তৃতীয় প্রহরকালে দেবরাজ সিংহগড়ের পশ্চিম-তোরণ অতিক্রম ক'রে রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই মাজা-ভাঙা ঘিয়ে-ভাজা বিচিত্র অশ্ব এবং তদুপরি রুক্ষকেশ ধূলিধূসর বিচিত্রতর অশ্বারোহীর অপূর্ব সমাবেশ দেখে পথচারী নাগরিকগণের কৌতুক এবং কৌতূহলের অন্ত রইল না। দেখতে দেখতে দেবরাজের পিছনে জনতা জ'মে গেল। সকলেই প্রশ্ন করে—কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে, কার বাড়িতে অতিথি হবে ? বিস্ময়াহত জনমণ্ডলীর কৌতূহল নিবারণের কোন প্রকার চেষ্টা না ক'রে দেবরাজ গম্ভীর বদনে সোজা রাজপ্রাসাদের অভিমুখে অশ্ব-চালনা ক'রে চলল। এর পূর্বে সে দু-তিনবার সিংহগড়ে এসেছে—রাজপ্রাসাদের পথ তার অজানা নয়।

প্রাসাদের সিংহদ্বারে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। প্রবেশোদ্যত দেবরাজের পথরোধ ক'রে আরক্ত নেত্রে কর্কশ কণ্ঠে সে বললে, "কোথায় যাও ?"

অকুতোভয়ে দেবরাজ বললে, "রাজপুরীতে।"

"কার কাছে ?"

"মহারাজার কাছে।"

সরোষে প্রহরী তর্জন ক'রে উঠল, "স্পর্ধা ত তোমার কম নয় দেখছি! একটা কানাকড়ির ভিখিরী, তুমি মহারাজার কাছে যাবে?—পালাও এখান থেকে, নইলে এখনি তোমাকে বন্দী করব।"

অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের কোটরপ্রবিষ্ট দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ন কণ্ঠে সে বললে, "বন্দী করবে, না, শেষ পর্যন্ত এই কানাকড়ির ভিখিরীকে বন্দনা করবে, তা ঠিক বলা যায় না। আমি মহাচণ্ড শ্মশাননিবাসী হ্রীং-ক্লেট অখ্যাত তান্ত্রিক দেবরাজ উপাধ্যায়। ভৈরবীচক্র থেকে উঠে সোজা এসেছিলাম মহারাজকে রোগমুক্ত করতে। ঔষধ-প্রয়োগের আজ প্রশস্ত দিন ছিল, কিন্তু তুমি প্রতিবন্ধক হ'য়ে আমার গতিরোধ করলে। তুমি রাজদ্রোহী, রাজমৃত্যুকামী। তোমার বিরুদ্ধে রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত ক'রে তোমার কর্মচ্যুতির পর তোমার স্থলে উত্তমসিংকে প্রতিষ্ঠিত করাব। আপাতত ফিরে চললাম।" ব'লে দেবরাজ লাগাম টেনে অশ্বের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল।

'কানাকড়ির ভিখিরী'র অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার অকস্মাৎ একটা উৎকট জটিলতায় পরিণত হওয়ায় প্রহরী একেবারে হকচকিয়ে গেল। মহারাজার চিকিৎসার প্রতিবন্ধক হওয়ার গুরু অপরাধের বিরুদ্ধে দেবরাজ কর্তৃক রাজসমীপে অভিযোগ আনা এবং পরিণামে তার কর্মচ্যুতি ও অজানা অচেনা উত্তমসিংয়ের নিয়োগ—সমস্ত ব্যাপারটাকে ষোল আনা সন্দেহ অথবা উপেক্ষা করবার মতো তার মনের জোর রইল না। এদিকে এক-পা এক-পা ক'রে দেবরাজ ফিরে চলেছে; দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে তাকে সন্ধান ক'রে বার করা কঠিন হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে প্রহরী ছুটে গিয়ে দেবরাজের ঘোড়ার লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে এসে, কি বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে, বললে, "শোন। উত্তমসিংহ কে?"

অবলীলার সহিত দেবরাজ বললে, "মধ্যমসিংয়ের বড় ভাই।"

বিস্মিত হ'য়ে প্রহরী জিজ্ঞাসা করলে, "মধ্যমসিং আবার কে?"

দেবরাজ বললে, "উত্তমসিংয়ের ছোট ভাই।"

সমস্যা কিছুমাত্র মন্দীভূত হ'ল না। এক মুহূর্ত চিন্তার পর প্রহরীর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, মান-মর্যাদা লজ্জা-সংকোচের অনুরোধে অন্ন-বস্ত্রের পাকা ব্যবস্থাকে সংশয়াপন্ন করার মত নিবুদ্ধিতা আর নেই। তাছাড়া, তান্ত্রিকদের প্রতি মনে মনে তার উৎকট ভীতি ছিল; সুতরাং দেবরাজের প্ররোচনায় রাজাদেশে তার কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার আশংকাও যে মনের মধ্যে উদিত হয় নি তা নয়। মস্তক হ'তে শিরস্ত্রাণ উন্মোচিত ক'রে দেবরাজের

সম্মুখে রেখে যত্ন করে সে বললে, "উত্তমসিং-মধ্যমসিংদের আমি জানি নে। কিন্তু আপনি আমাকে অধমসিং ব'লে জানবেন। আমি আপনাকে বুঝতে পারি নি প্রভু। আমার অপরাধ মার্জনা করুন।"

দেবরাজ ধূর্ত ব্যক্তি; কোথায় কোন্ জিনিস শেষ এবং কোন্ জিনিস আরম্ভ করা উচিত তা সে বিলক্ষণ বোঝে; বললে, "তবে আমাকে মহারাজার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।"

প্রহরী বললে, "মহারাজার কাছে আপনাকে পাঠাবার অধিকার আমার নেই। প্রধান মন্ত্রীমশায় এখন রাজপ্রাসাদে মন্ত্রণাগারে আছেন, আমি আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা করবেন।'

দেবরাজ বললে, "বেশ, তাই হোক।"

অদূরে একজন টহলদার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাকে ডেকে প্রহরী সব কথা বুঝিয়ে ব'লে তার সঙ্গে দেবরাজকে প্রধানমন্ত্রী বল্লভাচার্যের নিকট পাঠিয়ে দিলে।

৪

একজন তান্ত্রিক চিকিৎসক রাজার চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হয়েছে—টহলদারের মুখে অবগত হ'য়ে সকৌতূহলে বল্লভাচার্য তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের আকৃতি দেখে কিন্তু মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

দেবরাজকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বল্লভাচার্য বললেন, "আপনি মহারাজার রোগ সারাবেন?"

দেবরাজ অসঙ্কোচে বললে, "হ্যাঁ, সারাব বইকি।"

বল্লভাচার্য বললেন, "কিন্তু না সারাতে পারলে কি তার ফল তা জানেন ত?"

দেবরাজ বললে, "সব জানি মন্ত্রীমশায়, এই দীর্ঘ পথ এত কষ্ট ক'রে নিজের জীবন দিতে আসি নি, পরের জীবন দিতেই এসেছি। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, এখান থেকে আমি অর্থোপার্জন ক'রেই যাব, প্রাণ দিয়ে যাব না।"

বল্লভাচার্য বললেন, "ভগবানের অনুগ্রহে আপনি যেন এখান থেকে অর্থোপার্জন ক'রেই যান।"

দেবরাজ বললে, "কারুর অনুগ্রহের দরকার নেই মন্ত্রীমশায়, সে কার্য আমি নিজের বিদ্যেবুদ্ধির জোরেই করে যাব।"

আরও কিছুক্ষণ দেবরাজের সহিত আলাপ-আলোচনা ক'রে বল্লভাচার্য রাজসমীপে উপস্থিত হলেন।

এতদিন পরে একজন চিকিৎসক চিকিৎসা করবার জন্য উদ্যত হয়েছেন শুনে রাজা উৎফুল্ল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "শর্তের কথা জানে ত?"

বল্লভাচার্য বললেন, "সম্পূর্ণ জানে। মহারাজাকে সারাতে পারবে, সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি জাতি?"

বল্লভাচার্য বললেন, "ব্রাহ্মণ। তান্ত্রিক।"

বল্লভাচার্যের কথায় উৎফুল্ল হ'য়ে রাজা বললেন, "তান্ত্রিক? তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ওষুধ দেবে না-কি?"

বল্লভাচার্য বললেন, "সেই রকমই ত বলে।"

রাজা বললেন, "সে কথা ভাল। ভেষজ-শক্তির সঙ্গে মন্ত্র-শক্তির যোগ হ'লে উপকার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।"

বল্লভাচার্য বললে, "উপকার হ'লে ত আমরা বেঁচে যাই মহারাজ, কিন্তু তার চেহারা দেখলে একটুও শ্রদ্ধা হয় না।"

রাজা বললেন, "তা হোক। তান্ত্রিকদের চেহারা দেখতে ভাল হয় না। ডাকান তাকে এখনি আমার কাছে।"

তথাপি দেবরাজ এলে তার মূর্তি দেখে রাজার উৎসাহ অনেকটা ক'মে গেল; বললেন, "আমাকে তুমি সারাতে পারবে?'

দেবরাজ বললেন, 'নিশ্চয় পারব।'

রাজা বললেন, "তিন মাসের মধ্যে?"

রাজার প্রতি তর্জনী আস্ফালিত ক'রে দেবরাজ বললে, "তিন মাস বলছেন কি মহারাজ! তিন দিনে আপনাকে সারিয়ে দোব?"

রাজা বললেন, "তুমি পাগল।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, এ পর্যন্ত যাঁরা আপনার চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন?"

রাজা বললেন, "না, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন না।"

করজোড়ে দেবরাজ বললে, "মহারাজা, অপরাধ মার্জনা করবেন,—সুস্থ-মস্তিষ্কের লোকেরা যখন কোনো সুবিধেই করতে পারে নি, তখন পাগলকেই

একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন না। আর, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন যে ব্যক্তির মহাচণ্ড শ্মশানে কুম্ভক যোগের দ্বারা শিববিন্দুর চতুর্দিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কাটে, সে পাগল নয় ত কি? আমি আপনার কাছে প্রাণ দিতে আসি নি মহারাজ। মহাচণ্ড শ্মশানে উৎকটভৈরবের যে মন্দিরগৃহো নির্মাণ করব, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে তার অর্থ সংগ্রহ করতে। আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে ব'লে রাখছি, আজ থেকে চার দিনের দিন এই পাগলের হাতে গুণে গুণে এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা আপনাকে দিতে হবে।"

উৎসাহিত হ'য়ে রাজা বললেন, "তা যদি হয় ত এক লক্ষ নয়, দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দোব; কিন্তু তা যদি না হয়, তা হ'লে—"

সূর্যপালকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে দেবরাজ বললে, "এ বিষয়ে আর 'কিন্তু' নেই মহারাজ, একেবারে নিশ্চয়। আজ সন্ধ্যাবেলা আমি ওষুধ নিয়ে আসব আর সেই সময়ে ঔষধ-সেবনের নিয়ম আপনাকে ব'লে দোব। আপাতত, আপনার রাশি কি আমাকে বলুন।"

সূর্যপাল বললেন, "সিংহ রাশি।"

দেবরাজ বললে, "আর মহারাণীর?"

সূর্যপাল বললেন, "বৃষ রাশি।"

নিজের বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, আপনি দক্ষিণ চক্ষু বন্ধ ক'রে বাম চক্ষু দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে একটু তাকিয়ে থাকুন।"

সূর্যপাল তাই-ই করলেন। কি করেন, তান্ত্রিক চিকিৎসকের হয়ত কোন মন্ত্র-প্রক্রিয়াই বা হবে!

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে দেবরাজ বললে, "এবার ঠিক উল্টো—আপনি দক্ষিণ, আমি বাম।"

সূর্যপাল বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন।

দেবরাজ বললে, "হয়েছে, এবার দুই চোখ খুলুন। কোনো ভয় নেই মহারাজ, তিন দিনেই আপনাকে সুস্থ ক'রে দোব। তবে রোগ-শান্তির পর পর 'দুষ্টস্যাদানং রবিনন্দনস্য' করতে হবে।"

সকৌতূহলে রাজা বললেন, "সে কি?"

দেবরাজ বললে, "সে অতি সামান্য ব্যাপার, যথাকালে জানতে পারবেন। এখন আমি চললাম, সময়ে আসব।"

রাজা বললেন, "ঔষধ-সেবনের নিয়ম পালনের কথা বলছিলে, নিয়ম খুব

কঠিন না-কি ?"

দেবরাজ বললে, "আজ্ঞে না মহারাজ, অতি সহজ নিয়ম, শুনলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু কঠিনই হোক আর সহজই হোক, নিয়ম পালন না করলে ওষুধে উপকার হবে কেন বলুন ?"

রাজা বললেন, "সে ত সত্যি কথা। তোমার কোনো চিন্তা নেই, নিয়ম পালন আমার দ্বারা বর্ণে বর্ণে হবে।"

প্রসন্নমুখে দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হ'ল। বিশেষত এই চিকিৎসায় যখন আমারও জীবন-মরণের কথা জড়িত।"

রাজা বললেন, "সত্যিই ত।" তারপর বল্লভাচার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে আহার এবং বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

"যে আজ্ঞে" ব'লে দেবরাজকে নিয়ে বল্লভাচার্য প্রস্থান করলেন।

৫

সন্ধ্যার পর রাজা-অন্তঃপুরে রাজা ও রাণী দেবরাজেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা এসে সংবাদ দিলে—দেবরাজ এসেছে।

রাজা বললেন, "নিয়ে এস এখানে।"

একটু পরেই পরিচারিকার সঙ্গে দেবরাজ প্রবেশ করলে। হাতে তার সুবর্ণ পাত্রে ঈষৎ লালচে রঙের খানিকটা তরল পদার্থ। বলা বাহুল্য, সুবর্ণ পাত্রটি রাজভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত, এবং পাত্রের ঔষধ সাধারণ লালরঙ-মিশ্রিত খাঁটি জল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দেবরাজকে দেখে রাজা ও রাণী আসন পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। মহারাণী চন্দ্রশীলা ভক্তিভরে দেবরাজকে প্রণাম করলেন।

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে দেবরাজ বললে, "জয় হোক মহারাণী মহারাজার!" তারপর সুবর্ণ পাত্রটি চন্দ্রশীলার হাতে দিয়ে বললে, "মহারাজ, আপনার ওষুধ এনেছি।"

রাজা বললেন, "ওষুধ খাবার নিয়ম কি বলুন ?"

দেবরাজ বললে, "আজ থেকে ঔষধ-সেবনের তিন রাত্রি আপনি মহারাণীকে আপনার দক্ষিণ পাশে নিয়ে এক পালঙ্কে পূর্ব শিয়রে শয়ন করবেন। এই

পাত্রটি সমস্ত রাত পালঙ্কের ঈশান কোণে রাখা থাকবে। প্রত্যূষে উঠে মহারাণী বাসি কাপড়ে আপনার হাতে ওষুধ দেবেন। আপনিও বাসি কাপড়ে পূর্বমুখে ব'সে সমস্ত ওষুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। দিনের মধ্যে একবার মাত্র ওষুধ খাওয়া। আবার কাল সন্ধ্যায় যে ওষুধ দিয়ে যাব, পরশু প্রত্যূষে তা খাবেন।"

রাজা বললেন, "মাত্র এই? আর কোনো নিয়ম নেই?"

দেবরাজ বললে, "আর একটি মাত্র নিয়ম আছে। নিদিধ্যাসনে দেখা গেল, আপনার এ ব্যাধির মধ্যে উষ্ট্রিকা দোষ আছে,—ওষুধ খাবার সময় আপনি কদাচ উট মনে করবেন না। উট মনে করলে উপকার ত হবেই না, উল্‌টে অপকার হবে। উট মনে পড়লে সেদিন আর ওষুধ খাবেন না।"

সকৌতূহলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "উট কি?"

দেবরাজ বললে, "এই—জন্তু উট। হাতী, ঘোড়া, উট—বলে না? সেই উট। লম্বা গলা, পিঠে কুঁজ।"

রাজা বললেন, "অত ক'রে বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। আমার নিজের উটশালাতেই ত হাজারো উট আছে।" তারপর এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে বললেন, "না না, উট মনে করব কেন? উট মনে করবার কি কারণ আছে?"

দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হবে। তা হ'লে তিন দিনে আরাম। তা যদি না হয় তা হ'লে আমি নিজে গিয়ে শূলে চ'ড়ে বসব মহারাজ।"

দেবরাজের কথা শুনে রাজা ও রাণী উভয়েই খুব সন্তুষ্ট হলেন। আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে তাঁদের মনের মধ্যে প্রবল আশা দেখা দিল।

৬

পরদিন প্রত্যূষে ঈশান কোণ থেকে ঔষধের পাত্রটি নিয়ে মহারাণী চন্দ্রশীলা সযত্নে স্বামীর হাতে দিলেন। পূর্ব দিকে মুখ ক'রে সূর্যপাল প্রস্তুত হ'য়েই ব'সে ছিলেন, ইষ্টদেবতা স্মরণ ক'রে ঔষধ পান করতে গিয়ে পাত্রটা মুখে ঠেকিয়েই ভূমির উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন।

উৎকণ্ঠিত স্বরে চন্দ্রশীলা বললেন, "কি হ'ল? খেলেন না কেন মহারাজ?"

অপ্রতিভ মুখে সূর্যপাল বললেন, "উট মনে প'ড়ে গেল।"

শুনে রাণী শিউরে উঠলেন; বললেন, "আগে থেকেই মনে পড়ছিল, না,

খেতে গিয়ে মনে পড়ল ?"

রাজা বললেন, "খেতে গিয়ে মনে পড়ল।'

নিঃশব্দে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে রাণী বললেন, "কি আর করবেন বলুন, একদিন পেছিয়ে গেল। কাল আর মনে করবেন না।"

মনে মনে কি ভাবতে ভাবতে রাজা বললেন, "না, তা আর করব না।"

সন্ধ্যাবেলা ওষুধ দিতে এসে সব কথা শুনে দেবরাজ মুখ গম্ভীর করলে। বললে, "মহারাজ, এত করে যে কথাটা নিষেধ ক'রে দিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই ক'রে বসলেন ?"

অপ্রতিভ হ'য়ে সূর্যপাল বললেন, "কি করি বল ? ইচ্ছে ক'রে করেছি কি ? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল।''

দেবরাজ বললে, "তার আগেই টপ্ ক'রে খেয়ে ফেললে ত হ'ত !"

অন্যমনস্কভাবে রাজা বললেন, "কাল না-হয় তাই করব।" তারপর মনে মনে ক্ষণকাল কি চিন্তা ক'রে বললেন, "দেখ দেবরাজ, এ নিয়মটা তুমি যদি আমাকে না জানাতে তা হ'লে এমনি-এমনিই পালন হ'য়ে যেত। জানিয়েই অসুবিধেয় ফেলেছো।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেবরাজ বললে, "বলেন কি মহারাজ। এর উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, না জানিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারি কি ? হঠাৎ যদি আপনি উটের কথা মনে ক'রে ফেলেন, তা হ'লে ?"

রাজা মৃদুভাবে আপত্তি করলেন ; বললেন, "না, না, হঠাৎ উটের কথাই বা মনে করতে যাব কেন ?"

দেবরাজ বললে, "এই যে আপনি বললেন, আপনার উটশালায় হাজারো উট আছে।"

রাজা বললেন, "কি গেরো। শুধু কি আমার উটশালাই আছে ! হাতীশালা নেই ? ঘোড়াশালা নেই !"

দেবরাজ বললে, "কিন্তু মহারাজ, উটশালাও ত আছে।"

রাজা আর তর্ক করলেন না—পরদিন নিয়ম পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

পরদিন কিন্তু একই ব্যাপার ঘটল, মুখে ঠেকিয়েই ওষুধের পাত্র নামিয়ে রাখতে হ'ল, উট মনে পড়ায় ঔষধ খাওয়া চলল না। তৎপরদিন থেকে ঔষধের পাত্র স্পর্শ করাও চলল না, আগে থেকেই উটের কথা মনে পড়তে থাকে।

৭

মহারাণী চন্দ্রশীলা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। ওষুধ খাবার সময় যাতে উটের কথা রাজার মনে না পড়ে, সেজন্য তিনি রাজাকে নানা প্রকারে অন্যমনস্ক করতে চেষ্টা করেন ; মিথ্যা ক'রে বলেন, "মহারাজা, আপনার হাতীশালায় আজ লছমনদাসের ভারি অসুখ, এক কুটো ডাল-পালা মুখে দেয় নি, আর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি শুঁড় নাড়ছে।"

লছমনদাস রাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয় হস্তী। কিন্তু শাক দিয়ে কখনও মাছ ঢাকা চলে? লছমনদাসের দীর্ঘ-আন্দোলিত শুঁড় রাজার মনে ঢুনডিনাথের লম্বা গলা রূপে উঁচু হয়ে দেখা দেয়,—রাজা ধীরে ধীরে অ-সেবিত ঔষধের পাত্র ভূমিতলে নামিয়ে রাখেন। ঢুনডিনাথ রাজার সবচেয়ে আদরের উট—খাস আরব দেশ থেকে বহু যত্নে এবং বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করা।

মহারাণী চন্দ্রশীলার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। মনে মনে বলেন, 'তোমার অপরাধ কি মহারাজ! আমার নিজেরই মন ক্রমশ এক উট-শালায় পরিণত হয়েছে।'

এমনি ভাবে মাসাধিক কাল গত হ'ল। সূর্যপালের পেটে এক বিন্দু ঔষধ প্রবেশ করল না, ওদিকে রাজার-হালে চর্ব-চষ্য-লেহ্য-পেয় আহারে দেবরাজের শরীর দিন দিন কান্তিমান হ'য়ে উঠেছে। ঔষধ দিতে এসে দেবরাজ গজগজ করে ; বলে, "মহারাজ, মনে করেছিলাম দিন চারেকে কার্য শেষ ক'রে বাড়ি ফিরব, কিন্তু আপনি এমনি ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছেন যে, দেখতে দেখতে এক মাস হ'য়ে গেল। ওদিকে বাড়িতে কত প্রয়োজনীয় কাজ পণ্ড হচ্ছে।"

রাজা কিছু বলেন না, বেকায়দায় পড়ে গেছেন, মনের আক্রোশ মনের মধ্যে চেপে চুপ ক'রে থাকেন।

৮

আর দিন পনের পরে কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে। বল্লভাচার্যকে আর দেবরাজকে রাজা ডাকিয়ে পাঠালেন।

উভয়ে উপস্থিত হ'লে দেবরাজের প্রতি সক্রোধ নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে রাজা বললেন, "দেবরাজ, তুমি একটি বিষম ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, জোচ্চোর।"

কাঁচুমাচু মুখে করজোড়ে দেবরাজ বললে, "কেন মহারাজ ?"

কঠোর কণ্ঠে রাজা বললেন, "আবার চালাকি করছ ? কেন মহারাজ !—কেন, তা জান না ?"

দেবরাজ কোন কথা বললে না, করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আমার আগেকার রোগ সেরে গেছে, তার বিন্দু-বিসর্গও আর নেই। কিন্তু তার জায়গায় নতুন যে-রোগ সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে পাগল হ'য়ে যাবার মতো হয়েছি। আগেকার রোগ এর চেয়ে ভাল ছিল। তার শেষ ছিল মৃত্যুতে, কিন্তু এ রোগে বেঁচে থেকে দিবারাত্র মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি।"

রাজার কাতরোক্তি শুনে দেবরাজের হাসি পেয়েছিল। অতি কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে সে বললে, "কি রোগ মহারাজ ?"

রাজা সজোরে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "হারামজাদা, আবার ন্যাকামি করছ ! উট-রোগ তা তুমি জান না ?"

শুনে মন্ত্রী বল্লভাচার্য চমকে উঠলেন ; বললেন, "বলেন কি মহারাজ ! উট-রোগ ?"

রাজা বললেন, "হ্যাঁ, উট-রোগ। ওই নচ্ছারটা একটা আস্ত উট আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়েছে। ঘুমিয়ে পর্যন্ত নিস্তার নেই, স্বপ্ন দেখি উটের। ঘুম ভাঙলে মনে হয়, উট। উট ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। জেগে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ মনের মধ্যে উট খট্‌খট্‌ ক'রে বেড়িয়ে বেড়ায়।" তারপর দেবরাজের দিকে আরক্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "বার কর্‌ এ উট আমার মনের ভেতর থেকে, নইলে তোকে শূলে চড়িয়ে, আগুনে পুড়িয়ে মারব।"

মনের অপরিসীম উল্লাস অতি কষ্টে মনের মধ্যে দমন ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, প্রথম দিনেই ত বলেছিলাম যে, নিদিধ্যাসনে দেখা গিয়েছিল আপনার রোগে উষ্ট্রিকা দোষ—"

দেবরাজের কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজা চিৎকার ক'রে উঠলেন, "চোপ রও পাষণ্ড ! ফের যদি উষ্ট্রিকা দোষের কথা উচ্চারণ করেছ, এক্ষুনি দু খণ্ড করব তোমাকে।" ব'লে কোষ থেকে অসি নিষ্কাসিত করলেন।

দেবরাজ দেখলে, আর বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে কাজ নেই। করজোড়ে বললে, "দোহাই মহারাজ ! দয়া ক'রে ও-কার্যটি করবেন না। প্রাণটা দেহে বর্তমান থাকলে উটের যা-হয় একটা ব্যবস্থা করতে পারব, কিন্তু না থাকলে উটকে কোনো মতেই বার করতে পারব না। এর অতি সহজ প্রতিকার আছে, অভয় দেন ত নিবেদন করি।"

রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কি ?"

দেবরাজ বললে, "আপনার পায়ের শির ত আর টন্‌টন্‌ করে না ?"

রাজা বললেন, "না।"

"বুক ধড়ফড় করে না ?"

"না।"

"চোখ লাল হয় না ?"

"না।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, তা হ'লে ত আপনার আসল রোগ একেবারে সেরে গিয়েছে। আপনার প্রতিশ্রুত দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমাকে বিদায় করুন, তা হ'লে আপনার মন থেকে বেরিয়ে এসে উটও আমার পিছনে পিছনে খট্‌খট্‌ করতে করতে চ'লে যাবে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে রাজা বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। মন্ত্রী-মশায়, এই শয়তানটাকে দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে লাথি মেরে বিদায় করুন।"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, এর এক ফোঁটা ওষুধ আপনার পেটে গেল না, আর দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা একে দিতে বলছেন ?"

রাজা বললেন, "এই সর্বনেশে লোককে আর একদিনও আমাদের রাজ্যে রাখবেন না। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে শেষ পর্যন্ত ও আপনার মনে হাতী ঢুকিয়ে ছাড়বে। তখন চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ওকে বিদায় করতে হবে।"

এই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক কথা শোনবার পর মন্ত্রী আর দিরুক্তি করলেন না, দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

সেই বিপুল বহুমূল্য অর্থ ষোলখানা মজবুত বোরায় পুরে আটটা ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী রক্ষীর দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে প্রফুল্লমুখে দেবরাজ নিজের সেই মাজা-ভাঙা ঘোড়ার উপর সমাসীন হ'য়ে চৈতসা অভিমুখে যাত্রা করলে। বলা বাহুল্য, রাজবাড়ির পুষ্টিকর দানা-পানির গুণে দেবরাজের সেই ঘিয়ে-ভাজা ঘোড়াও অনেকটা বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।

৯

রাত্রে মহারাণী চন্দ্রশীলা পূর্বের মতো রাজার বাম পার্শ্বে শয়ন করলেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর সূর্যপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, কাল রাত্রে আপনার সুনিদ্রা হয়েছিল ত?"

প্রসন্নমুখে রাজা বললেন, "হ্যাঁ, সমস্ত রাত।"

"স্বপ্ন দেখেছিলেন?"

"দেখেছিলাম।"

সভায় মহারাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের স্বপ্ন?"

সহাস্যমুখে রাজা বললেন, "উটের স্বপ্ন একেবারেই নয়; শুধু তোমার স্বপ্ন।"

সূর্যপালের কথা শুনে লজ্জায় এবং আনন্দে মহারাণীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। মনে মনে ভাবলেন, উটটা তা হ'লে সত্য সত্যই দেবরাজের সঙ্গে প্রস্থান করেছে।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সত্যেন ডাক্তার

বৈঠকখানা ঘর। তাহার দরজার পার্শ্বে ছোট একখানা কাষ্ঠ ফলকে লেখা ছিল—'Dr. S. N. Halder M. B. (Gold Medalist)'। সত্যেন ডাক্তার প্রত্যহ সকালে ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত এই ঘরে বসিয়াই তাহার ডাক্তারী কার্য সম্পন্ন করে। 'গোল্ড মেডালিস্ট এম-বি'র এই ঘরটির মধ্যে রোগীর সমাবেশ এক রকম হয় না বলিলেই চলে। এখানে হয় না মানে—সত্যেন ডাক্তার হইতে দেয় না। সত্যেন বলে—তিনজন পর্যন্ত রোগীকে একজন ডাক্তার ঠিক মত চিকিৎসা করিতে পারে; রোগীর সংখ্যা তার বেশী হলে, সেখানে ডাক্তারী ঠিক হয় না, হয়—ওই নামের একটা চটকদার ব্যবসা। চিন্তাশীল চিকিৎসকের এই মন্তব্যের সত্যাসত্য অপর কাহারও পক্ষে নির্ধারণ করা সহজ নহে।

সেদিন সকালে সত্যেন ডাক্তারের সামনেকার চেয়ারখানায় যে ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন,—আজ ছ'মাস এই মাথা-ঘোরা রোগে বাবা ভুগছিলেন; আমরা মনে করেছিলুম, আপনার ওষুধটা খেয়ে অনেকটা নরম পড়েছে। কিন্তু কাল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে একেবারে যে ঘুরে পড়লেন, ব্যস্। আর···। 'এ্যাপোপ্ল্যাক্সি' আর কি!

—অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, না—পড়েই অজ্ঞান হলেন ?

—আজ্ঞে সেটা ঠিক……

—আচ্ছা, অজ্ঞান হবার পর, আর কথা-টথা কিছু বলতে পারেন নি ?

ভদ্রলোক কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে কহিলেন—আজ্ঞে, মাথা ঘুরে পড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে অজ্ঞান, তা আর কথা কইবেন কি করে ?

—তা নয়, কথা কইবার ইচ্ছায় ঠোঁট নড়ে উঠেছিল কি ? অনেক সময় বাইরে অজ্ঞান হলেও ভেতরে পুরো-দস্তুর Sense থাকে, তাই বলছি।

—আজ্ঞে, ঠোঁট নড়বে কি ? একেবারেই যে অসাড়। 'য়্যাপোপ্ল্যাক্সি'।

—য়্যাপোপ্ল্যাক্সি নয়—য়্যাপোপ্ল্যাক্সি নয় !

—নয় ! তবে ?

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সত্যেন ডাক্তার বলিল—কলেরা।

—কলেরা ?

—হ্যাঁ ; Dry cholera। বাইরেকার লক্ষণ দেখে কি ভেতরের রোগের diagnosis হয় ? যে-রকম সব লক্ষণ শুনলুম—Pure কলেরা ; এর আর কোন ভুল নেই। কলেরা হলেই যে ভেদ আর বমি হতে হবে, এমন কোন কথা নেই।…যাক্।

এমন সময় একটি মধ্যবয়স্ক লোক বাহিরের দেওয়াল-গাত্রে তাহার বাইকটি ঠেসাইয়া রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার হাঁটুর উপরের কাপড় রক্তাক্ত, সার্টে কাদার দাগ, কপালের দুই চার জায়গায় তখনো রক্ত ঝরিতেছে। লোকটি বিশেষ কাতর ভাবে কহিল—দেখুন ডাক্তার……

তাড়াতাড়ি তাহার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া সত্যেন ডাক্তার কহিল—শুধু শুধু দেখে আর কি করব বলুন। আর রুগী হাতে নেবার আমার সাধ্য নেই, কারণ তিনটি রুগী আমার হাতে…। বলিয়াই সত্যেন ঢোক গিলিয়া সঙ্গে সঙ্গে কহিল—বসুন, বসুন। আমি ভুলে গেছলুম। তিনটির মধ্যে একটি কাল কলেরাতে……যাক, কি হয়েছে আপনার বলুন ত ? দেখচি ত সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে চারিদিকে কেটে-কুটে গেছে।

—সাংঘাতিক পড়ে গেছি, ডাক্তারবাবু। একটা মলম-টলম কিছু, না হয়—টিঞ্চার আইডিন, কি বেনজুইন…

—কিছু হবে না। আপনার হিষ্টিরিয়া হয়েছে ; সেই হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা করতে হবে।

—হি-ষ্টি-রি-য়া !

—হঁ্যাগো মশাই, হিষ্টিরিয়া। আজ-কাল এই যুদ্ধের হিড়িকে, বোমার আতঙ্কে, এই চাল-ডালের অসম্ভব মূল্য-বৃদ্ধিতে বহু লোকের মাথা আর মন অসুস্থ হয়ে উঠেছে। তারই ফলে যত সব অঘটন ঘটচে। কেউ সাইকেল থেকে পড়ে যাচ্চে, কেউ দক্ষিণে যেতে ভুলবশতঃ উত্তরে চলে যাচ্চে, কেউ বিনা দোষে ছেলে-মেয়েকে ধরে মারচে, কারো-বা পেট নাবাচ্চে; জ্বর, সর্দি-কাশি.... মানে কারো মনই 'নরম্যাল' অবস্থায় নেই। সুতরাং···

—যাক্‌ আমার বাইক থেকে পড়ে জখম হওয়াটা আপনি বলছেন—হিষ্টিরিয়া ?

—নিশ্চয়ই! আপনাকে হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা করতে হবে।

হঠাৎ বাড়ীর সামনে একটি রিক্সা আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটি প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক তাহা হইতে নামিয়া, ও-দিককার দরজা দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইনি সত্যেন ডাক্তারের মাসিমা। বরানগরে থাকেন। দুপুর বেলা মাসিমা কহিলেন—বাবা সতু, একটা বিয়ে-থা কর বাবা। এমন তোর ঘর-বাড়ী, কিন্তু একটা মেয়েছেলের অভাবে সবই যেন ছিরিভেণ্ট। দিদি বেঁচে থাকতে...।

—দেখ মাসিমা, বিয়ে-টিয়ে করবার কোন উপায় নেই। তাহলে ডাক্তারী ছাড়তে হয়। আর ডাক্তারী করতে গেলে বিয়ে করা কিছুতেই চলে না। ডাক্তারী কাজটাকে নেহাৎ সোজা মনে করো না, মাসিমা।

—বলিস কি রে বাবা! জগৎশুদ্ধ ডাক্তার···

—রেখে দাও তোমার জগৎশুদ্ধ ডাক্তার! বিয়ে করে সকলের মত বেশ সংসার-ধর্ম পেতে বসা, ও আমার চলবে না। অসম্ভব।...নাকের মধ্যে ঘা হয়েচে না কি মাসিমা? হঁ্যা, তাই ত বটে!

—হঁ্যা বাবা, মাঝে-মাঝেই হয়, আবার আপনি সেরে যায়।

—না—না, কখনই সারে না। ও তোমার অম্বলের রোগ। bad -Liver। আচ্ছা, আমি ও রোগ তোমার সারিয়ে দেব এখন। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই কহিল—না হবে না। তুমি থাকবে সেই বরানগরে আর আমি এখানে, এতে আমার দ্বারা তোমার চিকিৎসা করা চলবে না। এক কাজ কর। রোজ খালি পেটে এক গ্লাস নেবুর জল খেতে সুরু কর। বলিয়াই সত্যেন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সু পায়ে দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়া ট্রামে চাপিয়া বসিল। মিনিট দশ-বার পরে ভবানীপুরে নামিয়া একটা ছোট

একতলা বাড়ীর দরজার কড়া নাড়িতেই একটি দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া কহিল—ওঃ! ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ। দেখুন, নেবুর জলটা ভাত খাবার পর চলবে না। ওটা খেতে হবে একবার সকালে খালি পেটে, আর একবার সন্ধ্যাবেলা। বুঝতে পেরেছেন ত? ব্যস্! এইটে বলতেই আমি এসেছিলুম। ওষুধ যেমন চলছে—চলবে।

পুনরায় হন্ হন্ করিয়া সত্যেন ডাক্তার তাহার গৃহের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

ইহার দিন চার-পাঁচ পরে একদিন রাত প্রায় দুইটার সময় ভবানীপুরের ঐ বাড়ীর দরজার কড়া সেদিনকারই মত আবার নড়িয়া উঠিল। সেদিনকারই মত দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং কহিল—ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ। সকালের ওষুধটা আজ খাওয়ানো হয়েচে কবার?

—যেমন বলে দিয়েছিলেন, তিনবার।

—চলুন ত, আমি এখন একবার দেখব আপনার মেয়েটিকে…কি নাম ওর? …সু…সু…সুলতা না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা এই এত রাত্রে…

—রোগের চিকিৎসার কি আর কাল-কাল দিন-সময় আছে? চিকিৎসকের কর্তব্য—ভয়ানক কর্তব্য। এর ভেতর দুঃখও যেমন পাওয়া যায়, আনন্দও তেমনি পাওয়া যায়; আপনার মেয়ের…কি নামটা হোল ওর?

—সুলতা।

—হ্যাঁ। সুলতার চিকিৎসার ভার যখন নিয়েছি, তখন…। আচ্ছা, ও চিৎ হয়ে ঘুমোয়, না কাত্ হয়ে ঘুমোয়?

—কখনো চিৎ হয়ে ঘুমোয়, কখনো কাৎ হয়ে ঘুমোয়।

—তা বললে হবে না। বেশীরভাগ সময় কি ভাবে ঘুমোয়? আচ্ছা, ওর জন্মের আগে আপনার স্ত্রীর কখনো বাত বা হাঁপানীর মত কি হয়েছিল? আচ্ছা, চলুন আমি এই সময়টা ওকে একবার দেখতে চাই।

সুলতা ভদ্রলোকের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বয়স বছর কুড়ি। অর্থাভাবে গরীব বাপ-মা এখনো তাহাকে পাত্রস্থ করিতে পারে নাই। কয়েকদিন আগে তাহার জ্বর ও আমাশয় হইয়াছিল। কিন্তু সত্যেন ডাক্তারের চিকিৎসার আমলে আসিল, সত্যেন অনেক-কিছু চিকিৎসা-তত্ত্ব আলোড়ন করিয়া তাহাকে ঔষধ-পত্র দিয়া চিকিৎসা চালাইতেছে।

সুলতাকে পরীক্ষা করিয়া সত্যেন ডাক্তার কহিল—দেখুন, এক কাজ করতে পারেন। সুলতাকে মাসখানেকের মত আমার বাড়ীতে রাখতে পারেন। দিন-কতক ওকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখের ওপর পেতে চাই। পারেন রাখতে ?

ভদ্রলোক সত্যেন ডাক্তারের পারিবারিক ইতিহাস সবই শুনিয়াছিলেন। জানিতেন যে একটা চাকর, একটা বামুন লইয়াই অবিবাহিত সত্যেন ডাক্তারের সংসার। সুতরাং একটু ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া ভদ্রলোক কহিল—তা-তা-তা, কোন বাধা নেই ; তবে কিনা ও হ'ল গিয়ে সোমত্ত মেয়ে, তা…

—ওঃ, রাখতে নেই বুঝি ? আচ্ছা, তবে থাক।—বলিয়াই ডাক্তার দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সকালে যে প্রেসক্রপশনটা করিয়াছিল, সেইটি একবার মনোযোগের সহিত পড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

সত্যেন ডাক্তার চলিয়া গেলে পর ভদ্রলোকটি ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে বহু আলোচনা ও পরামর্শ হইল এবং তাহার ফলে ভদ্রলোক পরদিন সকালেই সত্যেন ডাক্তারের কাছে গিয়া বলিল—দেখুন আমরা ত আপনার স্ব-ঘর। কাল একটা বিয়ের দিনও আছে। যদি সুলতাকে আপনি গিয়ে… ওর নাম কি…

—কি বলুন ত ?

—যদি ওকে বিয়ে করেন, তা হলে ওকে আপনার কাছে রাখতে আর কোনই বাধা থাকে না।

—বিয়ে ! ওঃ।—বিয়ে করলে আর কোনই বাধা থাকে না ? ওর দিনকতক আমার কাছে থাকা চাই-ই। আচ্ছা, ওর 'রিউম্যাটিক্ টেনডেনসি' …আচ্ছা, যাক। বিয়ে ! আচ্ছা তাই হবে। প্রেসক্রপশনটা এনেছেন ? ডিজিটেলিস্‌টা আমি বদলে দেব।

অতঃপর সত্যেন ডাক্তার 'ডিজিটেলিস্'ও বদলাইয়া দিল এবং পরদিন অবিবাহিত জীবনের চিরকালের ধারাটাও বদ্‌লাইয়া দিয়া শুভক্ষণে রোগী এবং স্ত্রী দুই একাধারে গৃহে আনিয়া চিকিৎসা বিদ্যার চরম এবং পরম গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিল।

জগদীশ গুপ্ত

লাঙ্গুলোপাখ্যান

—আসিতেছে! আসিতেছে!!—

—আসিতেছে!!!—

এই খবরটার দিকে আমাদের নজর গেল। আমাদের জীবনের স্বাদের তেতো মিষ্টির দৈনন্দিন তারতম্য খুব কম; জীবনের স্রোতে জোয়ার ভাটার ওঠা-নামা আরো কম।...পাঁচড়া থেকে পানের চালান এল তো পান পয়সায় পাঁচটা—না এল তো দুটো। আলু পটল ঝিঙের দর; শীত গরম বর্ষার কম বেশি, ছেলেটার জ্বর, মেয়েটার সর্দি, চাকরটার বে-আক্কেল—এমনি সব খবরের আদান-প্রদান ঘুরতে থাকে; তার বিরাম নেই, বদল নেই, শেষ নেই—

খুব যার কাজের নেশা সে আদার বাজারে ঘোরে—আর খুব যে-বার বিপড়তা সে-বার কলেরা ঢোকে।

হঠাৎ লোকে দেখলে দেয়ালে, গাছে গাছে, আলোর খুঁটিতে, দোকানের ঝাঁপে, ফেরিওয়ালার ঝাঁকায়—এক কথায় নিত্যানন্দের টাক ছাড়া সমস্ত প্রকাশ্য স্থানে। ঐ আসবার খবরটি পেয়ে আমরা একটু নড়ে বসলাম অর্থাৎ একটু বিস্ময় এল, আর ছোট মেয়েটির জ্বরের খবর শোনবার পর শুধোলাম,—কে

আসছে হে ? কিন্তু কেউ তা জানে না। কে আস্‌ছে, কেন আস্‌ছে তা এমন করে অনুমানই করা গেল, যা সকলেরই মন-সই। তবু মনটা খাড়া হয়েই রইল।

পরদিনই শোনা গেল, যে আস্‌ছে বলে রটেছে সে এসেছে, সে আর কিছুই নয়, সার্কাসের দল। মেয়ে-পুরুষ আর ছোট-বড়োয় এত লোক যে তাদের আসার খবর পেতে-না-পেতে তারা চোখের উপর পরিস্ফুট হয়ে উঠল। কোন্‌ দেশী লোক তারা তা বোঝা গেল না, কেউ পেন্টুলান পরা, কারো পরনে লুঙ্গি, কারো পায়জামা, কারো ধুতি—

হালদার বললে—মগ।

মোহন বল্‌লে,—ছাই জানো, বর্গী।

তৃতীয় ব্যক্তি সর্বেশ্বর কোনোটাই মঞ্জুর কর্‌লে না, বল্‌লে—তেলেঙ্গী।

আমি বল্‌লাম—বাড়িতে পটলে, আলুতে, থোড়ে, ঝিঙেয়, পোস্তর চচ্চড়ি—সব দেশের লোক ওতে আছে।

ছেলের দল তামাশা দেখতে দুপুর রোদেই ছুটল—এসে খবর দিলে,—রাজার মাঠে সার্কাসের তাঁবুতে উই উঁচু মাস্তুলের সঙ্গে ঝুলে আছে, আর মানুষের চচ্চড়ির সঙ্গে ইঁদুর থেকে সিংহ পর্যন্ত জানোয়ারের ফোড়ন আছে।

আমাদের এখানে গাড়ি বল্‌তেই রুটিওয়ালা রঞ্জনের গাড়ি…সেই গাড়িখানাকে তারা সাজিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে হ্যান্ডবিল বিলি করে গেল।

মাস্টার তুলসীর অপূর্ব ক্রীড়াচাতুর্য।
বীরকেশরী বিশ্বনাথের হিংস্র ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ !!
ছয় বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশু
অজিতকুমারের সিংহের পিঞ্জরে একাকী প্রবেশ !!!

ইত্যাদি অদ্ভুত কীর্তির খবর সেই হ্যান্ডবিলে পেয়ে জায়গাটায় এমন রৈ-রৈ উঠল যে, সর্বেশ্বর আদার বাজারে গেল না ; আর বওয়াটেরা তাস-পিটতেই ভুলে গেল।

রাত আটটায় খেলা আরম্ভ কিন্তু এমনি মানুষের ব্যগ্রতা যে, সাড়ে ছ-টা না বাজতে তাঁবুতে তিলধারণের স্থান রইল না ; দুটি মাথার ভেতর দিয়ে ছুঁচ গলানো যায় না, মাথায় মাথায় এমনি ঠাসাঠাসি।

তিন রাত্তির খেলা দেখিয়ে সার্কাসের দল খাঁচা আর তাঁবু গো-যানে বোঝাই দিয়ে চলে গেল। মাস্টার তুলসী, বীরকেশরী বিশ্বনাথ, আর ছয় বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশু অজিতকুমার তার সঙ্গে গেলেন, কিন্তু আমরা বয়স্কের দল, তামাশা দেখতেই লাগলাম।—

আড়াআড়ি করে বাঁশ বেঁধে তার ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে আনন্দ চাকির ছেলেটা তার বাঁ-হাতের হাড় দু-টুকরো করে ফেললে। শ্যামাদাসের নাতি ভুতো নিলে সিংহের পার্ট আর ন্যালা নিলে অজিতকুমারের পার্ট কিন্তু সিংহের চেয়ে মানুষ হিংস্র বেশি, তাই ন্যালা ভুতোর মুখের ভেতর মাথা দেবার উদ্দেশ্যে তার হাঁ-র ভেতর নাক দিতেই ভুতো তার নাক এমন কামড়ে দিলে যে, রক্ত ঝরে একাকার। রক্ত বন্ধ করতে ডাক্তার ডাকতে হল। ইত্যাদি।

সার্কাসের দল রওনা হয়ে যাবার পরদিনই যে ভয়ংকর গুজবটায় দেশে হৃৎকম্প ছেয়ে এল তার চেয়ে ওলাউঠো ভালো—সার্কাসের বাঘটা নাকি খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে পালিয়েছে—এই দু-এক ক্রোশের মধ্যেই। সার্কাসের খাঁচার মধ্যে বীরকেশরীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধের সময় মনে হয়েছিল, বাঘকে নেশা ধরানো হয়েছে···বীরকেশরীর হুংকারে আর চপেটাঘাতেও তার তখন হুঁশ হয়নি—

বড়ো নিরীহ বাঘ, রাগ নামমাত্র নাই, খাবার লোভও নাই, কোনো ক্ষমতাই তার নাই—অমন বাঘের সঙ্গে লড়ে আমরাও জনে জনে বীরকেশরী হতে পারি···তখন এই সব মনে হয়েছিল, আলোচনাও হয়েছিল—কিন্তু সেই বাঘই দু-এক ক্রোশের মধ্যেই খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে গেছে শুনে সে যে আফিংখোর তা চট করে ভুলে গেলাম আর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে নিরম্বু হয়ে উঠল—

তার স্তিমিত চক্ষু আর স্তিমিত রইল না—

পিটপিট করে না তাকিয়ে সে যেন অঙ্গদরায়বারের রাবণের মতো চারিদিক্ থেকে কটমটিয়ে তাকাতে লাগল।···আশু সিক্দার সার্কাস দেখে এসে বলেছিল, —আফিং খেয়ে ঝিমচ্ছে যে বাঘ, তার মুখের ভেতর হাত দেয়া তো তুচ্ছ কথা, তার মুখের ভেতর দিয়ে হেঁটে আমি তার পাক্যন্ত্রে যেতে পারি। সেই আশু সিক্দেরও খবরটা শুনে ধাঁ করে পেছনদিকে চেয়ে নিলে; কিন্তু তার পেছনে ছিল দেয়াল।···আশুর চাউনি দেখে মনে হল, সার্কাসের দলে যখন ছিল তখন বাঘ আফিং খেত; দল ছেড়ে এসে এখন সে নিরামিষ ঘাস খায় না তা আশু জানে—

বিন্দু বোষ্টম বললে—ভালোই হয়েছে, বাঘটাকে একবার দেখতে পেলে নেমন্তন্ন করে বোষ্টমীকে তার সাথে দিতাম।

শুনে আমরা হাসতে গেলাম, কিন্তু হাসিটা দাঁতের ওপারেই আট্কে রইল। হরি ঘোষের চিরটা কাল মাতব্বরি ধরন—

সে বললে—বাজে গুজব। বাঘ যদি ছুটেই থাকে—ছুটেছে বলেই যে এদিকে আস্বে তারই বা কি কথা?

কথাটা সঙ্গত—

মেনে নিতেও সুখ হল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল—না আসারও তো হেতু নেই। লোকপরম্পরায় শোনা গেল, মাইল তিনেক দূরে বাঘটাকে দেখা গেছে…

যদি বাঘ আসে তবে আত্ম ও আর্তরক্ষার পক্ষ কোন দিকে, সবাই মিলে সলা-পরামর্শ করে তাই একটা নির্ণয় করতে বিধু হালদারের উঠোনে জমায়েত হলাম—কিন্তু কোনোরূপ ব্যবস্থা না হতেই অবস্থা অনুরূপ দাঁড়িয়ে গেল…

তালাই পেতে একে একে সব বসেছি—বিধু হালদার ছিলিমটা ধরিয়েছে—দু-হাত ফিরেওছে—

নিমাই টেনে মোহনের হাতে দিতে যাবে, এমন সময় নিমাইয়ের হাত মধ্যপথে থেমে গেল……

"খেয়ে ফেললে, খেয়ে ফেললে"—এমনি একটা চিৎকার শুনে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলাম, একটা লোক আলুথালু হয়ে ছুটে আসছে—

মুহুর্মুহু পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কি দেখছে— যত সে চেঁচাচ্ছে তত তার দৌড়ের বেগ বাড়ছে…দেখতে দেখতে সে এসে পড়ল—

আসার পথে হরি ঘোষকে কাত করে ফেলে দিয়ে জলের ঘটিটা লাথি মেরে ঝম্ করে ছুটিয়ে দিয়েছে…এমন সময় কে যেন বলে উঠল,—বুঝি বাঘ!… শুনে চোখের নিমেষ না পড়তেই যেন ঝড় উঠল…

বিধু হালদার লোকটার হাত ধরে একটা ঝটকা মেরে তাকে মাটির ওপর বসিয়ে দিলে…ভূশায়িত হরি ঘোষকে পা দিয়ে চট্‌কে বারান্দায় উঠে পড়লাম…

পরক্ষণেই লোকে ঘর ভরে গেল—হরি ঘোষ বিদ্যুদ্বেগে উঠেই ঘরে ঢুকে খিল্ এঁটে দিলে…

বাইরে রইল কেবল অজানা সেই লোকটা।

সে বন্ধ দরজার ওপর হাত চাপড়ে কাঁদতে লাগল,—ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় বাঘের মুখে দিও না……

কিন্তু আমাদের তা কানেও গেল না।

হরি ঘোষ গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে,—ওই বেটাই বাঘ ডেকে এনেছে…ওই বাঘের পেটে যাক্।

বিন্দু বোষ্টম বললে—এগিয়ে যাও বাবা, এগিয়ে যাও—সঙ্গে করে এনেছ যদি তবে সঙ্গে নিয়েই আর একটু এগিয়ে যাও…আমরা বাঁচি। লোকটা এগিয়ে গেল না, দরজা ধরে কাতরাতে লাগল। কিন্তু গোল বাধালে মোহন।

সে বললে,—আমার বৌ ছেলে একলা আছে···দরজা ছাড়ো আমি যাব। বলে সে বিধু হালদারের চার হাত লম্বা বাঁশের লাঠিগাছটা হাতে করলে।

আমরা বললাম, বৌ-ছেলে আমাদেরও আছে। তবু দরজা আমরা খুলব না।···অন্য রাস্তা পাও, যাও।

দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বিধু হালদার নিজে। মোহনের উদ্যম দেখে সে খিলটা চেপে ধরে আরো শক্ত হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মোহন ভীষণ ষণ্ডা—ষাঁড়ের শিং ওপড়ায়—

সে বিনাবাক্যে এগিয়ে এসে বিধু হালদারের ঘাড়টা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরলে—এবং আমরা হাঁ হাঁ করে উঠে কিছু করে উঠবার আগেই তাকে উঁচু করে তুলে বরাবর দেয়াল পর্যন্ত ছুঁড়ে দিলে—

বিধু গিয়ে দেয়ালের উপর পড়ল—

আর মোহন খিল খুলে ডাক ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেল···সেই অবসরে সেই লোকটা আড় হয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে দড়াম্ করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

অনর্থক আক্রান্ত হয়ে বিধু হতবুদ্ধির মতো দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে ছিল···সকলের আগে সেই ছুটে এসে অচৈতন্য লোকটাকে কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে হাওয়া করতে লাগল···

ঘরের এক কোণে ভাগ্যিস্ জলের কলসী ছিল···আমি আঁজলা করে জল তুলে তুলে তার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম—

শুকনো কাঁচা মেঝে কাদা হয়ে চাষের উপযোগী হয়ে উঠল।

খানিক বাদেই লোকটা চোখ খুললে বটে কিন্তু দেখলাম, সে চোখে যেন কোনো ভাব নাই—মানে চোখ চেয়েও কিছু যেন তার চোখে পড়ছে না···তার শুকনো ঠোঁট আর জলে-ভেজা চুলের দিকে চেয়ে আমার বড় মমতা হল—

যেন তার কেউ নেই, বেঘোরে মরছে।

যাই হোক্ হাওয়া করতে করতে তার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটল···শুয়েই একটু হাঁ করলে—শুধোলাম, জল খাবে ?

উত্তরে হাঁ করেই রইল।

জল গড়িয়ে জলের ঘটিটা তার মুখের কাছে আনতেই অবাক্ কাণ্ড ঘটে গেল—ইচ্ছে ছিল, জল তার মুখে ঢেলে দেব—সে গিলতে থাকবে—

কিন্তু আচম্কা সে জলের ঘটিটা কেড়ে নিয়ে মাথাটি মাটি ছেড়ে একটু তুলে এক ঘটি জল এক চুমুকে খেয়ে ফেলেই কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে এমন

একটা চিৎকার ছাড়লে যে পিলে চমকে আমাদের মনে হল বাঘ বুঝি তার বুকের ওপর এসে বসেছে।

তার মুখের সুমুখ থেকে সরে এসে শুধোলাম, কথাটা কি হে ?

সে বললে—বাঘ !

—দেখেছ ?

—হুঁ...

—কোথায় ?

—মেটেপানি পুকুরে...পুকুরে কাপড় কাচছিলাম...আমি ধোপা।...একখানা কাপড় জলে ডুবিয়ে নিয়ে পাটের ওপর ফেলব বলে যেমন হাত তুলেছি তেমনি খস্‌খস্‌ একটা শব্দ কানে এল...চেয়ে দেখি, ওপারকার বনমল্লিকের ঝোপের ভেতর...বাবা রে !...বলেই লোকটা পুনরায় শিবনেত্র হয়ে গেল।

—কি দেখলে ?

—বাঘের দুটো চোখ, জ্বলছে...হাতের কাপড় ফেলে দিয়ে দিলাম ছুট...বাঘটাও এক লাফ মেরে আমার পিছু নিলে। ভাবলাম, এইবার গেছি। কিন্তু ভগবান বাঁচিয়েছেন...বাঘ পাটের ধারে এসেই কাপড়খানাকে ছিঁড়তে লেগে গেল...তাই রক্ষে নইলে এতক্ষণ...

কি ঘটত তা সে বললে না—

কিন্তু বুঝতে কারো কণ্ট হল না।—

বাঘ-ভির্মির রুগী আপনি সুস্থ হয়ে উঠুক...কিন্তু আমাদের দুর্ভাবনার কথা হয়ে উঠল এইটে যে, বাঘ কাপড় ছেঁড়া তাড়াতাড়ি শেষ করে লোকটার পশ্চাদ্ধাবন করে এই ঘরের কাছাকাছি এসেছে কি না জানতে হলে দরজা খুলে বেরিয়ে চারিদিকটা একবার দেখে আসা দরকার। বিশু সিকদার তাই দরজার খিল নিঃশব্দে খুলে কপাট একটুখানি ফাঁক করে বাইরের কতটা দেখলে তা সে-ই জানে—

তবে শশব্যস্তে খিল আরও শক্ত করে এঁটে দিয়ে বললে—কই, কোথায় বাঘ !...কোথাও তো দেখতে পেলাম না।

বিন্দু বোষ্টম বললে—নাকের ডগার নজর দুনিয়ার এপার ছেড়ে কত দূরই বা যাবে ! দুনিয়ার ওপারে যদি পথ থাকে, এপারে তো নেই। কি বলো, বিশু ?

শুনে আমরা কায়ক্লেশে একটু হাসলাম।

বিপদের ওপর বিপদ বাধালে হালদার—সে বড়ো তাগিদ দিতে লাগল।

এতগুলি লোক যদি তার বাড়িতেই রাত কাটাবার ইচ্ছে করে বসে তবেই একটা খরচের ধাক্কা—

চাল অভাবে চিঁড়ে-মুড়ির জলপান দিতেই হবে—অভুক্ত রাখাও অন্যায়—কাজেই বিকাল পাঁচটায় সে সুদূর ভবিষ্যৎ ভেবেই ঠেলতে লাগল ; বললে—বাঘ যদি এ অবধি ধাওয়া করেই থাকে, তবে সে কি এতক্ষণ না খেয়ে আছে ভেবেছ ?…রাস্তায় লোকজন চলেছেই, আর কাউকে না পাক, মোহন তো এক রকম যেন তাই ভেবেই বেরিয়ে গেল।…বাঘ দিনে একটার বেশি শিকার করে না।…বাড়ি যাও তোমরা, ছেলেপিলেরা সব অরক্ষিত অবস্থায় আছে। ছেলে-পিলেদের অরক্ষিত অবস্থাটা আমরাও জানতাম, কিন্তু এও জানতাম যে, ছেলে-পিলেদের মায়েরা আছেন ; আমাদের অভাবে তাঁরা অত্যন্ত অরক্ষিত হলেও দরজায় খিল লাগিয়ে দিতে পারেন।

এই কথা শুনে হালদার হাল ছেড়ে দিলে—

যা জানো তা-ই করো, আমি বসলাম—বলে সে কাদার ওপরেই বসে পড়ল, বলতে লাগল,—মোহনের দেহ কি একটুখানি !…একটা বাঘের তিনদিনের খোরাক—তা সে যত বড়ো বাঘই হোক না।…যতক্ষণ মোহনকে শেষ করে বাঘের আবার খিদে পাবে ততক্ষণেও কি তোমরা বাড়ি পৌঁছতে পারবে না ?

শুনে তাকে যথেষ্ট কটূক্তি করা হল—

কিন্তু হালদারের হালছাড়া ভাবটা গেল না।

আসান দিলে মোহন— বাঘের পেটে গিয়ে নয়, ফিরে এসে।

বেরোও তোমরা…বাঘ মারা পড়েছে—বলে সে হুংকার ছেড়ে লাঠি ঘোরাতে লাগল—আমরা বাতাসের আওয়াজটা পেলাম—দরজা খুলেই বেরিয়ে এলাম, বেরিয়ে দেখি, তার সঙ্গে ঢের লোক—সবারই হাতে লাঠি।

তারা বললে—বাঘ এদিকে আসেনি। বলে তারা হাসতে লাগল, যেন ঠাট্টা করে।

বাঘের ভয়ে ছেলেরা ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে—

আর, ক-জনে মতলব করে সদর দরজায় জাঁতি-কল পেতে রাখলে, এলেই বাঘ মারা পড়বে। মেয়েরা কালো হাঁড়ির তলায় চুন দিয়ে ভূতের ছবি এঁকে বাঁশের মাথায় রেখে দিলে—

সূর্য না ডুবতেই ঘরে ঘরে টিনের বাদ্য বাজতে লাগল…শুনে মনে হল, বাঘ যদি যম-কালা না হয় তবে এ শব্দের সীমানা ত্যাগ করতে সে বাধ্য।

পরদিন বাঘ সম্বন্ধে কোনো কথা শোনা গেল না—আমরা কিছু সাহস

পেলাম···বাঘ তবে অন্যদিকে গেছে। গিরি গয়লা বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে একবার করে ময়লা দাঁত দেখিয়ে যেতে লাগল,—কি হে, কত বড়ো বাঘ? আছ তো? কিন্তু দুঃখের বিষয়, গিরিধরের হাসি বাসী হতেও গেল না—টাটকাই শুকিয়ে গেল।

কামিনীর মা বেচারী ছাগল পুষতো—

গিরি যেদিন হাসির টহল দিয়ে গেল সেই রাত্রের ভোরেই কামিনীর মা তার ছাগলের খোঁয়াড়ে ঢুকেই চেঁচিয়ে হাহাকার করে বেরিয়ে এল—

মাটিতে আছড়ে পড়ে লুটিয়ে লুটিয়ে মাথা কুট্‌তে লাগল, সে কী কান্না। একমাত্র ছেলে মরলেও মা অমন করে কাঁদে না।

কাকের মুখের খবর পেয়ে দেখতে দেখতে মানুষ জড়ো হল—

কামিনীর মা কাঁদতে লাগল—ধাড়ি বাচ্চায় নটি ছিল···ঐ টিম্‌টিমে দুটো আছে, আর-সব গেছে। ওরাও কি বাঁচবে? ওদের যে মা মরেছে। কামিনীর মা মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল।

দেখলাম, খোঁয়াড়ের বেড়ার একটা দিক একেবারে ভাঙা; অগুন্তি ছোট ছোট ক্ষুরের দাগ আর হেঁচড়ে টেনে নেবার দাগ রয়েছে—ধুলোর ওপর··· ঐ টিমটিমে দুটির চোখে এমন বিহ্বল ভাব যে, বাঘ ছাড়া অপর কিছু তার কারণ হতেই পারে না।—

কামিনীর মাকে বোঝাব কি! ভয়ে আমাদেরই বুদ্ধিশুদ্ধি তাল পাকিয়ে গেল। চেয়ে দেখি, হারু সরকার মাথা ঘুরে পড়ে বুঝি!

আমরা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—

কামিনীর মা কাঁদতে লাগল—কী ঘুম তুই ঘুমিয়েছিলি হতভাগী···তোর যে সর্বনাশ হয়ে গেছে।···কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ সে পাগলের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আমি থানায় চললাম···দেখি দারোগা কি বলে।

পরে শুনেছি দারোগা তাকে যা বলেছিল তা না শুনলেই ভালো হত—

পরদিন গেল, রাধা গয়লার দুগ্ধবতী গাভীটি। তেমনি গোরু—দেশের সেরা গোরু; দু-বেলায় দশ সের ক্ষীরের মতো দুধ দিত।—

রাধা বললে,—ঝটাপটির শব্দে ঘুম ভেঙে বিছানায় শুয়ে সস্ত্রীক কাঁপতে লাগলাম···ওদিকে গোরুর পরলোকযাত্রার শব্দ ক্রমশঃ দূরে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল···আতঙ্ক ষোলোআনা পূর্ণ হল। দেশের লোক গিয়ে রাধা গয়লার গোয়ালের ভাঙা বেড়ার সামনে জমল—কেউ কেউ বাঘের পায়ের দাগ খুঁজতে লাগল, কিন্তু পেলে না।

অনুচিত পাকযন্ত্রে হজম হবার অপেক্ষায় খাসির দেহধারণ অনাবশ্যক—মনে মনে তর্কের পর এই সিদ্ধান্তে এসে দিনু মোড়ল তার খাসিটাকে মেরে ঘরে ঘরে মাংস বেঁটে দিলে।

…চন্দ্র রায়ের ঘোড়াটা গেল—

আরো দুজনের গোরু গেল—

ডোমপাড়ার শুয়োর পর্যন্ত একাদিক্রমে বাঘের পেটে যেতে লাগল…

রোগের চিকিৎসা আছে—

মড়কে রক্ষা-কালী আছেন—

বাঘের জন্যে আফিং আছে, কিন্তু সে খাঁচায় ঢুকিয়ে…এখন উপায় কি? ভাবতে গিয়ে চোখে আঁধার দেখতে লাগলাম।

চন্দ্র রায় প্রস্তাব করলে,—ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, গোরু, পাঁঠা, খাসি, মেষ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা—যার যা আছে সব একত্র করে একটা ঘরে খিল এঁটে সারারাত যদি বসে থাকা যায়—

হারু বললে,—জানো না তাই ও কথা বলছ।…বাঘের আবার কী ভয়ংকর জোর…থাবার একটি ঘায়ে তোমার দরজা ভেঙে বাঘ যদি তোমার—তোমায় বলেই বলছি—ঘরে ঢোকে, তবে সে কি আর মানুষ ফেলে পাঁঠা নিয়ে যাবে।

চন্দ্র রায় কেঁপে উঠল।

আশ্চর্য এই যে, সেই যে লোকটা বাঘ দেখে হাঁপিয়ে এসে পড়েছিল তারপর কেউ বাঘটিকে চাক্ষুষ করে নাই।

কে একজন অভয় দিল, রাত্তিরেই বাঘের ভয়, দিনে তারা ঘুমোয়।

শুনে ছেলেদের আবার স্কুলে পাঠাতে লাগলাম—কিন্তু সেই ইস্কুলের পথ থেকেই টেকো নিত্যানন্দের ছেলেটা ভয়ে সাদা হয়ে মুখে বা-আ-আ শব্দ করতে করতে ছুটে এসে একেবারে মরণাপন্ন হয়ে উঠল।—

আমরা ভাবতে লাগলাম,—যখন গোরু বাছুর প্রভৃতি ইতরপ্রাণী সব শেষ হয়ে যাবে তখন কি হবে?

তারপর দেখলে টেকো নিত্যানন্দ নিজে—

সে যে কী অবস্থা তার!…তার টাক পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল।…সামলে নিয়ে নিত্যানন্দ যা বললে তা এই—

চাদরখানা কাঁধে ফেলে সে বেয়াইবাড়ি যাবে বলে বেরিয়েছিল, না গেলেই নয়, তাই দিনে দিনে গিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসাই ছিল তার ইচ্ছে।

রায়বাবুদের আম-কাঁঠালের বাগানের ভেতর দিয়ে যে পথটা সেইটে সোজা।… চল্‌তে চল্‌তে বাগানের মাঝামাঝি সে এসেছে এমন সময় দেখে মস্ত একটা মোটা কাঁঠালগাছের গুঁড়ি ঠেস্‌ দিয়ে বসে আছে—বাঘ; হাঁড়ির মতো মাথাটা তার। দেখেই তার চোখের তারা কপালে আর নিজে সে 'বাবা গো' বলে গাছে উঠে গেল।…বাঘ তারই দিকে চোখ রেখে ঠোঁট চাটতে লাগল।…সে একটা ডালে বসে আর—একটা ডাল দু-হাতে জড়িয়ে ধরেও পড়ে আর কি…এমনি যখন অবস্থা, প্রাণ গেছে—আর নেই…তখন বাঘ ঠোঁট চাটতে চাটতে উঠে হেল্‌তে দুল্‌তে জঙ্গলে ঢুকে গেল; ডালে বসে সে কালীকে পাঁঠা আর হরিঠাকুরকে 'লুট' মানত করেছে।…বাঘ চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ সে গাছ থেকে নামে নাই; সম্প্রতি নেমে ছুট্‌তে ছুট্‌তে পালিয়ে এসেছে · কাঁধের চাদর এখন কোথায় সে-জ্ঞান তার নেই।

তারপর বল্‌লে—বাঘটা সাত হাত লম্বা খুব হবে।

বিবরণ শুনে কানা কেষ্ট বল্‌লে—বাঘ তোমার পেছু নিয়েছিল সেটা বললে না যে।

—কি রকম?

—আমি দেখেছি যে!…তুমি তো গাছে উঠলে পরে; আগে তো এগুতে তুমি পেছুতে বাঘ…গাছ বেড়ে বেড়ে তুমিও যত ছোটো বাঘও তত ছোটে…ঘণ্টাখানেক এমনি করে ছোটার পর দুস্তোর বলে তুমি গাছে উঠে গেলে।… হাতে ছড়িটাড়ি থাক্‌লে এক হাত বোধ হয় লড়তেই, ভাব দেখে তাই মনে হল।

—তুমি তখন কোথায়?

—আর এক গাছের উপর। বলে কেষ্ট খলখল করে হাসতে লাগল।

নিত্যানন্দ চটে গেল, বললে,—আমি কি মিছে কথা বলছি?

কেষ্ট বললে,—আমি কি বলছি যে তুমি—

কানাকে আমরা ধমকে থামিয়ে দিলাম—

অসময়ে হাসি-তামাশা ভালো লাগে না।

মানুষ ছাড়া আর সব জন্তুই বাঘের পেটে যেতে লাগল।

দারোগা কামিনীর মাকে হাঁকিয়ে দেবার সময় বলে দিয়েছিল,—খালি হাতে এলে কি আর বাঘের নামে নালিশ চলে রে? একটা খাসি আন্‌তিস তো দেখা যেতো।

বাঘ যাকে দয়া করে রেখে গেছে, নির্দয় হয়ে তাকেই দারোগার মুখে তুলে

দিতে কামিনীর মা-র মন সরে নাই।

কামিনীর মা অবলা, শোকাতুরা—

তাকে দেখে দারোগা তার খাসি খেতে চেয়েছিল—

জোয়ান পুরুষ কাছে গেলে দারোগা যা চেয়ে বস্‌বে বলে অনুমান হল তা দামী জিনিস—

সে-বস্তু দারোগার পাতে দেবার সামর্থ্য আমাদের নাই। কাজেই থানার দিক থেকে সাহায্য পাবার আশা ত্যাগ করেই বসে ছিলাম—

একমাত্র ভরসা (যদি দয়া করেন) তিন ক্রোশ দূরের বিজ্‌লিহাটি কুঠীর বাবুরা—ছোটবাবু মস্ত শিকারী, নাম শোনা ছিল।

দশ-বারোজন গিয়ে ছোটবাবুর পায়ের ওপর ঠাস্‌ হয়ে পড়লাম—বাবু রক্ষে করুন।

বাবু কেদারায় বসেছিলেন, হাঁটু কাঁপানো বন্ধ করে বল্‌লেন—কী হয়েছে তোমাদের ?

—ভুবনডাঙ্গা বাঘের পেটে গেল, বাবু। বলে হারু সরকার এগিয়ে যেতেই বাবু বললেন—তোমার নাম ?

হারু বল্‌লে—হারাধন সরকার।

—বসো। বলে বাবু আমাদের বসিয়ে সব কথাগুলো মন দিয়ে শুন্‌লেন।

—ঘোড়া, বলদ, মোষ, গোরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, খাসি, পাঁঠা এমন কি পাতিহাঁস পর্যন্ত কত যে নষ্ট হয়েছে তা আর কি বল্‌ব, বাবু! আপনি—শুনেছি ভারী শিকারী···আমাদের রক্ষে করুন। বলে হারু সরকার তাঁর পা ধর্‌তে গেলে বাবু পা টেনে নিয়ে রাজী হয়ে গেলেন—

বাবু বড়ো ভালো মানুষ।

তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে চলে এলাম—

আর সেই রাত্রে আমার বলদটি গেল।

পরদিন দুপুরে আহারাদি করে কুঁচকি পর্যন্ত বুট এঁটে ছোটবাবু শিকারে এলেন।

তাঁর বন্দুক ধর্‌বার কায়দা দেখে ভাবলাম, এ কাজ এঁরই বটে।

ছোটবাবু বিশ্রাম করতে করতে বললেন,—একা এ বনে তো শিকার হয় না ···জঙ্গল ঘের্‌তে হবে ; সঙ্গে লোক চাই।

শুনে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল—

দলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘে মানুষ নিয়ে গেছে এ গল্প শোনা আছে।

কিন্তু বন্দের শোকে আমার বুক জ্বলছিল, আমি লাফিয়ে উঠে বললাম—আমি আপনার সঙ্গে যাব।

ছোটবাবু হেসে বললেন—দুজনেও হয় না।

আর একজন উঠল—দেখাদেখি আর একজন…ক্রমে আমরা ত্রিশ-বত্রিশজন বাবুর সঙ্গে বাঘ মারতে তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম। বাবু অনেক খোঁজ-পাত্তা নিলেন, ঠিক্ হল ঠিক বারোটার সময় রওনা হতে হবে।

বাবুর হাতে বন্দুক—

আমাদের হাতে কুড়োল থেকে কাটারি পর্যন্ত। ঐ জাতীয় অস্ত্র একটু ধারালো অবস্থায় যার বাড়িতে যটা ছিল সব এনে হাজির করলে—ছোটবাবু যার কাটারি অপছন্দ করলেন সে একটু ক্ষুণ্ণই হল। শিকার ব্যাপারে অস্ত্র-শস্ত্র হারাবার ভয় যথেষ্ট তা জেনেও লোকে না বলতেই তা নিয়ে এল দেখে মনে হল, ভয়ে মানুষ দুর্বল হয় খুব। সে সব বাদে, প্রচুর টিন আনা হল—

মশালও নিলাম—

ছোটবাবু ইংরেজী কায়দায় আমাদের সাজিয়ে নিলেন…এক সারে চারজন…দু-সারের মাঝে দেড়হাত ফাঁক্…

সমান তালে পা ফেলে যখন রওনা হলাম তখন ভয়ের মধ্যেও আনন্দ হল। যেখানে নিত্যানন্দ বাঘ দেখেছিল সেই রায়বাবুদের বাগানের পরই খানিকটা ফাঁকা জায়গা; তারপরই অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা জঙ্গল; সামনেই একটা ডোবা; ডোবার ভেতরকার জঙ্গল একেবারে নিরেট—জঙ্গলের মাথা মাটির ওপরেই দু-মানুষ সমান উঁচু; ডোবার পাশেও জঙ্গল—বেত আর বাঁশই বেশি। এইটেই আমাদের গন্তব্য।

রায়বাবুদের বাগানের মুখে আসতেই সবারই পা যেন থেমে থেমে পড়তে লাগল—সকলের আগে ছিলেন বন্দুক নিয়ে ছোটবাবু স্বয়ং; বেশ আসছিলাম—ছোটবাবু নির্ভয়ে, আমরাও প্রায় তাই; কিন্তু এই স্থানটিতে এসে ছোটবাবু পেছনে ফিরে চেয়ে নিলেন—

তারপর মাথার ওপর বাঁ হাত ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন,—বলো ভাই বন্দে মাতরম্।

বললাম।

ছোটবাবু বললেন,—বাজাও টিন্।

সঙ্গে সঙ্গেই এমন বাদ্য বেজে উঠল যে, ভয় হল, সার্কাসের বাঘ তার বীর-কেশরী গুরুকে মনে পড়ে যদি এদিকেই আসে।

দুই সারির মধ্যে যে দেড় হাত ফাঁক ছিল, বাগান পার হবার সময় তা কমতে কমতে অগ্রগামীর পিঠের সঙ্গে পশ্চাদ্গামীর পিঠের প্রায় ঠেকাঠেকি হয়ে গেল।

খোসা ফকিরের পিঠের একটা স্থান নবাই কাহারের কাটারির খোঁচা লেগে ফুটো হয়ে গেল—

শিকারে নবাইয়ের এমনি আগ্রহ।

বাগানটা বেশ বড়োই ; পার হতে দেরী হল···আরো দেরী হল লোকগুলোর অনর্থক ভয়ের দরুণ। যেতে যেতে একজন বলে ওঠে,—ও কি!···সঙ্গে সঙ্গে সবাই থেমে ভাবে, এইবার গেছি—

কিন্তু সেটা ভ্রমমাত্র।

এমনি করে নির্বিঘ্নে বাগান পার হয়ে ডোবার ধারে এসে ছোটবাবু বললেন,—এই জঙ্গল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পেটো টিন্।

টিন বাজতে লাগল—

টিন বাজিয়ে জঙ্গল দু-বার প্রদক্ষিণ করা হল, কিন্তু বাঘ বেরুলো না।··· দু-একজন উঁচু গাছের আগডালে উঠে চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখে এল—বাঘের নিশানা কোথাও নাই।···

কিন্তু দুরদৃষ্ট কাছেই ছিল, দেখা দিল।···ছোটবাবুর কথায় আর তাঁর বন্দুকের দিকে চেয়ে সাহস পেয়ে লাঠি দিয়ে চোখ বুজে পিট্‌তে লাগলাম সেই মহাজঙ্গল।···

পিট্‌তে পিট্‌তে—

যে জায়গায় নিত্যানন্দ পিট্‌ছিল সেই জায়গার জঙ্গল ফুঁড়ে—

কি বেরিয়ে এল তা দেখবার সময় কারো হল না—

মুহূর্ত মধ্যে শিকারবাহিনী নিজের পথ দেখ্‌লে···

ছোটবাবু ডোবার দিকে লক্ষ্য রেখে আর কাণ্ড আশ্রয় করে বাঁশের ঝাড়ে বসে ছিলেন, তিনি সেখান থেকে হেঁকে বললেন,—বাঘ নয়, বাঘ নয়। যারা শুনতে পেল তারা ফিরে এল।

—কি ওটা?

—শেয়াল। বাঘ এখানে নেই। বলে ছোটবাবু নেমে এলেন।

চূড়ান্ত ক্লান্ত হয়ে যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বাড়ি পৌঁছতে রাত হল।

আমারই ঘরে ছোটবাবুকে বসিয়ে তাঁকে সুস্থ করছি…ডাবটার মুখ কেটে পাথরের বাটিতে জলটুকু ঢেলে তাঁর হাতে দিয়েছি…তিনিও জলটুকু খেয়ে আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলে সবল হয়ে উঠেছেন, এমন সময় নেপাল সাউ মরি বাঁচি করে ছুটতে ছুটতে এসে বললে—বাঘ!

—কোথায়?

—কানা কেষ্টর বাড়িতে ঢুকল। শিগ্গির এসো, এত বেলা বুঝি সাফ হয়ে গেল। বলে নেপাল ধুঁকতে লাগল।…

ছোটবাবু লাফিয়ে উঠে কাঁধের ওপর বন্দুক তুলে নিলেন, আমরাও কাটারি কুড়োল যা পেলাম তাই নিয়ে মশাল জেবলে ছুটতে ছুটতে কেষ্টর বাড়ি এসে দেখি বাড়ি অন্ধকার—কোনো জনমানব সেখানে নেই।…হাঁকতেই কেষ্ট বেরিয়ে এল—

ছোটবাবু বললেন—খবর পেলাম, তোমার বাড়িতে বাঘ ঢুকেছে।

কেষ্ট তার একটি চক্ষু বড়ো করে বললে—আমার বাড়িতে বাঘ? কই না।…ঢুকলে আমিই আগে খবর পেতাম।

নেপাল এগিয়ে এল, বললে—হ্যাঁ ঢুকেছে, আমি দেখেছি।

কেষ্ট বললে,—রান্নাঘরে ঢুকেছিল, ফ্যান খেয়ে নর্দমা দে বেরিয়ে গেছে। নেপাল নাছোড়বান্দা, বললে—আমি দেখলাম।

কেষ্ট রেগে উঠল—দেখেছ, বেশ করেছ, কাল এসো, রাজা করে দেব।

ছোটবাবু বললেন,—আহা, তুমি রাগ করছ কেন, কেষ্ট? না ঢোকাই তো মঙ্গলের কথা।

ছোটবাবুর কথায় কেষ্ট শান্ত হল—

হেসে বললে—আসুন বাবু, বসবেন আসুন। গরিবের ঘর—মনে কিছু করবেন না। মহা সমাদরে বারান্দায় জল চৌকি পেতে কেষ্ট বাবুকে বসালে।…আমার হাতের লণ্ঠন নিয়ে কেষ্ট ঘরে ঢুকে তামাক সাজতে বসল।

ছোটবাবু বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠলেন—কেষ্ট, ওটা কি হে?

—কোনটা বাবু?

—ঐ যে তোমার বিছানার নিচে থেকে ঝুলছে।

—ও, ঐটে? ওটা একটা চামর।

—দেখি চামরটা।

কেষ্ট চুপ করে রইল।

ছোটবাবুর আর কোনো দোষ নাই, শিকারীও ভালো, তবে বড়ো একগুঁয়ে। বললেন—দাও না দেখি।

কেষ্ট নড়লও না, শব্দও করল না।

ছোটবাবু তখন আমায় হুকুম করলেন—আনো তো ঐটে, আমি দেখব।

হুকুম পেয়ে এগিয়ে যেতেই কেষ্ট হাতের কলকে মাটিতে রেখে চট্ করে দাঁড়িয়ে উঠে দরজা আগলে এক চক্ষু পাকিয়ে বললে—খবরদার, আমার ঘরে ঢুকো না বলছি।

আমি অবাক হয়ে পিছিয়ে এলাম—

কিন্তু ছোটবাবু অপমানবোধ করলেন—করবারই কথা। উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে রাগে আঙ্গুল কাঁপিয়ে বললেন—নিয়ে এসো, আমি চাই ওটা।

ছোটবাবুকে যারা খুশি করতে চায় তারাই দলে পুরু, আর সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল যে চামর দেখাতে কেষ্টর এত আপত্তি আর অনিচ্ছা কেন!... কাজেই পাঁচ-সাতজন এসে কেষ্টর কিলবৃষ্টি গা-পেতে নিয়ে তাকে ধরে ফেললে—

আমি ঘরে ঢুকে বিছানা উলটে দিলাম—দেখলাম, সাতফুট লম্বা একখানা বাঘছাল লম্বালম্বি পাতা।...

ঝুলছিল তারই লাঙ্গুল।

সুকুমার রায়

হ্যশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওমরা সিপাই সান্ত্রী গিজ্ গিজ্ করছে—এমন সময় কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডানদিকে উঁচু থামের উপর ব'সে ঘাড় নিচু ক'রে চারদিক তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "কঃ"।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ—সভাশুদ্ধ সকলের চোখ এক সঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একেবারে একসঙ্গে হাঁ করে রইল। মন্ত্রী একতাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই ক'রে রাজার মাথার উপর পড়ে গেল। রাজামশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বললেন, "জল্লাদ ডাক।"

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজামশাই বললেন, "মাথা কেটে ফেল।" সর্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে; সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের নিজের মাথায়

হাত বুলাতে লাগল। রাজামশাই খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন, "কই মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোড় ক'রে বলল, "আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?" রাজা বললেন, "বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কিরে! যে ঐ রকম বিট্‌কেল শব্দ করেছিল, তার মাথা।" শুনে সভাশুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক নিঃশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় করে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন যে, ঐ কাকটাই ওরকম আওয়াজ করেছিল। তখন রাজামশাই বললেন, "ডাকো, পণ্ডিত সভার যত পণ্ডিত সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির। তখন রাজামশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ করে গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বলতে পার?"

কাক আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি। পণ্ডিতেরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরা মতো পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল,—"আজ্ঞে, বোধ হয় তার খিদে পেয়েছিল।"

রাজামশাই বললেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আসতে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রি হয়। মন্ত্রী, ওকে বিদায় ক'রে দাও—" সকলে মহা তম্বী ক'রে বললে, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ওকে বিদায় করুন।"

আর একজন পণ্ডিত বললেন, "মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়সপক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কি?"

রাজা বললেন, "আশ্চর্য এই যে, তোমার মতো মোটা বুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোল তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী আজ থেকে এ'র মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পণ্ডিতের এরকম দুর্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজামশাই দস্তুর মতো খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম—সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো

কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল—রাজা মশাইয়ের খিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের "মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা" ব'লে গাল দিচ্ছে, এমন সময় রোগা সুটকো মতো একজন লোক হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র উজির নাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কী হলো, কী হলো?" তখন অনেক জলের ছিটা পাখার বাতাস আর বলাকওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল, "মহারাজ, সেটা কী দাঁড়কাক ছিল?" সকলে বলল, "হাঁ-হাঁ-হাঁ, কেন বল দেখি?" লোকটা আবার বলল, "মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসেছিল—আর মাথা নিচু করে ছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল, আর "কঃ" ক'রে শব্দ করেছিল?" সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললে, "হাঁ হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায়, হায়, সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন?"

রাজা বললেন, "তাই তো, একে তোমরা তখন খবর দাও নি কেন?" লোকটাকে কেউই চেনে না, তবু সে কথা বলতে সাহস পেল না, সবাই বললে, "হাঁ ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল" — যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কী খবর দেবে, একথা কেউ-ই বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত ক'রে বলল, "দ্রিঘাংচু"। সে আবার কি! সবাই ভাবল, লোকটা ক্ষেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, "দিঘাণ্ডু কি হে?" লোকটা বলল, "দিঘাণ্ডু নয় দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল, "ও!" তখন রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি রকম হে," লোকটা বলল, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডানদিকের থামের উপর বসে মাথা নিচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে চোখ পাকিয়ে 'কঃ' ব'লে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।" পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।"

রাজা বললেন, "তোমায় খবর দেয় নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কী ?" লোকটা বলল, "মহারাজ, সে কথা বললে লোকে যদি বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।"

রাজা বললেন, "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে বলে ফেল।" সভাশুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বলল, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র যদি তাকে বলতে পারতাম তা হলে কি যে আশ্চর্য কাণ্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ তার কথা কোনো বইয়ে লেখে নি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব ?" রাজা বললেন, "মন্ত্রটা আমায় বল ত।" লোকটা বলল, "সর্বনাশ। সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে, তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে তা হ'লেই সর্বনাশ।"

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজামশাই দু'দিন উপোস করে তিনদিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।"

রাজামশাই গম্ভীর ভাবে এটা মুখস্থ ক'রে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোনো রকম আশ্চর্য কিছু হয় কি না। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পান নি।

নলিনীকান্ত সরকার

দেশভক্তের স্বদেশী পানীয়

আমার এক দরদী বন্ধু ছিলেন সেকালে। সেকালকার সাহিত্যিকদের অনেকেরই পরম সুহৃদ। তিনি প্রায়ই এখান-ওখান থেকে আমার গানের বায়না যোগাড় ক'রে দিতেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে।

একদিন দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে বিশ্রাম করতে যাচ্ছি, এমন সময় বন্ধুবরের আবির্ভাব। বন্ধুবর সুসংবাদ দিলেন, আমাকে এক্ষুনি তাঁর সঙ্গে বেরোতে হবে,—ভালো বায়না, মোটা টাকা। কোথায় যেতে হবে, বন্ধুটি কিছুতেই কবুল করলেন না। আমি একান্ত অনুগতের মতো তাঁর অনুসরণ ক'রে চলতে লাগলাম। বন্ধুবর সটান শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে দু'খানি টিকেট কিনলেন বেলঘরিয়ার। ট্রেনে চ'ড়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বেলঘরিয়ায়? ব্যাপার কি?'

বন্ধুবর একটু মুচকি হাসি হেসে বললেন, 'চলোই না—আর, কতক্ষণই বা।'

বেলঘরিয়া স্টেশনে নেমে বন্ধুর সঙ্গে পদব্রজে চলেছি অজ্ঞাত আসরে গান গাইতে। মনে সত্যই একটা অস্বস্তি খেলছে, কোথায় নিয়ে চলেছে? কিছুদূরে গিয়ে বন্ধু আমার থামলেন একটি বাগানবাড়ীর দরজার সম্মুখে।

প্রকাণ্ড ফটক—প্রকাণ্ড দরজা—একটা হাতী অনায়াসে গ'লে যেতে পারে। দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ। বন্ধুবর দরজায় ঘা দিতে দিতে কি-একটা নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন। দরজা খুলে গেল ;—দেখি, একজন প্রবীণ ব্যক্তি, বয়স আন্দাজ ষাট-পঁয়ষট্টি, পরনে লুঙ্গি, খালি গা,— সামনে দাঁড়িয়ে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের অর্গলও খুলে গেল ; আমাদের দেখে তিনি অনর্গল বকতে শুরু করলেন। আমাকে দেখামাত্র জড়িতস্বরে বন্ধুটির উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'এই যে মাইরি, নলিনীবাবুকে নিয়ে এসেছ!' ব'লে সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হয়ে আমার পা দুটি জড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'কী সৌভাগ্য আমার!'

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এ কোথায় এলাম? বন্ধুটি আমার অবস্থা দেখে বেশ উপভোগের হাসি হাসছেন। আমি নিজেই সরে গিয়ে আমার বাবার বয়সী এই বৃদ্ধের হাত থেকে পা-দুটি ছাড়িয়ে নিলাম। দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের দুই বন্ধুর দুই স্কন্ধে তাঁর দুটি হাত রেখে কোনোক্রমে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে তিনি চলতে লাগলেন বন্ধুবরের কাছে শুনলাম। ইনিই এই বাগানবাড়ীর মালিক এবং আজকের আসরের আহ্বায়ক।

মনটা দমে গেল। এর আগে এই জাতীয় বাগানবাড়ী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। বাগানবাড়ীর মহামান্য মালিক উগ্র সুরাসুরভি বিলিয়ে অসংযত রসনায় অসম্বন্ধ প্রলাপ বকতে বকতে, অনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে আমাদের নিয়ে এসে দাঁড়ালেন একটি সুসজ্জিত কক্ষের সম্মুখে। কক্ষের ভিতরে দুটি নারী এবং পাঁচ-ছ'জন ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক আসর জমিয়ে ব'সে আছেন। নারী দু'টির একজনের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, আর একজন চল্লিশের কোঠায়। ভদ্রলোক ক'টি গৃহস্বামীরই সমবয়সী,—সকলেরই বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। পলিত-কেশ, গলিত-দন্ত পুরুষপুঙ্গবদের এরূপ স্খলিত-চরণ-চারণ আমার কল্পনার অতীত ছিল।

গৃহস্বামী ঘরে ঢুকেই নেশা-নিষিক্ত অভিভাষণে আমার পরিচয় জ্ঞাপন করলেন : 'এই যে ভদ্রলোকটিকে দেখছো, ইনি হচ্ছেন 'দি গ্রেট নলিনীবাবু' —ইণ্ডিয়ার ভেতরে দি বেস্ট্ সঙস্টার।' —ব'লেই ছোট মেয়েটির দিকে তর্জনী-সঙ্কেত ক'রে আমাকে বললেন, 'আর নলিনীবাবু, এই যে মেয়েটিকে দেখছেন, ইনি ক্যালকাটার বেস্ট্ ডান্সট্রেস।'

ভদ্রলোকের ব্যাকরণ-জ্ঞান না থাকলেও রসজ্ঞান ছিল বেশ টনটনে। এই রসজ্ঞানের পরম-পরিণতি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য।

বেশ বুঝতে পারলাম, ওদের মত আমিও মজুরো খাটতে এখানে এসেছি। গিয়ে বসলাম সেই আসরে। সঙ্গে সঙ্গে এল বোতল আর গেলাস। গৃহস্বামী স্বয়ং সারি সারি গেলাস সাজিয়ে প্রত্যেকটি গেলাসে পরিমাণ মতো হুইস্কী ঢেলে সোডার জল দিয়ে গেলাসগুলি পূর্ণ করলেন। তারপর একটি গেলাস আমার সম্মুখে ধরে প্রস্তাব করলেন পানের জন্যে। আমি সবিনয়ে অস্বীকৃতি জানালাম। ভদ্রলোক আর দ্বিরুক্তি না করে সেই গেলাসটিই ধরলেন ছোট মেয়েটির মুখের কাছে। তাঁর ঐ হাতে-ধরা অবস্থাতেই মেয়েটি গেলাস থেকে মদ্যপান করতে উদ্যত হলো। মেয়েটি সুরার অধরোষ্ঠ স্পর্শ করা-মাত্র ভদ্রলোক গেলাসটি টেনে নিয়ে আবার আমার মুখের কাছে ধরে বললেন, 'এবার তো রিফিউজ্ করতে পারেন না!'

তাই তো, এ মহাপ্রসাদ প্রত্যাখ্যান করি কী ক'রে? রক্ষা করলেন আমার বন্ধুটি। তিনি গৃহস্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললেন। কর্তা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কোনক্রমে পা-দুটি সিধে রেখে অনুতাপ-তপ্ত কন্ঠে বক্তৃতা শুরু করলেন, 'হুইস্কী অফার করার জন্যে আমি নলিনীবাবুর কাছে এই প্রকাশ্য সভায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নলিনীবাবু স্বদেশী আন্দোলনের লোক, দেশকে স্বাধীন করার জন্যে এঁরা না করেছেন কি—বোমা, রিভলবার, ডাকাতি, জেল, আন্দামান, ফাঁসি' ইত্যাদি ইত্যাদি···

কিছুতেই বক্তৃতা বন্ধ হয় না। সকলেই অনুরোধ করতে লাগলো তাঁকে বসবার জন্যে। কিন্তু তাঁর মুখে তখন একটি বুলি : 'আগে বলুন, নলিনীবাবু, ক্ষমা করেছেন!' সত্যিই মুখ ফুটে ব'লতে হ'লো, 'ক্ষমা করেছি।' শেষে পান-প্রত্যাশী এক ব্যক্তি উঠে জোর করে তাঁকে বসিয়ে দিলেন।

মহাসমারোহে পান-পর্ব আরম্ভ হলো। পান-পর্ব সাঙ্গ হ'লে শুরু হ'লো নাচ-গানের আসর। বয়স্কা মেয়েটি ধরলে গান, গানের সঙ্গে ছোটটির নাচ। কখনো বা গানের পর নাচ, নাচের পর গান চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বারুণী-রাঙিন বন্ধু শ্রোতাদের নানা ভঙ্গি সহকারে নানা প্রকারের সরস বাহবা-ধ্বনি। প্রায় ঘণ্টাখানেক নাচ গানের পর তাঁরা ধরলেন আমাকে গাইবার জন্যে। আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না গাইতে। বন্ধুটি গৃহস্বামীর নাম ক'রে বললেন, 'তিনি আসুন, তারপর হবে।'

এত নাচ-গান চলেছে, কিন্তু আসল লোকটিই নেই। সেই মদ্যপান-

পর্বের পর তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছেন, আর ফেরেন নি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আচম্বিতে হ'লো গৃহস্বামীর আবির্ভাব—চোখ দু'টি বড় বড়, ঘর্মাক্ত কলেবর। হাতে একটি প্রকাণ্ড কাচের গেলাস নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে সেই ফেণশীর্ষ গেলাসটি আমার মুখের কাছে ধ'রে নিবেদন করলেন, 'অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি, নলিনীবাবু, আপনার জন্যে। বিলিতী ব'লে আপনি হুইস্কী খেলেন না।' দেখি, এই স্বদেশী দলের মহামান্য অতিথির জন্যে তিনি সংগ্রহ ক'রে এনেছেন এক গেলাস তাড়ি!

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

কেলো কামড়ায়

কিছুক্ষণ থেকে রাস্তায় একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু তেমন কান দিই নি। পাড়ার অনেকের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। সবার আওয়াজ ছাপিয়ে আশুদার গলা উঠছিলো। ব্যাপারটা আন্দাজ করতে দেরী হ'ল না। আশুদার সঙ্গে কোনদিনই পাড়ার কারুর সদ্ভাব নেই, কারুর না কারুর সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই আছে—আজকাল হাঙ্গামাটা যেন একটু ঘন ঘন হচ্ছে। কাজেই ওদিকে মন না দিয়ে নিজের চরকায় মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে চেঁচামেচি যেন বেড়েই চলল। পাড়ার অনুকূল, গজেন, সতু, জিতু, মিতু সবার গলা পাওয়া যেতে লাগল, আর সবার ওপরে আশুদার ক্যানক্যানে গলা সবাইকে ছাপিয়ে উঠতে লাগল।

ব্যাপার কি! মুখ বাড়িয়ে দেখি, আশুদার বাড়ীর সামনে বেশ বড় রকমের একটি ভিড় জমা হয়েছে। কাজটাজ ফেলে ছুটলুম সেখানে। হাঙ্গামা মেটানোর চাইতে কৌতূহল মেটানোর ইচ্ছাই যে প্রবলতর ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। গিয়ে দেখি, যা ভেবেছিলুম তাই, আশুদার পেয়ারের কুকুর কেলোকে নিয়ে হাঙ্গামা বেধেছে।

কেলোর একটু ইতিহাস আছে। বছর দুয়েক আগে আশুদা তাকে বাচ্চা অবস্থায় নিয়ে এসেছিলেন। তার বংশবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলে আশুদা বলতেন —আপিসের এক সায়েব দিয়েছে।

চাকরি থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে আজীবন বিশ্বস্ততার পুরস্কাররূপে বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতীক স্বরূপ এই সারমেয়র শিশুটিকে কোলে নিয়ে আশুদা যেদিন বাড়ী ফিরলেন সেদিন সে বাড়ীর শিশুমহলে খুবই সোরগোল পড়েছিল।

ভাল জাতের বিলিতি কুকুর ব'লে দিন কয়েক তার আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হয় নি। কালো রঙ বলে তক্ষুনি তার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল কেলো। কিছুদিন কোলে কোলেই কেলোর দিন কাটতে লাগলো, বাড়ীর বাইরে তাকে যেতে দেওয়া হ'ত না। তার পরে জিনিষ পুরানো হ'তে থাকলে যা হয় অর্থাৎ কেলো সমন্ধে সবাই উদাসীন হ'য়ে পড়লো। কেলোও সবার অলক্ষ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে।

বড় ঘরের ছেলে, তার ওপরে আদরে মানুষ দেখতে দেখতে কেলোর দেহ হয়ে পড়ল বিরাট, সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটিও সেই অনুপাতে হ'তে লাগল ক'ড়া। কেলো দিনরাত ঘেউ ঘেউ করে, পাড়ার ছেলেরা পেয়ে গেলো মজা, তারা কেলোকে দেখতে পেলেই দূর থেকে ই'ট মারা সুরু করলে। কেলো তার অদ্ভুত স্বপ্রতিভায় আততায়ীকে চিনে রেখে দেয় এবং সুবিধা পেলেই আঘাতের তারতম্য অনুসারে তাকে দংশন করে। ফলে, পাড়ার প্রায় সব ছেলেকেই কেলো দংশন করেছে। তাদের অঙ্গে যেমন কেলোর দংশন ক্ষতচিহ্ন বর্তমান, তেমনি কেলোও শতাধিক লোষ্ট্রনিক্ষেপচিহ্ন সর্বদাই অঙ্গে ধারণ করে থাকে। তার অঙ্গের ঘা আর শুকোয় না। অবশ্য তাতে তার তেজোবৃদ্ধি হয়ে চলেছেই দিনে দিনে।

শুধু পাড়ার নয়, বে-পাড়ার ছেলে মেয়েরাও কেলোকে চেনে। তারা স্কুলে যাবার-আসবার পথে সাবধান হ'য়ে চলে। আশুদার বাড়ীর কাছাকাছি এলেই তাদের গতি মন্থর হয়; মেয়েরা বলে—ও ভাই, কেলো আছে কিনা দেখ। কেলোকে সকলেই চেনে। কেলোর অত্যাচারে পাড়ায় ফেরিওয়ালা, বাঁদর নাচনেওয়ালা, এমনকি বিয়ের শোভাযাত্রার পর্যন্ত যাবার জো নেই। কেলো দিনের বেলায় বাড়ীতে থাকে না। বাড়ীর সামনেই রাস্তার ঠিক মাঝখানে সটান পড়ে থাকে। ঠেলাগাড়ীর চীৎকার, মোটরের ভোঁক ভোঁক কিছুতেই তার গ্রাহ্য নেই, শেষকালে তারাই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। একবার এক

রিক্সাওয়ালা কেলোর একটা পায়ের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দিয়েছিল, তাতে কেলো পাড়া ফাটিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ধরে এমন আর্তনাদ করেছিল যে, তার অতি বড় দুষমনের মনও তার প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠেছিল।

দিন দুই সে পিছনকার একটা পা লেংড়ে চলল বটে কিন্তু তার পরেই তার বিক্রম হ'য়ে উঠল তিনগুণ, কারণ পা-টা একটু সারামাত্র সে পাড়ার মধ্যে রিক্সাওয়ালা দেখলেই তাকে কামড়াতে আরম্ভ করে দিলে। শুধু পাড়ার মধ্যেই নয়, এমনকি বড় রাস্তায় রিক্সার ঠুং ঠাং আওয়াজ শুনতে পেলেও সেখানে পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকত।

পৃথিবীশুদ্ধ লোক কেলোর বিরুদ্ধে হ'লেও একা আশুদা ছিলেন তার স্বপক্ষে। সন্ধ্যেবেলা আশুদা যখন নিজের হাতে বাড়ীর রক্‌টি মুছে তাতে মাদুর পেতে বসতেন, কেলো সে সময়টা আর কোথাও থাকতে পারত না। সে-ও এসে আশুদার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ত। আর আশুদা তার ঘেয়ো গায়ে হাত বুলোতেন ও আস্তে আস্তে ছেলে ঘুম পাড়ানো ছড়া গাইতেন আর কেলো চোখ বুজে শুয়ে এই আদর উপভোগ করত।

কেলোর সঙ্গে অন্যের যে রকম সম্পর্কই থাক না কেন, আমাকে সে কখনও কিছু বলত না, বরং আমার একটু অনুগতই ছিল সে। এক সময় আমার অনেকগুলি কুকুর ছিল এবং কুক্কুরের এই জীবটির প্রতি আমার মমতাও ছিল অনন্যসাধারণ। একদিন কি একটা কাজে সন্ধ্যেবেলা আশুদার বাড়ী গিয়েছিলুম। কেলো যে সদর দরজার কাছে শুয়েছিল অতটা লক্ষ্য করি নি। আশুদা ব'লে ডাকতেই কেলো গর্জে উঠল—গর্‌র্‌র্—কামড়ায় আর কি!

আমি ভড়কে না গিয়ে বললুম—এই যে কালোবাবু; আশুদা বাড়ী আছেন? বলা মাত্র কেলো চেনা লোকের মত ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কাছে এসে একেবারে পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। সেই থেকে কেলো আমাকে দেখলেই কাছে এসে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ে। আমিও মাঝে মাঝে তাকে এক আধ পয়সার জিলিপি ঘুষ দিয়ে তার মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করি। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে, সময় বিশেষে অনেক কুকুরকেই আজকাল 'বাবু' বলতে হয় এবং বদমাইসকে ঘুষ না দিলে সংসারযাত্রা সুগম হয় না। যাক এখন কেলোর কাহিনীই হোক।

হঠাৎ দেখা গেল কেলো বাড়ীতে আহার করা ত্যাগ ক'রে রাস্তায় আস্তাকুঁড় ঘেঁটে খেতে আরম্ভ করেছে। শুধু তাই না, পাড়ায় এমনকি বেপাড়ার পর্যন্ত উৎসব বাড়ীর দরজায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে—মাঝে মাঝে

দু-তিন দিন পর্যন্ত সে জায়গা ছাড়বার নাম করে না। নিমন্ত্রিতদের ভুক্তাবশিষ্ট মৎস্য, মাংস ও দরবেশ মেরে মেরে দেহের পরিধি তার যে রকম বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে বেপাড়ার নেড়ী কুত্তাদের সঙ্গে যুদ্ধে দন্তাঘাতে ও ছেলেদের লোষ্ট্রাঘাতের চিহ্নেও সর্বাঙ্গ ভরে উঠল। কেলোকে এইভাবে আস্তাকুঁড় ঘাঁটতে দেখে একদিন আশুদাকে বললুম—অমন ভালো কুকুরটা অযত্নে খারাপ হয়ে গেল।

আশুদা হাসতে হাসতে বললেন—আরে ভাই অযত্নে নয়, ভদ্রলোকের ছেলে ছোটলোক মেরে খাওয়াই তো order of the day।

বললুম—তা ব'লে রাস্তায় আস্তাকুড় ঘেঁটে খেয়ে বেড়াবে বাড়ী থাকতে।

আশুদা বললেন—কি করবে বল, ওতো আর মানুষ নয়। রেশানে যে চাল দেয় তার ভাত কুকুরেরও অখাদ্য। যেমন তার রূপ তেমনি তার গন্ধ, রসের কথা ছেড়েই দাও। আমরা পয়সা খরচ করেও আস্তাকুড় খাই, ও বিনি পয়সায় তার চেয়ে ভাল আস্তাকুঁড় পেয়েছে বলেই বাড়ীতে খায় না। তাতে মনিবেরও দু'পয়সা বাঁচে।

সেদিন সকালে আশুদার বাড়ীর সামনে চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলুম—হৈ-হৈ ব্যাপার বেধেছে। অশোকস্তম্ভ গুহরায়, স্বাধীনতা সেন চৌধুরী, আজাদহিন্দ বক্সী, দামোদর ভ্যালি সরখেল, জহরলাল মিত্র মজুমদার প্রভৃতি পাড়ার মুরুব্বিরা খুব উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি করছেন। দেখলুম ভারতী সেনগুপ্তা, অমৃতপাক চক্রবর্তী প্রভৃতি পাড়ার মুরুব্বিনীরাও সেখানে উপস্থিত আছেন।

আমি যেতেই আশুদা চীৎকার ক'রে উঠলেন—এই যে নিরঙ্কুশ, দেখত ভাই সামান্য একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এরা কি হাঙ্গামা লাগিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি, হ'ল কি ?

দু'পক্ষই হৈ-হৈ ক'রে উঠল। পাড়ার অধিকাংশ লোকই কেলোর অর্থাৎ আশুদার বিরুদ্ধে। তাদের নালিশ হচ্ছে, কেলোর অত্যাচারে টেকা মুস্কিল হয়ে পড়েছে এবং আশুদার আস্কারা না পেলে সে কখনই এতটা বাড় বাড়তে পারত না। কিন্তু এতদিন যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, আর তারা সহ্য করবে না। এবার যা হয় একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার হয়ে যাবে।

আশুদাও কম যান না। তিনি একাই একশ'। হাত পা ছুঁড়ে গলা বাজি ক'রে তিনি জাহির করতে লাগলেন, কেলো অত্যন্ত শান্ত নিরীহ জীব, সকলে উত্যক্ত করায় স্রেফ আত্মরক্ষার্থে তাকে মাঝে মাঝে একটু অসভ্য ব্যবহার

করতে হয়। তার মত অবস্থায় পড়লে পাড়ার যে কোন লোক তার চেয়েও অনেক বেশী খারাপ ব্যবহার করত এবং বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে, হামেশা করে থাকে।

দুপক্ষের কথা শুনে সেদিনকার ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার যেটুকু ধারণা হ'ল তা এই—বিঠলভাই গুপ্তভায়া, পাড়ার সবাই তাঁকে বিটকেল ভাই ব'লে ডাকে। তাঁর দুই খলিফা ছেলে প্যান্তা আর খ্যাঁচাকে চেনে না এ মহল্লায় ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই। কেলোকে তারা বড় ভালবাসে। যেতে আসতে ঢেলাটা খোঁচাটা দিয়ে প্রায়ই তাকে আপ্যায়িত ক'রে থাকে। মাস কয়েক আগে কেলোর দংশনে খ্যাঁচাকে প্রায় দিন পনেরোর জন্য শয্যা নিতে হয়েছিল। এর পর কিছুদিন তারা কেলো সম্বন্ধে উদাসীনই ছিল, কিন্তু কয়েকদিন থেকে আবার এদের ইঁটের জ্বালায় কেলোকে দিবা-নিদ্রা একেবারে ত্যাগ করতে হয়েছে, বেচারির সর্বাঙ্গে ঘা হয়েছে দগ্‌দগে।

আজ সকাল বেলা প্যান্তা বাজার করে বাড়ী ফিরছিল। দু'হাত জোড়া, একহাতে রেশনের ঝুলি অন্য হাতে বাজারের—গানের সাথে "লারে লাপ্পা" গাইতে গাইতে বাড়ীর দিকে চলেছে এমন সময় কেলো কোথা থেকে নিঃশব্দে এসে তার পায়ের ডিমের খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। আশুদা অবিশ্যি বলছেন—ও কিছু না, একটু বড়ির মত মাংস কেটে নিয়েছে, তাতে আর হ'য়েছে কি।

বিঠলভাই চীৎকার করতে লাগলেন—নিরঙ্কুশ, তুমি ভাই বিচার কর। নিত্যি এই কুকুরের অত্যাচার সহ্য ক'রে তো আর বাঁচা যায় না।

হঠাৎ কেলো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে "ঘেউ" শব্দে এক বিরাট হুঙ্কার ছাড়ল। অর্থাৎ—খবরদার কুকুর কুকুর ক'র না বলছি। 'সারমেয়' বলতে পার না!

এই রকম দুপক্ষেই চেঁচামেচি চলছে, এমন সময় শ্রীমতী ভারতী দেবী এক প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন—দেখুন, এরকম চেঁচামেচি করলে কিছু হবে না। এখন বেলা প্রায় দশটা বাজে, সকলের কাজকর্ম আছে। তার চেয়ে সন্ধ্যাবেলা নিরঙ্কুশ বাবুর বৈঠকখানায় সব আসুন, দু'পক্ষেরই সওয়াল জবাব শুনে নিরঙ্কুশবাবু বিচার ক'রে যা বলবেন তাই হবে।

বিঠলভাই-এর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এতে রাজী আছেন?

বিঠলভাই বললেন—তা আছি। নিরঙ্কুশ ভাই ন্যায় বিচার করতে হবে।

ঠিক হ'ল সেদিন সন্ধ্যায় আমার বৈঠকখানায় পঞ্চায়েৎ বসবে। পাড়ার সব মুরুব্বিরাই আসবেন। আশুদাও ঠিক সময়ে কেলোকে নিয়ে সেখানে হাজিরা দেবেন। দশজনে পরামর্শ করে দেখা যাক কি করতে পারা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে থাকতেই আমার বৈঠকখানায় পাড়ার মুরুব্বিরা এসে জমতে লাগলেন। এই মাগ্গিগণ্ডার দিনেও চোরা বাজার থেকে কিছু চিনি কিনে এনে রেখেছিলুম। অতগুলো লোক আসবে আমার বাড়ীতে, এক কাপ করে চা অন্তত না দিলে কি চলে। যথাসময়ে আশুদাও এলেন, সঙ্গে কেলো। আশুদা আসরে এসে বসতেই কেলোও তাঁর পাশে এসে বসে পড়ল। লোকজন আসবে বলে সেদিন গদির ময়লা চাদর তুলে পরিষ্কার চাদর পেতে ছিলুম, কেলোর পদচিহ্নে বেশ খানিকটা জায়গা ময়লা হয়ে গেল। কেলোর আসাটা অনেকে পছন্দ না করে আপত্তি করলেন। কিন্তু আশুদা বললেন—এ বিষয়ে আমি বিচারকের অনুমতি চাইছি। বিচারালয়ে আসামীর উপস্থিতি প্রয়োজনীয়।

আর কেউ কিছু বললেন না। আমি আশুদাকে বললুম—তা হ'লে কেলোকে আপনি ধরে থাকবেন। এখানে যদি সে কাউকে কামড়ায় তাহলে তাকে আদালত-অবমাননার অপরাধে অপরাধী করা হবে।

সকলেই উপস্থিত, পাড়ার কয়েকজন মহিলাও এসেছেন। কয়েকটি কৌতূহলী ছেলেও জানালায় উঁকিঝুঁকি মারছে। পরিস্থিতি প্রায় আদালতের মতনই হয়ে উঠেছে, এমন সময় মহিলাদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করলেন—এবার আমাদের কাজ আরম্ভ করলেই তো হয়, আর দেরী কিসের? কদিন থেকে আমার রাঁধিবার লোকটাও আসছে না—

প্রথমে বিঠলভাই আরম্ভ করলেন—এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন এবং আশুবাবুর কুকুর দ্বারা দংশিত হয়েছেন এমন অনেকে যারা উপস্থিত নাই তাঁরা সকলে আমাকে তাঁদের মুখপাত্র ক'রে এই সভায় পাঠিয়েছেন। অবিশ্যি মহিলাদের তরফ থেকে আমার কাছে এ সম্বন্ধে কোনো অনুরোধ আসে নি।

তবুও—

শ্রীমতী চক্রবর্তী বললেন—যদি কিছু বলবার থাকে তো আমরা নিজেরাই বলব।

বিঠলভাই বললেন—বেশ। আমাদের অভিযোগ হচ্ছে যে, আশুবাবুর কুকুরের অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হয়েছি। এ সম্বন্ধে আশুবাবু কোনো ব্যবস্থা তো করেনই না, বরং তাঁর হালচাল দেখে মনে হয়, এ বিষয়ে তাঁর

প্রশ্রয় পেয়েই যেন তাঁর কুকুর দিনে দিনে অত্যাচার বাড়িয়েই চলেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—এ বিষয়ে আশুবাবুর কিছু বলার আছে ?

আশুদা বল্লেন— আমার কুকুর আপনাদের প্রতি কি রকম অত্যাচার ক'রে থাকে এবং আমি কি রকমে তাকে প্রশ্রয় দিই তা প্রকাশ না করলে আমি কিছুই বলতে পারি না।

স্বদেশজীবনকে সাবধান ক'রে দিতে হল—দেখুন ওরকম ভাষা ব্যবহার করলে প্রতিপক্ষও আপনার প্রতি অনুরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে পারে। অতএব সকলের প্রতিই আমার অনুরোধ যে, ভাষা সম্বন্ধে একটু সংযত হবেন।

আশুবাবু বললেন—আমার কুকুর কখনও যাকে-তাকে কামড়ায় না। যে তাকে বিনা কারণে মারে তাকেই সে কামড়ায়। আঘাত না পেলে কখনো সে অন্যকে দংশন করে না। পাড়ার ছেলেবুড়ো যাকে যাকে সে কিমা করেছে, তাদের প্রত্যেকেই পূর্বে কখনো-না-কখনো আঘাত করেছে।

অধমতারণ ঘোষ দস্তিদার বললেন— আপনি ইচ্ছে করলেই তাকে সামলাতে পারেন।

আশুদা জোর করে বললেন—না, সামলাতে পারি না। আজকালকার দিনে লোকে নিজের ছেলেকেই সামলাতে পারেন না তো কুকুর! এই, আপনার ছেলে শ্রীমান পতিতপাবন আপনার খায়, আপনার পরে, থাকে আপনার আশ্রয়ে, কিন্তু সে কি আপনার বাধ্য ? সেদিন যে সে বৌবাজারে বোমা মেরে ধরা পড়ল—আমি কি বলব সে কার্য আপনার প্রশ্রয় পেয়ে করেছে ?

স্বদেশজীবনবাবু বললেন—দেখুন নিরঙ্কুশবাবু আমি একটা উপায় বাতলে দিতে পারি। আশুবাবু যদি তা পারেন তা'হলে দুপক্ষেই রক্ষা পায়। আমি বলি কি কেলোর মুখে একটা Muzzle অর্থাৎ মুখবন্ধ পরিয়ে দিলে ও আর কারুকে কামড়াতে পারবে না। Muzzle-টার দাম না হয় পাড়ার সবাই চাঁদা করে তুলে দেওয়া যাবে। টাকা চার-পাঁচের মধ্যেই একটা লোহার তারের Muzzle পাওয়া যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলুম—আশুবাবু কি বলেন ?

আশুদা ঘোরতর আপত্তি করে বললেন—না তা হতে পারে না। প্রথমত কালুর (আশুদা আবার আদর ক'রে কেলোকে কালু বলেন) প্রতি অত্যাচার না করলে ও কখনো কামড়ায় না, দ্বিতীয়ত—মুখে Muzzle লাগিয়ে রাখা মানে

জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া—এ কুকুর যাকে-তাকে বিনা কারণে কামড়ায়। কালু মোটেই সে রকম নয়। যদিই বা তর্কের খাতিরে তাকে সেই জাতের কুকুর ব'লেই ধরা যায় তবুও Muzzle লাগানোটা ভদ্র উপায় নয়। কালু কুকুর ব'লেই স্বদেশজীবনবাবু তাকে Muzzle লাগাতে বলতে পারলেন। তাঁর ভাই যে গেল বছর বাসে পকেট মেরে ধরা প'ড়ে দু'মাস জেল খেটে এল—পাড়ার লোকেরা তো বলতে পারে রাস্তায় বেরুবার সময় এবার থেকে যেন তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তার সেই অবস্থা দেখলেই সকলে পকেট সামলাবে কিংবা তাকে পকেটমার ব'লে চিনতে পারবে। Muzzle লাগাতে আপত্তির তৃতীয় কারণ হচ্ছে যে, কালু রাস্তায় খেয়ে উদরপূর্তি ক'রে থাকে। সে পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে। তাতে কালুর ও আমার দুজনেরই অসুবিধা। রেশনের চাল ওর মুখে রোচে না ; রুচলেও সরকার কুকুরের জন্য রেশন দেয় না, দিলেও উনি দুটি লোকের আহার একাই ক'রে থাকেন।

শ্রীমতী অমৃতপাক বললেন—আশুবাবুর কথা সকলকেই মানতে হবে। আমাদের একটা নতুন চাকর এসেছে, সে তিনজনের ভাত একা খায়, তাতেও তার পেট ভরে না। তার জন্য আজ একমাস বাড়ীশুদ্ধ সকলে আধ পেটা খেয়ে আছি। এর একটা কিছু ব্যবস্থা হয় না। গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার—

শ্রীমতী অমৃতপাককে স্মরণ করিয়ে দিতে হ'ল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে—কেলোর অত্যাচার। আপনারা ইচ্ছা করেন তো গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের বিষয়ও এখানে আলোচিত হ'তে পারে কিন্তু এখন নয়।

আজাদহিন্দবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন—ঠিক কথা। আচ্ছা কেলোর আরেকটি অত্যাচারের কথা আমি এই সভায় উপস্থিত করছি। এ সম্বন্ধে আশুবাবু কি বলেন শুনতে চাই। কেলো রোজ সকালবেলা আমার বাড়ীর দরজার সামনেই ময়লা ত্যাগ করে প্রাতর্ভ্রমণে যায়। এর একটা বিহিত করতে অনুরোধ করি অংশুবাবুকে।

আশুবাবু বললেন—এর বিহিত করতে অনুরোধ করুন সহর পরিস্কার করবার ভার যাদের ওপর আছে তাঁদের। কেলোকে শেখানো হয়েছে ঐ কর্মগুলি রাস্তাতেই সারবার জন্য।

স্বদেশবাবু শ্লেষ করে বললেন—কি শিক্ষাই দিয়েছেন।

আশুদা হাসতে হাসতে বললেন—দেখুন স্বদেশজীবনবাবু, কেলোকে

শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—খবরদার বাড়ীতে ওসব কর্ম করবে না। সেই শিক্ষার জন্য কেলো ভুলেও কখনো বাড়ীতে ও কাজ করে না। আর আপনাকে জন্মাবধি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বাড়ীতেই ওসব কাজগুলো সারতে কিন্তু তথাপি আপনি প্রতিদিন বাড়ীতে ঢোকবার সময় আমার বাড়ীর গায়ে সেটি সেরে তবে বাড়ী ঢোকেন। এ বিষয়ে কালু আপনার চাইতে অনেক উন্নত। তার ওপরে সহররক্ষক কোম্পানি এই জন্য বৎসরান্তে তার কাছ থেকে পাঁচ টাকা খাজনা আদায় ক'রে থাকে। আপনি কত খাজনা দেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

আশুদার কথা শুনে ঘরে একটা উচ্চ হাসির রোল উঠল।

অনেকক্ষণ থেকেই দূরে একটা ঠুনঠুন আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। আওয়াজটা একটু স্পষ্ট হ'তেই কেলো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হুমকি ছাড়লে—গর্-র্-র।

হঠাৎ কেলোর এই ভাবান্তর দেখে সভাস্থ প্রায় সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। একজন মহিলা ব'লেই ফেললেন—আশুবাবু, ওকে সামলান। আমাদের কামড়াবে নাতো?

আশুবাবু কেলোর ঘেয়ো গায়ে হাত বুলাতে বুলোতে বললেন—কালু, চুপ ক'রে ব'সো।

ওদিকে ঠুনঠুন্ আওয়াজ ক্রমে স্পষ্টতর হ'তে হ'তে ঘুঙুরের আওয়াজে পরিণত হ'ল। কেলো আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। কেলোর বিরোধী পক্ষ তার এই ভাব দেখে পাশ কাটাবার বন্দোবস্ত করছে এমন সময় রাস্তায় সুরের প্রস্রবণ ছুটল— "হরি দাসের গুলগুলু ভাজা
খেতে বাবু বড়ই মজা—
টাটকা ভাজা গরম তাজা"—

ব্যস, আর কথা নয়। কেলো একটি হুঙ্কার ছেড়ে এক লাফে সভাস্থল পেরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

সভা হ'ল নিস্তব্ধ!

মিনিট দুয়েক যেতে না যেতেই বাইরে বিকট আর্তনাদ উঠল—ওরে বাবা, গেছি রে! মেরে ফেললে রে! ওরে হরিদাসের গুলগুলু ভাজারে!

সবাই মিলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম দূরে তিনকড়িদের বাড়ীর সামনে ভিড় জমেছে। তিনকড়ির গলা শুনতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি ভয়ানক কাণ্ড—কেলো এক ঘুগনি-দানাওয়ালাকে কামড়ে পালিয়েছে। লোকটার মাথায় স্ট্র-হ্যাট, চোখে কালো চশমা, একটা লাল কম্ফর্টারকে স্কার্ফ

ক'রে পরা হ'য়েছে। হাত-কাটা খাঁকি সার্ট, ধুতি পরা, দু-পায়ে মোটা করে ঘুঙুর বাঁধা। কেলো তাকে কামড়ে রক্তারক্তি করে দিয়েছে।

তিনকড়ি সন্ধ্যেবেলায় তার বৈঠকখানার চারদিক বন্ধ ক'রে নিরিবিলি ব'সে খাঁটি খাচ্ছিল এমন সময় তার শান্তিভঙ্গ ক'রে ঘুগ্নিওয়ালার বিরাট আর্তনাদ !!! সেখানে পেঁছে দেখি ঘুগ্নিওয়ালা ও তিনকড়ি সমানে চেঁচাচ্ছে। তিনকড়ি ঘুগ্নিওয়ালাকে ধ'রে বলছে—ঘুগ্নি বিক্রি করিস তো এমন অদ্ভুত সেজেছিস কেন ?

ঘুগ্নিওয়ালা বললে—তা' বলে কুকুরে কামড়াবে ?

—আলবৎ কামড়াবে। তোর এই সাজ দেখে আমারই তোকে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

ঘুগ্নিওয়ালা কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় তিনকড়ি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাকে বললে—যাও বলছি, নইলে—

এই ব'লে সে বিরাট মুখব্যাদান ক'রে ঘুগ্নিওয়ালাকে তাড়া করতেই—ওরে, বাপরে ব'লে তল্পি তুলে সে মারলে টেনে দৌড়।

সেদিনকার বিচার সভা এইখানেই শেষ হ'ল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গে সবে সকাল হইয়াছে।

কালিদাস স্বগৃহের বহির্দেশে চম্পক বৃক্ষের তলায় বসিয়া ঝিরঝিরে বাতাসে খুব মনোযোগ দিয়া পুঁথি পড়িতেছিলেন, এমন সময় অঙ্গনের ও-প্রান্ত হইতে কে বলিল—বলি কালিদাস বাড়ি আছ কি?

কালিদাস মুখ তুলিয়া দেখিলেন ভাস এদিকে আসিতেছেন। 'মেঘদূত' খানা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া কালিদাস আগাইয়া গিয়া ভাসকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন।

ভাস বৃদ্ধ ব্যক্তি, শিখা-সূত্রধারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মত তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, শ্বেতশ্মশ্রু বুকের উপর পড়িয়াছে। বেশ দীর্ঘচ্ছন্দে পদবিক্ষেপ করিয়া হাঁটিবার অভ্যাস আছে। আসিতে আসিতে বলিলেন—সকালে কি করছিলে? গাছের তলায় বসেছিলে দেখলাম।

কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আজ্ঞে বসে বসে 'মেঘদূত'খানা একবার দেখছিলাম। কাল রাত্রে যে রকম গুমোট গিয়েছে—তাতে গাছতলায় বসলে তবুও একটু—

—নাঃ, দু'চোখের পাতা কাল বুজতে পারিনি। স্বর্গ আর সে স্বর্গ নেই। ক্রমেই খারাপ হয়ে আসচে। দেবরাজ উদাসীন, একবিন্দু বৃষ্টি পড়েনি আজ দশ পনেরো দিন। তারপর তোমার কাছে একটু এলাম বাবাজী—

কালিদাস বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্যপাদ কবিকে সাদরে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন—বিশ্রাম করুন। ব্যজনী কি আনাবো ?

—থাক, দরকার হবে না। এটি চম্পক বৃক্ষ দেখচি যে।

—আজ্ঞে নন্দনকানন থেকে দেবরাজের কর্মচারীকে বলে কয়ে একটি চারা আনিয়েছিলাম। তবে এখনো পুষ্প প্রসবের সময় হয় নি।

—সে কি রকম ? বর্ষাকাল, সে সময় তো উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে নাকি ? এখন তো—

—তা নয়। এ একটু অন্য রকম। আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আপনাকে একটি চারা দিতে পারি।

—চম্পকের চারা আপাতত আবশ্যক নেই। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে অন্য একটু কারণে। আমাকে সুবন্ধু বলছিল তোমার 'মেঘদূত'-এর নাকি বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে, মর্ত্যে নাকি কোন্ প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্চে ? এই হল আমার নান্দী। এখন উত্তর দাও।

—আজ্ঞে আপনার কথা যথার্থ। সুবন্ধু আপনাকে ঠিকই বলেছে। আজ ভাবছিলাম মর্ত্যে গিয়ে দেখে আসব। দেব, আপনি সঙ্গে চলুন না।

—নিশ্চয় যাবো। সেই শুনেই তো আমি সকালেই এখানে এলাম। আজকাল মর্ত্যে আমাদের আর আদর নেই। সংস্কৃত ভাষাটাই ভারতবর্ষে সবাই ভুলে যাচ্চে। এখন সেখানে অন্য ভাষার চর্চা।

—আজ্ঞে বহু অর্বাচীন বালক কবির আজকাল সেখানে প্রাদুর্ভাব।

—তবু তো তোমার কাব্য সেখানে আদৃত হয়, পঠিত হয়। আমার 'অবিমারক'-এর কথা, 'স্বপ্ন বাসবদত্তা'র কথা ত সবাই ভুলে গিয়েচে। তোমার কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্যও তো হোলো। আমার নাটক কে পড়ে ?

—আজকাল বাঙ্ময়-আলেখ্যের যুগ চলেচে ভারতবর্ষে। আমার উজ্জয়িনীতে পর্যন্ত দুটি বাঙ্ময়-আলেখ্যের প্রেক্ষাগৃহ। এবার যদি—

এমন সময় কবি সুবন্ধু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে দেবদারু কুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় এদিকে আসিতেছেন দেখা গেল। সুবন্ধু অনেক ছোট ইঁহাদের চেয়ে—দ্বাদশ শতাব্দীর লোক কালিদাস ও ভাস তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। সুবন্ধু দীর্ঘাকৃতি লোক, তাঁরও শ্বেতশ্মশ্রু, তবে ভাসের মত

বক্ষদেশাবলম্বী নয়, হাতে একটা সরু যষ্ঠি।

ভাস বলিলেন, ওহে ছোকরা, শোন এদিকে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

সুবন্ধু ভাসের সঙ্গে অত্যন্ত সমীহ করিয়া কথাবার্তা বলেন, ভাস কালি-দাসেরও পূর্বাচার্য্য, সুবন্ধুর মত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবির পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। তবে সুবন্ধু মনে মনে এই বৃদ্ধ কবির প্রতি একটু অনুকম্পার ভাবও পোষণ করেন। হয়তো সেটা তারুণ্যের স্পর্দ্ধা।

সুবন্ধু বলিলেন—আজ্ঞে যাবো।

—এখন মর্ত্যে কোনো গোলযোগ নেই তো?

দুজনেই সুবন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন। সুবন্ধু যে ঘুর ঘুর করিয়া প্রায়ই মর্ত্যধামে যাতায়াত করেন, এ সংবাদ দুজনেই রাখেন। ভাবেন তরুণ বয়স, বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে এখনো অনেক বিলম্ব, মর্ত্যধামের শৌখিন লীলাবিলাসের বাসনা এখনও তাহার যায় নাই। সুবন্ধু লজ্জিত সুরে জবাব দিলেন—আজ্ঞে, মর্ত্যধামের গোলযোগ মিটবার নয়। ও লেগেই আছে। তবে তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

ভাস বলিলেন—সুবন্ধু এখন কি রচনা করচো?

—আজ্ঞে কিছু না। আপনাদের নাম তো মর্ত্যে এখনো যথেষ্ট। আমার নামই তো লোকে ভুলে গিয়েচে। আমার 'বাসবদত্তা' এখন আর কে পড়ে?

—আমার নাটক কে পড়ে?

—ও কথা যদি আপনি বলেন তো আমাদের আশাই নেই। আপনারা ঋষি হয়ে গিয়েচেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র।

ভাস উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—পূজ্যপাদ ভবভূতি এদিকে আসচেন দেখছি—

ভবভূতি অঙ্গনে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—আমার কি সৌভাগ্য! এখানেই যে আজ দেখচি কবি সম্মেলন।

সুবন্ধু বলিলেন—কিন্তু আমার সৌভাগ্য সকলের চেয়ে বেশী। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত কবি আজ এখানে মিলিত হয়েচেন। দেখে ধন্য হোলাম।

কালিদাস বলিলেন—আমিও সে কথা বলতে পারি।

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আপনি বলতে পারেন না।

—কেন?

—আপনি দেখচেন দুজনকে। আমি দেখচি তিন দিক্‌পালকে। আমি

বিখ্যাত কবি নই। আমাকে বাদ দিয়ে বিচার করবেন।

ভবভূতি বলিলেন—ওহে ছোকরা তুমি থাম তো। তোমাদের বিনয়ের কলহ এখন রাখো। আমি যে জন্যে এসেছি—কালিদাসকে বলি। আমার সময় কম। পিতৃব্য ভাস, আপনার কোন অসুবিধে হবে না ?

ভাস ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—স্বাচ্ছন্দে বল বাবাজী। আমার কি অসুবিধে ?

ভবভূতি কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পৃথিবীতে আমি দাম্ভিক বলে গণ্য হয়েছিলাম একটি শ্লোক লিখে, এখন দেখচি আমার সেই শ্লোক আমার কাব্যের চেয়েও খ্যাতি লাভ করেচে। এখন আমার একটা কথা। শুনলাম, দাদা, আপনার মেঘদূতের নাকি বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে পৃথিবীতে ?

—হ্যাঁ ভাই।

—আমার 'উত্তররামচরিত' খানার ওইরকম করা যায় না ? কিংবা 'মালতী মাধবে'র ? সেইজন্যই আপনার কাছে এলাম আজ।

কালিদাস কিছু উত্তর দিবার পূর্বেই সুবন্ধু বলিলেন—ও ক'রে দেবো দাদা। সুধাংশু রায় নিপুণ বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণকারক। সে স্বর্গে এসেচে কিছুদিন হোল, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। আমার 'বাসবদত্তা' কাব্যখানার জন্যে তাকে বলেছিলাম—

ভবভূতি অধীরকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছা, তার দেহ হাওয়া হয়ে রয়েচে—মর্ত্যধামে তার কিছু করবার ক্ষমতা আছে আজকাল ? বড় অসার কথা বলে ছোকরা।

—আজ্ঞে, আমার কথা প্রণিধান করুন। আমার সঙ্গে ছিল সোঢ়ল—

—সে আবার কে ?

—আজ্ঞে আপনারা সফরী মৎস্যের খবর কি রাখবেন ? আমরা হোলাম কাব্য-সমুদ্রের সফরী—আপনারা অগাধ জলসঞ্চারী রুই কাত্‌লা—সোঢ়ল কবি ধরেচে তার কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে—

—কি কাব্য ?

—আজ্ঞে উদয় সুন্দরী-কথা নামে চম্পু কাব্য—খুব নামকরা কাব্য—তবে কি আপনার কিংবা পিতৃব্য ভাসের—কিংবা কালিদাস দাদার—

—থাক আমার কথা বাদ দাও—ও'দের কথা বলতে পারো। সারা পৃথিবীতে মেঘদূতের নাম ব্যাপ্ত হয়েচে, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ পড়ে একজন ম্লেচ্ছ কবি—

ভাস বলিলেন—বাদ ওই সঙ্গে আমার নামটাও দাও। একমাত্র স্নেহভাজন কালিদাসের নাম এখনো পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে। হ্যাঁ, তুমি যে ম্লেচ্ছ কবির উল্লেখ করলে, আমিও রাখি সে সংবাদ—তার নাম—ম্লেচ্ছ নাম বড় দুরুচ্চার্য—তার নাম—

কালিদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন—গয়থী। ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করে মাঝে মাঝে। আমার নাটক তার নাকি ভাল লেগেছে। যাক সে সব কথা! আজ মর্ত্যধামে আমরা যাচ্চি মেঘদূতের আলেখ্য-দর্শনে। ভবভূতি তুমিও চলো, আমরা বড় আনন্দ পাবো। তোমার শিক্ষা মর্ত্যে অমর হয়ে আছে, অযথা বিনয় কেন? আলেখ্য-দর্শনের বীজ তুমিই বপন করেছিলে তোমার অমর নাটকে। তোমার সমানধর্মা লোকেরা তোমাকে এখন চিনেচে। ঠিকই বলেছিলে, কাল নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুলা। ধন্য তুমি।

কথা শেষ করিয়া কালিদাস ভবভূতিকে সাদর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন।

মর্ত্যধামে রাত্রিকাল উপস্থিত হইবার পূর্বেই এই দলটি যাত্রা করিলেন কবিকুঞ্জ হইতে। পথে বাণভট্টের সঙ্গে দেখা। এতগুলি কবিকে এক সঙ্গে দেখিয়া বাণভট্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—উপাধ্যায়গণ, আপনারা কোথায় চলেচেন? একসঙ্গে এতগুলি জ্যোতিষ্ক? এই যে সুবন্ধুও—ব্যাপার কি?

ভাস প্রবীণতম এবং এই দলের অধিনায়ক। তিনি বলিলেন—আমরা যাচ্চি কালিদাসের মেঘদূতের বাঙময়-আলেখ্য দর্শনে, মর্ত্যে—তোমারও তো—

বাণভট্টের পরিধানে মহার্ঘ পীতবর্ণের পট্টবাস, মাথার চুল সাদা হইলেও কুঞ্চিত, পারিপাট্যযুক্ত ও দীর্ঘ। তাঁহার হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ, দুই কর্ণে কর্ণিকা পুষ্পের গুঞ্জিকা, বেশ শৌখীন ধরনের লোকটি। ভাসের কথায় তাঁহার বিস্ময় যেন আরও বাড়িয়া গেল। শুধু বলিলেন—ও।

কালিদাস সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন বাণভট্টকে।

এতক্ষণে বাণভট্ট যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—না না, আমাকে ক্ষমা করবেন। তাতঃপাদ ভাসও চলেচেন দেখচি। এসব সুবন্ধুর ক্রিয়াকলাপ আমি জানি। যখন তখন মর্ত্যধামে ঘুর ঘুর ক'রে যাওয়ার ফল আর কি। আজকাল কি অতিরিক্ত আসব পান ক'রে থাকো সুবন্ধু?

সুবন্ধু অপ্রতিভের সুরে উত্তর দিলেন—না দাদা।

—সেদিনও তো দেখলাম বাঙময়-আলেখ্য প্রেক্ষাগৃহে—?

—আজ্ঞে না আপনার ভ্রম হয়েচে! ও আসব নয়, একপ্রকার বৃক্ষপত্রের

ক্বাথ, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে পান করা হয়। একটু আস্বাদ ক'রে দেখছিলাম —মর্ত্যে সবাই খায়—

—মর্ত্যবাসীদের অলীক ব্যসন তোমাকে পেয়ে বসচে ক্রমে ক্রমে। আর একটি হচ্চে এই বাঙ্ময়-আলেখ্য। মর্ত্যে এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। সেদিন এই সুবন্ধুর পরামর্শে ওর সঙ্গে আমার 'কাদম্বরী'র বাঙ্ময়-আলেখ্য দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে এসেছি—

ভাস সাগ্রহে বলিলেন—কেন ? কেন ?

—আচার্য ভাস, আপনি প্রবীণ ও প্রাচীন, আপনাকে সেই রকম ভক্তি করি, আপনার সামনে আর সে সব কথা বলতে চাই নে। আর কথায় কথায় গীত ! নাঃ, আমি তো দুঃখে আক্ষেপে চলে এলাম—সুবন্ধু সব জানে, আবার আপনাদের আজ নিয়ে যাচ্চে—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, আমি নিয়ে যাই নি দাদা। কালিদাস দাদাই বল্লেন উনিই আমাকে নিয়ে যাচ্চেন। বরং আপনি ওঁদের জিজ্ঞেস করুন—

কালিদাস বলিলেন—সে ঠিক। সুবন্ধু জানতো না। আমিই ওকে যেতে বলেচি। দেখেই আসি কেমন হোলো মেঘদূত। চল্লাম ভায়া বাণভট্ট—

রাত্রিকাল। কলিকাতা 'প্রদীপ' সিনেমাতে 'মেঘদূত' হইতেছে। ভীড় খুব। ডিমভাজা ও ঘুঘনি, চানাচুর, বাদামভাজা, আলু-কাবলীওয়ালাদের পাশ কাটাইয়া কবিদল সিনেমা হলে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ছবি আরম্ভ হইল। ছবি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কালিদাস বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—একি ? এ কার মেঘদূত ? আমার তো নয়—

ভাস বলিলেন—তাইতো। আমিও তাই ভাবচি।

ভবভূতি বলিলেন—শুধু নামটাই নিয়েচে।

কালিদাস ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন—এখানে বসে দেখে কি করবো। বাণভট্ট ঠিক বলেছিল। চলুন আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

বাহিরে আসিয়া কালিদাস বলিলেন—ওহে সুবন্ধু, তুমি সেই বৃক্ষপত্রের ক্বাথ সেবন করবে নাকি ?

—আজ্ঞে না চলুন। ও অভ্যেস নেই আমার, দৈবাৎ সেদিন একটু আস্বাদ করেছিলাম মাত্র।

এমন সময় দুটি ছোকরা যাইতে যাইতে একজন আর একজনকে বলিতেছে শোনা গেল—'মেঘদূত' কার লেখা বই হে ?

অপর ছোকরা জবাব দিল—অতীন ঘোষের।

—'ভাবীকাল' ?

—তা জানি নে। বই উঠেচে জানিস ?

—কাল একখানা 'মেঘদূত' আর একখানা 'ভাবীকাল' খুঁজে দেখতে হবে পাওয়া যায় কিনা।

কালিদাস পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঠিক পিছনে ছোকরা দুটি। রাগে ও ক্ষোভে কালিদাস কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। ছবি দেখিয়াও এত রাগ তাঁহার হয় নাই। ভাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—শুনেচেন এ অর্বাচীন বালক দুটি কি বলচে ? অতীন ঘোষ নামক কোনো ব্যক্তির লেখা এই বই। বাঙ্ময়-আলেখ্যই প্রধান জিনিস, লেখকের নামটা জানবার আবশ্যক কি ?

সুবন্ধু বলিলেন, এই বাঙ্ময়-আলেখ্যের নির্মাণকার হোলো অতীন ঘোষ নামক কোন লোক। ওরা অত কৌতূহলী নয় গ্রন্থকর্তা সম্বন্ধে। আলেখ্য নিয়ে আসল কথা। অতীন ঘোষকেই ভেবেচে গ্রন্থকর্তা। মহাস্থবির অশ্বঘোষের নাম করলেও কলিদাস দাদার মানটা থাকতো। তা নয়, অতীন ঘোষ।

সুবন্ধু হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস রাগের সুরে বলিলেন—অত হাস্য কিসের ? বৃক্ষপত্রের ক্বাথ পান না করেই এই। চলো এখান থেকে যাই।

—বৃক্ষপত্রের ক্বাথে বিহ্বলতা আসে না দাদা, এ আসব নয়। আপনি আস্বাদ ক'রে দেখতে পারেন।

ফিরিবার পথে ভবভূতি বলিলেন—না হে সুবন্ধু, তোমার সেই সুধাংশু রায়কে আর কোন কথা বোলো না, আমার 'উত্তররামচরিতে'র বাঙ্ময়-আলেখ্যে কোন প্রয়োজন নেই—

ভাস বলিলেন—আমারও 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' সম্বন্ধে ওই কথা—বাণভট্ট ছোকরা যথার্থ কথাই বলেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে—

কলিদাস বলিলেন—সুবন্ধু কিন্তু ওর 'বাসবদত্তা'র ঠিক আলেখ্য করাবে আপনি দেখে নেবেন—ও এখনো আসক্তি পরিত্যাগ করে নি—সেই সুধাংশু রায়কেও ধরবে ঠিক—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—যা বলেন দাদা। আপনারা হোলেন প্রথিতযশা কবি, আপনাদের কথা আলাদা—নাম যা হবার আপনাদের হয়েই গিয়েচে।—আপনাদের কি ?

ইহাদের অপেক্ষাও বিস্ময়কর ঘটনা সেদিন কালিদাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কালিদাস ভাসকে সঙ্গে লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চম্পক বৃক্ষের বেদীমূলে বসিয়া আছেন। ব্যাসদেব প্রবীণতম ও প্রাচীনতম কবি, তিনি কখনো আসেন না। শুধু কবি নহেন, দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়াও তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যাসদেবের আকৃতি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায়, পরিধানে কষায় বস্ত্র, মস্তকে শুভ্র কেশভার, গম্ভীর ও সৌম্য মুখভাব। উভয়ে সসম্ভ্রমে ব্যাসদেবের পাদ-বন্দনা করিলেন। কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আমার গৃহ পবিত্র হোলো আপনার চরণস্পর্শে। আমার প্রতি কি আদেশ, তাতঃপাদ?

ব্যাসদেব আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমার মঙ্গল হোক। কালিদাস, তোমার কুশল? ভাস, তুমি ভাল আছ? বোস, বোস। কোথায় গিয়েছিলে? মর্ত্যধামে? ভবভূতিও সঙ্গে ছিল? ছোকরা ভাল লেখে। সেখানে কেন?

কালিদাস কারণ বলিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন—আমিও ঐ কারণেই এসেছিলাম, গীতার একটি বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণ করিয়ে দিতে পারো? অবশ্য আমি প্রচারের দিক দিয়েই বলচি। তত্ত্ব-প্রচারের সুবিধে হবে। তোমরা তো আজকালকার ছেলে, মর্ত্যের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, আমার তা নেই। ভাস কি বলো?

ভাস বলিলেন—অনুমতি যদি করেন তো বলি, ও সব কলঙ্ককারী ব্যাপারের মধ্যে আপনি যাবেন না। বলো না হে কালিদাস সব খুলে ঘটনাটা?

পরে ব্যাসদেব সব শুনিয়া নীরব রহিলেন।

ভাস বলিলেন—এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন। আপনাকে আমি কি বলবো?

ব্যাসদেব বলিলেন—তোমার যে কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে, তার নামটি কি বল্লে? মেঘদূত? কি অবলম্বনে লেখা? কাব্যের ঘটনাটি কি?

কালিদাস লজ্জিত সুরে বলিলেন—সে আর আপনার শোনার প্রয়োজন নেই তাতঃপাদ। সে কিছু না। ওই একটা দেশবিদেশের বর্ণনার মত। আমাদের কথা বাদ দিন। আপনি এবেলা আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য ক'রে যান।

ব্যাসদেব থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার কাছে যাইতে হইবে। বেদ সম্বন্ধে কি আলোচনা আছে। অন্য সময়ে চেষ্টা করিবেন। এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

ব্যাসদেব বিদায় লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ভাস কালিদাসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বোঝো ব্যাপার!

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কুইন অ্যান

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট উডবার্ণ সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইতেছেন, আসবাবপত্র বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। দুইটা কুকুর সঙ্গে যাইবে, গোটা-চারেক বিলি হইয়া গিয়াছে। বাকি আছে একটি ঘুড়ী। সাহেব ওটাকে প্রথম হইতে ওয়েলার জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া বড় ভুল করিয়া বসিয়া আছেন। প্রবল খিলাফৎ আন্দোলনের যুগ ; যাহাদের কিনিবার ক্ষমতা আছে, বলিতেছে, আরেবিয়ান জাতের হইলে কেনা যাইত। দুই-একজন নন-খিলাফতিস্ট রাজী হইয়াছে, কিন্তু দর উঠিতেছে না। তাহা ছাড়া সাহেবের কানে উঠিয়াছে, ইহারা নিজেরা ব্যবহার করিবে না, তিনি যাত্রা করিলেই জাত ভাঁড়াইয়া ঘুড়ীটাকে প্রাচ্য করিয়া লইবে, তাহার পর চড়া দামে ছাড়িয়া দিবে।

এদিকে সময় আর মাত্র দিন-পনেরো-ষোল ; মীমাংসা একটা হওয়া চাই-ই। অথচ সাহেবের ইচ্ছা নয় যে, ঘুড়ীটা যাহার-তাহার হাতে পড়িয়া কষ্ট পায়, একাদিক্রমে দশটা বৎসর একসঙ্গে আদর-যত্নে কাটাইল। কি যে করিবেন, ব্যাকুল ভাবে চিন্তা করিতে করিতে একদিন হঠাৎ রায়সাহেবের কথা মনে পড়িয়া গেল। রায় সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্তী জমিদার অ্যান্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট।

তাঁহার হাতের দেওয়া খেতাব, লোকটা খাতির রাখিলেও রাখিতে পারে। সাহেব ভাবিলেন, দেখাই যাক্ না; ভেজে কিনা ঘড়ীটা তাহা হইলে সুখে থাকে।

রায়সাহেবকে সেলাম পাঠানো হইল। উপস্থিত হইলে অবান্তর নানা রকম কথার পর আসল কথাটা পাড়িলেন। দেখা গেল, ভিজিয়া থাকাটাই রায়-সাহেবদের স্বাভাবিক অবস্থা, বেশি সিঞ্চিত করিতে হইল না। সাহেব যে অন্যের হাতে প্রিয় ঘড়ীটাকে বিশ্বাস করিয়া দিতে চান না, আর এতগুলো হোমরা-চোমরাদের মধ্যে তিনিই যে সাহেবের বিশ্বাসভাজন বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন, ইহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সাহেবের যখন সেই রকমই অভিরুচি, তখন তিনি উপহার হিসাবেই সেটিকে লইতে রাজী আছেন, গৌরবের সহিত রাজী আছেন। তবে দাম হিসাবে নয়, শুধু বিলাতে গিয়া তিনি যাহাতে ওই রকমই একটি ঘড়ী অবিলম্বে কিনিয়া লন, সেজন্য অল্পস্বল্প করিয়া অন্তত পক্ষে হাজার খানেক টাকাও অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রায়সাহেবোচিত বিনয়ের সহিত একটু তর্কও করিতে ছাড়িলেন না, "তা যদি না করেন সাহেব তো হুজুরের দান দেখে অধীন না হয় সর্বদা হুজুরকে স্মরণ করবে, কিন্তু অধীনকে মনে করার হুজুরের কাছে কি থাকবে? না, সে হবে না।"

উঠিবার সময় রায়সাহেবও আসল কথাটা পাড়িলেন, "বার্থ-ডে অনার্সের সময়টা আসছে, হুজুর যাচ্ছেন, আশেপাশেই ক-বছরের মধ্যে পাঁচ-ছটা রায়-সাহেব হয়ে গেল, ছ্যাকড়া-গাড়ির মতো বেড়ে যাচ্ছে, কমপক্ষে 'রায়বাহাদুর'টা না পেলে আর মান থাকছে না! লোকে গালাগাল দেওয়ার জন্যে আজকাল কথাটা ব্যবহার করছে।"

সাহেব কথা দিলেন, আগন্তুক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফর্দ দিবার সময় তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন। উঠিবার সময় করমর্দন করিয়া বলিলেন, "আমার মস্ত বড় একটা সান্ত্বনা রইল যে, ঘড়ীটা একজন সমঝদার আর হুঁশিয়ার ঘোড়সওয়ারের হাতে পড়ল। শুনলাম, এ তল্লাটে নাকি এ-বিষয়ে আপনার সমকক্ষ আর নেই কেউ।"

রায়সাহেব নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না, তেমন কিছু নয়, তবে ঘোড়া জিনিসটা ছেলেবেলা থেকে চড়ার অভ্যাস আছে এই যা।"

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, তবে পনরো আনা বাড়াইয়া বলা। বয়স যখন চৌদ্দ কি পনরো হইবে, রায়সাহেব ফটো তুলিবার জন্য শখ করিয়া একবার

একটা টাট্টুতে চড়িয়াছিলেন, একটা মারাঠী ব্যবসাদার বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল। চড়ার পরমুহূর্ত হইতে ঘোড়াটা বনবন করিয়া অল্প পরিসরের মধ্যে এরকম ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া দেয় যে, প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত ঘাড়ের চুল আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল ; সবে নূতন পৈতা হইয়াছে, গায়ত্রীর উপর খুব বিশ্বাস, এক হাতে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ,' আর এক হাতে ঘোড়ার ঘাড়ের রোমরাশি।

পরে জানা গেল, সেটি সার্কাসের ঘোড়া। সেই যে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকিয়া গেল রায়সাহেবের মনে, সেই হইতেই ও-জানোয়ারটি সম্বন্ধে চাণক্যের উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিয়াছেন। সার্কাসের ঘোড়া বা বাহিরের ঘোড়া বাছেন না, ভাবেন, রেসের ঘোড়া হইলেই বিপদ কম হইত নাকি ? সে বরং আরও বড় করিয়া চক্কর মারিত।

কিন্তু রায়সাহেবীর মোহ, উপায় কি ?

তাহা ছাড়া, আরও একটু কথা আছে। নিশ্চিন্ত জীবনের সব চেয়ে যাহা বড় চিন্তা, কিছুদিন হইতে তিনি তন্দ্বারা নির্মমভাবে আক্রান্ত। পরিবর্ধমান ভুঁড়ি তাঁহাকে হিমসিম খাওয়াইয়া ছাড়িতেছে। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন, এর দাওয়াই বেড়ানো ; সেটা উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ওরা রব তুলিয়াছিল, "তাহা হইলে ঘোড়ায় চড়ুন।" বিশ্রী রকম গরম পড়িয়া কষ্ট বাড়িয়াছে। দোমনা হইয়া কয়েকদিন হইতে ভাবিতেছিলেন, মন্দ কি, একটা তেমন শান্তশিষ্ট, প্রভুভক্ত, বিশ্বাসপরায়ণ, বাধ্য, ভব্যসভ্য, নিরীহ, গোবেচারী গোছের ঘোড়া যদি পাওয়া যাইত !

এই সময়টায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তলব করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যেদিন চলিয়া গেলেন, সেইদিন বৈকালে সাহেবের সহিত আমির হোসেন ঘুড়ীটাকে আনিয়া হাজিরা করিল। হ্যাঁ, একটা জিনিস বটে। দীর্ঘ নিটোল শরীর, উন্নত বর্তুল গ্রীবা, বিশাল চক্ষু দুইটি প্রাণের দীপ্তিতে ভরা, এক মুহূর্ত সুস্থির নয়—চনমন চনমন করিতেছে, ক্ষুরের আওয়াজে আর সাজের মশমশানিতে জায়গাটা যেন জাগিয়া উঠিল। আমির হোসেন জানাইল, ঘুড়ীর নাম—কুইন অ্যান।

পারিষদেরা বলিল, "হ্যাঁ, হুজুরের যুগ্যি ঘুড়ী বটে। গা নয় তো কাচ—মাছি বসলে পিচলে পড়বে।"

অতি মসৃণ গা-টার দিকে চাহিয়া রায়সাহেব শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, হুঁ, তবে আমি তাড়াতাড়ি ওকে কিছু বলছি না। খাক-দাক জিরুক কদিন।

জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া—এ কুকুর যাকে-তাকে বিনা কারণে কামড়ায়। কালু মোটেই সে রকম নয়। যদিই বা তর্কের খাতিরে তাকে সেই জাতের কুকুর ব'লেই ধরা যায় তবুও Muzzle লাগানোটা ভদ্র উপায় নয়। কালু কুকুর ব'লেই স্বদেশজীবনবাবু তাকে Muzzle লাগাতে বলতে পারলেন। তাঁর ভাই যে গেল বছর বাসে পকেট মেরে ধরা প'ড়ে দু'মাস জেল খেটে এল—পাড়ার লোকেরা তো বলতে পারে রাস্তায় বেরুবার সময় এবার থেকে যেন তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তার সেই অবস্থা দেখলেই সকলে পকেট সামলাবে কিংবা তাকে পকেটমার ব'লে চিনতে পারবে। Muzzle লাগাতে আপত্তির তৃতীয় কারণ হচ্ছে যে, কালু রাস্তার খেয়ে উদরপূর্তি ক'রে থাকে। সে পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে। তাতে কালুর ও আমার দুজনেরই অসুবিধা। রেশনের চাল ওর মুখে রোচে না; রুচলেও সরকার কুকুরের জন্য রেশন দেয় না, দিলেও উনি দুটি লোকের আহার একাই ক'রে থাকেন।

শ্রীমতী অমৃতপাক বললেন—আশুবাবুর কথা সকলকেই মানতে হবে। আমাদের একটা নতুন চাকর এসেছে, সে তিনজনের ভাত একা খায়, তাতেও তার পেট ভরে না। তার জন্য আজ একমাস বাড়ীশুদ্ধ সকলে আধ পেটা খেয়ে আছি। এর একটা কিছু ব্যবস্থা হয় না। গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার—

শ্রীমতী অমৃতপাককে স্মরণ করিয়ে দিতে হ'ল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে—কেলোর অত্যাচার। আপনারা ইচ্ছা করেন তো গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের বিষয়ও এখানে আলোচিত হ'তে পারে কিন্তু এখন নয়।

আজাদহিন্দবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন—ঠিক কথা। আচ্ছা কেলোর আরেকটি অত্যাচারের কথা আমি এই সভায় উপস্থিত করছি। এ সম্বন্ধে আশুবাবু কি বলেন শুনতে চাই। কেলো রোজ সকালবেলা আমার বাড়ীর দরজার সামনেই ময়লা ত্যাগ করে প্রাতর্ভ্রমণে যায়। এর একটা বিহিত করতে অনুরোধ করি অংশুবাবুকে।

আশুবাবু বললেন—এর বিহিত করতে অনুরোধ করুন সহর পরিষ্কার করবার ভার যাদের ওপর আছে তাঁদের। কেলোকে শেখানো হয়েছে ঐ কর্মগুলি রাস্তাতেই সারবার জন্য।

স্বদেশবাবু শ্লেষ করে বললেন—কি শিক্ষাই দিয়েছেন।

আশুদা হাসতে হাসতে বললেন—দেখুন স্বদেশজীবনবাবু, কেলোকে

শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—খবরদার বাড়ীতে ওসব কর্ম করবে না। সেই শিক্ষার জন্য কেলো ভুলেও কখনো বাড়ীতে ও কাজ করে না। আর আপনাকে জন্মাবধি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বাড়ীতেই ওসব কাজগুলো সারতে কিন্তু তথাপি আপনি প্রতিদিন বাড়ীতে ঢোকবার সময় আমার বাড়ীর গায়ে সেটি সেরে তবে বাড়ী ঢোকেন। এ বিষয়ে কালু আপনার চাইতে অনেক উন্নত। তার ওপরে সহররক্ষক কোম্পানি এই জন্য বৎসরান্তে তার কাছ থেকে পাঁচ টাকা খাজনা আদায় ক'রে থাকে। আপনি কত খাজনা দেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

আশুদার কথা শুনে ঘরে একটা উচ্চ হাসির রোল উঠল।

অনেকক্ষণ থেকেই দূরে একটা ঠুনঠুন আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। আওয়াজটা একটু স্পষ্ট হ'তেই কেলো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হুমকি ছাড়লে—গর্-র্-র।

হঠাৎ কেলোর এই ভাবান্তর দেখে সভাস্থ প্রায় সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। একজন মহিলা ব'লেই ফেললেন—আশুবাবু, ওকে সামলান। আমাদের কামড়াবে নাতো?

আশুবাবু কেলোর ঘেয়ো গায়ে হাত বুলাতে বুলোতে বললেন—কালু, চুপ ক'রে ব'সো।

ওদিকে ঠুনঠুন্ আওয়াজ ক্রমে স্পষ্টতর হ'তে হ'তে ঘুঙুরের আওয়াজে পরিণত হ'ল। কেলো আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। কেলোর বিরোধী পক্ষ তার এই ভাব দেখে পাশ কাটাবার বন্দোবস্ত করছে এমন সময় রাস্তায় সুরের প্রস্রবণ ছুটল—

"হরি দাসের গুলগুলু ভাজা
খেতে বাবু বড়ই মজা—
টাটকা ভাজা গরম তাজা"—

ব্যস, আর কথা নয়। কেলো একটি হুঙ্কার ছেড়ে এক লাফে সভাস্থল পেরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

সভা হ'ল নিস্তব্ধ!

মিনিট দুয়েক যেতে না যেতেই বাইরে বিকট আর্তনাদ উঠল—ওরে বাবা, গেছি রে! মেরে ফেললে রে! ওরে হরিদাসের গুলগুলু ভাজারে!

সবাই মিলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম দূরে তিনকড়িদের বাড়ীর সামনে ভিড় জমেছে। তিনকড়ির গলা শুনতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি ভয়ানক কাণ্ড—কেলো এক ঘুগনি-দানাওয়ালাকে কামড়ে পালিয়েছে। লোকটার মাথায় খড়-হ্যাট, চোখে কালো চশমা, একটা লাল কম্ফর্টারকে স্কার্ফ

ক'রে পরা হ'য়েছে। হাত-কাটা খাঁকি সার্ট, ধুতি পরা, দু-পায়ে মোটা করে ঘুঙুর বাঁধা। কেলো তাকে কামড়ে রক্তারক্তি করে দিয়েছে।

তিনকড়ি সন্ধ্যেবেলায় তার বৈঠকখানার চারদিক বন্ধ ক'রে নিরিবিলি ব'সে খাঁটি খাচ্ছিল এমন সময় তার শান্তিভঙ্গ ক'রে ঘুগ্‌নিওয়ালার বিরাট আর্তনাদ !!! সেখানে পে'ছৈ দেখি ঘুগ্‌নিওয়ালা ও তিনকড়ি সমানে চেঁচাচ্ছে। তিনকড়ি ঘুগ্‌নিওয়ালাকে ধ'রে বলছে—ঘুগ্‌নি বিক্রি করিস তো এমন অদ্ভুত সেজেছিস কেন ?

ঘুগ্‌নিওয়ালা বললে—তা' বলে কুকুরে কামড়াবে ?

—আলবৎ কামড়াবে। তোর এই সাজ দেখে আমারই তোকে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

ঘুগ্‌নিওয়ালা কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় তিনকড়ি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাকে বললে—যাও বলছি, নইলে—

এই ব'লে সে বিরাট মুখব্যাদান ক'রে ঘুগ্‌নিওয়ালাকে তাড়া করতেই—ওরে, বাপরে ব'লে তল্পি তুলে সে মারলে টেনে দৌড়।

সেদিনকার বিচার সভা এইখানেই শেষ হ'ল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গে সবে সকাল হইয়াছে।

কালিদাস স্বগৃহের বহির্দেশে চম্পক বৃক্ষের তলায় বসিয়া ঝিরঝিরে বাতাসে খুব মনোযোগ দিয়া পুঁথি পড়িতেছিলেন, এমন সময় অঙ্গনের ও-প্রান্ত হইতে কে বলিল—বলি কালিদাস বাড়ি আছ কি ?

কালিদাস মুখ তুলিয়া দেখিলেন ভাস এদিকে আসিতেছেন। 'মেঘদূত' খানা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া কালিদাস আগাইয়া গিয়া ভাসকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন।

ভাস বৃদ্ধ ব্যক্তি, শিখা-সূত্রধারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মত তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, শ্বেতশ্মশ্রু বুকের উপর পড়িয়াছে। বেশ দীর্ঘচ্ছন্দে পদবিক্ষেপ করিয়া হাঁটিবার অভ্যাস আছে। আসিতে আসিতে বলিলেন—সকালে কি করছিলে ? গাছের তলায় বসেছিলে দেখলাম।

কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আজ্ঞে বসে বসে 'মেঘদূত'খানা একবার দেখছিলাম। কাল রাত্রে যে রকম গুমোট গিয়েছে—তাতে গাছতলায় বসলে তবুও একটু—

—নাঃ, দু'চোখের পাতা কাল বুজতে পারিনি। স্বর্গ আর সে স্বর্গ নেই। ক্রমেই খারাপ হয়ে আসচে। দেবরাজ উদাসীন, একবিন্দু বৃষ্টি পড়েনি আজ দশ পনেরো দিন। তারপর তোমার কাছে একটু এলাম বাবাজী—

কালিদাস বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্যপাদ কবিকে সাদরে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন—বিশ্রাম করুন। ব্যজনী কি আনাবো ?

—থাক, দরকার হবে না। এটি চম্পক বৃক্ষ দেখচি যে।

—আজ্ঞে নন্দনকানন থেকে দেবরাজের কর্মচারীকে বলে কয়ে একটি চারা আনিয়েছিলাম। তবে এখনো পুষ্প প্রসবের সময় হয় নি।

—সে কি রকম ? বর্ষাকাল, সে সময় তো উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে নাকি ? এখন তো—

—তা নয়। এ একটু অন্য রকম। আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আপনাকে একটি চারা দিতে পারি।

—চম্পকের চারা আপাতত আবশ্যক নেই। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে অন্য একটু কারণে। আমাকে সুবন্ধু বলছিল তোমার 'মেঘদূত'-এর নাকি বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে, মর্ত্যে নাকি কোন্ প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্চে ? এই হল আমার নান্দী। এখন উত্তর দাও।

—আজ্ঞে আপনার কথা যথার্থ। সুবন্ধু আপনাকে ঠিকই বলেছে। আজ ভাবছিলাম মর্ত্যে গিয়ে দেখে আসব। দেব, আপনি সঙ্গে চলুন না।

—নিশ্চয় যাবো। সেই শুনেই তো আমি সকালেই এখানে এলাম। আজকাল মর্ত্যে আমাদের আর আদর নেই। সংস্কৃত ভাষাটাই ভারতবর্ষে সবাই ভুলে যাচ্চে। এখন সেখানে অন্য ভাষার চর্চা।

—আজ্ঞে বহু অর্বাচীন বালক কবির আজকাল সেখানে প্রাদুর্ভাব।

—তবু তো তোমার কাব্য সেখানে আদৃত হয়, পঠিত হয়। আমার 'অবিমারক'-এর কথা, 'স্বপ্ন বাসবদত্তা'র কথা ত সবাই ভুলে গিয়েচে। তোমার কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্যও তো হোলো। আমার নাটক কে পড়ে ?

—আজকাল বাঙ্ময়-আলেখ্যের যুগ চলেচে ভারতবর্ষে। আমার উজ্জয়িনীতে পর্যন্ত দুটি বাঙ্ময়-আলেখ্যের প্রেক্ষাগৃহ। এবার যদি—

এমন সময় কবি সুবন্ধু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে দেবদারু কুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় এদিকে আসিতেছেন দেখা গেল। সুবন্ধু অনেক ছোট ইঁহাদের চেয়ে—দ্বাদশ শতাব্দীর লোক কালিদাস ও ভাস তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। সুবন্ধু দীর্ঘাকৃতি লোক, তাঁরও শ্বেতশ্মশ্রু, তবে ভাসের মত

বক্ষদেশাবলম্বী নয়, হাতে একটা সরু যষ্ঠি।

ভাস বলিলেন, ওহে ছোকরা, শোন এদিকে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

সুবন্ধু ভাসের সঙ্গে অত্যন্ত সমীহ করিয়া কথাবার্তা বলেন, ভাস কালিদাসেরও পূর্বাচার্য্য, সুবন্ধুর মত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবির পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। তবে সুবন্ধু মনে মনে এই বৃদ্ধ কবির প্রতি একটু অনুকম্পার ভাবও পোষণ করেন। হয়তো সেটা তারুণ্যের স্পর্দ্ধা।

সুবন্ধু বলিলেন—আজ্ঞে যাবো।

—এখন মর্ত্ত্যে কোনো গোলযোগ নেই তো?

দুজনেই সুবন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন। সুবন্ধু যে ঘুর ঘুর করিয়া প্রায়ই মর্ত্যধামে যাতায়াত করেন, এ সংবাদ দুজনেই রাখেন। ভাবেন তরুণ বয়স, বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে এখনো অনেক বিলম্ব, মর্ত্যধামের শৌখিন লীলাবিলাসের বাসনা এখনও তাহার যায় নাই। সুবন্ধু লজ্জিত সুরে জবাব দিলেন—আজ্ঞে, মর্ত্যধামের গোলযোগ মিটবার নয়। ও লেগেই আছে। তবে তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

ভাস বলিলেন—সুবন্ধু এখন কি রচনা করচো?

—আজ্ঞে কিছু না। আপনাদের নাম তো মর্ত্ত্যে এখনো যথেষ্ট। আমার নামই তো লোকে ভুলে গিয়েচে। আমার 'বাসবদত্তা' এখন আর কে পড়ে?

—আমার নাটক কে পড়ে?

—ও কথা যদি আপনি বলেন তো আমাদের আশাই নেই। আপনারা ঋষি হয়ে গিয়েচেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র।

ভাস উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—পূজ্যপাদ ভবভূতি এদিকে আসচেন দেখছি—

ভবভূতি অঙ্গনে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—আমার কি সৌভাগ্য! এখানেই যে আজ দেখচি কবি সম্মেলন।

সুবন্ধু বলিলেন—কিন্তু আমার সৌভাগ্য সকলের চেয়ে বেশী। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত কবি আজ এখানে মিলিত হয়েচেন। দেখে ধন্য হোলাম।

কালিদাস বলিলেন—আমিও সে কথা বলতে পারি।

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আপনি বলতে পারেন না।

—কেন?

—আপনি দেখচেন দুজনকে। আমি দেখচি তিন দিক্‌পালকে। আমি

বিখ্যাত কবি নই। আমাকে বাদ দিয়ে বিচার করবেন।

ভবভূতি বলিলেন—ওহে ছোকরা তুমি থাম তো। তোমাদের বিনয়ের কলহ এখন রাখো। আমি যে জন্যে এসেছি—কালিদাসকে বলি। আমার সময় কম। পিতৃব্য ভাস, আপনার কোন অসুবিধে হবে না?

ভাস ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—স্বাচ্ছন্দে বল বাবাজী। আমার কি অসুবিধে?

ভবভূতি কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পৃথিবীতে আমি দাম্ভিক বলে গণ্য হয়েছিলাম একটি শ্লোক লিখে, এখন দেখচি আমার সেই শ্লোক আমার কাব্যের চেয়েও খ্যাতি লাভ করেচে। এখন আমার একটা কথা। শুনলাম, দাদা, আপনার মেঘদূতের নাকি বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে পৃথিবীতে?

—হ্যাঁ ভাই।

—আমার 'উত্তররামচরিত' খানার ওইরকম করা যায় না? কিংবা 'মালতী মাধবে'র? সেইজন্যই আপনার কাছে এলাম আজ।

কালিদাস কিছু উত্তর দিবার পূর্বেই সুবন্ধু বলিলেন—ও ক'রে দেবো দাদা। সুধাংশু রায় নিপুণ বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণকারক। সে স্বর্গে এসেচে কিছুদিন হোল, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। আমার 'বাসবদত্তা' কাব্যখানার জন্যে তাকে বলেছিলাম—

ভবভূতি অধীরকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছা, তার দেহ হাওয়া হয়ে রয়েচে—মর্ত্যধামে তার কিছু করবার ক্ষমতা আছে আজকাল? বড় অসার কথা বলে ছোকরা।

—আজ্ঞে, আমার কথা প্রণিধান করুন। আমার সঙ্গে ছিল সোঢ়ল—

—সে আবার কে?

—আজ্ঞে আপনারা সফরী মৎস্যের খবর কি রাখবেন? আমরা হোলাম কাব্য-সমুদ্রের সফরী—আপনারা অগাধ জলসঞ্চারী রুই কাতলা—সোঢ়ল কবি ধরেচ তার কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে—

—কি কাব্য?

—আজ্ঞে উদয় সুন্দরী-কথা নামে চম্পু কাব্য—খুব নামকরা কাব্য—তবে কি আপনার কিংবা পিতৃব্য ভাসের—কিংবা কালিদাস দাদার—

—থাক আমার কথা বাদ দাও—ওঁদের কথা বলতে পারো। সারা পৃথিবীতে মেঘদূতের নাম ব্যাপ্ত হয়েচে, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ পড়ে একজন ম্লেচ্ছ কবি—

ভাস বলিলেন—বাদ ওই সঙ্গে আমার নামটাও দাও। একমাত্র স্নেহভাজন কালিদাসের নাম এখনো পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে। হ্যাঁ, তুমি যে ম্লেচ্ছ কবির উল্লেখ করলে, আমিও রাখি সে সংবাদ—তার নাম—ম্লেচ্ছ নাম বড় দুরুচ্চার্য—তার নাম—

কালিদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন—গয়থী। ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করে মাঝে মাঝে। আমার নাটক তার নাকি ভাল লেগেছে। যাক সে সব কথা। আজ মর্ত্যধামে আমরা যাচ্চি মেঘদূতের আলেখ্য-দর্শনে। ভবভূতি তুমিও চলো, আমরা বড় আনন্দ পাবো। তোমার শিক্ষা মর্ত্যে অমর হয়ে আছে, অযথা বিনয় কেন? আলেখ্য-দর্শনের বীজ তুমিই বপন করেছিলে তোমার অমর নাটকে। তোমার সমানধর্মা লোকেরা তোমাকে এখন চিনেচে। ঠিকই বলেছিলে, কাল নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুলা। ধন্য তুমি।

কথা শেষ করিয়া কালিদাস ভবভূতিকে সাদর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন।

মর্ত্যধামে রাত্রিকাল উপস্থিত হইবার পূর্বেই এই দলটি যাত্রা করিলেন কবিকুঞ্জ হইতে। পথে বাণভট্টের সঙ্গে দেখা। এতগুলি কবিকে এক সঙ্গে দেখিয়া বাণভট্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—উপাধ্যায়গণ, আপনারা কোথায় চলেচেন? একসঙ্গে এতগুলি জ্যোতিষ্ক? এই যে সুবন্ধুও—ব্যাপার কি?

ভাস প্রবীণতম এবং এই দলের অধিনায়ক। তিনি বলিলেন—আমরা যাচ্চি কালিদাসের মেঘদূতের বাঙ্ময়-আলেখ্য দর্শনে, মর্ত্যে—তোমারও তো—

বাণভট্টের পরিধানে মহার্ঘ পীতবর্ণের পট্টবাস, মাথার চুল সাদা হইলেও কুঞ্চিত, পারিপাট্যযুক্ত ও দীর্ঘ। তাঁহার হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ, দুই কর্ণে কর্ণিকা পুষ্পের গুঞ্জিকা, বেশ শৌখীন ধরনের লোকটি। ভাসের কথায় তাঁহার বিস্ময় যেন আরও বাড়িয়া গেল। শুধু বলিলেন—ও!

কালিদাস সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন বাণভট্টকে।

এতক্ষণে বাণভট্ট যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—না না, আমাকে ক্ষমা করবেন। তাতঃপাদ ভাসও চলেচেন দেখচি। এসব সুবন্ধুর ক্রিয়াকলাপ আমি জানি। যখন তখন মর্ত্যধামে ঘুর ঘুর ক'রে যাওয়ার ফল আর কি। আজকাল কি অতিরিক্ত আসব পান ক'রে থাকো সুবন্ধু?

সুবন্ধু অপ্রতিভের সুরে উত্তর দিলেন—না দাদা।

—সেদিনও তো দেখলাম বাঙ্ময়-আলেখ্য প্রেক্ষাগৃহে—?

—আজ্ঞে না আপনার ভ্রম হয়েচে। ও আসব নয়, একপ্রকার বৃক্ষপত্রের

ক্বাথ, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে পান করা হয়। একটু আস্বাদ ক'রে দেখছিলাম —মর্ত্যে সবাই খায়—

—মর্ত্যবাসীদের অলীক ব্যসন তোমাকে পেয়ে বসচে ক্রমে ক্রমে। আর একটি হচ্চে এই বাঙ্ময়-আলেখ্য। মর্ত্যে এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। সেদিন এই সুবন্ধুর পরামর্শে ওর সঙ্গে আমার 'কাদম্বরী'র বাঙ্ময়-আলেখ্য দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে এসেছি—

ভাস সাগ্রহে বলিলেন—কেন ? কেন ?

—আচার্য ভাস, আপনি প্রবীণ ও প্রাচীন, আপনাকে সেই রকম ভক্তি করি, আপনার সামনে আর সে সব কথা বলতে চাই নে। আর কথায় কথায় গীত ! নাঃ, আমি তো দুঃখে আক্ষেপে চলে এলাম—সুবন্ধু সব জানে, আবার আপনাদের আজ নিয়ে যাচ্চে—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, আমি নিয়ে যাই নি দাদা। কালিদাস দাদাই বল্লেন উনিই আমাকে নিয়ে যাচ্চেন। বরং আপনি ও'দের জিজ্ঞেস করুন—

কালিদাস বলিলেন—সে ঠিক। সুবন্ধু জানতো না। আমিই ওকে যেতে বলেচি। দেখেই আসি কেমন হোলো মেঘদূত। চল্লাম ভায়া বাণভট্ট—

রাত্রিকাল। কলিকাতা 'প্রদীপ' সিনেমাতে 'মেঘদূত' হইতেছে। ভীড় খুব। ডিমভাজা ও ঘুঘ্নি, চানাচুর, বাদামভাজা, আলু-কাবলীওয়ালাদের পাশ কাটাইয়া কবিদল সিনেমা হলে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ছবি আরম্ভ হইল। ছবি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কালিদাস বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—একি ? এ কার মেঘদূত ? আমার তো নয়—

ভাস বলিলেন—তাইতো। আমিও তাই ভাবচি।

ভবভূতি বলিলেন—শুধু নামটাই নিয়েচে।

কালিদাস ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন—এখানে বসে দেখে কি করবো। বাণভট্ট ঠিক বলেছিল। চলুন আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

বাহিরে আসিয়া কালিদাস বলিলেন—ওহে সুবন্ধু, তুমি সেই বৃক্ষপত্রের ক্বাথ সেবন করবে নাকি ?

—আজ্ঞে না চলুন। ও অভ্যেস নেই আমার, দৈবাৎ সেদিন একটু আস্বাদ করেছিলাম মাত্র।

এমন সময় দুটি ছোকরা যাইতে যাইতে একজন আর একজনকে বলিতেছে শোনা গেল—'মেঘদূত' কার লেখা বই হে ?

অপর ছোকরা জবাব দিল—অতীন ঘোষের।

—'ভাবীকাল' ?

—তা জানি নে। বই উঠেচে জানিস ?

—কাল একখানা 'মেঘদূত' আর একখানা 'ভাবীকাল' খুঁজে দেখতে হবে পাওয়া যায় কিনা।

কালিদাস পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঠিক পিছনে ছোকরা দুটি। রাগে ও ক্ষোভে কালিদাস কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। ছবি দেখিয়াও এত রাগ তাঁহার হয় নাই। ভাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—শুনেচেন এ অর্বাচীন বালক দুটি কি বলচে ? অতীন ঘোষ নামক কোনো ব্যক্তির লেখা এই বই। বাঙ্ময়-আলেখ্যই প্রধান জিনিস, লেখকের নামটা জানবার আবশ্যক কি ?

সুবন্ধু বলিলেন, এই বাঙ্ময়-আলেখ্যের নির্মাণকার হোলো অতীন ঘোষ নামক কোন লোক। ওরা অত কৌতূহলী নয় গ্রন্থকর্তা সম্বন্ধে। আলেখ্য নিয়ে আসল কথা। অতীন ঘোষকেই ভেবেচে গ্রন্থকর্তা। মহাস্থবির অশ্বঘোষের নাম করলেও কালিদাস দাদার মানটা থাকতো। তা নয়, অতীন ঘোষ।

সুবন্ধু হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস রাগের সুরে বলিলেন—অত হাস্য কিসের ? বৃক্ষপত্রের ক্বাথ পান না করেই এই। চলো এখান থেকে যাই।

—বৃক্ষপত্রের ক্বাথে বিহ্বলতা আসে না দাদা, এ আসব নয়। আপনি আস্বাদ ক'রে দেখতে পারেন।

ফিরিবার পথে ভবভূতি বলিলেন—না হে সুবন্ধু, তোমার সেই সুধাংশু রায়কে আর কোন কথা বোলো না, আমার 'উত্তররামচরিতে'র বাঙ্ময়-আলেখ্যে কোন প্রয়োজন নেই—

ভাস বলিলেন—আমারও 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' সম্বন্ধে ওই কথা—বাণভট্ট ছোকরা যথার্থ কথাই বলেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে—

কালিদাস বলিলেন—সুবন্ধু কিন্তু ওর 'বাসবদত্তা'র ঠিক আলেখ্য করাবে আপনি দেখে নেবেন—ও এখনো আসক্তি পরিত্যাগ করে নি—সেই সুধাংশু রায়কেও ধরবে ঠিক—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—যা বলেন দাদা। আপনারা হোলেন প্রথিতযশা কবি, আপনাদের কথা আলাদা—নাম যা হবার আপনাদের হয়েই গিয়েচে।—আপনাদের কি ?

ইহাদের অপেক্ষাও বিস্ময়কর ঘটনা সেদিন কালিদাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কালিদাস ভাসকে সঙ্গে লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চম্পক বৃক্ষের বেদীমূলে বসিয়া আছেন। ব্যাসদেব প্রবীণতম ও প্রাচীনতম কবি, তিনি কখনো আসেন না। শুধু কবি নহেন, দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়াও তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যাসদেবের আকৃতি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায়, পরিধানে কষায় বস্ত্র, মস্তকে শুভ্র কেশভার, গম্ভীর ও সৌম্য মুখভাব। উভয়ে সসম্ভ্রমে ব্যাসদেবের পাদ-বন্দনা করিলেন। কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আমার গৃহ পবিত্র হোলো আপনার চরণস্পর্শে। আমার প্রতি কি আদেশ, তাতঃপাদ ?

ব্যাসদেব আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমার মঙ্গল হোক। কালিদাস, তোমার কুশল ? ভাস, তুমি ভাল আছ ? বোস, বোস। কোথায় গিয়েছিলে ? মর্ত্যধামে ? ভবভূতিও সঙ্গে ছিল ? ছোকরা ভাল লেখে। সেখানে কেন ?

কালিদাস কারণ বলিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন—আমিও ঐ কারণেই এসেছিলাম, গীতার একটি বাঙ্ময়-আলেখ্য নির্মাণ করিয়ে দিতে পারো ? অবশ্য আমি প্রচারের দিক দিয়েই বলচি। তত্ত্ব-প্রচারের সুবিধে হবে। তোমরা তো আজকালকার ছেলে, মর্ত্যের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, আমার তা নেই। ভাস কি বলো ?

ভাস বলিলেন—অনুমতি যদি করেন তো বলি, ও সব কলঙ্ককারী ব্যাপারের মধ্যে আপনি যাবেন না। বলো না হে কালিদাস সব খুলে ঘটনাটা ?

পরে ব্যাসদেব সব শুনিয়া নীরব রহিলেন।

ভাস বলিলেন—এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন। আপনাকে আমি কি বলবো ?

ব্যাসদেব বলিলেন—তোমার যে কাব্যের বাঙ্ময়-আলেখ্য হয়েচে, তার নামটি কি বল্লে ? মেঘদূত ? কি অবলম্বনে লেখা ? কাব্যের ঘটনাটি কি ?

কালিদাস লজ্জিত সুরে বলিলেন—সে আর আপনার শোনার প্রয়োজন নেই তাতঃপাদ। সে কিছু না। ওই একটা দেশবিদেশের বর্ণনার মত। আমাদের কথা বাদ দিন। আপনি এবেলা আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য ক'রে যান।

ব্যাসদেব থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার কাছে যাইতে হইবে। বেদ সম্বন্ধে কি আলোচনা আছে। অন্য সময়ে চেষ্টা করিবেন। এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

ব্যাসদেব বিদায় লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ভাস কালিদাসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বোঝো ব্যাপার !

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কুইন অ্যান

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট উডবার্ণ সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইতেছেন, আসবাবপত্র বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। দুইটা কুকুর সঙ্গে যাইবে, গোটা-চারেক বিলি হইয়া গিয়াছে। বাকি আছে একটি ঘুড়ী। সাহেব ওটাকে প্রথম হইতে ওয়েলার জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া বড় ভুল করিয়া বসিয়া আছেন। প্রবল খিলাফৎ আন্দোলনের যুগ; যাহাদের কিনিবার ক্ষমতা আছে, বলিতেছে, আরেবিয়ান জাতের হইলে কেনা যাইত। দুই-একজন নন-খিলাফতিস্ট রাজী হইয়াছে, কিন্তু দর উঠিতেছে না। তাহা ছাড়া সাহেবের কানে উঠিয়াছে, ইহারা নিজেরা ব্যবহার করিবে না, তিনি যাত্রা করিলেই জাত ভাঁড়াইয়া ঘুড়ীটাকে প্রাচ্য করিয়া লইবে, তাহার পর চড়া দামে ছাড়িয়া দিবে।

এদিকে সময় আর মাত্র দিন-পনেরো-ষোল; মীমাংসা একটা হওয়া চাই-ই। অথচ সাহেবের ইচ্ছা নয় যে, ঘুড়ীটা যাহার-তাহার হাতে পড়িয়া কষ্ট পায়, একাদিক্রমে দশটা বৎসর একসঙ্গে আদর-যত্নে কাটাইল। কি যে করিবেন, ব্যাকুল ভাবে চিন্তা করিতে করিতে একদিন হঠাৎ রায়সাহেবের কথা মনে পড়িয়া গেল। রায় সাহেব ননীগোপাল চক্রবর্তী জমিদার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট।

তাঁহার হাতের দেওয়া খেতাব, লোকটা খাতির রাখিলেও রাখিতে পারে। সাহেব ভাবিলেন, দেখাই যাক্ না ; ভেজে কিনা ঘড়ীটা তাহা হইলে সুখে থাকে।

রায়সাহেবকে সেলাম পাঠানো হইল। উপস্থিত হইলে অবান্তর নানা রকম কথার পর আসল কথাটা পাড়িলেন। দেখা গেল, ভিজিয়া থাক্লাটাই রায়-সাহেবদের স্বাভাবিক অবস্থা, বেশি সিঞ্চিত করিতে হইল না। সাহেব যে অন্যের হাতে প্রিয় ঘড়ীটাকে বিশ্বাস করিয়া দিতে চান না, আর এতগুলো হোমরা-চোমরাদের মধ্যে তিনিই যে সাহেবের বিশ্বাসভাজন বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন, ইহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সাহেবের যখন সেই রকমই অভিরুচি, তখন তিনি উপহার হিসাবেই সেটিকে লইতে রাজী আছেন, গৌরবের সহিত রাজী আছেন। তবে দাম হিসাবে নয়, শুধু বিলাতে গিয়া তিনি যাহাতে ওই রকমই একটি ঘড়ী অবিলম্বে কিনিয়া লন, সেজন্য অল্পস্বল্প করিয়া অন্তত পক্ষে হাজার খানেক টাকাও অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রায়সাহেবোচিত বিনয়ের সহিত একটু তর্কও করিতে ছাড়িলেন না, "তা যদি না করেন সাহেব তো হুজুরের দান দেখে অধীন না হয় সর্বদা হুজুরকে স্মরণ করবে, কিন্তু অধীনকে মনে করার হুজুরের কাছে কি থাকবে ? না, সে হবে না।"

উঠিবার সময় রায়সাহেবও আসল কথাটা পাড়িলেন, "'বার্থ'-ডে অনার্সের সময়টা আসছে, হুজুর যাচ্ছেন, আশেপাশেই ক-বছরের মধ্যে পাঁচ-ছটা রায়-সাহেব হয়ে গেল, ছ্যাকড়া-গাড়ির মতো বেড়ে যাচ্ছে, কমপক্ষে 'রায়বাহাদুর'টা না পেলে আর মান থাকছে না! লোকে গালাগাল দেওয়ার জন্যে আজকাল কথাটা ব্যবহার করছে।"

সাহেব কথা দিলেন, আগন্তুক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফর্দ দিবার সময় তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন। উঠিবার সময় করমর্দন করিয়া বলিলেন, "আমার মস্ত বড় একটা সান্ত্বনা রইল যে, ঘড়ীটা একজন সমঝদার আর হুঁশিয়ার ঘোড়সওয়ারের হাতে পড়ল। শুনলাম, এ তল্লাটে নাকি এ-বিষয়ে আপনার সমকক্ষ আর নেই কেউ।"

রায়সাহেব নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না, তেমন কিছু নয়, তবে ঘোড়া জিনিসটা ছেলেবেলা থেকে চড়ার অভ্যাস আছে এই যা।"

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, তবে পনরো আনা বাড়াইয়া বলা। বয়স যখন চৌদ্দ কি পনরো হইবে, রায়সাহেব ফটো তুলিবার জন্য শখ করিয়া একবার

একটা টাট্টুতে চড়িয়াছিলেন, একটা মারাঠী ব্যবসাদার বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল। চড়ার পরমূহূর্ত হইতে ঘোড়াটা বনবন করিয়া অল্প পরিসরের মধ্যে এরকম ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া দেয় যে, প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত ঘাড়ের চুল আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল; সবে নূতন পৈতা হইয়াছে, গায়ত্রীর উপর খুব বিশ্বাস, এক হাতে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ,' আর এক হাতে ঘোড়ার ঘাড়ের রোমরাশি।

পরে জানা গেল, সেটি সার্কাসের ঘোড়া। সেই যে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকিয়া গেল রায়সাহেবের মনে, সেই হইতেই ও-জানোয়ারটি সম্বন্ধে চাণক্যের উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিয়াছেন। সার্কাসের ঘোড়া বা বাহিরের ঘোড়া বাছেন না, ভাবেন, রেসের ঘোড়া হইলেই বিপদ কম হইত নাকি? সে বরং আরও বড় করিয়া চক্কর মারিত।

কিন্তু রায়সাহেবীর মোহ, উপায় কি?

তাহা ছাড়া, আরও একটু কথা আছে। নিশ্চিন্ত জীবনের সব চেয়ে যাহা বড় চিন্তা, কিছুদিন হইতে তিনি তদ্দ্বারা নির্মমভাবে আক্রান্ত। পরিবর্ধমান ভুঁড়ি তাঁহাকে হিমসিম খাওয়াইয়া ছাড়িতেছে। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন, এর দাওয়াই বেড়ানো; সেটা উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ওরা রব তুলিয়াছিল, "তাহা হইলে ঘোড়ায় চড়ুন।" বিশ্রী রকম গরম পড়িয়া কষ্ট বাড়িয়াছে। দোমনা হইয়া কয়েকদিন হইতে ভাবিতেছিলেন, মন্দ কি, একটা তেমন শান্তশিষ্ট, প্রভুভক্ত, বিশ্বাসপরায়ণ, বাধ্য, ভব্যসভ্য, নিরীহ, গোবেচারী গোছের ঘোড়া যদি পাওয়া যাইত!

এই সময়টায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তলব করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যেদিন চলিয়া গেলেন, সেইদিন বৈকালে সাহেবের সহিত আমির হোসেন ঘুড়ীটাকে আনিয়া হাজিরা করিল। হ্যাঁ, একটা জিনিস বটে। দীর্ঘ নিটোল শরীর, উন্নত বর্তুল গ্রীবা, বিশাল চক্ষু দুইটি প্রাণের দীপ্তিতে ভরা, এক মুহূর্ত সুস্থির নয়—চনমন চনমন করিতেছে, ক্ষুরের আওয়াজে আর সাজের মশমশানিতে জায়গাটা যেন জাগিয়া উঠিল। আমির হোসেন জানাইল, ঘুড়ীর নাম—কুইন অ্যান।

পারিষদেরা বলিল, "হ্যাঁ, হুজুরের যুগ্যি ঘুড়ী বটে। গা নয় তো কাচ—মাছি বসলে পিচলে পড়বে।"

অতি মসৃণ গা-টার দিকে চাহিয়া রায়সাহেব শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, হুঁ, তবে আমি তাড়াতাড়ি ওকে কিছু বলছি না। খাক-দাক জিরুক কদিন।

ঘোড়ার নিয়মই হচ্ছে মাঝে মাঝে বেশ দিনকতক বসিয়ে রাখা।"

যাঁহারা ঘোড়া সম্বন্ধে কিছু বোঝেন, তাঁহাদের বোধহয় বলিয়া দিতে হইবে না, ঘোড়ার নিয়ম ঠিক বিপরীত। অভিজ্ঞ আমির হোসেন রায়সাহেবের ভুলটা শুধরাইয়া দিতে যাইতেছিল, পারিষদদিগের একজনের চোখ-টিপুনিতে থামিয়া গেল।

রায়সাহেব বিচক্ষণের মতো একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, ঘোড়া এত মোটা হওয়া কি ভালো—কোনোখানে একটু টোল নাই, তোমরা কি বল হে?"

দুই একজন ব্যাপারটা বুঝিল, মাছি পিছলানোর কথাটা রায়সাহেবকে ভড়কাইয়া দিয়াছে। বলিল, "আজ্ঞে, ঘোড়া একটু যদি রোগা-শোগা তোবড়ানো-তাবড়ানো না হল তো কি হল? যদি নিজের মাংস বইতেই হয়রান হল তো সওয়ারী বইবে কখন?"

একজন বলিল, "আর তাহলে তো ঘোড়ায় না চড়ে লোকে গোল বালিশেই চড়তে পারত হুজুর।"

রায়সাহেব বলিলেন, "দৌড়োয় কেমন আমির হোসেন? মানে, ইয়ে তো বেশ?"

আমির হোসেন গর্বের গাঢ়স্বরে বলিল, "তীরের মতো হুজুর, একটু রাশ আলগা দিয়ে একটুখানি ঈশারা, ব্যস, আর দেখতে হবে না।"

রায়সাহেব বিবর্ণ মুখে বলিলেন, "আমিও তাই চাই, ভালো কথা, থামাবার ইশারাটা কি? ওর নাম কি, সব ঘোড়া আবার একই ইশারাতে থামে না কিনা। আমি ছেলেবেলায় যে ঘোড়াটায় চড়তুম—"

"থামানো এক হ্যাঙ্গাম হুজুর, এক-একবার দেখেছি, রাশ টেনে প্রায় শুয়ে পড়তে হয়েছে সাহেবকে, তবে থেমেছে।"

ঘুড়ীটা ছটফট করিতেছিল, পিঠে দুইটা সাবাসির চাপড় কষিয়া আমির হোসেন বলিল, "তবে আর বলছি কি, হুজুরের যুগ্যি ঘুড়ী একেবারে। তবে একটা বড় দোষ আছে।"

রায়সাহেব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "কি, কি দোষ?" আগ্রহটা চাপিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বেশ বুঝা গেল, অশ্বিনীর গুণের তালিকায় ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হইয়া দোষের আশায় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

আমির হোসেন বলিল, "এক-এক সময় কি দোষ হয়, কোনোমতেই চাল ধরে না তখন।"

"চাল ধরে না মানে কি? দৌড়ুতে চায় না?"

"দৌড়ুনো দূরের কথা, বিলকুল নড়তে চায় না। ঝোঁক এক-একবার দু-তিনদিন পর্যন্ত থেকে যায়। সাহেব কত ডাক্তার দেখালেন, কত—"

"নড়তে চায় না মানে কি? অনেক ঘোড়া চলে না, কিন্তু একই জায়গায় ঘুরপাক খায়, অন্তত সেটুকুও নিশ্চয় চলে তো?"

"আজ্ঞে না, চারটি নাল পুঁতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, হাজার মারুন, পিটুন, লোভ দেখান, কিছুতেই কিছু হয় না।"

রায়সাহেবের মুখে এতক্ষণ হাসি দেখা দিল। অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতেছেন যেন, ভাবটা এইরকম করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তো পা পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকবে, নড়বে না? বেশ, এমনই আপাতত তুমিই ফেরি দাওগে রোজ, তবে এইরকম এক গুঁয়েমি ধরলে আমায় খবর দিও, শায়েস্তা করে দোব।"

আমির হোসেন সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, আর দেখ আমির হোসেন, ফেরি করবার সময় তুমি আর ওকে দৌড় করিও না, আপাতত দৌড়ের অভ্যাসটা থাক। আমি ওই পা পুঁতে দাঁড়ানো থেকে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করা, তারপরে একটু একটু কায়দামাফিক দৌড়ুনো, তারপর আরও জোরে, এই করে একেবারে গোড়া থেকে তোয়ের করব। একটি বছরের বেশী লাগবে না।"

আমির হোসেন বিস্ময়াভিভূত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, একজন পারিষদের ইশারায় আর একটা সেলাম করিয়া "যে আজ্ঞে হুজুর" বলিয়া চলিয়া গেল।

ঘুড়ীটা নূতন আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া তিন-চারদিন বেজায় মনমরা হইয়া রহিল। আমির হোসেন ঘুড়ীর সহিত এত্তালা করিল, "সাহেবকে দেখতে না পেয়ে কিছু খাচ্ছে-টাচ্ছে না হুজুর, তিন দিনেই যেন গলে গেছে।"

রায়সাহেব বলিলেন, "জোর করে খাওয়ানোর দরকার নেই, ওদের সয় না।"

একটু থামিয়া বলিলেন, "মেহনত করাচ্ছ তো?"

"আজ্ঞে, এত কাহিলের ওপরে—"

পারিষদের একজনের চোখ-টিপুনিতে আমির হোসেন কথাটা আর শেষ করিল না; একটু থামিয়া বলিল, "আজ বিকেলে একবার বের করেছিলাম, দেখলাম নড়তে নারাজ। ভাবলাম থাক্, দুদিন ধরে আর ফেরি দোব না, হুজুরেরও মানা আছে।"

রায়সাহেব উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ওই তো আমির

হোসেন, ঘোড়ার মেজাজ বুঝতে তোমার এখনও দেরি আছে। এইতো মেহনত নেবার সময়; ঘোড়ার জেদ বাড়তে দিয়েছ কি বিগড়েছে,—ঘোড়ার আর রেয়তের। ও কাজের কথা নয়, সকালে একবার নিয়ে এস, বাছাধন বুঝুন কার পাল্লায় পড়েছেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, তা বলে যেন খাওয়াতে জেদ ভাঙতে যেও না, পিঠে সইবে বলে যে পেটেও সইবে, তা ভেবো না,—” বলিয়া রসিকতায় আবার হাসিয়া উঠিলেন। সকলে যোগ দিল। ঘুড়ীটা মাথা নীচু করিয়া ডান ক্ষুর দিয়া রাস্তা চাঁছিতেছিল, ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া নাক কাঁপাইয়া একটা আওয়াজ করিল।

কি ভাবিল, অথবা কিছু ভাবিল কিনা, সেই-জানে। রাত্রে দেখা গেল তাহার অগ্নিমান্দ্যটা হঠাৎ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। চারিদিনের না হোক, দিন দুইয়ের আহার সে দিব্য পুষাইয়া লইল এবং বেশ স্ফূর্তির সহিত অঙ্গ চালনা করিতে লাগিল। মোটের উপর বেশ বুঝা গেল, ও স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে, যাওয়া-আসা, মিলন-বিরহ পৃথিবীতে চিরকালই চলিতেছে, উহার জন্য শোকে ঘাস-জল ছাড়িয়া দিলে শুধু আত্মনির্যাতনই সার হয়; এবং বোধ করি এও ভাবিল যে, তাহাতে শুধু দুশমনের মুখেই হাসি ফুটে মাত্র।

পা-থেকে মাথা পর্যন্ত যত রকম ঘোড়ায় চড়িবার সাজগোজ শরীরকে ভারাক্রান্ত এবং জবড়জঙ করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমস্তই কয়েকদিন পূর্বে কেনা হইয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া রায়সাহেব ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া সযত্নে গোলমাল করিয়া সবগুলি পরিধান করিলেন। আজ অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার ফোটো লওয়া হইবে, বহুদিনের সাধ। সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, একখানা টাঙানো থাকিবে বারান্দায়, একখানা বৈঠকখানায়, একখানা শোবার ঘরে। প্রত্যেক পারিষদ এক-একখানা করিয়া দস্তখত করা ছবি পাইবে। খান পনরো আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

শহর হইতে ফটোগ্রাফার আসিয়াছে, সাড়ম্বরে ক্যামেরা ঠিকঠাক করিতেছে। রায়সাহেবের মনটি খুব প্রসন্ন; ঘোড়ায় চড়াও হইবে, ফোটো লওয়াও হইবে, আর এদিকে ঘোড়া এক পা নড়িবেও না, চক্কর দেওয়া তো দূরের কথা।

পারিষদেরা সব হাজির; হাসি-ঠাট্টা, ঘোড়া দুরন্ত করার গল্প চলিতেছে। রায়সাহেব বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথার পাগড়িটাতে সাধ্যমতো রাজপুতী ঢঙ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় আরশিতে ঘুড়ীর ছায়া পড়িল।

রায়সাহেব ঘুরিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-কার ঘোড়া আমির হোসেন ?"

আমির হোসেন ঝুঁকিয়া একটি সেলাম করিয়া সহাস্য বদনে কহিল, "হুজুরেরই কুইন অ্যান, রাত থেকে খেয়েদেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, চেনা যাবে কমনে থেকে ? শুধু একবারটি কয়েছিলাম, দেখিস, মালিক প্রথম সওয়ারী হবেন...ইউ নোটি গেরেল !"

শেষের ইংরেজীটুকু ঘুড়ীর উদ্দেশে; সে শরীর দুলাইয়া দুলাইয়া অতিরিক্ত নাচ লাগাইয়া দিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে আমির হোসেনের হস্তধৃত লাগামের এক-একটা উৎকট ঝাঁকুনি দিয়া নিজের অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করিতেছিল। দাবড়ানি খাইয়া রায়সাহেবের পোশাকের উপর চক্ষু দুইটা ন্যস্ত করিয়া একটা আনন্দ ধ্বনি সহকারে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

আমির হোসেনের বাঁ হাতটা তাহার ঘাড়ের উপর বুলাইয়া বলিল, "সবুর, মালিক আসছেন ; লেকিন সাচ্চা চাল দেখানো চাই, হাঁ।"

রায়সাহেবের মুখটা শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ ভাল কথা। অনন্ত, কাল বলছিলে, একবার চড়বে, না হয় ঘুরে এস না ; দোব ব্রিচেসটা খুলে ? মানে, কথা হচ্ছে, আমার পাল্লায় পড়লে এমন ঢিট করে ছাড়ব যে, খানিকক্ষণ ওর আর পদার্থ থাকবে না, মিইয়ে যাবে ; তখন আর চড়ে সুখ পাবে না"

অনন্ত নামক পারিষদ তাড়াতাড়ি একটু হাতজোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না হুজুর, ওরে বাবা ! কালকে মিইয়ে ছিল বলেই বলেছিলাম চড়ব ; নেহাত পা পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকছে, বললে কিনা !"

রায়সাহেব একবার অপর সকলের উপর চোখ দুইটা বুলাইয়া আনিলেন, কেহ চোখ নামাইয়া লইল, কেহ চুপ করিয়া দরজার আড়ালে সরিয়া গিয়া চোখে চোখ ফেলিতে দিল না। একজন একেবারে সামনা-সামনি ছিল, ভীত ভাবে হাসিয়া বলিল, "হুজুরকে বঞ্চিত করে কেউ কি আগে চড়তে রাজী হবে ? হোক কলিযুগ, তবু—"

উপায়ান্তর না দেখিয়া রায়সাহেব আরশির সামনে সরিয়া আসিয়া পাগড়িটা খুলিয়া আবার সযত্নে এবং সবিলম্বে চাপিয়া চাপিয়া বাঁধিতে লাগিলেন। আশা, যদি ইতিমধ্যে কিছু একটা হইয়া গিয়া তিনি এ-যাত্রা রক্ষা পান ;— ভূমিকম্প, কি অগ্নিকাণ্ড, কি অপঘাত, যা হয় একটা কিছু, মানটা কোনো রকমে যাহাতে বাঁচিয়ে যায়। কিন্তু পাগড়ি-বাঁধা পর্যন্ত যথেষ্ট সময় থাকিতেও

সে-সব কিছুই হইল না ; যদিও ইহাতে কোনো সন্দেহ রহিল না যে, সাধের বিপদটি খুবই আসন্ন, তাঁহার ঘোড়ায় চড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে মাত্র। দায়ে-পড়া বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইলেন। নরম আলগা শরীরের মাংস পাতলা করিয়া মাখা ময়দার মতো পোশাকের খাঁজে খাঁজে ভরিয়া যাইতে লাগিল।

প্রথম তো চড়াই এক সমস্যা। যে পারিষদটি কলিযুগ হইলেও রায়সাহেবকে প্রথম অশ্বারোহণের আনন্দ ও গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে চায় নাই, সে সামনে আসিয়া বলিল, "আপনি তা বলে যেন লাফিয়ে চড়তে যাবেন না হুজুর, এই সেদিন অমন বাতে ভুগলেন। তার চেয়ে আমির হোসেন, তুমি এই বারান্দার পাশটায় এনে দাঁড় করাও, হুজুর টুপ করে উঠে পড়ুন।"

রায়সাহেব সামান্য একটু ল্যাংচানোভাবে চলিতে চলিতে বলিলেন, "তবে তাই যান ; হ্যাঁ, ব্যথাটা যেন একটু আউড়েছে বটে।"

ঘুড়ীটাকে বারান্দার পাশে আনিয়া দাঁড় করানো হইল। সে পিঠটা একটু সংকুচিত করিয়া সংশয়ান্বিত দৃষ্টিতে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিল।

চড়িতে যা দেরি ; ঘুড়ীটা সঙ্গে সঙ্গে তরতর করিয়া প্রাণ লইয়া পালানো গোছের করিয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল ; আমির হোসেনের হাতে লাগামটা ছিল, অতি কষ্টে রুখিয়া ফেলিল। গালে পিঠে হাত বুলাইয়া আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; বলিল, "ঠাণ্ডা রহ বেটী, ভয় নেই।"

রায়সাহেব উঠিয়াই দুই হাতে কুইন অ্যানের ঘাড় জড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই প্রশ্ন করিলেন, "ফোটো তোলা হচ্ছে না তো ?"

ফোটোগ্রাফার বলিল, "তুলিনি এখনও ; আপনি যেই একটু স্টেডি হয়ে বসবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে এক্সপোজার দোব ; সেই জন্যে অপেক্ষা করে আছি।"

রায়সাহেব মাথাটা তুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুইন অ্যান হঠাৎ সামনের পা দুইটি মুড়িয়া পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিতে আবার মাথাটা গুজড়াইয়া পড়িলেন এবং ওরই মধ্যে নির্ভুল হিসাব করিয়া বলিলেন, "আপনি তাহলে কাল আসবেন, খবর দোব। আমির হোসেন কাছে আছ তো ?

"এ যে রয়েছি হুজুর, লাগামটা দোব ?"

"না না, ধরে থাক, লাগাম চাইছি না, জিজ্ঞাসা করছিলাম···ওই আবার উঠল ; টেনে নামাও, টেনে নামাও আমির হোসেন ; বসে পড় ভুঁয়ে, শিবু বেয়ারাকে ডেকে নাও, ভারি আছে !"

আমির হোসেন টানিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেই কুইন অ্যান সামনের পায়ে ভর দিয়া পিছনে লাফাইয়া উঠিল।

রায়সাহেব ঘাড়ের দিকে খানিকটা পিছলাইয়া গিয়া আর্তস্বরে বলিলেন, "তোমরা কেউ ল্যাজ চেপে ধর, কিছু বলবে না, খুব ঠাণ্ডা ঘু—"

আমির হোসেন তাড়াতাড়ি সাবধান করিয়া দিল, "না না, ল্যাজে হাত দিলে আজ ও বরদাস্ত করবে না, একে মন ভালো নেই, মোটে এই একটু ফুর্তি জমে আসছে—"

রায়সাহেব শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, "তা হলে ? এ যে একবার সামনে উঠছে, একবার পিছনে উঠছে, এ কোন দেশী ফুর্তি আমির হোসেন ? বাপরে, যেন ধোপার পাটে কাপড়কাচা করছে।"

সাহেব পিঠে হাত ঠুকে বলতেন, "ডার্লিং, প্রিটি ডিয়ার। তাই বলুন না হুজুর।"

পারিষদের মধ্যে একজন বলিল, "ডার্লিং তো মেমকে বলে সাহেবেরা, সে কথা উনি ঘুড়ীকে কেমন করে—"

আওয়াজ পাইয়া রায়সাহেব ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন, "তোমরা বুঝি সব তামাশা দেখছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? মেমসাহেবকে বলে—কেন, একে বললে কি অন্যায়টা হয় ?...ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং।—তুমি সঙ্গে সঙ্গে এই দিকে হাতটা ঘুরিয়ে ঠুকতে থাক আমির হোসেন, যেন মনে করে, আমি ঠুকছি, মানে সাহেব ঠুকছে। আর কি বলতেন সায়েব ?"

"প্রিটি ডিয়ার বলুন হুজুর।"

"প্রিটি ডিয়ার।—ওই রে! লাগাম কষে ধরে থেকো। প্রিটি ডিয়ার।

"বলুন, নোটি গেরেল।"

"দেখো দেখো, অন্যমনস্ক হয়ো না। না, ওটা আর বলে কাজ নেই, বড্ড যেন বোঝে, গুড গার্ল বলতেন কি সায়েব ? বললে বুঝতে পারবে ? যাদুমণি সোনামণি এই রকম কতকগুলো বাংলা শেখাও এবার আমির হোসেন যেমন শুনতে মিষ্টি, তেমনই—ধর ধর, ধর আমির হোসেন! আমি ভাবছি, নেমে আবার ভালো করে উঠব; বেদখল করে ফেলেছে, বারান্দার কাছে আর একবার নিয়ে যেতে পার ?"

"যাচ্ছি হুজুর, তবে সায়েব বারান্দার ওপর পা-তুলে রুটি খেতে শিখিয়েছিলেন, তাই ভাবছি—যদি হঠাৎ মনে পড়ে যায়—আপনি এখন পিঠে রয়েছেন।"

"না না; তবে কাজ নেই; আর একটু দূরে সরিয়ে নাও বরং। বারান্দা থেকে কতটা দূরে আছে আমির হোসেন ? দূরে গিয়েই বরং ভালো করে দাঁড় করাও, নেমে পড়ি।"

আমির হোসেন আর একটা সামনে উঠিবার ঝোঁক সামলাইতে সামলাইতে বলিল, "নামতে গেলেই বাগড়া দেবে ; মনটা ভালো আছে কিনা, একটু নাচতে-কুঁদতে চায় ; খালি জিন পছন্দ করবে না এখন। ভালো ওয়েলার হুজুর, এদের রেওয়াজই এই।"

রায়সাহেব নিরাশ ভাবে বলিলেন, "সর্বনাশ! তা হলে? নামতেও বাগড়া দেবে, পিঠে রেখেই বা কি ভালো ব্যবহারটা করছে? এ কি ফ্যাসাদে পড়া গেল?"

কুইন অ্যান আরও দুই-একবার সামনে এবং পিছনে পা তুলিয়া নিজের শরীরটা নানা ভাবে দুলাইয়া দুলাইয়া যেন আমির হোসেনের কথাটার সমর্থন করিল, তাহার পর চিঁ-হিঁ-হিঁ করিয়া একটি সুদীর্ঘ হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল।

গলাটা বেশ ভালো করিয়া জাপটাইয়া ধরিয়া রায়সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "ডাকলে কেন ওরকম করে আমির হোসেন? বারান্দায় টেবিলের ওপর আমার প্লেটে পাউরুটি পড়ে আছে, শিগগির সরিয়ে নিতে বল তো!"

"না হুজুর, ডাকার পর কুইন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ও ওর একটা ল্যুটিস হচ্ছে।"

রায়সাহেব ভদবস্থ হইয়াই একটু পড়িয়া রহিলেন। পরে অতি সাবধানে মাথাটা সামান্য একটু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ; "ঠিক বলছো তো? দেখো।"

"হ্যাঁ হুজুর, প্রায়ই তো এই রকম—"

তাড়াতাড়ি আবার শুইয়া পড়িয়া রায়সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "প্রায়ই মানে?"

"না আর ভয় নেই হুজুর ; বসুন সিধে হয়ে।"

ভয় কথাটা বোধ হয় পৌরুষে বড় বেশী ঘা দিল ; তাহা ছাড়া ঘুড়ীটাও সত্যই আর নড়াচড়া করিতেছে না। রায়সাহেব সতর্ক ভাবে এবং আমির হোসেনকে খুব সতর্ক করিতে করিতে সিধা হইয়া বসিলেন। আমির হোসেন লাগামটা দিতে যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, আগে তুমি এক হাতে ওর ঘাড়ের চুলটা ধর কষে। আর দেখ, ঘাড়ের চুল বেশি ছোট করে ছেঁটে কাজ নেই, বড় চুলেই ঘুড়ীকে মানায় ভালো।"

পারিষদরা আবার আগাইয়া আসিয়াছিল। অনন্ত বলিল "আজ্ঞে তা তো মানাবেই, ঘুড়ী হল মেয়ে-ঘোড়া কিনা।"

রায়সাহেব ঘুড়ীর কানের মাঝখানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া ছিলেন। মুখ না ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, অনন্ত?"

অনন্ত আরও আগাইয়া আসিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যেন ঠাণ্ডা হয়েছে, না ?"

"হতেই হবে হুজুর কার পাল্লায়—"

"ফোটোগ্রাফার চলে গেছে ?"

দূরে বারান্দার এক কোণ হইতে উত্তর আসিল, "না, এই তো রয়েছি।"

অনন্ত বলিল, "যান না, এই বেলা টপ করে ফোটোটা তুলে নিন না মশাই। হুজুর তো বেটীকে শায়েস্তা করে এনেইছেন।"

ফোটোগ্রাফার আস্তে আস্তে নামিয়া প্রায় বিশ হাত দূরে স্ট্যাণ্ডটা দাঁড় করাইয়া ক্যামেরাটা বসাইল, নিজে কালো পর্দার ভিতর ছয়-সাতবার মাথা গলাইয়া, বাহির করিয়া প্রায় মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফোকাস ঠিক করিল। কুইন অ্যান স্থির ; ল্যাজটি পর্যন্ত নড়ে না। ফোটোগ্রাফার চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া ক্যামেরার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "ঠিক হয়েছে, আর সেকেণ্ড কয়েক ; দেখবেন, যেন—"

লেন্সের মুখ হইতে ক্যাপটা খুলিয়া লইয়া কায়দা করিয়া হাত ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল, "ওয়ান, টু—"

কুইন অ্যান এতক্ষণ পরে একবার ঘাড় বাঁকাইয়া একটু আড় চোখে দেখিয়া লইল, তাহার থ্রী বলার সঙ্গে সঙ্গে চিঁ-হিঁ-হিঁ করিয়া উঠিল, এবং চোখের পলকে ঘুরিয়া গিয়া ক্যামেরার একেবারে সামনা-সামনি হইয়া দাঁড়াইল।

ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা ছাড়িয়া "বাপরে বাপ !" বলিয়া তিন লাফে গিয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল। যাহারা বারান্দায় ছিল, তাহারা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। রায়সাহেব লাগাম ছাড়িয়া গলা আঁকড়াইয়া শুইয়া একটা বিকট চিৎকার করিয়া উঠিলেন। আমির হোসেন তাড়াতাড়ি আসিয়া লাগামটা ধরিয়া ফেলিল।

একটু রুক্ষ ভাবেই বলিল, "ওয়ান টু-ওসব বলবার কি দরকার ছিল ওনার ? এই বলে সাহেব এদানি ওকে হার্ডল ডিঙুতে শেখাচ্ছিলেন, ওনার ওই তিন-ঠ্যাঙে জিনিসটা দেখে ভাবলে বুঝি—"

রায়সাহেব শুইয়া শুইয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "সরিয়ে নাও ফোটোগ্রাফার, ওটা সরিয়ে নাও। হার্ডল রেস-সেই সাত বেড়া ডিঙিয়ে ছোটে তো···নিয়েছি সরিয়ে ?"

কুইন অ্যানের হার্ডল ডিঙাইবার ইচ্ছা ছিল কিনা বলা যায় না ; কিন্তু সম্ভাবনার পূর্বেই তিন-চার জন আসিয়া স্ট্যাণ্ড ও ঢাকনাসুদ্ধ ক্যামেরাটা বারান্দায় তুলিয়া ফেলিল। কুইন অ্যান সামনের ডান ক্ষুরটা দিয়া কাঁকরের রাস্তাটা চার-পাঁচবার জোরে জোরে আঁচড়াইল, তারপর খুব আস্তে আস্তে

শরীর আন্দোলিত করিয়া সামনে চলিতে আরম্ভ করিল। রায়সাহেব ঘাড়ের রোমরাশির ভিতর হইতে রুদ্ধ গলায় প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় চলল বল তো আমির হোসেন? ক্যামেরাটা বারান্দায়, না ঘরে?"

"মন-মরা হয়ে যেন আস্তাবলে চলল বলে বোধ হচ্ছে হুজুর, ওর ইচ্ছেটা ছিল একটু ঘুরে-ফিরে আসা, শেষ নাগাদ একটু ডিঙুবে বলে আশা করেছিল, তাও হল না। ওর দিল্ ভেঙে গেছে, দেখছেন না?"

রায়সাহেব মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "হুঁ! তাই মনে হচ্ছে বটে।" যেন পাঁজরা ভেদ করিয়া তিনি ঘুড়ীর ভাঙা দিল্ প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

একটু পরে প্রশ্ন করিলেন, "যাচ্ছে তো ঠিক আস্তাবলের দিকে আমির হোসেন? কোনখানটায় এল? কতক্ষণ থাকে বল তো মন-মরা ভাবটা? আর মিনিট পাঁচ-ছয় থাকবে, না?"

পরদিন সকালে রায়সাহেব একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। পারিষদেরা উপস্থিতই ছিল। অনন্তকে বলিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ অনন্ত, বাতটা একেবারে সেরে না গেলে ঘোড়ায় চড়াটা কাজের কথা নয়। দিব্যি পছন্দ হয়েছিল ঘুড়ীটা হে, যেমন দেখতে তেমনই তেজী। কাল দেখলাম কিনা একটু নেড়ে-চেড়ে। ভেবেছিলাম মনের মতনটি করে গড়ে নোব, কিন্তু না, তুমি দিয়ে দাও কাগজে একটা বিজ্ঞাপন। সামনের শীতটা যাক, তখন আবার একটা কিনে নিতেই বা কতক্ষণ?"

পারিষদদের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ততার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর

প্রাতর্ভ্রমণ

১

প্রেম দুইপ্রকার—আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক। এই দুই প্রকার প্রেমের বিরোধ এক দিকে যেমন সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলির মূল, তেমনই যুগ-যুগান্ত ধরিয়া এই বিরোধই সর্বপ্রকার সাহিত্য, আর্ট, এমনকি ধর্মবুদ্ধির মূলেও প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে।

মানুষ সাধারণত কর্মক্ষেত্রে আবশ্যিক এবং ধর্মক্ষেত্রে ঐচ্ছিক প্রেমের পক্ষপাতী। বর্তমান যুগে সামাজিক ক্ষেত্রেও ঐচ্ছিকতার প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। বিবাহের পূর্ববর্তী প্রেম ঐচ্ছিক এবং পরবর্তী প্রেম আবশ্যিক। ইহাই ঐচ্ছিকপন্থী এবং আবশ্যিকপন্থীদের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ, অথচ বিবাহের পর ঐচ্ছিক এবং আবশ্যিক প্রেমের প্রভেদ যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই সামান্য সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিলেই এই বিরোধের কারণ অন্তর্হিত হইতে পারে।

যাহা হউক, লেক রোডের মিঃ বাসু ঐচ্ছিকপন্থী। সম্প্রতি বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া ঐচ্ছিক মতে বিবাহ করিয়াছেন এবং লেক রোডে

বাসা করিয়াছেন। পিতা ধর্মচর্চা এবং শেয়ার চর্চা করিয়া দিনাতিপাত করেন। মাতাঠাকুরাণী দান করেন, পূজা করেন, গৃহস্থালী দেখেন এবং কনে বউয়ের মত সাজিয়া-গুজিয়া সিনেমায় যান।

নিকটেই লেক। লোকমুখে শুনা যায়, একবার লেক ঘুরিয়া আসিলেই মনে স্ফূর্তি হয়, শরীরে বল হয়, রক্ত-চলাচল ভাল হয়, লিভার ফাংশন উন্নত হয়, ঘর্মনিঃসরণহেতু রোমকূপগুলি পরিষ্কৃত হয়, পেশীগুলি সবল হয়, ইউরিক অ্যাসিড বিনষ্ট হয়, মেদ ও চর্বি কমিয়া যায়, দৈর্ঘ্য বাড়িয়া যায়, অগ্নিমান্দ্য তিরোহিত হয়, রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়, পাকা চুল কাঁচা হয়, টাকে কেশোদ্গম হয়, লোমচর্ম কোমল হয়, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়, কর্মশক্তি দ্বিগুণিত হয় এবং দেহের কান্তি ও লাবণ্য শতগুণ বর্ধিত হয়।

সুতরাং মিঃ বাসু সস্ত্রীক লেক ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন।

একদিনের কথা। বাসুদম্পতী প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বাসু সাহেবের পরনে হাফ-শার্ট, হাফ-প্যাণ্ট, হাত-ঘড়ি, মোটা মোজা, ক্যানভাসের জুতা, আর হাতে একগাছি চেরিকাঠের ছড়ি। মিসেসের পরনে আঁট-সাঁট করিয়া জড়ানো হালকা বেগুনি রঙের মাদুরা শাড়ি, ভয়েলের ছিটের ব্লাউজ, পায়ে গোড়ালি খোলা স্ট্র্যাপ-দেওয়া কালো বার্নিশ করা শ্লিপার, কানে ছোট্ট দুইটি দুল, গলায় সরু লকেট-হার, হাতে একখানি রঙিন রুমাল, কপালে একটি ছোট সিন্দুরের টিপ।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া লেক রোড দিয়া আসিয়া ল্যান্সডাউন রোড এক্স্টেনশন দিয়া সাদার্ন অ্যাভিনিউ পার হইয়া আসিতেই মিসেস বলিলেন দেখ, আমার শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই, তোমার সঙ্গে অত তাড়াতাড়ি হাঁটিতে পারছি না।

মিঃ বাসু বলিলেন, তবে চল, একটু আস্তে আস্তেই যাওয়া যাক। আস্তে হাঁটতে তো তোমার হাঁটাই হয় না।

তা হ'লে চল, আজ বরং বাড়ি ফিরে যাই।

না, তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। তুমি ডান দিক দিয়ে জোরে হেঁটে যাও, আর আমি বাঁ দিক দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটি। আবার এখানে এসে দুজনে একসঙ্গে ফিরলেই হবে। তুমি এসে আমার জন্যে একটু অপেক্ষা কর।

বেশ, সেই ভাল।

এই কথার পর মিসেস ক্লক-ওয়াইজ এবং মিস্টার কাউন্টার ক্লক-ওয়াইজ লেক ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন।

২

লেক ক্লাবের বাঁ দিক দিয়া মিসেস আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছেন, ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে, উদীয়মান সূর্যের ঈষৎ-রক্তাভ কিরণ মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে, আর সেই কিরণে কানের দুল দুইটি ও হাতের হীরার আংটিটি চিকচিক করিতেছে। ক্লাবের সীমানা পার হইতেছে সম্মুখে একটি আধ-যুবা আধ-প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়া মিসেস হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয়, তিনি ঐচিহ্নকপন্থী। ভদ্রলোক হাফপ্যান্ট-হাফশার্ট শোলা হ্যাট-সমন্বিত এবং মন্থর গতি, দ্রুতভাষী, মৃদুহাসি ও মুগ্ধদৃষ্টি। ইনিই প্রথম কথা বলিলেন, এই যে, আপনি ?

হ্যাঁ।

নমস্কার।

নমস্কার।

আপনি তো দেখছি বিবাহিতা। কই, একখানা নিমন্ত্রণ-পত্রও তো পেলাম না !

আপনার এখানকার ঠিকানাটা ঠিক জানা ছিল না।

জানা থাকলে নিমন্ত্রণ করতেন ?

নিশ্চয়ই। আপনি বুঝি এখনও বিয়ে করেন নি ?

এ যাত্রা ওটা বাকিই থেকে গেল।

কেন বলুন তো ?

তাও আবার জিজ্ঞেস করছেন, মানে জিজ্ঞেস করতে পারছেন ?

যাকগে। আপনি বুঝি রোজই বেড়ান ?

প্রায়ই। কিন্তু আপনি একা যে।

ক্ষতি কি ?

রোজই কি একা আসেন ?

না। আজও একা নই। উনি ঐদিক দিয়ে ঘুরে আসছেন।

আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন তো ?

নিশ্চয়ই দোব। চলুন, আমরা এদিক দিয়ে এগিয়ে যাই, পথেই ওর সঙ্গে দেখা হবে।

আমি দু'বার ঘুরেছি, আর পারছি না। চলুন, বরঞ্চ ঐ বেঞ্চিটায় একটু বাস, যতক্ষণ না মিস্টার এসে পৌঁছান।

তার চেয়ে বরং আস্তে আস্তে একটু এগোই, কি বলেন ?

ওঃ বুঝেছি। আপনার স্বামী বুঝি—

না, না, সেকি! তিনি আবার কি মনে করবেন? চলুন, তবে একটু বসাই যাক।

উভয়ে গিয়া তাল গাছের তলায় একটি বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হইলেন। আধ-যুবা আধ-প্রৌঢ় ভদ্রলোক অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং মিসেস ক্রমাগত, হাঁ, না, হুঁ, উঁহুঁ, বেশ, ও আচ্ছা, সেকি, নিশ্চয়ই, কক্ষনো না, যান, তাই নাকি, ছিঃ আবার, বটে, তাই তো, থাকগে, প্রভৃতি স্বল্পাক্ষর শব্দ দ্বারা উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

সময় কাটিতে লাগিল, বেলা বাড়িতে লাগিল, রৌদ্র উঠিতে লাগিল, বাতাস কমিতে লাগিল, মিসেস ঘামিতে লাগিলেন, মাথার কাপড় কাঁধের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল, মিসেস চঞ্চল হইতে আরম্ভ করিলেন, এবং উভয়ে পূর্বদিকে মিঃ বাসুর উদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

৩

কাউন্টার-ক্লক-ওয়াইজগামী মিঃ বাসু ছোট এবং বড় লেকের মাঝের পুল পার হইয়া মাড়োয়ারী ক্লাবের পাশ দিয়া একটু অগ্রসর হইতে জনৈকা আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলার সম্মুখীন হইলেন। মহিলাটিই প্রথম কথা বলিলেন, এই যে, আপনি!

হ্যাঁ, নমস্কার।

নমস্কার।

আপনি বুঝি এই অঞ্চলেই থাকেন?

হ্যাঁ। আপনি বিলেত থেকে ফিরলেন কবে?

এই তো মাত্র বছর খানেক হবে। আপনি মানে কিছু মনে করবেন না এখনও—

হ্যাঁ, এখনও আমি একাই আছি, আর তাই থাকব।

কেন বলুন তো?

তাও আবার জিজ্ঞেস করছেন, মানে জিজ্ঞেস করতে পারছেন? যাকগে, আপনি—

আমার কথা আর বলবেন না। জালে জড়িয়ে পড়েছি।

বেশ তো। কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্‌। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন না?

নিশ্চয়ই। তিনি লেকের ওপাশ দিয়ে এদিকেই আসছেন। চলুন, আমরা এগোই, সামনেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

আমি অনেক হেঁটেছি। আর পারছি না। বরঞ্চ এখানে একটা বেঞ্চিতে বসা যাক। উনি তো একটু পরেই এসে পড়বেন।

না, বরং আমরাও এগোই, মানে—

ওঃ বুঝেছি। আপনার স্ত্রী বুঝি—

না না, সে কি! তিনি কিছু মনে করবেন না। চলুন, ঐ আমতলার একটা বেঞ্চিতে একটু বসাই যাক।

উভয়ে গিয়া বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হইলেন। আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলা অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, আর মিঃ বাসু হ্যাঁ, না, অচ্ছা, বেশ তো, কিন্তু, নিশ্চয়ই, যান, উঁহু, যাকগে, কক্ষনো না, তাই নাকি, ইস, বটে, প্রভৃতি স্বল্পাক্ষর শব্দ দ্বারা উত্তর দিতে লাগিলেন।

সময় কাটিতে লাগিল, বেলা বাড়িতে লাগিল, রৌদ্র উঠিতে লাগিল, মিঃ বাসু ঘামিতে লাগিলেন, বার বার ছড়ি ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং উভয়ে সতৃষ্ণ নয়নে পূর্বদিকে মিসেসের উদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মিঃ বাসু অধৈর্য হইয়া বলিলেন, নাঃ, এইবার উঠে দেখা যাক, কেন এত দেরি হচ্ছে।

আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলাটি বলিলেন, কি লাভ? যদি আমাদের বিপরীত দিক দিয়ে আসেন, যেমন আসবার কথা, তা হ'লে তো এখানে বসেই দেখা হবে। আর আমরা যেদিক দিয়ে যাব, তিনিও যদি সেই দিক দিয়েই ঘোরেন, তবে তো সারাদিনেও দেখা হবে না। সুতরাং এখানে ব'সে অপেক্ষা করাই ভাল।

সুতরাং তাঁহারা বসিয়াই রহিলেন।

৪

যখন মিঃ বাসু আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলাটির সহিত আমতলায় এবং মিসেস আধ-যুবা আধ-প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সহিত তালতলায় বসিয়া ঘামিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের লেকরোডের বাড়িতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ছেলে-বউকে এত বেলাতেও ফিরিতে না দেখিয়া পিতা এবং মাতা উভয়েই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত বিবিধ লৌকিক ঘটনা মনে করিয়া আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঝি বলিল, গত রাত্রে বউ-

দিদির মুখখানা ভার-ভার দেখাচ্ছিল। পুরাতন চাকর বলিল, গত রাত্রে শুইতে যাইবার আগে দাদাবাবুর মুখখানা খুব শুকনো দেখাচ্ছিল। কি সর্বনাশ! তা হ'লে কি—

থানায় খবর গেল। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল। কলিকাতায় যে-সব আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল। ছেলের শ্বশুর-বাড়ি সম্পর্কিত যাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে খবর পাঠানো হইল।

বেলা দশটার মধ্যে বাসুর বাড়ি লোকে ভরিয়া গেল। বিভিন্ন পুরুষ ও নারী বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করিতে লাগিলেন। আধুনিকপন্থী জনৈক কুটুম্ব বলিলেন, যত সব ছেলে-ছোকরার কাণ্ড! বেরিয়েছে কোথায় ট্যাক্সি ক'রে বেড়াতে। খাবার সময় হ'লেই সুড়সুড় করে বাড়ি ঢুকবে। শুধু শুধু এত সব হাঙ্গামা! বাগবাজারের বনেদী ঘরের জনৈকা মহিলা একসঙ্গে চারটি পান এবং এক আউন্স দোক্তা গালে পুরিয়া দিয়া বলিলেন, যখন বালিগঞ্জে বাড়ি করে, তখনই পই পই ক'রে মানা করেছিলাম, শুনলে তো না।

সাড়ে দশটার সময়ে লেক রোড হইতে অভিযান শুরু হইল। প্রথমে তিনখানা ছয়-সিলিণ্ডার মোটর গাড়ি; তারপরে একখানা অ্যামবুল্যান্স; তারপর একখানা ট্যাক্সিতে পুলিশের লোক; তারপরে ডাক্তারের গাড়ি; তারপরে একখানি গাড়িতে একটি লেডি ডাক্তার, দুইটি নার্স ও দুইটি ঝি; তারপরে একখানি গাড়িতে একখানি প্রকাণ্ড জাল এবং তিনটি বলিষ্ঠ জেলে; তারপরে সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার ও ফোটোগ্রাফার; সর্বশেষে নারীরক্ষা-মণ্ডলীর জনৈক প্রতিনিধি এবং তাঁহার সহকর্মিণী।

সাদার্ন অ্যাভেনিউ পার হইয়া অভিযানটি দ্বিধাবিভক্ত হইল। এক ভাগ ক্লক-ওয়াইজ এবং অপর ভাগ কাউণ্টার-ক্লক-ওয়াইজ যাত্রা করিল।

একটু পরেই ক্লক-ওয়াইজ গামী একখানি মোটর গাড়ি হইতে বাগবাজারের বনেদি মহিলাটি বলিয়া উঠিলেন, ওই যে আমাদের শৈলী, কিন্তু সঙ্গে ওটি কে?

ওদিকে কাউণ্টার-ক্লক-ওয়াইজ গামী একখানি গাড়ি হইতে মিঃ বাসুর মাতাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, ওই যে আমাদের খোকা! কিন্তু সঙ্গে ওটি কে?

৫

লেক রোডের বাড়িখানিতে আজ সারাদিন সমাগত ও সমাগতাদিগের হৈ-হৈ-রৈ-রৈ চলিতে লাগিল। বন্ধু, বান্ধবী, আত্মীয়, আত্মীয়া প্রতিবেশী প্রভৃতির আলোচনা, সমালোচনা, মন্তব্য, কটাক্ষ, ব্যঙ্গ, ভর্ৎসনা, উপদেশ প্রভৃতির বন্যায় বাড়িখানি ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল এবং তন্মধ্যে খোকা ও শৈলী গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিয়া এবং পলাইয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিল।

রাত্রে মিঃ বাসু বলিলেন, আচ্ছা, তোমার আক্কেলটা কি, শুনি? বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত লেকের ধারে বেঞ্চিতে ব'সে না থেকে বাড়ি চ'লে এলেই তো পারতে! তা হ'লে এই হুলস্থুলটা হ'ত না।

মিসেস বলিলেন, তোমারই বা আক্কেলটা কি? অতক্ষণ পর্যন্ত আম-তলায় ব'সে না থেকে একটু দেখলেই পারতে; স্ত্রীটির কি হ'ল! তুমিও তো বেশ নিশ্চিন্তই ছিলে!

উভয়ে উভয়ের প্রতি ভীষণ চটিলেন, অথচ কেহই কাহাকেও যুক্তি দ্বারা পরাস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং চটিয়াই রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, কণ্টকেনৈব কণ্টকম, মানব-মনের আদিম শত্রুটি দ্বিতীয় শত্রুটিকে পরাভূত করিয়া ফেলিল।

খোকা গম্ভীর ঐচ্ছিক স্বরে বলিলেন, আমার ইচ্ছে আমরা এক পথেই চলি।

শৈলী একান্ত বিনীত ও অনুগত আর্বশ্যিক সুরে বলিলেন, আমারও।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

ত্রিলোচন কবিরাজ

আর কোনও শব্দ কানে আসিতেছিল না, শুধু পায়ের খড়ম জোড়ার সঙ্গে ফুটপাথে ঘর্ষণের ফলে অবিশ্রাম নানা ছন্দে খটাস্-খটাস্ ধ্বনি উঠিতেছিল, তাহাই শুনিতে শুনিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চলিতেছিলাম। সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ মনে হইতেছিল। সকালে 'জেণ্টস রেস্তোরাঁ ডিলাক্স'-এ এক পয়সায় এক কাপ চায়ের সঙ্গে তিন দিনকার বাসী রুটির একখানা পোড়া টোস্ট খাইয়াছিলাম। ক্রমাগত তাহারই ঢেঁকুর উঠিতেছিল। সমস্ত দিন বাড়ি ফিরিব না সংকল্প লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু কোথায় দিন কাটাইব স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। পরিচিত দুই একটি বন্ধুর বাড়ি কাছেই ছিল, যাইতে পারিতাম। কিন্তু মনে মনে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের উপর কেমন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কাহারও কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। দুই একটি ঝি বাজার লইয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেল, ফিরিয়াও চাহিলাম না। প্রতি মুহূর্তেই মন উত্তরোত্তর সংসারে বীতরাগ হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত জগৎটাই যদি কেওড়াতলা অথবা কাশীমিত্রের ঘাট হইয়া যাইত তাহাতেও কোনো আপত্তি ছিল না।

সহসা পথের ধারের একটি ঘরের মধ্যে পুরুষের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। জানালা দিয়া দেখি অনেকগুলি লোক। কেহ সরবে কাঁদিতেছে, কেহ রুমালে চোখ মুছিতেছে। কেহ মরিয়াছে মনে হইল, কিন্তু বাড়ির সম্মুখে খাটিয়া দেখিলাম না। উপরে চাহিলাম—দেখিলাম বাড়িখানার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা সাইনবোর্ড—তাহাতে সোনালী অক্ষরে লেখা 'প্রেমার্তিহরণ ঔষধালয়', তাহার নীচে লেখা—শ্রীত্রিলোচন কবিরাজ। ঔষধালয় ও কবিরাজ উভয়কেই নূতন মনে হইল, কাজেই কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু অচিরাৎ বুঝিলাম ভুল করিয়াছি, কবিরাজ এবং ঔষধালয় কোনোটিই নূতন নহে, যেহেতু সাইনবোর্ডের সোনালী অক্ষরে কালো দাগ পড়িয়াছে এবং সদরের যে ঘরে রুদ্যমান জনগণকে দেখিলাম তাহারই পাশে একটা বড়ো হল ঘর, তাহার আসবাবপত্রও অতি পুরাতন এবং ফরাসের একশ একটি স্থানে কালি এবং তেলের দাগ; ক্যাশবাক্সের সম্মুখে যে লোকটি বসিয়াছিলেন তিনিও অতি প্রাচীন। বুঝিলাম এইটি কবিরাজ মহাশয়ের ডিস্‌পেনসারী। ক্যাশবাক্স-রক্ষক ভদ্রলোকটি আমাকে আগ্রহের সঙ্গে দেখিতেছিলেন, সহসা ডাকিলেন, "আসুন ভিতরে আসুন।"

ভিতরে ঢুকিয়া ফরাসে বসিলাম। দেয়ালে একখানি প্রকাণ্ড আকারের মদনভস্মের অয়েলপেন্টিং ছিল, সেইখানি দেখিতেছি এমন সময় ভদ্রলোকটি কহিলেন, "জানেন তো বাড়িতে ব্যবস্থা নিলে দর্শনী আট টাকা?"

কহিলাম, "কিসের দর্শনী"?

"কবরেজ মহাশয়ের। ব্যাধি অবশ্য আপনার তিন দিনেই নির্মূল হবে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী।"

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছেন বুঝি? ব্যাধি আমার নেই।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "অবশ্য আছে। এই ব্যাধি নেই এমন পুরুষ এবং নারী জগতে নেই মশাই, রাজা-রাজড়া থেকে—"

কথা সমাপ্ত হইতে দিলাম না। বিদ্রূপ করিয়া কহিলাম, "আপনি অন্তর্যামী দেখছি।"

বৃদ্ধ নির্বিকার ভাবে কহিলেন, "প্রায়, এই তেষট্টি বছর বয়স হল মশাই, আঠারো বছর থেকে কবরেজ মশায়ের কম্পাউন্ডারী করছি। প্রত্যহ গড়-পড়তায় তিন-শ রোগীকে ওষুধ দেই। বর্ষা আর বসন্তে এই রোগী হয় দুশো। ত্রিশটি ছেলে মোড়ক বেঁধে অবকাশ পায় না, নিজে দেখছি তো

কবরেজ মশায়ের ওষুধ নইলে কারো চলে না। আর আপনি কিনা—"

একটু সম্ভ্রম হইল, কহিলাম, "কি ব্যাধির কথা বলছেন জানলে—"

বৃদ্ধ কহিলেন, "'সাইনবোর্ড' দেখেন নি? যাবতীয় প্রণয়ঘটিত ব্যাধির চিকিৎসা এখানে ওষুধ এবং মুষ্টিযোগ সহযোগে করা হয়। দর্শনী আট টাকা ওষুধ বিনামূল্যে। এর চেয়ে সুবিধে পাবেন কোথাও?"

শিরোঘূর্ণন, হৃৎকম্প প্রভৃতি প্রণয়ঘটিত অনেক প্রকার ব্যাধির নামও তাহার বহুবিধ পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন বড়ো বড়ো মাসিক ও সংবাদ পত্রে অবশ্য দেখিয়া আসিতেছি, এ পর্যন্ত তাহার প্রয়োজন হয় নাই। আর আজ বৃদ্ধ কহিলেন, "ভাবছেন? ভাবছেন বুঝি কোনোও ব্যাধি নেই আপনার? কবরেজ মশায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই বুঝতে পারবেন ব্যাধি আছে কিনা, আপনার আর বয়স কি মশাই, আমি শ্রীবলরাম রসনিধি, পাঁচ পাঁচটি স্ত্রীকে নিমতলার ঘাটে পার করেছি, এই তেষট্টি বছর বয়স, এখনও আমাকে মাঝে মাঝে কবরেজ মশায়ের কাছে ব্যবস্থা নিতে হয়।" প্রতিবাদ করিলাম না, কিন্তু মনে হইল হয়তো ব্যাধি আমারও কোথাও আছে। গৃহিণীর সহিত ঝগড়া করিয়া আসা অবধি মাথাটা টনটন্ করিতেছিল, ভাবিলাম হয়তো এটাও প্রণয়ঘটিত কোনো ব্যাধি হইবে, কিছু জিজ্ঞাসা করিব এমন সময় রসনিধি মহাশয় সসম্ভ্রমে কহিলেন, "ওই কবিরাজ মহাশয় আসছেন!" পরক্ষণেই হুঁকা হাতে ত্রিলোচন কবিরাজ মহাশয় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে। মাথার সম্মুখের দিকে চুলের উৎপাত নাই, পিছনে কয়েক গুচ্ছ শুভ্র কেশ, তাহাতে একটি ধুতুরা ফুল। কবিরাজ মহাশয়ের ললাটে একটি যাত্রার দলের মহাদেবের ধরনে ললাট নেত্র আঁকা, তাহার মধ্যে একটি রক্ত-চন্দনের অক্ষিতারকা। ফরাসে বসিয়াই কবিরাজ মহাশয় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কেন জানি না, আমি চোখ বুঝিলাম, কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "ভয় নাই, আরোগ্য হবে।" পরে হুঁকায় টান দিয়া কহিলেন, "রোগীগণকে উপস্থিত করো মাধাই!" কবিরাজ মহাশয়ের আহবান শুনিয়া গুটিকয়েক অল্প বয়সের শিক্ষার্থী ডিস্‌পেন্‌সারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া রোগীদের বসিবার ঘরে চলিয়া গেল। আমি ফরাস ছাড়িয়া একটি টুলের উপর গিয়া বসিয়া সতৃষ্ণনেত্রে রোগীদের ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রোগীদের ঘর হইতে নানারূপ গুঞ্জন দীর্ঘশ্বাস অস্ফুট স্ফুট রোদন শুনিতে পাইলাম। তাহার পরই কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্রদের কাঁধে ভর দিয়া

রোগীরা আসিতে শুরু করিল। একি! প্রায় যে সকলেই আমার পরিচিত। রসনিধি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দেখিতেছি মিথ্যা নহে। রাজনৈতিক নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিকপত্র-সম্পাদক পর্যন্ত সর্ববিধ ব্যক্তিই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে সকলেই কাঁদিতেছেন, কিন্তু কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছেন না। অতি বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের বালক পর্যন্ত রোগ দেখাইতে আসিয়াছে। একটা প্রশ্ন মনে জাগিল, উঠিয়া রসনিধি মহাশয়ের কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কহিলেন, "হাঁ মেয়েরাও আছেন, তবে তাঁরা দোতলায়। এঁদের ব্যবস্থার পর তাঁদের ব্যবস্থা হবে।"

কবিরাজ মহাশয় হাঁকিলেন, "অগ্রে অল্প বয়স্কগণকে উপস্থিত করো।" একসঙ্গে পাঁচ-সাতটি স্কুলের ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া ফরাসে বসিল। কবিরাজ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "পরীক্ষায় ফেল করিয়াছ ?"

সকলেই সমস্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর দিল, "হুঁ।"

কবিরাজ মহাশয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। রসনিধির দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "প্রাতে মোহমুদ্গর গুড়িকা একমাত্রা, পথ্য উপবাস।" ব্যবস্থাপত্র লইয়া ছেলে কয়টি দর্শনী দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এইবার বয়স্ক রোগী আসিতে শুরু করিলেন। প্রথমে যিনি আসিলেন তাঁহাকে চিনিতাম না। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কবিরাজ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেশা কি ?"

ভদ্রলোক কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিলেন, "পত্রিকার সম্পাদক।"

"হুঁ! কবিতা ছাপা হয় ?"

"আজ্ঞে তাতেই তো– "

"হুঁ! লেখিকার কাছে পত্রলিখন কার্য করা হইয়াছে ?"

"আজ্ঞে! তাঁর জবাব পেয়েই তো—" বলিয়াই ভদ্রলোক আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি কবিরাজ মহাশয়ের অভ্রান্ত নির্দেশ দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম! কবিরাজ মহাশয় হাত বাড়াইয়া রোগীর নাড়ী দেখিলেন। তাহার পর কহিলেন, "ব্যবস্থা—প্রাতে ও সন্ধ্যায় অশ্রুভৈরব বটি, মধ্যাহ্নে সংকল্প প্রণয়ান্তক।" তাহার পর রোগীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "পত্রিকা সম্পাদনা ত্যাগ করো।" এই সময় ক্ষীণ একটি আর্তনাদ শুনিলাম। পরক্ষণেই মাধাই আসিয়া জানাইল যে, দ্বিতলে একটি রোগিণীর মূর্ছা হইতেছে।

ত্রিলোচন কবিরাজ উঠিলেন এবং একটিপ নস্য নাসারন্ধ্রে টিপিতে টিপিতে দ্বিতলে চলিয়া গেলেন, এই অবসরে আমি রসনিধি মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিয়া কহিলাম, "যদি কিছু মনে না করেন—"

রসনিধি কহিলেন, "আদৌ মনে করব না প্রশ্ন করুন।"

ত্রিলোচন কবিরাজের জীবন কাহিনী শুনিবার জন্য দুর্নিবার আগ্রহ হইতেছিল। কহিলাম, "কবিরাজ মহাশয়কে অনেক দিন থেকেই জানেন আপনি। তাঁর সম্বন্ধে—"

রসনিধি কহিলেন, "ত্রিলোচন কবরেজের কথা জানেন না আপনি? আচ্ছা, সংক্ষেপে শুনুন তবে। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, কবরেজ মশাই পড়তেন সিদ্ধান্ত কৌমুদি, আমরা পড়তাম মুগ্ধবোধ। অকস্মাৎ একদিন গ্রামের রজকনন্দিনী ধৈর্যময়ী ত্রিলোচন কবরেজের নামে অভিযোগ করল যে, তিনি তার অঙ্গ স্পর্শ করেছেন। অধ্যাপক মশাই চতুষ্পাঠী থেকে তাঁকে বিদায় দিলেন। ত্রিলোচন কবরেজ সেই থেকেই সংসার ত্যাগ করেন। তারপর এ দেশ সে দেশ ঘুরে দেখলেন যে, জগতে প্রেম ব্যাধিই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তখন জীবহিতের জন্য এই ব্যাধির ওষুধ খুঁজতে তিনি গেলেন হিমালয়। সেখানে সিদ্ধবাবা মদনমথনজীর নিকট দীক্ষা নেন, তিনিই তাঁর প্রেম ব্যাধি আরাম করেন। তারপর গুরুর আদেশে তিনি লোকহিত সাধনের জন্য গুরুদত্ত ওষুধ পত্তর নিয়ে সংসারে আসেন এবং এই ডিসপেন্সারী খোলেন। তাঁর ছাত্রেরা কেউ বিবাহ করতে পারে না; তবে আমার পৈতৃক বৃত্তি বলে আমার সম্বন্ধে তাঁর অন্য ব্যবস্থা ছিল। তা তাঁর কৃপাতে হোক আর ভাগ্য বলেই হোক পাঁচ পাঁচটার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। গুরু হে তুমিই সত্য।" বলিয়া রসনিধি হাত জোড় করিয়া তাঁর উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। এই সময় কবিরাজ মহাশয় আবার আসিয়া ফরাসে বসিলেন। এইবার আমিও ভক্তিভরে কবিরাজ মহাশয়ের পদধূলি লইলাম। কবিরাজ মহাশয় মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রোগীরা তখনও কাঁদিতেছিল। ত্রিলোচন কবিরাজ হাঁকিলেন, "চুপ!" ক্রন্দনধ্বনি থামিয়া গেল, শুধু ফোঁসফোঁসানি শোনা যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় রোগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স বছর পঁচিশ, গায়ে একটা রঙিন পাঞ্জাবী, চোখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ। ফরাসে বসিয়াই ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজের খোলা নস্যদানি হইতে খানিকটা নস্য ফরাসে উড়িয়া পড়িল, কবিরাজ

মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর রোগীর নাড়ি দেখিয়া কহিলেন, "রোগের বিবরণ বর্ণনা কর।"

কেমন করিয়া পাশের বাড়ীর ছাদে শাড়ি শুকাইতে দেখিয়া তাঁহার রোগের প্রথম সূত্রপাত এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনিদ্রা অরুচি দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, ভদ্রলোক তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শেষে গত সন্ধ্যায় শাড়ির অধিকারিণী তাহার মাথায় 'ছাদ' হইতে একঝুড়ি তরকারির খোসা ফেলিয়া দেওয়াতে অনেকগুলি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিতা রচনা করিবার প্রবৃত্তি তাহার অন্যতম। এই পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া পকেট হইতে একটি কলার খোসা কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রোগী পুনরায় কহিলেন, "তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রেখেছি আমি—খোসা নয়, এ ফুল।" কবিরাজ মহাশয় তাহার হাত হইতে খোসা লইয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সেটা ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হুঁ, জঞ্জাল প্রক্ষেপকারিণীর বয়স কত?" রোগী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ষোলো, ষোলো, Sweet—"

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিয়া কহিলেন, "চুপ! ব্যবস্থা—কিশোরী কালানল প্রাতে; সন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাসারি ঘৃত, বুকে মালিশ। যাও দক্ষিণের বাতায়নে একটু স্থূল যবনিকা প্রলম্বিত করো গে।"

ইহার পর ক্রমাগত রোগীরা আসিতে লাগিলেন; একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম যে, সকলেই অসংকোচে সকলের সম্মুখে রোগের গূঢ় নিদান উদ্ঘাটন করিতেছে। লজ্জার লেশমাত্র কাহারও নাই। বৃদ্ধ অনুকূল চক্রবর্তীকে চিনিতাম। চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে তিনি সম্প্রতি বিশ্বম্ভর পাকড়াশীর প্রৌঢ়া পত্নীকে দেখিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছেন এবং এদিকে পাকড়াশী মহাশয় অনুকূলবাবুর চতুর্থপক্ষের সহধর্মিণীকে কাশীবাস করাইবার সংকল্প করিয়াছেন—সংকল্পের ফলে তাঁহার অরুচি ও শিরঃশূল ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়াছে। উভয়ের রোগের এই পারিবারিক গোপন নিদানের কথা উভয়ে পরস্পরের সম্মুখেই বর্ণনা করিয়া গেলেন, বলিতে বাধিল না। দেখিয়া ত্রিলোচন কবিরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি আমার ভক্তি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল।

রোগী ক্রমাগত আসিতেছে, ব্যবস্থা লইতেছে, বিরাম নাই। এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিল দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ঝড়ের মতো একজন ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। 'বাস্তবিকতা'র অন্যতম সদস্য রাতুল রাহা!

সহসা রাতুল রাহা হরিকুমারের স্বপ্নরাজ্য হইতে বাস্তব শহরে আসিলেন কি করিয়া। ঘরসুদ্ধ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ। যে সকল রোগীরা ক্ষণকাল পূর্বেও ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন তাঁহারাও নবাগত রোগীর অবস্থা দেখিয়া কৌতূহলে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজ রাতুল রাহার দিকে একবার চাহিলেন তাহার পর উঠিয়া আলমারি হইতে বেল কাঠের স্টেথস্কোপটি বাহির করিয়া রাতুল রাহার বুকে লাগাইলেন। রোগী চিৎকার করিয়া উঠিলেন "ব্যথা! ব্যথা! বুক আর নেই।—ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কবরেজমশাই।"

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিলেন, রোগী চুপ করিলেন। নাড়ি পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "হুঁ। রোগ জটিল।"

রাতুল রাহা হতাশ হইয়া কহিলেন, "সারবে কি! না ফাঁদে বন্ধ হয়ে—" ত্রিলোচন কবিরাজ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় নাই। অবস্থা বলো।" রোগী কহিলেন, "অবস্থা নেই আর। হৃদয়ের নাভিশ্বাস উঠেছে।" ত্রিলোচন কবিরাজ চক্ষু মুদিয়া কহিলেন, "হুঁ। বলো।"

রাতুল রাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "প্রেম আমার বুকে নীড় বেঁধেছিল সেই ছোট বেলা থেকে। সেই নীড়ে হাজারো প্রেমপাখি ডিমফুটে বেরিয়েছে। তারা জগৎ ঘুরে সবাই এখন হৃদয় খাঁচায় আসতে চায়। কিন্তু ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই!" বলিয়া রাতুল রাহা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ত্রিলোচন কবিরাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "স্পষ্ট করে বলো।" রাতুল রাহা যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে, একাদিক্রমে উনিশটি কুমারীকে তিনি প্রেমনিবেদন করিয়াছেন। পরে নিবেদিতাগণের অভিভাবক এবং অভিভাবিকারা সন্ধান পাইয়া রাহা মহাশয়কে 'বাস্তবিকা' হইতে কুমারীগণের প্রেমার্থ গ্রহণ করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছেন; ফলে তাঁহার ইহলৌকিক জনক-জননী শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘটক বলিতেছেন যে, রাহা মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এক বৎসরে একান্নটি বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং যথোপযুক্ত মর্যাদা পাইয়াছিলেন। শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুরেরা অত্যন্ত খুশি হইয়াছেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া একটা আসন্ন সুতহিবুক যোগের সন্ধান করিতেছেন।

ত্রিলোচন কবিরাজ খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "রোগ জটিল। রীতিমতো চিকিৎসা আবশ্যক।" তাহার পর চক্ষু মুদিত করিয়া ব্যবস্থা বলিতে লাগিলেন, "প্রাতে বৃহৎ প্রেমাঙ্কুশ-লৌহ পূর্ণমাত্রা ও পুরোহিত-নিসূদন রস অর্ধবটি; মধ্যাহ্নে বিবাহ-বিদ্রোণ রস ও সন্ধ্যায়

ঘটকাশনিও খট্টাঙ্গাবলেহ। পথ্য প্রথম তিন দিবস লঙ্ঘন পরে অবস্থা মতো।" ব্যবস্থা মতো ঔষধ লইয়া যখন রাহা মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন তখন হরিকুমারের বর্তমান সংবাদ শুনিবার অভিপ্রায়ে আমিও উঠিলাম। ত্রিলোচন কবিরাজ পিছন হইতে ডাকিলেন, "অপেক্ষা করো।" ফিরিলাম, কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "তোমাকে আমার একটু প্রয়োজন আছে।" বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত রোগী বিদায় লইয়া গেল। তখন ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, "তোমাকে এই প্রথম দেখিলাম কিন্তু তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ মমতার সঞ্চার হইয়াছে, যেহেতু দেখিতেছি এই ব্যাধি তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। কিন্তু দেখিলে তো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, খ্যাতিমান, ধনী দরিদ্র কেহই এই নিদারুণ প্রেমব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পান নাই। আমি যদি তোমাদের শহরে চিকিৎসালয় না খুলিয়া বসিতাম তাহা হইলে কি হইত তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। প্রথম যৌবনে এই ব্যাধি আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, গুরুদীক্ষা লইয়া উদ্ধার পাইয়াছি কিন্তু এখনও আমার মাঝে মাঝে তোমাদের নূতন নূতন উপন্যাস ও কবিতার বই পড়িয়া আবার দুই একটি উপসর্গ দেখা দিতেছে। কাজেই গ্রন্থপাঠ একরকম বর্জন করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এই দারুণ সংক্রামক ব্যাধি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তোমরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িতেছ বলিয়াই বোধ হয় এত শীঘ্র রোগগ্রস্ত হও। পূর্বে যেখানে কণ্ঠাশ্লেষ ব্যতীত রোগোৎপত্তি হইত না সেখানে এখন একটি কটাক্ষই দেখিতেছি যথেষ্ট— আবার স্কুল কলেজ এবং তোমাদের মধ্যে শাড়ির আঁচল ও চাবির গুচ্ছ পর্যন্ত রোগজীবাণু ছড়াইতেছে। ভবিষ্যতে পদশব্দ শুনিয়াই তোমরা মূর্ছা যাইবে।"

লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলাম, পকেটে পয়সা না থাকিলে এখনও গৃহিণী আসিবার শব্দ শুনিলে মূর্ছার উপক্রম হয়, তাহা আর বলিতে পারিলাম না। ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, "তুমি অদ্য যাও। তুমি রোগগ্রস্ত হও নাই সুখের কথা, কিন্তু এ ব্যাধিসংকুল নগরে যেখানে মেয়ে স্কুলের গাড়ি হইতে বায়োস্কোপের ছবি পর্যন্ত এই দারুণ রোগের জীবাণু বহন করিতেছে, সেখানে রোগগ্রস্ত হইতে বেশি সময় লাগে না। সাবধানের বিনাশ নাই, কাজেই প্রতিষেধক মদনমর্দক বটি ও কটাক্ষারি অঞ্জন লইয়া যাও। সপ্তাহে একটি করিয়া বড়ি শীতল জলসহ সেবন করিবে ও প্রত্যহ চোখে কটাক্ষারি অঞ্জন একবার করিয়া লাগাইবে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, রোগিনীরা অপেক্ষা করিতেছেন।"

আমি প্রণাম করিলাম। কবিরাজ মহাশয় পুনরায় মোহমুদগর আবৃত্তি করিতে করিতে দোতলায় চলিয়া গেলেন।

বাহির হইয়া প্রথমে দ্রুতপদে কাশীমিত্রের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজল অনুপানে ত্রিলোচন কবিরাজের একটি বটি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজন সংক্রান্ত সর্বপ্রকার চিন্তা তিরোহিত হইল, গৃহিণীর কথাও ভুলিয়া গেলাম, মনে হইতে লাগিল জগতে আমি একাকী—আমার কেহ নাই, কেহ নাই, কেহ নাই। সম্মুখে দুর্গতিনাশিনী গঙ্গা খল্ খল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতে লাগিলেন।

পরিমল গোস্বামী

প্রতিহিংসা

ত্র্যহস্পর্শ ঘটে তিথির যোগাযোগে, তিন পুরনো বন্ধুর মিলন ঘটল রেলের যোগাযোগে। তিনবন্ধু—সীতেশ সিংহ, ব্রজদুলাল বাগ, আর হলধর হাতী। অন্য সবাই এই পাশবিক পদবী নিয়ে ওঁদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করাতে ওদের মধ্যে এক ধরনের বাধ্যতামূলক বন্ধুত্ব ঘটেছিল এককালে। কিন্তু সে কাল কতদিন হল পার হয়ে গেছে।

দশ-পনেরো বছর পরস্পর দেখা নেই। দুজন সপরিবার হাওয়া বদল থেকে ফিরছিলেন, একজন শ্বামীর বাড়ি থেকে। মিলন হল নাগপুর লাইনের গাড়ীতে।

গাড়ীতে বসে বসেই পুরনো দিনের কত কথা, কত স্মৃতির রোমন্থন চলছিল। তবু প্রত্যেকেরই মনে হল, আগের মতন আর জমছে না। সবই এখন বৈষয়িক কথা, পারিবারিক কথা, জমির কথা—হিসাব আছে, রস নেই। পরস্পরের প্রতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেমন যেন একটা ঈর্ষার ভাব। গুমোর রেখে কথা। হৃদয় খুলল না কারোই, যদিও দেখা হবার পর মেয়েদের একপাশে সরিয়ে দিয়ে তিনবন্ধু একটুখানি নিবিড় হয়ে কাছাকাছি বসেছিলো।

গাড়ী ঘাটশিলা ছেড়ে চলেছে।

এতক্ষণ পরে সীতেশ সিংহ একটা নতুন প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। বললেন, 'একটা কথা মনে এলো। এইখানে কোথায় যেন বছর তিন চার আগে একটা বড় রেল কলিশন হয়েছিল না ? জায়গাটা ঠিক কোথায় মনে করতে পারছি না।'

কিন্তু জায়গাটা কারোই মনে পড়ল না।

বাগ বললেন, 'উঃ, কত লোক মারা পড়ল সেদিন, এবং অকারণে।'

প্রসংগটা নিজেদের ছেড়ে অন্যদের দিকে সম্প্রসারিত হওয়াতেই প্রত্যেকেই মনে মনে একটা আরাম অনুভব করলেন।

সিংহ বললেন, 'আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গেই মনে দপ্ করে জ্বলে উঠল কেন বুঝি না। কথাটা বলেছিল অ্যারিস্টটল।'

হাতী প্রশ্ন করলেন—কথাটা কি ? খুব দামী নিশ্চয় ?

সিংহ সে কথায় উত্তর না দিয়ে কিছু লজ্জিত ভাবে আগের কথার জের টেনে বললেন—'না, না, আমার ভুল হয়েছে। অ্যারিস্টটল নয়, কথাটা বলেছেন আমাদের তালতলার দ্বিজু মুন্সী। তিনিও বিজ্ঞ লোক।'

অ্যারিস্টটলের নামে যদি বা কাজ হত, দ্বিজু মুন্সী নামক অজ্ঞাত পরিচয় লোকের নামে অপর দু'জনের উৎসাহ নিভে গেল। তবু বাগ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কথাটা কি, তা তো বললে না ?'

সিংহ এ প্রশ্নে মনে মনে একটু গর্বিত হয়ে উঠলেন। যেন তাঁরা প্রার্থী, তিনি দাতা।

বললেন—'দ্বিজু মুন্সীর মতে—যে যেমন মরণ চায়, তার তেমনই মরণ ঘটে।'

বাগ তো এ কথা শুনে যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। এত বড় একটা বাজে কথা শোনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জানালার বাইরে মাথা বার করে প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগলেন।

হাতীর মনেও অবিশ্বাস। তিনি বললেন, 'এও আবার হয় না কি ? ধর, যাকে বাঘে খেল, সে কি বাঘের হাতে মৃত্যু চেয়েছিল ?'

হাতী সম্ভবত বাঘের দৃষ্টান্তটা বাগকে লক্ষ্য করে বলেন নি। কিন্তু কথাটা বাগের কাছে বড়ই সন্দেহজনক একটি ইংগিত বলে বোধ হল। তাঁর মাথাটা বাইরে থাকলেও কথাটা ঠিক কানে প্রবেশ করেছে। তিনি মাথাটা আরও খানিকটা বাইরে মেলে ধরলেন।

সিংহ বললেন, 'অবচেতন মনে কে কি চায় বা না চায়, বাইরে থেকে তার বিচার করা চলে না।'

বাগের কান যথেষ্ট বাইরে থাকা সত্ত্বেও এ কথাটাও তাঁর কানে প্রবেশ করল। তখন তিনি মাথাটা ভিতরে টেনে এনে মহা বিরক্তির সুরে বললেন, 'ঐ এক কথা হয়েছে আজকাল, ঐ অবচেতন মন। ওটা স্রেফ ধোঁয়া। ওই ধোঁয়ার আড়ালে আসল সত্যটা চাপা পড়ে।'

সিংহ এ কথায় খোঁচাটা অনুভব করলেন, কিন্তু তবু একটু হেসে বললেন, 'বিজ্ঞানের অনেক কথা ও-রকম মনে হয় সত্যিই, কারণ এ-সব কথা বুঝতে হলে একটুখানি ধৈর্য দরকার—' বলে তির্যক দৃষ্টিতে বাগের দিকে একবার চাইলেন। দেখলেন ঝড়ের মেঘের আভাস ফুটে উঠেছে। তাই পরিস্থিতিটা একটু সরল করার জন্যে একটুখানি জোরের সংগে বললেন—'এই যে সেদিন আমাদের বৈকুণ্ঠ বোস মারা গেলেন, তাতেও তো দ্বিজু মুন্সীর কথাই প্রমাণ হচ্ছে। হচ্ছে কি না?'

কিন্তু বৈকুণ্ঠ বোস কে এবং কিসেই বা তিনি মারা গিয়ে দ্বিজু মুন্সীর কথা প্রমাণ করলো, তা ওঁরা দুজন বুঝতে পারলো না।

হাতীই প্রথম বলে উঠলেন, 'বৈকুণ্ঠ বোস? তিনি আবার কে? না জেনে উত্তর দেবো কি করে?'

সিংহ একটু নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি শান্তভাবে বললেন, 'নাম না জানা আশ্চর্য নয়। তিনি পড়াশুনা নিয়েই ঘরে বন্ধ থাকতেন। তাঁর ঘরে বই আর বই।'

বাগের একটু ব্যাকরণ-প্রীতি ছিল এককালে। তিনি বলে উঠলেন, 'বই নিয়ে থাকতেন অথচ তার নাম বৈকুণ্ঠ? এমন মানুষের তো বইতেই সব চেয়ে বেশি কুণ্ঠা থাকা উচিত—' বলে নিজেই খানিকটা হাসলেন।

হাতী বিরক্ত হলেন। বললেন, 'তোমার ঐ ভাষাতত্ত্ব এখন কিছুক্ষণ একটু সিকেয় তুলে রেখে তারপর কি হল শোন।'

সিংহ বলতে লাগলেন, 'বৈকুণ্ঠবাবু অবিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুর সময় বয়স ষাট বছর পার হয়েছিল।'

হাতী প্রশ্ন করলেন, 'বিয়ে করেন নি কেন? সাধক ছিলেন বুঝি?'

—'না, স্বাধীনতা ভালবাসতো খুব।'

—'ও! বুঝেছি ইংরেজদের সংগে লড়াই করতে হয়েছে বোধ হয়? ওঃ সে কি দিনই গিয়েছে! সেই বারীন ঘোষের যুগ থেকে—'

—'না, সে সব কিছু না। তিনি বলতেন—বিয়ে না করার সুবিধা কি জান? যখন যেমন ইচ্ছা, বিছানার যে কোন পাশ দিয়ে নীচে নামা যায়।

এত বড় স্বাধীনতা আমি বিয়ে করে হারাতে চাই না।'

হাতী বললেন, 'কথাটা তো খুব ভালো বলেছেন তিনি। আর হাতী, তোমার তো এটা অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা উচিত ছিল, তোমার তৃতীয় পক্ষ চলছে। প্রত্যেক দু'টি বিয়ের মধ্যে তুমি ইণ্টারভ্যাল পেয়েছ, তাতেও বিষয়টা সিরিয়াসলি নাও নি শুনে তাজ্জব বনে গিয়েছি।'

সিংহ হেসে বললেন—'কেন, 'বিয়ের আগের দিনগুলি ?'

—'সে আর ভেবে দেখার মত বুদ্ধি ও পাবে কোথায় ? আমার মনে হয় প্রথম জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই হাতী বিয়ে করে আসছে।'

হাতী একথা শুনে একটু উত্তেজিত। কিন্তু কোন প্রতিবাদ না করে নাকটা একটুখানি বাঁয়ের দিকে বেঁকিয়ে ছেড়ে দিলেন। মনে হল যেন শুঁড় বেঁকালেন। তারপর ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে চাপা গলায় বললেন—'পক্ষ দিয়ে কথা বল না, যা শুনতে বসেছ তাই মন দিয়ে শোন ! বিয়ের কথা নয়, মৃত্যুর কথা হচ্ছিল বুঝলে ?'

—'আচ্ছা বেশ, বেশ ! যদিও দু'টির মধ্যে তফাৎ দেখি না কিছু, তবু বিয়ের কথা থাক্, মৃত্যুর কথাই শোনা যাক্,' বলে বাগ পরিস্থিতিটা হাল্কা করে দিলেন। 'আর শুধু মৃত্যুর কথা নয়—হচ্ছিল বৈকুণ্ঠ বোসের মৃত্যুর কথা।'

সিংহ এ সভায় লায়ন্‌স কেয়ারটি পেয়েছেন সেটি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরে দু'জন শ্রোতাকে নিয়ে মাঝে মাঝে একটু খেলা করছেন। বাগের কথা শেষ হলে তাই একটা মাত্র কথা বললেন, 'ওঃ ! সে কথা ভাবতে গেলেও মনের মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়।'

হাতী ও বাগের কৌতূহল আরও খানিকটা চড়ে গেল। ওঁরা দু'জনেই আরও একটু ঘনিয়ে বসলেন সিংহের কাছে।

সিংহ বলতে লাগলেন, 'আরও একটা বড় স্বাধীনতা তিনি ভালোবাসতেন —অসুস্থ হওয়ার স্বাধীনতা।

হাতী বলে উঠলো, 'মানে, ইচ্ছে করে অসুখ বানিয়ে নিতেন ?'

বাগ যোগ করলেন—'ইচ্ছা মৃত্যুর কথা শুনেছি বটে, কিন্তু ইচ্ছা-অসুখ তো শুনি নি।'

সিংহ বললেন, 'সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। আগেই তো বলেছি, বই নিয়ে দিন কাটাতেন, বিয়ে করেন নি, শৌখীন ছিলেন—অথচ দেখ মৃত্যুটা ঠিক তাঁর এই সময়েই জরুরী দরকার ছিল না। অবিবাহিত, সে আর মরতে চাইবে কেন ?'

হাতী এ কথার প্রতিবাদ করলেন, 'বিয়ে করলে মরাটা জরুরী হয় না কি ?'

বাগ বললেন, 'তা হতে পারে। সংসার ত্যাগ করার পক্ষে ওটা একটা মস্ত প্রেরণা।'

সিংহ বললেন, 'আমার কথাগুলো চুপ করে শোন। বৈকুণ্ঠ ছবিও আঁকতেন। অয়েল পেন্টিং শিখেছিলেন এক মাষ্টার রেখে।'

হাতী বলে উঠলেন—'এরপর যা যা বলবে তা বুঝতে পেরেছি। বলবে, ফ্লাইং ক্লাবের মেম্বার ছিলেন তিনি, রাইফেল শুটিংয়ে ওস্তাদ ছিলেন তিনি, শিকার করতেন, রেস খেলতেন। একে একে না বলে এক সংগে বললেই ভালো হত। বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোকের পৈতৃক টাকা ছিল অনেক। এই কথাটা আগে বললেই ল্যাঠা চুকে যেত! টাকা থাকলে সব রকম শখই থাকে।'

সিংহ বললেন, 'না, ও-সব শখ ছিল না। কোন, একদিন তাঁর খেয়াল হল তিনি আমার ছবি আঁকবেন। আমাকে সেজন্য তাঁর সামনে কয়েকদিন বসতে হবে। মানে, ওঁদের ভাষায় সিটিং দিতে হবে। আমার রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। আমি সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছি, তিনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়, তাই তাঁর মন জোগানো আমার পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল না। তা ছাড়া ছবি ভালোই আঁকতেন, লোভও হয়েছিল। কিন্তু দু'দিন সিটিং দেবার পর একটা ঘটনা ঘটল। তিনি দ্বিতীয় দিন আঁকার শেষে বললেন—হাতে একটু ব্যথা অনুভব করছি। বলেই বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত-খানা একটু টিপতে লাগলেন। তারপর বললেন—সীতেশ, ডাক্তার ডাক।

বাগ এই সময় জিজ্ঞাসা করে বসলেন—'তোমার সংগে বৈকুণ্ঠবাবুর পরিচয়টা কি সূত্রে?'

—'সে কথা এখন থাক্। তাঁর অনেক বই ছিল, পাড়ার লোক বই পড়তে যেতেন এবং—কিন্তু সে কথাও থাক্। যা বলছিলাম—ডাক্তার ডাকার কথায় আমি ভ্রান্তিবশতঃ বলে ফেলেছিলাম, ও কিছু না, একটুখানির জন্য আবার ডাক্তারের হাঙ্গামা কেন?' —এইটুকু বলে তাঁর চোখের দিকে চেয়েই বুঝলাম ভুল করেছি। এতটা জানতাম না। কথায় কথায় অসুখ হওয়া এবং ডাক্তার ডাকা যে তিনি পছন্দ করেন, এটা জানা থাকলেও এ বিষয়ে আমার খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু তবু ঝোঁকের মাথায় আরও বলে ফেললাম, 'আমি মাসাজ করে সারিয়ে দিচ্ছি, হাতটা এগিয়ে দিন তো।'

—'তারপর?' প্রশ্ন করলেন বাগ।

—'তারপরের ঘটনাগুলো এত সহজ তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। বৈকুণ্ঠবাবু তুলিতে অনেকখানি নীল রঙ মাখিয়ে তড়িৎ গতিতে সমস্ত

ছবিখানার উপর এলোমেলোভাবে টানতে লাগলেন। আমার ছবির মুখে সে যে কি করল! তারপর দাঁড়িয়ে উঠে ইজেলখানা হাতের ধাক্কায় কাত করে ফেললেন। সেখানা সশব্দে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল।'

হাতী প্রশ্ন করলেন, 'ডান হাতে ?'

সিংহ বললেন, 'ডান হাতে। কি শক্তি দেখলাম সে হাতে! এবং সেই হাতের জন্য ডাক্তার জরুরী দরকার ছিল। তারপর সেই ডান হাতেই টেলিফোন তুলে এক ডাক্তারকে ফোন করলেন। শুনলেন—নেই। অন্য আর একজনকে ডাকলেন। জরুরী ডাক। আমি বললাম—উঠি তাহলে ? বৈকুণ্ঠবাবু বললেন—না। কথাটা এমন জোরের সঙ্গে বললেন যে, আমি চমকে উঠলাম। আমার আর ওঠা হল না। ঐ রকম আদেশের সুরে কথা বলতেন এক এক সময়।'

বাগ বললেন—'তোমার উপর বিরূপ হয়েছিলেন যখন, তখন উঠতে বললেও তো পারতেন!'

—'হ্যাঁ, তা পারতেন, কিন্তু বললেন না। বোধ হয় উত্তেজনার মুখে ছবিখানা নষ্ট করে মনে কিছু অনুতাপ হয়েছিল! কিন্তু এ আমার অনুমান মাত্র।'

—'তারপর ?'

—'তারপর যা ঘটল, তা বললে বিশ্বাস করবে না।'

—'তবু বল, আর বলবে বলেই তো ভূমিকা ফেঁদেছ!'

হাতীও চেপে ধরলেন—'না, বলতেই হবে। সব বিশ্বাস করব। আর বিশ্বাস করব বলেই তো এতটা শোনা।'

সিংহ বললেন—'বেশ আমার দোষ দিও না! আমি যা ঘটেছে বলছি।'

সিংহ বলতে লাগলেন—'যে ডাক্তার এলো, সে তাঁর পরিচিত নয় বলেই মনে হল। হয়তো তাঁর নোট বইতে ডাইরেক্টরি দেখে অনেক ডাক্তারের নাম লিখে রেখেছেন, তাই যখন যাকে ইচ্ছে ডাকতেন। কিন্তু এও আমার অনুমানমাত্র। কিন্তু চুলোয় যাক্ সে কথা। তারপর যা ঘটল, ওঃ! তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। আমার মনে হয় তা আর নাই বা শুনলে!'

—সিংহের এই ভাবে খেলানোয় খুব আনন্দ। কারণ, এর পরেই ওঁরা দু'জনেই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলেন—'না, না—সে কি কথা ?'

সিংহ একটু তির্যক হাসি হেসে বললেন—'হাতীর না হয় সহ্য করার অভ্যাস আছে, কিন্তু বাগ, তুমি কি পারবে তা সহ্য করতে ? তোমার আবার শুনলাম ব্লাড প্রেশার বেশী।'

হাতী বললেন—'আমাকে একটু খোঁচা না দিয়ে তোমরা কেউ কথা বলছ না

দেখছি। আমার ওতে কিছুই হয় না।'

বাগ হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ডান হাতের তর্জনী বাঁ হাতের তর্জনীর মাথা থেকে সুরু করে মধ্যমা ও অনামিকার মাথা পর্যন্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাত নামালো।

হাতীর তৃতীয় পক্ষের প্রতি স্পষ্ট কটাক্ষ। তিনি বললেন, 'কেন বার বার রসভঙ্গ করছ? সিংহকে একটানা বলতে দাও।'

সিংহ মৃদু হেসে বলতে লাগলেন, 'শোন। ডাক্তার যুবক। সে নানাভাবে পরীক্ষা করে বলল, আমি তো কিছু পাচ্ছি না। সবই ঠিক আছে। আর ঠিক তখনই—'

'কি হল?'

বৈকুণ্ঠবাবু গর্জন করে উঠলেন। ডাক্তারের মুখে ঐ কথা শুনে ক্ষেপে উঠলেন।

'কেন ক্ষেপে উঠলেন?'

'বোঝা উচিত। তবে কারণ কেউ জানে না।'

'অথচ ক্ষেপলেন?'

'অথচ ক্ষেপলেন! বললেন কি জান? বললেন, 'ডাক্তার তোমার স্কুল মাস্টার হওয়া উচিত ছিল। এ লাইন তোমার নয়।' ডাক্তার তার প্রথম ডাক্তারি জীবনে এমন অপমানকর কথা কারো কাছে শোনে নি। সে তো লজ্জায় কোন রকমে একখানা প্রেসক্রিপশন লিখে ফী নিয়ে পালিয়ে গেল। আর বৈকুণ্ঠবাবু প্রেসক্রিপশনখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'অজ মূর্খ!' —তারপর ক্লান্তভাবে চেয়ারের উপর শিথিলভাবে দেহটা এলিয়ে দিলেন।

'আমি সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বললাম, 'নতুন ডাক্তার কিনা। তা ছাড়া আপনি যে হাতে ভয়ানক কিছু হয়েছে ভাবছেন, সেই হাতেই তো ইজেল কাত করলেন। আরো কত কী করলেন!'

এ কথায় বৈকুণ্ঠবাবু সোজা হয়ে বসে টেবিলে প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাত করে বললেন, 'কিছু হয় নি তা হাতের বাইরে দেখে তোমরা বোঝ কী করে?'

আমি বললাম, 'তাও তো বটে।—আমার এ কথায় বৈকুণ্ঠবাবু কিছু শান্ত হলেন।'

হাতী বললেন, 'স্রেফ স্নায়ুর ব্যাপার।'

বাগ বললেন, 'কিসের ব্যাপার তা আমরা বলি কেন, ডাক্তার বলবে। সিংহ বল, তারপর কি হল?'

সিংহ বললেন, 'আমি সেইদিন ভালোভাবে বুঝতে পারলাম, অসুখের ধারণাটাই বৈকুণ্ঠবাবুর অসুখ।'

হাতী আবার বলে উঠলেন, 'এ রকম একটা কেস আমার জানা আছে।'

বাগ তৎক্ষণাৎ তার জবাবে বললেন, 'আমার দশটা জানা আছে। কিন্তু তার জন্য রসভঙ্গ করতে যাওয়া ঠিক নয়।'

হাতী এ কথায় শুধু শুঁড় নাড়ার ভংগীতে নাকটা একবার বাঁ দিকে বেঁকিয়ে ছেড়ে দিলেন।

সিংহ বললেন—'তোমরা যা জান, তার কোনটার সংগেই বৈকুণ্ঠবাবুর কেস মিলবে না।'

বাগ বললেন—'তোমার গল্পের ধরন দেখেই তা আমি বুঝতে পেরেছি, তারপর কি হল বল।'

'এর আর তারপর নেই। সবটাই শেষকালে একসংগে ঘটল। ব্যাপারটা বিশ্রী। বৈকুণ্ঠবাবু প্রায় প্রতিদিন ডাক্তার বদল করতেন। যে ডাক্তার বলতেন, 'কিছু হয় নি তাঁকে তেড়ে মারতে যেতেন। আর যে ডাক্তার সব বুঝতে পেরে অর্থহীন বড় বড় ল্যাটিন নাম উচ্চারণ করে ভয় দেখাতেন, তাঁর চিকিৎসায় আরাম বোধ করতেন। যে ডাক্তার এই রাম ধাপ্পা দিয়ে বৈকুণ্ঠবাবুকে সুস্থ রেখেছিলেন, তিনি নিজেই হঠাৎ হৃদরোগে মারা যাওয়াতে বৈকুণ্ঠবাবু অন্ধকার দেখলেন।'

'ডাক্তার নিজে মরে গেলেন?'—হাতী বলে উঠলেন।

বাগ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'কেন বাধা দিচ্ছ ভাই? মানুষ একদিন না একদিন তো মরবেই।'

হাতী আহত হলেন এতক্ষণে। বললেন—'তবেই আর কি! বৈকুণ্ঠবাবুর প্রসংগও তা হলে থাক?'

সিংহ মৃদু হেসে বললেন, 'না কোন প্রসঙ্গই থাকবে না। শোন। বৈকুণ্ঠবাবুর কাছে আর যেতাম না। অসুখের বাতিকে ক্রমেই যেন কেমন হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর অসুখ হয়েছে এ কথায় কতদিন আর সায় দেওয়া যায়? ক্রমে তাঁর অন্যান্য দু'একজন বন্ধুও তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করলেন। ডাক্তারদের উপর, তাঁর বিশ্বাস ক্রমে আরও নষ্ট হয়ে গেল। কারণ তাঁর অসুখ আছে এ কথা কেউ স্বীকার করতেন না। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে টেলিফোন ডাইরেক্টরী দেখে নতুন নতুন ডাক্তার ডাকতে লাগলেন। কিন্তু তবু কেউ মনের মতো নয়। সবাই নিজের বিদ্যা বড় করে দেখে, অসুখের গুরুত্বটা কেন যেন

তাদের চোখ এড়িয়ে যায়।'

শেষে আমি বৈকুণ্ঠবাবুর কথা ভুলে যাবারই চেষ্টা করেছিলাম, এমন সময় একদিন আমার ডাক পড়ল। ডাকতে এলো তাঁর ভাইঝি ঝর্ণা।

বাগ এতক্ষণ হাঁফ ছেড়ে বলে উঠল, 'যাক্ এতক্ষণে একটা মেয়ে তাহলে আনলে কাহিনীর মধ্যে? আমি তো এরই জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করে রয়েছি। এবারে গল্পের মোড় ঘোরাবে ঐ ঝর্ণা। কিন্তু মেয়েটি এসে কি বলল?'

'আরে না, সে রকম কিছু না। মোড় ঘোরাবে না।'

'কিন্তু তোমার মাথা ঘোরাবে নিশ্চয়।'

'না, তেমন কিছু না। শোন। বৈকুণ্ঠবাবুর 'স্টাডি'-টা আলাদা হলেও তাঁর বাড়ীর একটা অন্দর ছিল, এবং সেখানে তাঁর ভাইয়ের পরিবার এবং অন্যান্য দু'একজন আত্মীয় আর দাসদাসীরা থাকত। তাঁর এই ভাইঝি ঝর্ণাকে তাঁর কাছে মাঝে মাঝে দেখেছি। মেয়েটি কলেজে পড়ত, দেখতে ভালো, এবং খুব চটপটে। সে তাদের গাড়ীতে করে এসে হাজির, এবং এসে খুব ব্যস্তভাবে বললো, "সীতেশদা, একবার চলুন আমাদের বাড়ীতে,"— একেবারে আদেশের সুরে। বাড়ীর মেয়ে ডাকতে এসেছে দেখেই বুঝলাম গুরুতর কিছু ঘটেছে। 'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তরে ঝর্ণা বলল, 'কি হয়েছে জানি না, ছ-সাত জন ডাক্তার একসঙ্গে কল দিয়েছেন জ্যাঠামশাই।'

'এত ডাক্তারের কথায় আমার হাসি পেল। বললাম তার উপর আবার আমাকে কল দেওয়া কেন?'

'এত দুঃখেও ঝর্ণা একটু হেসে বললো, "এ-কলটা আমিই দিলাম, এখন চলুন। যাবেন তো আমার কল-এ?" —দেখলে তো এমন অবস্থাতেও তার মুখে কথা ফোটে কেমন?'

বাগ বললে, 'দেখছি, এখন বলে যাও, আর থেমো না।'

'বেশ, ঝর্ণার সঙ্গেই গাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে। গিয়ে দেখি বৈকুণ্ঠবাবুর সে চেহারা আর নেই। ওজন অনেক কমে গেছে। ইতিমধ্যে দেহের যাবতীয় পরীক্ষনীয় জিনিসের পরীক্ষা করানো হয়ে গেছে, এক্স-রে করিয়েছেন। আমি যেতেই মনে হলো যেন একটু খুশি হলেন। আমি বিছানার পাশে বসতেই তিনি আমার ডান হাতখানা চেপে ধরে রইলেন একটু-ক্ষণ। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে—?'

বৈকুণ্ঠবাবু চোখের ইশারায় পাশের ঘর দেখিয়ে বললেন, 'জীবনের স্বাদ

চলে গেছে, একটু স্বাদ ফেরাচ্ছি।'

'সে কেমন ?'

একসঙ্গে সাতটি পণ্ডিতকে কল্ দিয়েছি, একটু মজা সৃষ্টি হবে, এই আর কি।'

আমি প্রশ্নার্ত চোখে তার দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি বললেন, 'সাতটা ডাক্তার কখনো একমত হয় ? ওরা ঝগড়া করবে, তর্ক করবে, সেইটে একটু উপভোগ করতে চাই।'

'তা কেন ?' আমি প্রশ্ন করি। সাতজন সাত রকম অসুখের নাম করলে কি আপনি খুশি হবেন ?

'খুশি হব, সেজন্য নয়। এতদিনের একটা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করব। ওরা কেউ কিছু জানে না, কিন্তু সব সময় আমার টাকা খেয়ে চলে যায়, বলে বিশেষ কিছুই হয় নি। আজ তার মজাটা টের পাওয়াব। আজ ওরা ঝগড়া করবে, আমার মজা বোধ হবে। একটুখানি নতুনত্ব, বিছানায় পড়ে থেকে থেকে বাইরের জীবন থেকে একেবারে কাটা পড়ে গিয়েছি। এক এক সময় ঘরকুনো হয়ে থাকার বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহ করে ওঠে। মনে হয় অদূরের পৃথিবীটা উপভোগ করি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, আগেও বাইরে যেতাম না, কিন্তু তখন না যাবার স্বাধীনতা ছিল। এখন সে স্বাধীনতা নেই বলে মনে মনে ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছি। আমার মারাত্মক অসুখ। এমন সময় এক এক সময় মনে বড় অদ্ভুত খেয়াল জাগে, মনে হয় ম্যাটাডোর হয়ে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করি। কিন্তু শোবার ঘরে ষাঁড় ঢোকাতে পারি না। নিজেরও কোনো ক্ষমতা নেই, তাই সাতটি ষাঁড় ঢুকিয়েছি যারা ডাক্তার নামে পরিচিত। বুদ্ধি খুলে গেল, তাই অতগুলো ডাক্তারকে একসঙ্গে কল দিয়ে ফাইটের মজাটা ঘরে শুয়ে অনুভব করবো। ঠিক করেছি ওদের মত না মিললে কাউকে ফি দেব না।'

'আমি কোনো কথারই প্রতিবাদ করলাম না। বরং সায় দিয়ে বললাম, 'সে বেশ হবে।' বললাম, 'ডাক্তাররা আর মুনিরা এক জাতের। সবাই ভিন্ন মতের।'

বাগ বললো, 'তুমি এতে সায় দিলে ? এ-যুগে অসুখ চেনাও তো যান্ত্রিক ব্যাপার, সব ডাক্তারেরই মত মেলে এ-যুগে।'

'আমার সায় না দিলে চলত না বলেই দিয়েছিলাম। নইলে প্রলয় কাণ্ড হত। সায় দিলাম বটে কিন্তু দেখলাম বৈকুণ্ঠবাবুর চোখ দুটি লাল। কথা বলার সময় যে আবেগ দেখলাম, তাও অস্বাভাবিক। স্নায়ু আর সচল নেই

বোঝা গেল। মাথায় বেশ বিকার দেখা দিয়াছে বোঝা গেল। ভয় হল তাঁর এই অস্বাভাবিক আচরণ দেখে, এর পর মানসিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে না হয়।'

'এই সব ভাবছি এমন সময় সেই মারাত্মক মুহূর্তটির মুখোমুখি হলাম।'

হাতী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সিংহ বাধা দিয়ে বললেন, 'আর কোনো কথা নয়, এ বারে শোন। সে যে কি করুণ একটা মুহূর্ত, কি ভয়ংকর তা প্রকাশ করার ভাষা নেই। পাশের ঘরে সাতজন বড় ডাক্তার বৈকুণ্ঠবাবুর যাবতীয় ল্যাবরেটারি রিপোর্ট নিয়ে এতক্ষণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, রোগীর ঘরের আত্মীয়রা উদ্বেগের সঙ্গে মিনিট গুনছে, এমন সময়—'

'এমন সময় কি হল?' বাগ চুপ করে থাকতে পারলেন না।

সিংহ বললেন, 'মনোযোগ দিয়ে শোন।'

শ্রোতাযুগলের বুক ওঠাপড়া করছে, কি ভয়ঙ্কর কথা শুনতে হবে তার জন্য উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা।

কিন্তু সিংহের কথায় সব যেন চুপসে গেল। তিনি বললেন, 'সেই ক্লান্তি মুহূর্তটিতে এত আকস্মিক, অথচ ব্যাপারটা তার তুলনায় এত সহজ যে তোমরা হাসবে কিনা তাই ভাবছি।'

হাতী বললেন, 'এত সহজ যদি, তবে এমন কঠিন ভূমিকা ফাঁদলে কেন?'

বাগ বললেন, 'যা কিছু অতর্কিত, যা কিছু সহজ, তারই ভূমিকা সব সময় কঠিন হয়, তার জন্য দুশ্চিন্তা কি? তোমার ভূমিকা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ব্যাপারটা সহজ হবে।'

সিংহ বললেন, 'ঠিক কথা। কিন্তু হতাশ হবার কারণ নেই। ডাক্তাররা প্রায় একঘণ্টা আলোচনা করে রোগীর ঘরে এসে বললেন, 'আপনার কিছুই হয় নি, —এ বিষয়ে আমরা একমত যে আপনার কোনো রিপোর্টে কোনো দোষ নেই—'

এর পর তাদের আর একটি কথাও বলা হল না। কারণ এর পর একটা বজ্রপাত ঘটল। কি বিকট চিৎকার। কি অমানুষিক সে চিৎকার, সমস্ত বাড়ী যেন কেঁপে উঠল।'

সিংহ চুপ করলেন। শ্রোতারাও চুপ, দু-মিনিট পর বাগ প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার বল তো?'

'ব্যাপার খুব সহজ আগেই বলেছি, বৈকুণ্ঠবাবু মারা গেলেন।'

'অ্যাঁ!'—দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন। হাতী বললেন, 'তবে যে বললে খুব সহজ ব্যাপার?'

'মরার মতন সহজ আর কি আছে ? যে সব বড় বড় ডাক্তারের ভিন্ন মতের উপর ভরসা করে তিনি এতক্ষণ কৌতুক সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, সেই সাতজন ডাক্তার—তার মধ্যে দুজন ইউরোপীয়—তাঁকে ষড়যন্ত্র করে ঠকালেন !'

'বৈকুণ্ঠবাবুর "কিছুই হয় নি" এ বিষয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে একমত হলেন, এটা তাঁর হিসাবের সম্পূর্ণ বাইরে ছিল।'

হাতী বিভ্রান্তভাবে বললেন, 'তারপর ?'

সিংহ বললেন, 'তারপর আর কথা নেই। হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গেল কি না !'

'কেন তিনি কি এ মৃত্যু চেয়েছিলেন ?'

সিংহ বললেন, 'অবচেতন মনে নিশ্চয় চেয়েছিলেন।'

হাতী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন এ কথায়। তিনি শুধু একটুখানি শুঁড় বেঁকালেন।

বাগ ছাড়বার পাত্র নন, তিনি বললেন মৃত্যুর কথা শোচনীয় অবশ্যই, কিন্তু তোমার কাহিনীতে ঝর্ণা কাব্যের উপেক্ষিতা হয়ে রইল, এও কম শোচনীয় নয়। ভেবেছিলাম কিছু ঘটবে।'

'ঘটেছে বৈ কি।'

'অ্যাঁ—ঘটেছে ?'

'ঐ যে'—সিংহ মুখ সেদিকে ফিরিয়ে বললেন—'ঐ যে ওখানে, আমারই দুটি সন্তানের জননী হয়ে বসে দোক্তা খাচ্ছেন তিনি।'

বাগ হতাশ হয়ে আপন মনে উচ্চারণ করলেন, 'ছি, ছি, গল্পটা মাটি করলে ?'

তুষারকান্তি ঘোষ

মসী বড় না অসি বড় ?

আমি খবরের কাগজের সম্পাদক। বহু সভাতে আমাকে অনেকে তাই প্রশ্ন করেন, "এটা কি সত্য যে, দি পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দি সোর্ড ?" অর্থাৎ কিনা কলম বড় না অসি বড় ? সৈনিকেরা অবশ্য আমার সঙ্গে একমত হবেন না, তবে আমি মনে করি যে তলোয়ারের চেয়ে কলমই বেশী ক্ষমতাশালী। একবার এক মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে এক মসীজীবী কেরাণীর মতদ্বৈধ হয়েছিল এবং তার ফল কি হয়েছিল সেই কথাই আজ আমি বলবো।

একথা আপনারা অনেকেই জানেন যে, যাঁরা গভর্ণমেণ্ট অফিস থেকে পেন্‌শন্‌ আনতে যান—তাঁদের আইডেণ্টিটি অর্থাৎ কিনা তাঁরা যে আসল লোক তার পরিচয় দিতে হয়।—তাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে পেন্‌শন্‌ অফিসে একটা বর্ণনা থাকে, যেমন তাঁদের আকার কেমন, কোন একটা বিশেষ চিহ্ন আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-অনেকদিন আগেকার কথা, তখন বৃটিশ রাজত্ব চলছে, এক জবরদস্ত জঙ্গী সাহেব নিজের পেন্‌শন্‌ নিজেই আনতেন। এই সাহেব মীরাটে চাকরি করতেন ও পরে রিটায়ার করে কলকাতায় বাস করেন। তাঁকে পেন্‌পেন্‌

অফিসের লোকেরা চিনতো—তাই কখনো কোন গোলমাল হয় নি।—কিন্তু একবার গোল বাধলো।

সেদিন কি কারণে জানি না; সেই জঙ্গী সাহেবের মেজাজটা খুব রুক্ষ ছিল। আর মজা এই, সেদিনই যে কেরাণীটি পেন্‌শন্‌ দিচ্ছিলেন তাঁর মেজাজটাও খুব শরীফ্‌ ছিল না। এই কেরানীটি ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগতেন ও শরীরের অবস্থা অনুযায়ী তাঁর মেজাজও কখনো গরম, কখনো ঠাণ্ডা থাকতো। মেজাজ খারাপ হলে তিনি অনেক সময় এমন কাজ করতেন কিংবা এমন কথা বলতেন যা অন্য সময় করতেন না। রাগ হ'লে তাঁর ভয়ডরও থাকতো না।

এখন সেই দিনের কথা বলি।

মিলিটারী সাহেবটি তাড়াতাড়িই পেন্‌শন্‌ চাইছিলেন আর কেরাণীটি তাঁকে বলছিলেন, 'ওয়েট, ওয়েট,' অর্থাৎ 'অপেক্ষা করুন'।

বার-কতক এরকম হবার পর সাহেবের গেল মেজাজ বিগড়ে এবং রাগের চোটে তিনি কেরাণীটিকে বলে উঠলেন, "জানো আমি কে? এখুনি এক কোপে তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দিতে পারি!"

কেরাণীটির মেজাজ সেদিন সপ্তমে চড়ে ছিল। তিনি সাহেবের নাকের সামনে তাঁর পেন্সিলটি তুলে বললেন, "আমার তরোয়াল নেই—সুতরাং তোমার মুণ্ডু হয়তো কাটতে পারবো না, কিন্তু এই পেন্সিল দিয়ে তোমার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে দিতে পারি, তা জানো?" শোনামাত্র সাহেব অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন, তবে অফিসের অন্যান্য লোকেরা এসে পড়ায় ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াতে পারল না। সাহেব পেন্‌শন্‌ নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

সাহেব বাড়ি চলে যেতে বাবুটি বিড় বিড় করে বললেন, "দাঁড়াও তোমাকে মজা দেখাচ্ছি! কলমের এমন খোঁচা মারবো যে, সামনের দুটো দাঁত থাকবে না।"

এর পরের মাসের কথা। সাহেব আবার পেন্‌শন্‌ নিতে এসেছেন এবং সেই পূর্বোক্ত কেরাণীটি তাঁর নিজের স্থানে বসে আছেন।

সাহেব পেন্‌শন্‌ চাওয়াতে বাবুটি বললেন, "আপনাকে এর আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না! সেই জন্যেই আপনার চেহারাটা আমাদের রেকর্ডের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো।" এই কথা বলে বাবুটি সাহেবের পেন্‌শন্‌ বইটি সামনে খুলে সাহেবকে বললেন, "আপনি একবার হাঁ করুণ তো, আপনার দাঁত দেখবো।"

সাহেব রেগে তাঁর বত্রিশটি দাঁত বের করে বললেন, "আমি তোমার মতন ডিসপেপ্‌টিক নই—এই দেখ আমার সব দাঁতগুলো ঠিক আছে।" বাবুটি সাহেবের দাঁত দেখে মাথা নেড়ে বললেন, "উহুঁঃ, এতো বড় মুশকিল হ'ল দেখছি। খাতায় লেখা রয়েছে যে আপনার সামনের দাঁত দু'টো নেই, অথচ আমি দেখছি যে আপনার বত্রিশটি দাঁতই বর্তমান। বুড়ো বয়সে দাঁত পড়ে গেলে আর তো দাঁত ওঠে না। এরূপক্ষেত্রে আমি আপনাকে পেন্‌শন্‌ দিই কি করে?" সাহেব শুনে বললেন, "চালাকি পেয়েছো! বরাবর আমি এখানে পেন্‌শন্‌ নিচ্ছি, আর এখন পেন্‌শন্‌ দেবে না।"

বাবুটি উত্তর করলেন, "তা আমি কি করবো? আমি তো গভর্ণমেণ্টের টাকা যাকে-তাকে দিতে পারি না!" এই সব গোলমাল শুনে অফিসের অন্যান্য লোকেরা এসে সাহেবকে বললেন, "পেন্‌শন্‌বাবুর কোন দোষ নেই। বইয়ের বর্ণনার সঙ্গে আপনার চেহারা যখন মিলছে না, তখন বাবু কি করবে? আপনার পুরাণ অফিস থেকে আপনার আইডেণ্টিটি আনিয়ে নিন না।" সাহেব বললেন, "আমি এখন খাবো কি? আমার সেই মীরাটের রেজিমেণ্ট এখন কোথায় বদলি হয়ে গেছে আমি জানি না। সেখান থেকে আমার আইডেণ্টিটি আনতে গেলে অনেক দেরি হবে।"

পেন্‌শন্‌-বাবুটি বললেন, "আমরা তার কি জানি?" এই কথা শুনে সাহেব রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলেন।

বাড়িতে সাহেবের স্ত্রী ছিলেন খাণ্ডারনী। বিনা পেন্‌শনে বাড়ি ঢোকাতে তিনি সাহেবের হাঁড়ীর হাল করলেন। বললেন, "যেখান থেকে পারো পেন্‌শন্‌ নিয়ে এসো, নইলে তোমার একদিন কি আমার একদিন।"

সাহেব বিমর্ষভাবে ক্লাবে গিয়ে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন; কিন্তু কেউ এমন বুদ্ধি দিতে পারলেন না যাতে তখুনি পেন্‌শন্‌ পাওয়া যায়। সাহেবের বন্ধুরা সকলেই বললেন, "এ মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের ব্যাপার। এর আইন-কানুন বড়ই শক্ত। তুমি তোমার পুরোন রেজিমেণ্ট থেকে আইন অনুযায়ী তোমার আইডেণ্টিটি আনবার চেষ্টা করো। তবে এক কাজ করতে পারো, তুমি কলকাতার পেন্‌শন্‌ অফিসকে একটা কড়া চিঠি লিখে দেখতে পারো।" সাহেব অগত্যা তাতেই রাজী হলেন এবং তার পরদিনই মীরাটে ও কলকাতার পেন্‌শন্‌ অফিসকে পত্র লিখলেন।

দিনের পর দিন যায়। সাহেবের স্ত্রীর মেজাজ ক্রমেই খারাপ হচ্ছে; বাড়িতে অর্থাভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেই। সাহেবকে উঠতে-বসতে খোঁটা খেতে

হচ্ছে, মেমসাহেব দিনরাতই দুঃখ করেন, "এমন অপদার্থের হাতে পড়েছিলুম যে, নিজের পেন্‌শন্‌টা অবধি আনতে পারে না। এই বুড়ো বয়সে আমাকে ভাত-কাপড়ের কষ্ট পেতে হচ্ছে। উনি আবার মিলিটারী সাহেব! প্রকাণ্ড গোঁফ থাকলেই মরদ হওয়া যায় না। মরি, মরি, সেই গোঁফ আবার মোম দিয়ে খাড়া করা হয়!" কখনো বা ভীষণ রেগে গিয়ে বলেন, "বেরোও আমার সামনে থেকে ; কাল যদি টাকা আনতে না পারো তবে বাড়ি ঢুকতে দোব না।"

কুড়ি-পঁচিশ দিন পর সাহেব পেনশন অফিস থেকে জবাব পেলেন। তারা লিখেছে :—"আপনার পত্র পাইলাম, আমরা এখনই এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করিতেছি।' আরও দিন-পাঁচেক পরে সাহেব মীরাট থেকে উত্তর পেলেন যে, তাঁর পত্র যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরের মাসের পেন্‌শনের দিনে সাহেব পেন্‌শন্‌ অফিসে গিয়ে দেখলেন যে, সেই বাবুটি ডেস্কের সামনে বসে আছেন। সাহেবের তখন বীরত্ব জল হয়ে গিয়েছে। বাবুটিকে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন এবং তাঁর 'মুণ্ডু কাটবেন' বলেছিলেন বলে অনেক ক্ষমা প্রার্থনাও করলেন। বাবুটির কিন্তু সেই একই কথা, 'বর্ণনা না মিললে আপনাকে পেন্‌শন্‌ দিই কি করে?" সাহেব সেবারেও ক্ষুণ্নমনে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে গেলেন।

বাড়ি ফিরতেই মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "পেন্‌শন্‌ এনেছো?" সাহেব অনেক কাকুতি-মিনতি করে জানালেন যে, তিনি পেন্‌শন্‌ পাননি! "আমি অনেক অনুরোধ, এমনকি ক্ষমা প্রর্থনাও করেছিলুম, কিন্তু সেই বাঙালীবাবুটি কিছুতেই শুনলে না।" মেমসাহেব বহুকষ্টে একমাস চালিয়েছেন। এখন আর একমাস কি করে চালাবেন ভেবে রণচণ্ডীমূর্তি ধারণ করলেন। সাহেবের মোচার মত গোঁফ খামচে ধরে বললেন, "এখুনি এই গোঁফ কামিয়ে এসো ; আর আজ থেকে গাউন পরো। যে নিজের অর্জিত পেন্‌শন্‌ ঘরে আনতে পারে না—সে মেয়ে মানুষেরও অধম।"

সেইদিন সাহেব ক্লাবে গিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবের কাছে আবার এই কথাটি পাড়লেন। সকলেই সাহেবের জন্য দুঃখিত, কিন্তু কেউই এমন কোন সৎ পরামর্শ দিতে পারলেন না যাতে সাহেব তখুনি পেনশনটি পান। এক বন্ধু বললেন, "তুমি মীরাটে ও কলকাতায় আবার রিমাইন্ডার দিয়ে চিঠি লেখো।" কিন্তু গভর্নমেণ্টের উচ্চ কর্মচারী আর এক বন্ধু বললেন, "ওতে কোন আশু ফল হবে না—আমি সিভিল কর্মচারী আর তুমি মিলিটারী কর্মচারী। আমরা দু'জনেই গভর্নমেণ্ট অফিসের হালচাল জানি। তারা টাকার ব্যাপারে কোন

দায়িত্ব নিতে চাইবে না এবং তাড়াতাড়িও কিছু করবে না। তারা মাস-খানেক বাদে আবার জবাব দেবে,—your grievance is receiving our prompt attention'—অর্থাৎ কিনা 'আমরা খুব সত্বরই তোমার নালিশ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছি।' এতে তোমার কি লাভ হবে?"

এই-সব কথা শুনে সাহেব অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন এবং গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। খানিকক্ষণ বাদে তিনি বন্ধুদের বললেন, "তোমরা আমার বাড়ির অবস্থা বুঝছো না। গিন্নী আমার গোঁফ ধরে ওঠবোস করিয়েছেন। কাল নোড়া দিয়ে আমার দাঁতগুলো ভাঙবেন।"

এক বৃদ্ধ সাহেব নীরবে একপাশে বসে চুরুট খাচ্ছিলেন এবং এই সব কথা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "আমি এর উপায় করে দিতে পারি, যদি আমার কথা শোন। তবে এতে তোমার কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হবে। আর জান তো হিন্দুরা বলে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, আর আমরা বলি, 'হাফ্ এ লোফ ইজ বেটার দ্যান নো ব্রেড'—তবে তোমাকে অর্ধেক ত্যাগ করতে হবে না, সামান্য কিছু ত্যাগ করলেই চলবে।" পেন্শনার সাহেব এই কথা শুনে আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলেন, "ভাই, তোমার মতলবটি বাতলিয়ে দাও, আমি তোমার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাক্‌বো।"

বৃদ্ধ সাহেব উত্তর করলেন, "কেন তুমিই তো তোমার নিজের উপায় বাতলিয়ে দিয়েছো। তুমি তো বললে যে, তোমার গিন্নী নোড়া দিয়ে তোমার সমস্ত দাঁতগুলো উপড়ে ফেলবে। তার চেয়ে কেন তুমি নিজেই সামনের দুটো দাঁত তুলে ফেল না; তাহলে কালই তো পেন্‌শন্‌টা পেয়ে যাও? মীরাটেও চিঠি দিতে হবে না, আর আইডেন্টিটিও আনতে হবে না। তোমার বয়সও তো হয়েছে—ও আর কতদিনই বা থাকবে? আর আজকাল এমন পেন্‌লেস এক্সট্র্যাকশনের ব্যবস্থা হয়েছে যে, তোমার দাঁত তুললে তুমি জানতেও পারবে না? এই তো সামনেই চৌরঙ্গীতে ডাক্তার আর আহমেদ রয়েছেন। তিনি দুটো দাঁতও তুলে দেবেন আর বাঁধিয়েও দেবেন। সেই দাঁত পরে থাকলে কেউ জানতেও পারবে না যে তোমার দুটো দাঁত নেই। কেবল পেন্‌শন্ আনবার দিন বাঁধানো দাঁত দুটো বাড়িতে খুলে রেখে যাবে।"

এই প্রস্তাব শুনে সাহেবের সব বন্ধুরাই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং সকলেই বললেন, "এর চেয়ে সোজা আর ভাল প্ল্যান হতে পারে না।" তাঁদের মধ্যে আবার যাঁরা আগে দাঁত তুলিয়েছিলেন তাঁরা জানালেন যে আজকাল দাঁত তোলাতে কোন কষ্ট নেই। মিলিটারী সাহেবও তখন এই প্রস্তাবে রাজী হলেন।

এর দিন চারেক পরের কথা। সাহেব বাড়ী থেকে বেরোবার সময় হাসি-মুখে মেমসাহেবকে বলে গেলেন, "আজ যদি পেন্‌শন্‌ আনতে না পারি তো তুমি আমার সব দাঁতগুলো নোড়া দিয়ে ভেঙে দিও।"

পেন্‌শন্‌ অফিসে গিয়ে সাহেব দেখলেন যে সেই ডিস্‌পেপটিক বাবুটি ডেস্কের সামনে বসে আছেন। সাহেব সামনে আসতেই বাবুটি বললেন, "আপনার identity এনেছেন কি?" সাহেব একগাল হেসে বললেন, "এই দেখুন আমার আইডেন্টিটি। এবার বর্ণনায় মিলেছে তো?" কেরাণী বাবুটি সাহেবের পেন্‌শন তখুনি দিয়ে দিলেন। সাহেব টাকাগুলি পকেটে নিয়ে যখন তাঁর কাছে হাসিমুখে বিদায় নিচ্ছেন, তখন বাবুটি তাঁর পেন্সিলটি সাহেবের গোঁফের সামনে নেড়ে বললেন, "সাহেব, কলমের খোঁচাটি কেমন বুঝলে তো? তোমার তলোয়ার বড় না আমার কলম বড়?" সাহেব বাঙালীবাবুর দুটি হাত ধরে বললেন, "তোমার কলমই বড়।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লীকা লাড্ডু

নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ যে করে, সে মন্দ লোক হইতে পারে; কিন্তু সে যে সাহসী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কারণ নাক কাটা ব্যাপারটি তো সহজ নয়; এমন কি ব্লেডের এক প্যোঁচে কাটিবে—ইহা নিশ্চিত জানিয়াও কাটিবার পূর্বে সাত-পাঁচ ভাবনা হয়। সেই ভাবনাই তো ভয় এবং সেই ভয়েই সংসারে শতকরা নিরানব্বই জন একজনের কাটা নাক দেখিয়া যাত্রা-ভঙ্গ করিয়া বসিয়া থাকে।

আমাদের গ্রামের হীরেন মুখুজ্জের মত নিরীহ প্রকৃতির ব্যক্তিটি যে অকস্মাৎ খোলস ছাড়িয়া সেই একজন হইয়া দাঁড়াইতে পারে—এ ধারণাই কেহ কোনদিন করিতে পারে নাই। এ যেন বল্মীকস্তূপের অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরি রূপে আত্মপ্রকাশ।

চল্লিশ বৎসর বয়সে সাত সাতটি পুত্র কন্যা সত্ত্বেও হীরেন দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া বসিল। বড় পুত্রটির বয়স ঊনিশ; দ্বিতীয় কন্যাটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে; বাকি পাঁচটি পনরো হইতে তিন পর্যন্ত, হারমোনিয়মের রিডের মত সারবন্দী দাওয়ায় বসিয়া ক্রন্দন ও কোলাহলের অবিরাম বেসুরা কোরাস

জমাইয়া রাখিয়াছে। হীরেনের বিবাহ হইয়াছিল তেরো বৎসর বয়সে, উপনয়নের পর ন্যাড়া মাথায় টোপর পরিয়া নয় বৎসরের বধূকে সে ঘরে আনিয়াছিল। তাহারও আগে বধূ ছিল একেবারে ঘরের পাশেই। দুই বাড়ীর মধ্যে কেবল একটা গলির ব্যবধান। দীর্ঘ সাতাশ বৎসর বিবাহিত জীবনে হীরেন কখনও রাত্রি নয়টার বেশী নয়টা এক মিনিট পর্যন্ত বাহিরে থাকে নাই ; তাও স্ট্যান্ডার্ড টাইম নয়, ক্যালকাটা টাইম। শুধু তাই নয়, এই সাতাশ বৎসর ধরিয়া একবেলা ভাত রাঁধিয়াছে, সকালে বিছানা তুলিয়াছে, ছেলেদের স্নান করাইয়াছে। স্ত্রী সূতিকাগারে প্রবেশ করিলে ছোটগুলির বিছানা কাচিয়াছে, রৌদ্রে দিয়াছে। সুতরাং ছেলেগুলিকে মানুষ করিবার অজুহাতে যে একটি তরুণীর প্রয়োজন, এটা নিতান্তই বাজে কথা। পুরুষ মহলে হীরেনের এই অকল্পিত সাহসিকতায় তাক লাগিয়া গেল। তাহার উপর বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে না কাটিতে তাহারা অনুভব করিল, জীবন পথে তাহাদের যাত্রাভঙ্গ ঘটিয়াছে। মাথা হেঁট করিয়াও চলা দুষ্কর।

শ্যামের স্ত্রী রাত্রে স্বামীর হাতখানা সরাইয়া দিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, যাও, যাও পুরুষ জাতের মুখে আগুন। তোমাদের ছুঁলে পাপ, গঙ্গাস্নান করতে হয়।

শ্যাম এ আকস্মিকতায় ঘাবড়াইয়া গেল। একেই স্ত্রীকে সে বাঘিনীর মত ভয় করে ; তাহার উপর অকস্মাৎ তাহাকে উল্কামুখী হইতে দেখিয়া বুকটা তাহার ঢিপঢিপ করিয়া উঠিল। শৃগালী উল্কামুখী কোনও রকমে সহ্য হইয়াছে, কিন্তু বাঘিনীর ক্ষুরধার দাঁতে যদি দাহিকা শক্তি যুক্ত হয় তবে ভাবিয়াও শ্যাম শিহরিয়া উঠিল। একেই কাঁচা মাংসের স্বাদে বাঘিনী ভয়ংকরী, তাহার উপর দাহিকা শক্তির প্রসাদে সিদ্ধ মাংসে কালিয়ার আস্বাদ পাইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

আজ আবার সে বাঘিনীকে খোঁচা দিয়াছে। সে আজই লোহার কাঁটা দিয়া স্ত্রীর বাক্স খুলিয়া চারটি সিকি সরাইয়া ফেলিয়াছে। না ফেলিয়াও বেচারার উপায় ছিল না, বিড়িওয়ালা বেনে মামার কাছে দেড় টাকার উপর ধার জমিয়া উঠিয়াছে ; সে আর ধার দিবে না বলিয়া নোটিশ দিয়াছিল। শ্যামের বরাদ্দ দৈনিক এক পয়সার বিড়ি, কিন্তু তাহাতে তাহার কুলায় না। এক পয়সায় দশটা বিড়ির মধ্যে পাঁচটা যায় দোক্তা হিসাবে, বাকি পাঁচটায় কাহারও দিন চলা অসম্ভব।

স্পন্দিত বক্ষে শুষ্ক মুখে শ্যাম তাহার পেটেণ্ট 'হে হে' শব্দে বোকা হাসি হাসিয়া বলিল, কেন, কি হ'ল কি ?

সুগ্রীব-মহিষীর মত মুখভঙ্গী করিয়া স্ত্রী বলিল, হেসো না, আর হেসো না, বুঝলে? "বাঁদরের মুখ পোড়ে আর বাঁদর হাসে,—বলে, এ কি সৌভাগ্য হল আমার," সেই বিত্তান্ত।

শ্যাম উষ্ণ হইয়া উঠিল, বাঁদর হইবার কামনাই তাহার জাগিয়া উঠিল, লেজ গজাইলে সে স্ত্রীর গলায় জড়াইয়া কণ্ঠ রোধ তো করিতই, উপরন্তু বালি-রাবণ-সংবাদের মত একটা নূতন সংবাদের সৃষ্টি করিত, স্ত্রীকে সাত ঘাটে চুবাইয়া লোনা জলের সাহায্যে ভিতরের সমস্ত বাঁদরামী উদ্গীরণ করাইয়া ছাড়িত। লেজের অভাবে সে দাঁত খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে তুমি বাঁদর বলছ?

তাহার মুখের কাছে দুই হাত নাড়িয়া দিয়া স্ত্রী বলিল, বলছি, বলছি, বলছি। শুধু তোমাকে নয়, গোটা পুরুষ জাতকে বলছি। সাত সাতটা বেটা-বেটী থাকতে চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করতে তোমাদের লজ্জা করে না? তোমরা সবাই হীরেন মুখুজ্জে।

সাপের মাথায় ইসের মূল পড়িল; শ্যাম একেবারে ফণা গুটাইয়া ঝাঁপির মধ্যে কুণ্ডলী পাকানো সাপের মত ন্যাতাইয়া পড়িল। আবার সে তাহার পেটেণ্ট 'হে হে' করিয়া বোকার হাসি হাসিয়া বলিল, তা তুমি বলেছ ঠিক। হে-হে-হে; কিন্তু সবাই তো আর হীরেন—

সবাই, সবাই, গোটা পুরুষ জাতটাই হীরেন।

শ্যাম মহা বিরক্ত হইয়া হীরেনকে গাল দিয়া উঠিল, শা-লা!

রামের বাড়ীতেও সেই অবস্থা।

রাম লেখাপড়া জানা লোক; শুধু লেখাপড়া জানাই নয়, সে একেবারে আধুনিক, যাহাকে বলে মডার্ণ। তাহার স্ত্রীও শিক্ষিতা মেয়ে, ফেরতা দিয়া কাপড় পরে, হাই হীল জুতা পরে, চোখে চশমা দেয়; বব ছাটে না কেবল চুলের বাহারের জন্য; চুলগুলি তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ এবং উপলসঙ্কুল ঝরণার মত ঢেউ খেলানো।

রূপার তৈয়ারী দেশী দাঁত খুটনির আকারের মত ভঙ্গিতে ঠোঁটের একদিক বাঁকাইয়া রামের স্ত্রী বলিল, রাম সীতার শোকে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন, ওটা বাজে কথা। বাল্মীকি আর শিশির ভাদুড়ীর সাজানো কথা। আসলে তিনি আর একটা বিয়ে করতে না পেয়ে পাগল হয়েছিলেন।

রাম একখানা বই পড়িতেছিল—ফ্রয়েডের মনস্তত্ব, সে মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, বাল্মীকিকে তুমি দেখই নি, শিশির ভাদুড়ীর রামরূপও কিন্তু তোমার মনের মধ্যে এখন নেই, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। মনে মনে

তুমি দেখেছ হীরেন মুখুজ্জেকে, আই অ্যাম সিওর।

বুদ্ধি এবং শিক্ষার জোরেই তোমরা এতদিন তোমাদের বর্বর রূপ ঢাকা দিয়ে নিজেদের ঢাক বাজিয়ে এসেছ—এ কথাটা হাজার বার স্বীকার করি। হীরেনের মধ্যে যে পুরুষ প্রকৃতি, সেটা অবশ্য রামের মধ্যেও ছিল এবং তোমার মধ্যেও আছে, এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।

স্বীকার করলাম। কিন্তু হীরেন বিয়ে করায় তোমার ক্রোধের হেতু ফ্রয়েড অনুসারে—

কি? হাজার বাতির সমকক্ষ ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের সুইচ কে যেন 'অন্' করিয়া দিল, শিক্ষিতা স্ত্রী ভদ্রভাবে তীক্ষ্নতম স্বরে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, ব্রুট কোথাকার!

পর মুহূর্তেই যেন ফিউজ হইয়া গেল, ঘরখানাকে অন্ধকার করিয়া দিয়া সে অন্তর্হিতা হইল। আধুনিকা হইয়াও সনাতন গোসাঘরে খিল দিল। রাম কিছুক্ষণ চেষ্টা করিল আবার বইয়ে মন দিতে। কিন্তু হাজারো রকমে মনকে বিশ্লেষণ করিয়াও মনকে একাগ্র অথবা শান্ত করিতে পারিল না। বইখানাকে রাখিয়া দিয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে সে ভয়ানক চটিয়া উঠিল হীরেনের উপর, দূর হইতেই তাহাকে উদ্দেশ করিয়া গালি দিয়া উঠিল, বীস্ট!

গ্রামের এই নর-নারী-সংবাদ হীরেনের কানেও উঠিয়াছিল। সে কিন্তু মোটেই লজ্জিত হইল না বা দমিল না। বল্মীকস্তূপ অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরি হইয়া উঠিয়া কেবল অগ্ন্যুদ্গারই করিতে আরম্ভ করিল; প্রকাশ্য পথেই সে আস্ফালন আরম্ভ করিল, কুছ পরোয়া নেই, এ তো বউ ম'লে বিয়ে করেছি, এবার একটা থাকতেই আবার বিয়ে করব। এক আধটা নয়—পাঁচ দশটা, দেখি কে কি করে আমার! চালাও পানসী!

হীরেনের সাহস দেখিয়া সমস্ত পুরুষ সমাজ সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু গোপনে! প্রকাশ্যে তাহারা তাহাকে গালি-গালাজ করিয়া আকাশ পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া দিল।

হীরেনের আস্ফালনের সংবাদ পাইয়া মেয়েরা যেন রণ রঙ্গিণী হইয়া পুরুষদের জীবন বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়া তুলিল। দায়ে পড়িয়া পুরুষেরা ভগবৎ ভক্ত হইয়া উঠিল। সাধুগণকে ত্রাণ কর, হে ভগবান! কেহ কেহ গোপনে গিরিমাটির সন্ধান করিতে লাগিল। শ্যাম বেচারা তো মুমূর্ষুর মত হতবাক হতচেতন হইয়া শবের মত এলাইয়া পড়িল; কিন্তু কাল কলি বলিয়া শাস্ত্রও মিথ্যা হইয়া গেল, শ্যামের স্ত্রী হতচেতন স্বামীর বুকের উপর প্রায়

নাচিতে লাগিল, তবু জিভ কাটিল না।

ঠিক এমন সময়ে—যে ভগবান যুগে যুগে সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হন—তিনি বোধ হয় দুস্থ পুরুষগণের দুঃখ মোচনের জন্য অবতীর্ণ না হইয়াও পার্শ্বপরিবর্তন করিলেন! চাকা ঘুরিয়া গেল। গাঙ্গুলীদের ছেলে নীরেন ভগবানের ইঙ্গিতে একটা বিষম কাণ্ড করিয়া বসিল। নীরেন এম. এ. পাশ, ভাল চাকরি করে; মাত্র বছর দুয়েক পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর শরীর খারাপ দেখিয়া সে তাহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া গেল; এবং কয়েক দিন পরেই বাড়ীতে সংবাদ দিল, বধূটির যক্ষ্মা হইয়াছে। তাহার চিকিৎসার জন্য তাহাকে এখন হাসপাতালে রাখিয়াছে, তাহার সেবা শুশ্রূষার জন্য নিজেও সে ছুটি লইয়াছে। নীরেনের বাপ-মা ছুটিয়া কলিকাতায় গেলেন; কিন্তু কয়েকদিন পরই তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া কেহ কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। নীরেনের মা ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিতেছেন, নীরেনের বাপের মুখ উদাস গম্ভীর। সংবাদটা অনুমান করিয়া লইবার পথে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা কোথাও ছিল না, স্টেশনে সমবেত সকলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

রামও স্টেশনে ছিল, সে বাড়ীতে গিয়া সুগভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ নীরেনের বউটি মারা গিয়েছে!

রামের স্ত্রী চমকিয়া উঠিল, কে? কে মারা গিয়াছে?

নীরেনের স্ত্রী। ভেরী স্যাড।

রামের স্ত্রী স্তব্ধ হইয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। রাম সে দৃষ্টি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই সে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উদ্যোগ করিল।

রামের স্ত্রী বলিল, চললে কোথা? তোমার তো আর স্ত্রী মরে নি যে, ঘোড়ার খোঁজে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ!

রাম অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ও সভয়ে বলিল, কি বল তুমি তার ঠিক নেই!

হাসিয়া রামের স্ত্রী বলিল, বলি আমি ঠিক।

রাম আবার ফিরিয়া বসিয়া বলিল, নাও, কি বলছ বল?

একটি কাজ করতে হবে। নীরেনের সঙ্গে শেফালির বিয়ের সম্বন্ধ করতে হবে। বাবা আমার টাকা খরচ করতে পেছুবেন না।

রামের মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, নীরেন হীরেনের সম্বন্ধে কি রকম ভাইও হয়, না? বোধ হয় মাসতুতো।

রামের স্ত্রী বলিল, সে আমি জানি না, তবে তোমার ভাবী ভায়রাভাই এটা আমি জানি।

সংধ্যার পর রাম বেড়াইয়া ফিরিলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, গিয়েছিলে নীরেনদের বাড়ী ?

অত্যন্ত তীক্ষ্ম বাঁকা হাসি হাসিয়া রাম বলিল, গিয়েছিলাম।

সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে স্ত্রী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

রাম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাঁকা-হাসি একটু বেশী করিয়া হাসিয়া বলিল, শুনলাম, হীরেনের সঙ্গে নীরেনের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রাম সম্পর্ক পর্যন্ত না।

কপাল কুচকাইয়া তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া স্ত্রী বলিল, মানে ?

মানে, নীরেনের স্ত্রীর মৃত্যু এখনও হয় নি এবং নীরেন তার রুগ্না স্ত্রীর শিয়রে সাবিত্রীর মত ব'সে আছে। বাপ মা কারও অনুরোধ শোনে নি। চাকরি থেকে ছ'মাসের ছুটি নিয়েছে, এবং দরকার হলে চাকরি ছেড়ে দেবে।

স্ত্রী কিছুক্ষণ রামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমাদের জাতটাই এমনই, বুঝেছ ? স্ত্রীর জন্যে মা বাপকে পর্যন্ত বিসর্জন দাও তোমরা !

বুদ্ধিমান, বহু বিদ্যার অধিকারী রাম হতবাক হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্যামের অবস্থা আরও শোচনীয়।

প্রথমে সে সগৌরবে একটা বিড়ি ফেলিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, শুনেছ তো ?

স্ত্রী মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, যখের ধনটন পেয়েছ নাকি ?

খুব করিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শ্যাম বলিল, বলি হীরেনের কথা নিয়ে খুব তো কথা বল—

বাধা দিয়া স্ত্রী বলিল, দু-টান খেয়েই বিড়িটা ফেলে আবার একটা বিড়ি ধরালে যে ?

ফেলিয়া দেওয়া আধপোড়া বিড়িটা কুড়াইয়া কুলুঙ্গিতে রাখিয়া দিয়া শ্যাম বলিল, ধেৎতেরি, বিড়ির নিকুচি করেছে !

স্ত্রী বলিল, তা বইকি, মরদের মুরদ তো বিশ বিঘে ধানের জমি। তাতে বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টি পয়সার বিড়ি চাই। সেই বিড়ি ফেলে দেওয়া।

শ্যাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, অপরাধ হয়েছে, বাপরে বাপ!

স্ত্রী এ কথার কোন প্রতিবাদ করিল না। গম্ভীর ভাবে পানের বাটা টানিয়া লইয়া দোক্তা খাইবার উপযোগী ডবল খিলি রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্যাম বলিল, নীরেনের কথা শুনেছ তো? হীরেনের কথা নিয়ে খুব তো খোঁচা দিয়ে দিয়ে কথা বল। নীরেন কি রকম—

যাও যাও, স্ত্রৈণ ভেড়ুয়া কোথাকার! ওই কথা নিয়ে বড়াই করতে লজ্জা করে না? বুড়ো বাপ মা, তুই একমাত্র ছেলে, তাদের ছেড়ে তুই—হুঁ! গলায় দড়ি তোমাদের। আমার ছেলে হলে কান ধরে টেনে আনতাম, এনে বিয়ে দিতাম! ছেলে নেই, পুলে নেই, কাঁচা বয়েস—হুঁ।

শ্যাম বিছানার উপর শুইয়া পড়িল, স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াইয়া নিঃশেষিত প্রায় বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া ঘরের চেলাকাঠের দিকে চাহিয়া গান ধরিল, তনয়ে তরো তারি-নী!

স্ত্রী বলিল, একটা টৌকির গান গাও। যত সব সেকেলে গান!

শ্যামের কণ্ঠস্বরটি ভাল। গানও সে ভালই গায়। স্ত্রীর কথায় তাহার তারিণীর স্তব অসমাপ্ত রহিয়া গেল, কিন্তু টৌকির গান তাহার একটাও মনে পড়িল না।

শুধু রাম আর শ্যাম নয়, যদু, মধু, হরি, মাধব, যাদব সকলের বাড়িতেই এখন নীরেনের আলোচনা; হীরেন এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে। নিষ্কৃতি পাইয়া সে বেশ স্বাভাবিক হইয়া উঠিল; হাট করে, বাজার করে, জমি দেখে, তাস খেলে, নীরেনকে লইয়া সেও আলোচনা করে। আলোচনায় সকলের সহিত সেও একমত। এটা একেবারে বাড়াবাড়ি, বাড়াবাড়িরও বেশী—অপরাধ।

মেয়েরা বলে, আদিখ্যেতা!

নীরেনের বাপ ছেলেকে বুঝাইয়া পত্র দিলেন, লিখিলেন, সমগ্র গ্রামের লোক তোমার এ আচরণের নিন্দা করিতেছে। তাহা ছাড়া তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, বিজ্ঞান বল, শাস্ত্র বল, কিসে তুমি তোমার এই আচরণের সমর্থন পাইলে? এ মায়া মিথ্যা, মিথ্যার মোহে পড়িয়া নিজের সর্বনাশ নিজে করিও না।

নীরেন উত্তর দিল, গ্রামের লোকের স্তুতি নিন্দায় আমার কিছু আসে যায় না। বিজ্ঞান ও শাস্ত্র এই দুইকেও আমি মানি না। তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু প্রেম, একমাত্র তাহাকেই আমি মানি।

শাস্ত্রকে মানি না বলিয়া রেহাই আছে, কিন্তু বিজ্ঞানকে মানি না বলা ধৃষ্টতা ; মাসকয়েক পরেই নীরেনের স্ত্রী মারা গেল। নীরেনের বাপ-মা আবার একবার কলিকাতায় ছুটিলেন, কিন্তু দুজনেই সেই পূর্বের মত ফিরিয়া আসিলেন, বাপের মুখ গম্ভীর, মায়ের চোখে জল। নীরেন আসে নাই, সে কাশী গিয়াছে, সেইখানেই স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদি সারিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইবে।

ঘরে ঘরে আবার একবার আলোচনা জমিয়া উঠিল।

শ্যামের স্ত্রী বলিল, মুখে ঝ্যাঁটা মুখে ঝ্যাঁটা! বুড়ো বাপ-মাকে ফেলে স্ত্রীর শোকে সন্ন্যাসী হওয়ার মুখে ঝ্যাঁটা।

শ্যামের উপস্থিত বিড়ির পয়সার প্রয়োজন ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে সমর্থন করিয়া বলিল, একশোবার।

শ্যামের স্ত্রী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, একশোবার? হাজার বার, লক্ষ বার।

শ্যাম বলিল, আমিও তো তাই বলছি, তুমি রাগছ কেন?

রাগছি কেন? তোমাদের দেখলে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। তোমরা কি মানুষ? তোমরা জানোয়ার।

সকালবেলা হইতে বিড়ি খাইতে না পাইয়া শ্যামের মেজাজ ভিতরে ভিতরে রুক্ষ হইয়া ছিল, তাহার উপর গালিগালাজের ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ডতায় বিড়ির পয়সার আশা জলাঞ্জলি দিয়া সে অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল ; গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া সে বলিল, কি, আমরা জানোয়ার?

একশোবার, হাজার বার, লক্ষ বার।

লক্ষ বার?

হ্যাঁ, কোটি বার।

তবে এই দেখ।—বলিয়া শ্যাম উঠান হইতে একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া উনানের উপর ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটার গায়ে দুম করিয়া বসাইয়া দিয়া হন হন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্যামের স্ত্রী প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল, কয়েক মুহূর্ত পরেই সে তারস্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোষণা করিল, ওগো মাগো, শেষে তুমি মাতাল গেঁজেলের হাতে আমাকে দিয়ে গেলে গো!

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সে বসিয়া আপনার বাপকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল, আবাগীর বেটা, চোখখেকো, কঞ্জুস, কিপটে, পয়সা খরচের ভয়ে আমার এই দশা ক'রে গেলি তুই!

এখানে বলা প্রয়োজন শ্যামেরা বংশজ ; তাহারা বরপণ পায় না, কন্যাপণ দিয়ে তাহাদের বিবাহ করিতে হয়।

শ্যাম বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছিল, হীরেনদের পাড়ায় আসিয়া দেখিল, রাস্তার উপরেই বেশ একটা মজলিস জমিয়া উঠিয়াছে ; মায় বুদ্ধিমান পণ্ডিত রাম পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত। সেও আসিয়া জমাইয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন তাহার দিকে বিড়ি দেশলাই আগাইয়া দিল, বলিল, ব'স বস'। একটা বেশ নধর খাসী দেখে দাও দেখি ভাই শ্যাম।

শ্যাম স্বভাবগত নির্বুদ্ধিতার সহিত অকারণে প্রশ্ন করিল, খাসী ?

হ্যাঁ, খাসী। হীরেনের নতুন বউয়ের আজ সাধভক্ষণ। আমরা রাত্রে ফিস্টি খাব।

অন্য একজন বলিল, একটা খাসীতে হবে তো ? মেয়েরাও তো ছাড়বে না।

রাম প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, তা হলে আমি নেই কিন্তু। ওদের সঙ্গে সামাজিক ভোজন না ক'রে উপায় নেই, কিন্তু, প্রীতি ভোজন অসম্ভব।

শ্যাম কথাটা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সায় দিল—আলবৎ !

মাস দুয়েক পর।

একদিন গভীর রাত্রে রাম তখনও একখানা বই পড়িতেছিল, তাহার আধুনিকা স্ত্রী সন্ধ্যা তাহার সহিত তর্কের নামে তুমুল কলহ করিয়া সদ্য ঘুমাইয়াছে। তর্কের বিষয় ছিল হীরেনের তথা সমগ্র পুরুষ জাতির নির্লজ্জতা। জীবজগতে অতিবড় নির্লজ্জ না হইলে এমন করিয়া কেহ বুদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যার সাধভক্ষণ উপলক্ষে প্রকাশ্য ভাবে সমারোহ করিতে পারে না। পরিশেষে বলিয়াছিল, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হীরেনের বউ লজ্জায় কারও সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পারে নি।

রাম উত্তরে তুলিয়াছিল নীরেনের প্রসঙ্গ, ফলে স্ত্রীর চোখে মুখে হিস্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল ; সভয়ে রাম সকল প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া বই লইয়া বসিয়াছে। সহসা একটা বুকফাটা ক্রন্দন-ধ্বনিতে নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া গেল ! সে চমকিয়া উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু আর কিছু শোনা গেল না।

ঘন্টাখানেক পর শ্যাম ডাকিল, রাম ! রাম !

কি হে ? চকিত হইয়া রাম জানালা খুলিয়া সাড়া দিল।

আসতে হবে ভাই একবার। হীরেনের বউটি মারা গেল।

মারা গেল ?

হ্যাঁ। প্রসব হতে গিয়ে মারা গেল।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া শ্যাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হীরেন বেচারীর ভাগ্যটাই খারাপ !

স্ত্রী বলিল, খারাপ ? পরম ভাগ্যবান লোক। লাফ দিয়ে আবার ঘোড়ায় চড়বে।

শ্যাম চুপ করিয়া রহিল, হীরেনের সপক্ষে কিছু বলিবার সাহস তাহার হইল না, আর বলিবার আছেই বা কি ?

স্ত্রী বলিল, একটি উপকার কর দেখি আমার। আমার মাসীর অবস্থা খুব খারাপ, তার ওপর আঠারো বছরের মেয়ে গলায় ; হীরেনকে ব'লে কয়ে বিয়েটি ঘটিয়ে দাও দেখি।

শ্যামের লজ্জা হইল, কিন্তু সে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। তাগাদার পর তাগাদা সে শ্রাদ্ধশান্তির অজুহাতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া অবশেষে একদিন প্রভাতে উঠিয়াই হীরেনের নিকট না গিয়া পারিল না।

হীরেনের দরজায় বেশ একটি ভিড় জমিয়াছিল, অনেকগুলি লোক। মধ্যস্থলে হীরেনের প্রথম পক্ষের শ্বশুর দাঁড়াইয়া হাত-মুখ নাড়াইয়া বলিতেছেন, বৃদ্ধ বয়সে আমার শাস্তিটা দেখ ! ওই নাতি-নাতনীর দল, তার বিষয় পত্র—এ সব কি আমার চালাবার শক্তি আছে, না সময় আছে ?

হীরেন গত রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শ্বশুরকে পত্র দিয়া গিয়াছে, "সংসারে আমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে ; ছেলেপুলেগুলির ভার, বিষয়-পত্রের ভার আপনার উপরই রহিল।"

শ্যাম হাঁফ ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিল।

স্ত্রী বলিল, বৈরাগ্য ?

শ্যাম বলিল, হ্যাঁ।

মুখে আগুন বৈরাগ্যের, একঘর ছেলেপুলে, তাদের ভাসিয়ে দিয়ে বৈরাগ্য ! তারপর স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়ে বলিল, তোমরা এমনই বটে !

রামের স্ত্রী বলিল, বৈরাগ্য, ভালবাসা, ও আমি বিশ্বাসই করি না। হীরেন আর বিয়ে করতে পাবে না বলে দেশ ত্যাগ করেছে।

রাম অবাক হইয়া গেল।

স্ত্রী বলিল, তা বিধবা বিবাহ করিলেই পারত। আজকাল তো আকছার হচ্ছে। একটা আদর্শ স্থাপন করাও হ'ত। তারপর হাসিয়া বলিল, আমার

মৃত্যুর পর তুমি অবশ্যই বিয়ে করবে ; তুমি কিন্তু বিধবা বিবাহ ক'র।

রামের ইচ্ছা হইল, ঠাস করিয়া স্ত্রীর গালে পুরাকালের মত একটি চড় কষাইয়া দেয়।

গ্রামে আলোচনাটা তুমুল হইয়া উঠিল।

সে তুমুল আলোচনাকে ঢাকিয়া দিয়া অকস্মাৎ কোথায় নহবতের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

বাঁশী বাজিতেছিল নীরেনদের দরজায়। নীরেন বিবাহ করিয়াছে। আজই সে বউ লইয়া ফিরিবে বারোটার ট্রেনে, এইমাত্র টেলিগ্রাফ আসিয়াছে।

রামের বউ ফিক্ ফিক্ করিয়া বাঁকা-হাসি হাসিতে আরম্ভ করিল ; শ্যামের বউ উঠানময় আরম্ভ করিল রণরঙ্গিণী-নৃত্য।

শ্যামের অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, সে ভাবিতেছিল, চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোক—কণ্টকে নৈব কণ্টকম্। এ ছাড়া আর উপায় কি। স্ত্রীর মাসীর ওই আঠারো বছরের কন্যাটিকেই—!

অশোক চট্টোপাধ্যায়

পীতাম্বর সাণ্ডেল

এক

সকালবেলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াই পীতাম্বর ওরফে পিতোমবাবু একটা দেড় বিঘৎ আন্দাজ হাই তুলিয়া ও সেই সঙ্গে চীনে পটকা ছোঁড়ার মত তিনটে তুড়ি দাগিয়া স্বগত বলিলেন, "হন্যে হয়ে উঠেছি, কী কুক্ষণেই যে পুন্নাম নরক অ্যাভয়েড করবার জন্যে এ কাজ করতে গিয়েছিলাম—উঃ, কেঁদে, কঁকিয়ে, গলিয়ে, চেঁচিয়ে গিন্নী যেন মেনিনজাইটিসের মত মাথার ভিতরটা ছারখার দিতে বসেছে, আর ছেলেটা 'আওয়ারে', 'হাফ-আওয়ারে', 'কোয়ার্টারে' গির্জের ঘড়ির মতো হাঙ্গামা করে ঘুমের পাট একেবারেই তুলে দিয়েছে। এরপর একদিন কিছু একটা করে বসব বলে রাখছি—পিতোম সাণ্ডেল রাগ করে না করে না ; কিন্তু করে যখন হুঁ···মু মু।" পাশের ঘর থেকে নারীকণ্ঠে কে বলিল, "ওগো, এখানে অন্ধকারে সিন্দুকটার ভেতর অবধি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, এটা একটু বারান্দায় বার করে দাও তো, রিং থেকে সেফটি-পিনটা যে কোথায় খুলে পড়ল—কিছুতে যদি হাতড়ে পাচ্ছি!"

পিতোমবাবু মনে মনে গর্জিয়া উঠিলেন, "অত্যাচার, অনাচার, অরাজকতা! সেপ্টি-পিন পাচ্ছ না বলে আমি এখন ঘুমের চোখে তোমার পিতামহের আমলের

জাহাজী সিন্দুকটা কাঁধে করে দৌড়াদৌড়ি করি। জাহান্নমে যাক্ তোমার সেপ্টি-পিন।" বাহিরে মিহি গলায় বলিলেন, "মেধোকে ডেকে বলো না সিন্দুকটা বার করে দিতে; আমার শরীরটা ভালো নেই তেমন।" নারীকণ্ঠ কিছু উচ্চে উঠিল, "বেলা ছুটা হয়ে গেল এখনও বিছানায় শুয়ে গা মোড়ামুড়ি দেওয়া হচ্ছে। আমার খেটে খেটে প্রাণ গেল আর উনি শুধু আরাম করবেন। এসো বলছি শিগগির বাইরে, নইলে কুরুক্ষেত্র হবে।"

পিতোমবাবু একবার নেপথ্যে পরলোকগতা মাতৃদেবীকে স্মরণ করিয়া সুড়সুড় করিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন, ভাঁড়ারের সিন্দুকটি নিরামিষ চাল ডাল ও আমিষ ইঁদুর আরশোলায় বেশ পুরা দুই কি আড়াই মন হইবে, পিতোমবাবু তাহা তুলিতে চেষ্টা করিয়া, না পারিয়া তাহাতেই কাঁধ দিয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে দরজার আলোর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই আকস্মিক আন্দোলনে ভীত হইয়া একটি নেংটি ইঁদুর এক ছিদ্রপথে সিন্দুক হইতে তড়াক করিয়া বাহির হইয়া পিতোমবাবুর গলার উপর অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার শিরদাঁড়া বহিয়া নামিয়া গেল। পিতোমবাবু "আরে আরে" বলিরা ইঁদুরটিকে তাড়াইতে গিয়া একটু বেসামাল হইয়া মেজের উপর গিন্নীর রক্ষিত একবাটি সরিষার তৈলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

গিন্নী তার স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "এক ফোঁটা কাজ করতে এসে অমনি পোয়াখানেক তেল উল্টে বসল। বাবারে বাবা, আমি তো আর পারিনে। সেই কোন্ রাজ্যি থেকে নসু খুড়োকে সেধে সেধে ঘানির তেল আনাই; তার হয়ে গেল! বলি রোজ যে এক গঙ্গা গিলে উজাড় করো, তা যায় কোথায়? একটা কাঠের বাক্স নেড়ে সরাতে গিয়ে যে হাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তেলের বাটি উল্টে গোল্লায় গেলে একেবারে!"

পিতোমবাবু "অ্যাডিং ইনসাল্ট্ টু ইন্জুরি" বলিয়া কি একটা বলিতে গেলেন; তাহার উল্টা উৎপত্তি হইল। গিন্নী আবার হাঁকিয়া উঠিলেন, "আরে রেখে দাও তোমার ইন্জিরি—ইন্জিরি আদালতে গিয়ে বলো গিয়ে;—এক পয়সার যার দেহে সামর্থ্য নেই সে আবার ইন্জিরি বলে, মুখে আগুন অমন ইন্জিরির।"

পিতোমবাবু অনুযোগের সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আরে বাবা।" কিন্তু কে সেকথা শোনে? গিন্নী আরও খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, "তোমার বাবাকে যা বলতে চাও, তাঁকে গিয়ে বলো, আমি কিসে তোমার বাবা হলাম শুনি? একবাটি তেল উল্টে আবার রস করবার চেষ্টা হচ্ছে। দূর হও এখনি

আমার ভাঁড়ার থেকে, নইলে ঐ বাকি তেল টুকুনও মাথায় ঢেলে দেব বলছি।"

পিতোমবাবু দেখিলেন, তাহার প্রিয়তমা পত্নী সত্য সত্যই কিছু উত্তেজিতা হইয়াছেন। তিনি তাই গেঞ্জীর উপর তেলের ছোপটুকুকে পরাজয়ের চীহ্নরূপে বহন করিয়া অক্ষত দেহে অবিলম্বে ভাণ্ডার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

স্নান করিতে করিতে পিতোমবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কী? স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই যে ব্যবহার, ইহাই কি চিরন্তন? সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, বেহুলা কি তবে পত্নী-সম্মার্জনী পীড়িত কবির পরিহাস মাত্র? পতি পরম গুরু এ মন্ত্র কি স্ত্রীলোকের মর্মে স্থান না পাইয়া অবশেষে তাহার চিরুনীতে আশ্রয় লইয়াছে? দেহগোদের উপর এ কী নিদারুণ বিষফোঁড়া! পিতোমবাবু নিজ চিন্তার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া মাথায় ঘটির পর ঘটি জল ঢালিয়া চলিয়াছেন—চৌবাচ্চা নিঃশেষ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, হঠাৎ স্নানাগারের বাহির হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কে বলিল, "খুব যে নবাবী করে সব জলটুকু খরচ করে রাখছ—কলে তো জল নেই—আমরা কি সব শালপাতায় গা হাত পা পুঁছে স্নানের কাজ সারব নাকি? রাস্তার কল থেকে চার-পাঁচ বালতি জল তুলে তবে তুমি অপিস যাবে, বুঝলে?"

পিতোমবাবু আতঙ্কে স্নানের জল ছাপাইয়া ঘামিয়া উঠিলেন, তিনি বাহিরে আসিয়া অন্যমনস্কতার দোহাই দিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নির্দয়া নারী হৃদয়ে তাঁহার সে বেদনাপূর্ণ আবেদন "ন্যাকামো" বলিয়া অভিহিত হইল। অগত্যা তিনি বালতি হস্তে রাস্তায় জল আনিতে বাহির হইলেন। ভাবিয়াছিলেন মেধোকে উৎকোচ-দানে বশ করিয়া উন্মুক্ত রাজপথে বালতি হস্তে বিচরণ করার অপযশ হইতে আত্মসম্মান রক্ষা করিবেন। কিন্তু মেধো তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া সিঁড়ির পথে "মা ঠাকরুণ ডাকছেন" বলিয়া উপর তলায় উধাও হইয়া গেল। প্রথম দুই বালতি জল পিতোমবাবু লোকচক্ষুর অন্তরালে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। কিন্তু তৃতীয় বালতি লইয়া তিনি সবে দরজার গোড়ার পা দিয়েছেন এমন সময় পিছনে কে হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পিতোমবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন নেপেন ভাদুড়ীকে। নেপেন ভাদুড়ী তাঁর সহিত এক আপিসে কাজ করে—এবং সময় পাইলেই অবান্তর কথা বলিয়া সকলের চিত্তবিনোদন করে, এইভাবে ধরা পড়িয়া পিতোমবাবু লজ্জায় আতঙ্কে শিউরিয়া উঠিলেন। নেপেনবাবু বলিলেন, "আরে সান্যাল মশাই, দিন দুপুরে জল চুরি করে কোথায় পালাচ্ছেন?"

পিতোমবাবু কোন উপায়ে আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য বলিলেন,

"আর ভাই, চাকর বেটা পালিয়েছে, দুর্দশায় পার নেই—বলো কেন ?"

উপরের বারান্দা হইতে ঘন কৃষ্ণ দেহখানি অর্ধেকের অধিক বাহির করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেধো চিৎকার করিয়া উঠিল, "বাবু শিগ্‌গির করুন, মা-ঠাকুরুণের চানের বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

"হে ধরণী দ্বিধা হও! এ কী নিদারুণ অপমানের আগুনে আমায় পুড়িতে হইল।" পিতোমবাবু এক মিনিটে তিন-চার বার রঙ বদলাইয়া করুণ নেত্রে নেপেনবাবুর দিকে চাহিয়া কোন কথা না বলিয়া বালতিটা তুলিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেলেন, নেপেনের অট্টহাস্যে পথঘাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে ধ্বনি যেখানে পিতোমবাবু স্ত্রীর নিকট এক বালতি জল কম আনার জন্য জবাবদিহি করিতেছিলেন সেখানেও পেঁছিল। পিতোমবাবু ক্ষণেকের জন্য কি যেন একটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "ও আবার কি রকম ঢং করছ ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "কিছু না, আপিসের বেলা হয়ে গেছে।"

স্ত্রী বলিলেন, "ঐখানে ভাত বাড়া আছে নিয়ে খেয়ে আপিসে বেরোও। ফেরবার পথে দুটো ডাব কিনে এনো—মেধো বললে, তোমাদের আপিসের কাছে পাওয়া যায়।"

দুই হস্তে দুটি ডাব লইয়া নিজে আপিস হইতে গৃহাভিমুখে যাইতেছেন ও নেপেন ভাদুড়ী তাহার সহকর্মীদিগের নিকট উক্ত ঘটনার সরস ব্যাখ্যা করিতেছেন, এই চিত্র অন্তরে অঙ্কিত করিয়া পিতোমবাবু কম্পিত চরণে আপিসের দিকে রওনা হইলেন। আপিসে ঢুকিয়াই তিনি দেখিলেন, নেপেন ভাদুড়ী জন দশেক ছোকরা-গোচের কর্মচারী পরিব্যাপ্ত হইয়া কি যেন একটা অভিনয় করিতেছে। পিতোমবাবু বুঝিলেন যে, তাঁহার পার্হস্থ্য জীবনের সহিত এ অভিনয়ের খুব নিকট কোনো যোগ আছে। তিনি মুখ ফিরাইয়া কোনো কল্পিত সরলরেখা অনুসরণ করিয়া সটান নিজের টেবিলে গিয়া বসিলেন। নেপেন ভাদুড়ী যে সকল কর্মচারিদিগকে লইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারা একে একে নিজের টেবিলে গিয়া বসিল, কেহ কেহ পিতোমবাবুর টেবিলের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া, "বাক্ আপ পিতোমবাবু" বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া গেল,—যেন পিতোমবাবু তাহাদের নিকট শান্ত্বনার জন্য কখনও আবেদন করিয়াছিলেন, একজন বলিয়া গেল, "ব্রাদার, তোমার শুনছি বড়ো দুঃসময় চলেছে। আমাদের পাড়ার ভুটানি বাবার একটা মাদুলি যোগাড় করে ধারণ করো না; দেখো অব্যর্থ গৃহশান্তি

হবেই হবে—বলব বাবাকে তোমার কথা ?”

পিতোমবাবু নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, “না, না, তোমায় অত পরোপকার করতে হবে না।” বলিয়া ব্যস্ততা দেখাইবার জন্য একটা আধমুনে লেজার টান দিতে যাইয়া টেবিলের ও নিজের ধুতিখানার উপর একটা লাল কালির দোয়াত উল্টাইয়া ফেলিলেন। রাগে ক্ষোভে পিতোমবাবু পাগলের মতো হইয়া উঠিলেন। কাপড়ে কালিলাগা দেখিলে সুভাষিণী, অর্থাৎ পিতোমবাবুর গৃহিণী, তাহাকে কি যে না করিয়া লাঞ্ছিত করিবেন তাহা পিতোমবাবু ভাবিতেই পারিলেন না। তাঁহার মানসিক অবস্থা যখন পত্নীভয়চিন্ত্রস্ত কোনও এক আগ্নেয়গিরির ন্যায় ধুমাইত, কম্পিত ও বিচলিত ঠিক সেই সময় নেপেন ভাদুড়ী আসিয়া পিতোমবাবুর থুতনিতে হাত দিয়া গাইয়া উঠিল—

“দাদা রে আমার,
দরগায় লাগাও শিন্নি,
পীরের কৃপায় হবেন গিন্নী
তোমা পরে সদয়া…ভাইরে সদয়া আ আ…।”

পিতোমবাবু বহু বর্ষের অনভ্যাস বলিয়া হঠাৎ পম্পিয়াই বিধবংসী ভিসুভিয়সের মতো সংহার-মূর্তি ধরিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। একবার “দি লাস্ট স্ট্র” বলিয়া সিংহনাদ করিয়াই পিতোমবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া টেবিলের নীচ হইতে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা তুলিয়া লইয়া নেপেন ভাদুড়ীকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। নেপেন আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। পিতোমবাবু তাহার পশ্চাতে “রাসকেল, রাসকেল” বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া সিঁড়ির নিকট তাহাকে চাপিয়া ফেলিলেন। ধর্ষিত নেপেনের উপর উদ্যত ওয়েস্ট পেপার-বাস্কেট পিতোমবাবু উদ্যত-অস্ত্র ইন্দ্রের ন্যায়ই শোভা পাইতে লাগিলেন। এমন সময় তিনতলার সিঁড়ি বাহিয়া আপিসের ছোটসাহেব নামিয়া আসিলেন। তাঁহার মেজসাহেব সেদিন তাঁহাকে গলদা চিংড়ির সহিত তুলনা করিয়া কি বলাতে তাঁহার চিত্ত কথঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত ছিল। সম্মুখে এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া তিনি ভীষণ চটিয়া গেলেন ও বড়োবাবুকে ডাকিয়া নেপেন ভাদুড়ীর পাঁচ টাকা ও পিতোমবাবুর দশ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পিতোমবাবু অনেক সাধ্য সাধনা করা সত্বেও সাহেবের কঠিন প্রাণে দাগ মাত্র পড়িল না।

দুই

জরিমানার কথাটা পিতোমবাবু গিন্নীর কাছে অনেকদিন ঢাকিয়া রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু মাসান্তে সুভাষিণী যখন তাঁহার নিকট হইতে বেতনের টাকা গুনিয়া লইতেছিলেন তখন টাকা কম দেখিয়া পিতোমবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, "এ কি ? দশ টাকা কম কেন ?"

পিতোমবাবু, "আমি এই কিনা···" বলিয়া কি একটা বলিতে গিয়া ভুল পথে ঢোঁক গিলিয়া বিষম খাইয়া বসিলেন। তিনি পুনর্বার স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিলে পর গিন্নী আবার তাড়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সত্যি কথা বলো বলছি, নইলে অনর্থ হবে, রেস খেলেছ ? বাজি হেরেছ ? কি করেছ ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "না জরিমানা দিয়েছি, সেদিন কি রকম মাথাটা গরম হয়ে উঠল···"

"তাই কি রাস্তায় মারপিট করেছিলে ? ওমা কি হবে গো ? বুড়ো বয়সে শেষকালে মারামারি করে থানা পুলিশ করলে ! ওমা মাগো, আমায় কিনা এও শুনতে হল !"

পিতোমবাবু যতই বলেন, "আরে না না, থানা নয়, পুলিশ নয়, আপিসে···" গিন্নীর ততই শোক বাড়িয়া চলে, "ওগো তুমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালে শেষকালে—মুখে চুনকালি মাখলে, আমার একি লজ্জা হল !"

এমন সময় নসু খুড়া আসিয়া পড়ায় গিন্নী পিতোমকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ের কাছে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ও নসু খুড়ো, বুড়ো বয়সে মারপিট ?" নসু খুড়ো গর্জিয়া উঠিলেন, "ইসটুপিড, পাষণ্ড কোথাকার, তুমি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলো।"

পিতোমবাবু দেখিলেন তিনি ক্রমে গভীর হইতে অতল জলে গিয়া পড়িতেছেন। তিনি এবার প্রাণপণ করিয়া গিন্নীর কান্না খুড়োর গর্জন সব ডুবাইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, "পুলিসেও যাইনি সুভাষিনীকেও মারিনি। ন্যাপা ভাদুড়িকে সিঁড়ির মোড়ে চেপে ধরেছিলাম বলে সাহেব জরিমানা করেছে।"

গিন্নী বললেন, "ও, আপিসে গিয়ে বুঝি ঐ সব করা হয় ?"

নসু খুড়ো বলিলেন, "তা আগে বলোনি কেন ?"

সুভাষিণী এতক্ষণ পুলিশ সংক্রান্ত কলংকভীতি হইতে সামলাইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি এখন ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে-ছোকরাদের

মতো ধস্তাধস্তি করতে তোমাদের একটু ঘেন্নাও কি হয় না? দশ দশটা টাকা! এখন কি তোমাদের বাদুরেপনার জন্য খোকার দুধ বন্ধ করব, না সকলে নিরামিষ খেয়ে দিন কাটাব?"

নসু খুড়ো বিচারকার্যনিরত সলোমানের ন্যায় মুখ করিয়া বলিলেন, "না না, শিশুর দুগ্ধপান বন্ধ করা কদাপি উচিত হবে না। তদ্ব্যতীত পীতাম্বর অনবধানবশত যে অবিমৃশ্যকারিতার কার্য করিয়া ফেলিয়াছে তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহার উচিত হইবে আগামী এক মাসকাল ট্রামে আপিস যাতায়াত না করিয়া পদব্রজে গমনাগমন দিয়া।"

সুভাষিণী অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে পাইয়া আনন্দে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ নসু খুড়ো! হেঁটে হেঁটে আপিস যেতে হলে ওনার রসের কোঁড় একটুখানি হালকা হয়ে আসবে—ছ্যাবলামি করাও একটু বন্ধ হবে।"

পিতোমবাবু নসু খুড়োর দিকে একবার বিষনেত্রে তাকাইলেন, কিছু বলিলেন না। সুভাষিণী খুড়া মহাশয়ের রায়ে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি খুশি মনে স্বামীকে বলিলেন, "তুমি যাও তো গো ছ-পয়সার কচুরি নিয়ে এসোগে। মেধো খোকাকে খেলা দিচ্ছে। নসু খুড়ো একটু বসে চা-টা খেয়ে যাও।"

নসু খুড়ো একটা নিকেলের ডিবা বাহির করিয়া তাহা হইতে এক টিপ তীব্রগন্ধ নস্য গ্রহণ করিয়া একটি মাসাধিককাল রজকদর্শন-বঞ্চিত রুমালে নাক মুছিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ, তা তোমরা যদি বলো, তাহা হইলে আমি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি?"

পিতোমবাবু ছয়টি পয়সা হস্তে লইয়া খাবারের দোকানে কচুরি আনিতে চলিলেন। মনে হইল কচুরি না হইয়া যদি নসু খুড়োর জন্য বিষ আনিবার জন্য এ যাত্রা হইত তাঁহার অন্তরে অন্তত কিছু সুখের সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তি পুরুষ হইয়া উৎপীড়িত পুরুষের বেদনা বুঝে না, বরং তাহার যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার বিষই, কচুরি নহে। হঠাৎ মনে হইল কচুরি খাইয়াও তো কেহ কেহ কলেরা হইয়া মারা যায়—নসু খড়াকেও বাসী দেখিয়া কচুরি খাওয়াইতে পারিলে তাহারও হয়তো একটা ভাল মন্দ ঘটিতে পারে। দোকানে পৌঁছাইয়া পিতোমবাবু বলিলেন, "বেশ ভাল রকম বাসী কচুরি আছে?"

দোকানদার অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; বলিল, "সে কি মশাই—বাসী কচুরি কি আবার কেউ বিক্রি করে নাকি ?" যেন কলকাতার ময়রার অভিধানে বাসী বলিয়া কোনো শব্দই নাই।

পিতোমবাবু বলিলেন, "আরে বাপু, কুকুরকে খাওয়াতে হবে—সস্তা-টস্তা করে দাও না থাকে তো।" ময়রা অগত্যা যেন খুব অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে এক ঠোঙা কচুরি বাহির করিয়া দিল। পিতোমবাবু সানন্দে কচুরি লইয়া গৃহে চলিলেন। মনে মনে বলিলেন, "কলেরা না হোক অন্তত দু-চার দিনের জন্য ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ হবে তো!"

একখানা কচুরি মুখে দিয়াই নসু খুড়ো বলিলেন, "থুঃ-থুঃ, ছ্যা ছ্যা, এই কি অদ্যকার কচুরি নাকি? বাবাজী, তোমাকে ময়রা ঠকাইয়াছে। এ কচুরি নিদেনপক্ষে তিন দিবসের বাসী মাল।"

গিন্নী বলিলেন, "বলি, তুমি কি চোখের মাথা খেয়ে দোকানে গিয়েছিলে নাকি? যাও শিগ্‌গির খাবারটা বদলে নিয়ে এসো। এদিকে চায়ের জল ফুটে উঠল ; কোনও কাজ কি তোমায় দিয়ে হবে না?"

পিতোমবাবু নিজের সযত্ন কল্পিত প্রতিহিংসার পথ এমন করিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতে দেখিয়া মরিয়া হইয়া বলিলেন, "না, না, ও কিছু তেমন বাসী নয় ; হাতে গরম না হলেই কি খাবার বাসী হয় ; খান না খুড়ো মশাই, কিছু হবে না।"

খুড়ো শিরঃ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "না বাবাজী, আমার আর বাসী খাইবার বয়স নাই।"

গিন্নী হাঁকিলেন, "শি...গ্‌গি...র যাও বলছি। নইলে তোমার রাত্রে ভাতের বদলে ঐ কচুরি খেয়েই থাকতে হবে।"

পিতোমবাবু হতাশ হইয়া পুনরায় ঠোঙা হস্তে পথে বাহির হইলেন। মুখখানা তাঁহার হস্তস্থিত বাসী কচুরি অপেক্ষাও শক্ত, ম্লান।

তিন

ট্রামের পয়সা না পাওয়াতে আজকাল পিতোমবাবু আপিসে প্রায়ই 'লেট' করিতে অরম্ভ করিলেন। বড়োবাবু তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, একথা সাহেবের কানে গেলে মুশ্‌কিল হইবে। পিতোমবাবু তাঁহাকে বলিলেন যে, কোনো ঘোর বিপদে পড়িয়া তাঁহার বর্তমান ট্রামে যাতায়াত করিবার সংস্থান নাই—কি করিবেন? বড়োবাবু বলিলেন, যেমন করিয়া হউক আপিসে সময়ে না পৌঁছাইলে বিপদ অনিবার্য।

পিতোমবাবু গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আপিসে 'লেটে' পোঁছানতে বড়োবাবু শাসিয়েছেন রিপোর্ট করচেন, বুঝলে ?"

গিন্নী বলিলেন, "কেন, পথে কি খেলা কর না কি ? দেরি হয় কেন ?"

"সকালে বাজার করে, তোমার ফুট ফরমাস খেটে, ভাত খেতে দেরি হয় ! তারপর যদি ট্রামের পয়সা না পাই তাহলে পাংচুয়াল হতে হলে আপিসে দৌড়ে যেতে হয় ।"

সুভাষিণী বিষকণ্ঠে উপদেশ দিলেন, "তবে এ কটা দিন দৌড়েই যেও ।" হতাশা ও গত্যন্তরবিহীনতা পিতোমবাবুকে পাগলের মতো করিয়া তুলিল, তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "না, ট্রামেই যাব । আলবত্ যাব !"

গিন্নী আরও জোরে বলিলেন, "অমন করে জানোয়ারের মতো চেঁচাচ্ছ কেন ? মারবে নাকি ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ মারবো । যদি ফের আমার কথার উপর কথা বলো তো মারই খাবে ।"

গিন্নী বোঁ করিয়া ঘুরিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়া দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি আজ নিশ্চয়ই মদ খেয়ে এসেছ । তা নইলে আমায় মারতে ওঠো । থাকো আজ ঐ ঘরে বন্ধ হয়ে । আজ তোমার খাওয়া দাওয়া বন্ধ ; নেশা ছুটলে পর আমার কাছে মাপ চাইবে, তবে তোমায় আমি ছাড়ব । ঝাঁটা মারো অমন পুরুষমানুষের মুখে ! চামারের মতো কথা শোনো একবার ; বলে কিনা মারবে ! ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি ।" পিতোমবাবু চিৎকার করিয়া বলিলেন, "খোলো বলছি দরজা, তা নইলে লাথি মেরে ভেঙে ফেলব ।"

"ভাঙো না ক্ষমতা থাকে তো । তারপর বাড়িওলাকে গুণাগার দিও ।"

পিতোমবাবু দড়াম করিয়া দরজায় একটা লাথি মারিলেন, পায়ে লাগিল বটে, তবে দরজার কিছুই হইল না । ডাকিলেন, "মেধো, মেধো !" শুনিলেন গিন্নী বলিতেছেন, "মেধো, ওদিকে যাস তো ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব ।"

পিতোমবাবু হতাশ হইয়া একটা বেতের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন ! আপিস হইতে ফিরিয়া কিছুই খাওয়া হয় নাই ; কি করিবেন ? একখানা 'প্রবাসী' পড়িয়াছিল, তুলিয়া লইলেন । প্রথমে চোখে পড়িল একটি প্রবন্ধ 'নরনারীর সমান অধিকার ।" পিতোমবাবু ভাবিলেন, "হায় রে, সে রকম সুদিন কি আমাদের কখনও হবে ?"

তিন চার ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল । কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়াও

সুভাষিণীর কোনোও সাড়া পাওয়া গেল না। একবার তোপসে মাছ ভাজার একটা উগ্র-মধুর গন্ধ দমকা হাওয়ার সহিত ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পিতোমবাবুর রসনায় বান ডাকাইয়া দিয়া আবার মিলিয়া গেল। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, "ওগো, লক্ষ্মীটি, দরজা খোলো, খিদেয় প্রাণ গেল। আমি দৌড়েই আপিস যাব, দরজা খোলো।" শুনিলেন ভর্জিত মৎস্যজড়িত জিহ্বায় নসু খুড়া সুভাষিণীকে বলিতেছেন, "না না খুলিয়া কাজ নাই। মাতাল মানুষ পুনরায় যদি প্রহার আরম্ভ করে, আমি এ বয়সে রোধ করিতে পারিব না।"

দরজা বন্ধই রহিল। পিতোমবাবু 'প্রবাসী'র গল্প ও প্রবন্ধ শেষ করিয়া বিজ্ঞাপনগুলি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ দেখিলেন একখানা ছবি। একজন লোক আদেশ করিবার ন্যায় ভঙ্গিতে হস্ত প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান। চক্ষু দিয়া তাহার অপূর্ব জ্যোতি নিঃসরিত হইতেছে। তাহার সম্মুখে দলে দলে লোক—কেহ করজোড়ে, কেহ হাঁটু গাড়িয়া, কেহ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণত। এক পার্শ্বে গুটিকয়েক হস্তী ও অশ্ব উক্তরূপে আত্মসমর্পণ মুদ্রায় উপস্থিত রহিয়াছে, ছবিটির নীচে বড়ো অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি

পথহারা চলৎশক্তিরহিতপ্রায় পথিক মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ ওয়েসিস্ দেখিতে পাইলে যেমন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে পুনর্জন্মের আশ্বাস পাইয়া পুনর্বার চাঙ্গা হইয়া উঠে, পিতোমবাবু বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া তেমনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, বন্দীদশা, নসু খুড়া, তোপসে মাছ সব ভুলিয়া আধভাঙা বেতের চেয়ারটার উপর যতটা পারেন, সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার অন্তরে যেন কোটি বিহঙ্গম কোনো এক নূতন উষার আশা-সূর্যের পানে চাহিয়া গাহিয়া উঠিল, "আর ভয় নাই, দুখ হল অবসান।"

পিতোমবাবু পাঠ করিলেন—

অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি

ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষ কি না করিতে পারে? পৃথিবীতে এই যে এত বিফলতার ক্রন্দন, এত উৎপীড়িতের ব্যাকুল আর্তনাদ, ইহার মূলে রহিয়াছে ইচ্ছাশক্তির অভাব বা অশিক্ষিত ভাব। শিক্ষিত ইচ্ছাশক্তি মানুষকে তেমনি করিয়াই ক্ষমতাবলম্বী ও অপরের মনের উপর প্রভাবাপন্ন করিয়া তোলে যেমন করিয়া শিক্ষিত মাংসপেশী কুস্তিগির বা যুযুৎসু-যোদ্ধা অকাতরে অপরের উপর শারীরিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। আমাদের শিক্ষা অনুসারে চলিলে আপনি যতই পরনির্ভরশীল, কাপুরুষ ও অপরের উপর প্রভাবহীন হউন না

কেন, তিন মাসের ভিতর আপনার কথায় লোকে উঠিবে বসিবে ; আপনার চোখের চাওনির সম্মুখে উদ্যত-ছোরা গুণ্ডাও হটিয়া যাইবে, অদম্য আত্মনির্ভর-শীলতা আপনাকে উন্নতির সর্বোচ্চশিখরে আসীন করিয়া দেবে।

এ শক্তি লাভের জন্য আপনাকে কিছু খাইতে হইবে না, কিছু ধারণ করিতে হইবে না। নিছক মানসিক শক্তির উপযুক্ত ব্যায়ামের দ্বারা আপনি দিনে দিনে অধিক হইতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন।

এ শক্তি আপনার ভিতরেই আছে। আমরা মাত্র তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিব।

নিচের ঠিকানায় পত্র লিখুন—

শ্রী প্রভাবানন্দ স্বামী
পোষ্ট বক্স ৩১৩, কলিকাতা

পিতোমবাবু ভাবিলেন, "কী আশ্চর্য ; আর আমি একটা সামান্য নারীর দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে কি করব তা ভেবে কুল পাচ্ছি না! কালই আমি স্বামীজীকে চিঠি লিখে সব ঠিক করে ফেলব!"

গভীর রাত্রে ঘরের দরজা খুলিয়া সুভাষিণী দেখিলেন, তাহার স্বামী অঘোরে নিদ্রা দিতেছেন। মুখ তাঁহার কী একটা বিজয়ানন্দের আলোকে উদ্ভাসিত। সুভাষিণী মনে মনে বলিলেন, "মদের এমনই গুণ বটে! পেটে ভাত পড়েনি একটাও, ঘুমের ঘোরে মুখ করেছে যেন ওকে কে লাটের গদিতে বসিয়ে দিয়েছে।"

চার

প্রভাবানন্দ পিতোমবাবুকে লিখিলেন—

"আপনি যে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে আমি সপ্রশংস সম্ভাষণ করিতেছি। আপনি এই পত্র লিখার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিলাভের পথে অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছেন।

"এখন আপনাকে বলি, ইচ্ছাশক্তি কি। আমরা যখন সজ্ঞানে কোন ইচ্ছা করি বা কোনরূপ ইচ্ছানুসারে কার্য করি তখন একথা আমরা কদাচ মনে করি না যে, আমাদের জ্ঞানের অন্তরালে কোন কিছু আছে যাহার উপর আমাদের কার্য বা ইচ্ছা কোনোরূপে নির্ভর করে। বস্তুত আমাদের যে মন তাহার মধ্যে

অজ্ঞানতার ক্ষেত্র অতিশয়ই স্বল্প-পরিসর। আমাদের যে অনভিব্যক্ত অননুভূত মনঃক্ষেত্র তাহা সর্বদাই আমাদের সজ্ঞান চিন্তা ও কার্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করিতেছে। যে ব্যক্তি বহুকাল কোনো কার্য সম্বন্ধে কোনো এক প্রকার মনোভাব পোষণ করিয়াছে সে যদি কখনও জোর করিয়া তাহার বিপরীত কিছু করিতে চায়, তাহা হইলে সজ্ঞানতার ক্ষেত্রে তাহার সেইরূপ কার্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে তাহা করিতে পারিবে না, কারণ, তাহার মনঃক্ষেত্রের প্রত্যেক আপাত অননুভূত প্রান্ত হইতে সে বিপরীত দিকে আকর্ষিত হইবে। এইজন্য সজ্ঞানে কোনও প্রকার কার্য চিন্তা বা ব্যবহার উত্তম রূপে করিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদের সমগ্র মনঃক্ষেত্র উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

"আপনি যদি অপরের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অক্ষম হন, তাহার কারণ এই যে, আপনি আজন্ম সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে এই ধারণাই মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন যে, আপনি অপর হইতে অধম, এই মনোভাব আপনাকে দূর করিতে হইবে।"

"আপনি পত্রোত্তরে ১৩৷৷০ টাকা আমায় পাঠাইলে আপনাকে আমি মৎ-লিখিত পুস্তক 'অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি' পাঠাইয়া দিব। পুস্তকানুগত নির্দেশ অনুসারে কার্য করিলেই আপনি ক্রমে ক্রমে প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীকে পদতলে আনিতে পারিবেন।"

পিতোমবাবু অবিলম্বে নিজের ঘড়িটি বন্ধক দিয়া পনেরো টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বামী প্রভাবানন্দকে পাঠাইয়া দিলেন।

"অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি" আসিল। ছাদের ঘরে লুকাইয়া বসিয়া পুস্তকের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়া পিতোমবাবু বুঝিলেন, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি আছে অনেক, কিন্তু তাহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই ছত্রভঙ্গ ইচ্ছাশক্তি একত্র করিতে হইলে তাঁহাকে কোনো কঠিন কার্য প্রত্যহ একাগ্র মনে কিয়ৎকাল ধরিয়া করিতে হইবে। যথা সুতার জট ছাড়ানো। অনেকটা সুতা জট পাকাইয়া তাহা এক মনে খুলিতে থাকিলে বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তি শীঘ্রই ঐ জটের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। পিতোমবাবু গিন্নীর 'ক্রোশের' সুতার বাণ্ডিল একটি অপহরণ করিয়া ছাদের ঘরে লইয়া খুলিয়া জট পাকাইয়া ফেলিলেন। তারপর জট ছাড়াইবার পালা। পিতোমবাবু যতই একদিক খুলেন উহা ততই অপরদিকে দ্বিগুণ জট পাকাইয়া যায়। তিন দিন ধরিয়া পিতোমবাবু তাহার বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তির কর্মগুলি একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াও দেখিলেন সুতায় যে জট সেই জট।

গিন্নী তাহাকে ঘন ঘন ছাদের ঘরে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশেপাশে সব গেরস্ত মানুষের বাড়ি ; বৌ-ঝিরা ছাদে বড়ি দিতে, চুল শুকুতে ওঠে ; তুমি ছাদে কিসের জন্য ঘোরাঘুরি করো, বলো তো ?"

পিতোমবাবু বলিলেন, "না ঘোরাঘুরি তো করি না, এই একটু বিশ্রাম হয়।"

সন্দিগ্ধচিত্ত গৃহিণী সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া একদিন হঠাৎ যখন স্বামী এক মনে সুতোর জট খুলিতে ব্যস্ত, সেই সময় ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাশিকৃত সুতো দেখিয়া তো তাহার চক্ষুস্থির। তিনি বলিলেন, "ওমা বুড়ো বয়সে তুমি কি শেষে ঘুড়ি উড়ুতে আরম্ভ করলে নাকি ? ছি, ছি, লোকে বলবে কি ? খবরদার আর তুমি ছাদে উঠে এসব করবে না !"

স্বামী বলিলেন, "ঘুড়ি আবার কোথায় ওড়াই ; এ কি ঘুড়ির সুতো ?"

"তাই তো এ দেখছি আমার বুনবার সুতো ! এ তুমি কোথায় পেলে ? আমি বলে সুতো নেই দেখে খোকাকে মারধর করলাম, মেধোকে কত গাল দিলাম, দেখো দিকিন আর তুমি সুতোটুকু নিয়ে এখানে খেলা করছ। ওমা কি ঘেন্না, তুমি ফের যদি আমার সুতোয় হাত দেবে তো দেখতে পাবে।" বলিয়া তিনি জট পাকানো সুতার রাশি লইয়া চলিয়া গেলেন।

পিতোমবাবু অতঃপর আপিসে অবসর সময়ে টোয়াইন সুতা জট পাকাইয়া ও খুলিয়া দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রথম পাঠ শেষ করিলেন।

পাঁচ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'আমি'।

স্বামীজী লিখিয়াছেন "আমি কে ? আমি সব ? আমি সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণু, আমি পালনকর্তা ব্রহ্মা, আমি সংহারক মহেশ্বর। আমার মধ্যেই সৃষ্টি, আমিই সৃষ্টি, আমিই স্রষ্টা। আমি ছাড়া আর কিছু নাই।"

দ্বিতীয় পাঠের উদ্দেশ্য ছাত্রকে নিজের উপর বিশ্বাসবান করা। উপায় প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে ১০০ বার হইতে ১০০০ বার 'আমি মাহাত্ম্য'-সূচক কোনো মন্ত্র জপকরা। ইহাতে সজ্ঞানে অজ্ঞানে সর্বতোভাবে মানসক্ষেত্র আত্মবিশ্বাস-বারিতে সিক্ত সরস হইয়া উঠে।

প্রথম সাতদিন পিতোমবাবু জপ করিলেন, "আমি বেলুন অপেক্ষা ঊর্ধ্বগামী, নায়েগারা অপেক্ষা প্রবল, সমুদ্র অপেক্ষা বিশাল ও গভীর, হিমালয় অপেক্ষা উচ্চ, তুষার হইতে শুভ্র, সূর্য হইতে প্রখর, আমি সর্বাপেক্ষা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।"

তারপর পনের দিন তিনি মনে মনে পৃথিবীর সকল বস্তু ও মানবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমা অপেক্ষা তুমি বহু নিম্নে। হে জলধর, হে পর্বত, হে কৃষ্ণ, আমা অপেক্ষা তোমরা ক্ষুদ্র। হে স্যাণ্ডো, হে হাকেনস্মিট, হে গামা ও ইমামবক্স, তোমরা আমা হইতে বহু স্বল্পবল। হে নেপোলিয়ন, তোমা হইতে আমি বড় যোদ্ধা; চানক্য, আমি তোমাপেক্ষা বিচক্ষণতর রাজনীতিবিদ্; কালিদাস, তোমা হইতে আমি বড়ো কবি; সেকস্‌পীয়র, তোমা হইতে আমি বড়ো নাট্যকার। হে ধরণীর অধিবাসী, তোমরা আমার পদে প্রণত হও।"

এইরূপে পিতোমবাবু বহু অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া অবশেষে এই পাঠে আসিলেন, যাহাতে কি করিয়া অপরকে নিজ ইচ্ছানুরূপ কার্য করানো যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমত, যে ব্যক্তিকে বশ করিতে হইবে তাহার অলক্ষিতে তাহার ঘাড়ের ঠিক মধ্যদেশে এককালীন পাঁচ-দশ মিনিট কাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইবে, ও মনে মনে বলিতে হইবে, "তুমি আমার দাস (বা দাসী), তুমি আমার কথামতো কাজ করিবে,— অন্যথা করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন, আমার আজ্ঞাবহ; তোমার নিজের বলিয়া কোন ইচ্ছা নাই।" তৎপরে (কয়েক দিবস এইরূপ করিবার পরে) একদিন তাহার চোখে চোখে চাহিয়া তাহাকে ধীরে শান্ত কণ্ঠে, সকল তীব্রতা বর্জিত ভাষায় বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহার পক্ষে তাঁহার আদেশমতো কার্য না করা সম্ভবতই অসম্ভব। ইহার পর তাহাকে যাহা বলা যাইবে সে তাহাই করিবে।

পিতোমবাবু দিন পনের আড়ালে আড়ালে সুভাষিণী ও মেধোর ঘাড়ের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া তাহাদের দাসত্বকে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তারপর একদিন তিনি মেধোকে সিঁড়ির ওপর ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার চোখের দিকে চাহিয়া ধীরে শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "হে মাধব, আমি তোমার প্রভু, তুমি আমার দাস। পরমপিতা ভগবান তোমাকে আমাপেক্ষা নিম্নাজ্ঞম অলংকৃত করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব হে মাধব, তুমি তোমার ভাগ্য নিয়ন্তার নির্দেশ অনুসরণ করো। এই পাদুকা-যুগল বহন করিয়া তুমি আমার কক্ষে স্থাপন করো।"

মেধো বাবুর কথা একটাও বুঝিতে না পারিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাবু বুঝিলেন মেধোর ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে ও সে তাঁহার ইচ্ছায় এবার নড়িবে চড়িবে। তিনি আবার

বলিলেন, "মাধব।" মেধো এবার সত্যই ভয় পাইয়া বলিল, "আজ্ঞে বাবু কি বলছেন?"

পিতোমবাবু বলিলে, "জুতো জোড়া নিয়ে ঘরে রেখে এসো।" মেধো তাঁহার পা হইতে জুতো জোড়া খুলিয়া লইয়া ঘরের দিকে চলিল; তাহার পশ্চাতে পিতোমবাবু বিজয়োল্লাস-গর্বিত বদনে বুক ফুলাইয়া অগ্রসর হইলেন। গিন্নী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিলেন। তিনি জুতা হস্তে ভৃত্য ও তৎপশ্চাতে খালি পায়ে বাবুর এই অপরূপ মিছিল দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপরে পিতোমবাবুকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?"

পিতোমবাবু গৃহিণীর মুখে এরূপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, সময় হইয়াছে। এইবার তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা পূর্ণ হইবে। তিনি মেধোর হস্ত হইতে চটিজোড়া লইয়া পায়ে দিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "রে নারী, সৃষ্টিতে তোমার স্থান কোথায় তাহা বুঝিয়াছ কি? তাহা আমার পদতলে। আইস আপন প্রকৃতিদত্ত স্থান পূর্ণ করো। অন্যথা হইবার নহে, তুমি আমার দাসী; আমার আজ্ঞা পালনেই তোমার জীবনের সার্থকতা।"

সুভাষিণী প্রথমে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন! হঠাৎ তাঁহার মনে হইল স্বামী সম্ভবত কোনো অ্যামেচার থিয়েটারের পালায় নামিয়াছেন, এ তাহারই রিহার্সাল হইতেছে। তাঁহার মেজাজটাও আজ একটু ভালই ছিল। তাই তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আ মরণ, রস করবার ইচ্ছে তো সঙ্গে চাকর বাকর নিয়ে বেরিয়েছেন কেন? চল ঐ ঘরে তোমার পালা শুনিগে।" পিতোমবাবু বলিলেন, "প্রিয়ে এ যে-সে অভিনয় নহে। ইহা জীবন-নাট্য! তুমি আমার দাসী—চিরকালের—আমার আজ্ঞাপালনেই তোমার পূর্ণতা ও স্থিতি।"

গিন্নী নিজের ভুল বুঝিলেন। বলিলে, "ও, তাই নাকি? আচ্ছা দেখা যাবে কে কার মনিব।"

পিতোমবাবু একটা ঘরের দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "যাও।"

গিন্নী বলিলেব, "তুমি যাও না।"

পিতোমবাবু হঠাৎ বিকট চিৎকার করিয়া বলিলেন, "যাও বলছি এক্ষুনি।"

গিন্নী ভাবিলেন, হয়তো স্বামী আমার নেশা-টেশা করিয়াছেন তাই আত্মরক্ষার্থে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিলেন।

একাধারে এরূপ দুইটি জয়ের আনন্দে পিতোমবাবু বিভোর হইয়া ছাদে গিয়া পায়চারী করিতে লাগিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে আপিসের কাপড় পরিবার জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিলেন, দ্বার বন্ধ। বহু চিৎকার করিলেন, বহু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কোনো ফল হইল না। অগত্যা বাসার কাপড়ে ও বাজারের খাবার খাইয়া পিতোমবাবু আপিসে গেলেন। দুয়ের মধ্যে পরাজয়ের ভেজাল পাইয়া আনন্দটা কিছু তাঁহার কমিয়া গেল।

বৈকালে গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন বাড়িতে কেহ নাই, শুধু মেধো। সে একটা তালা ও চাবি তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ বাপের বাড়ি গেছেন, আমায় ছুটি দিয়েছেন, আমি চললুম।" পিতোমবাবু বলিতেন, "সে কি? আর খাওয়া-দাওয়া, তার কি ব্যবস্থা?"

মেধো বলিল, "বাড়ীতে চাল-ডাল-নুন-তেল কিছুই নেই; মা ঠাকরুণ টাকা পয়সাও কিছু দিয়ে যান নি।"

পিতোমবাবু পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন মাত্র সাড়ে তিন আনা পয়সা আছে। তিনি মেধোকে বলিলেন, "তুমি যাও।" মেধো চলিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া পিতোমবাবু দেখিলেন, ঘরে বাক্স প্যাঁটরা কিছুই নাই—মায় বিছানাপত্র আয়না চিরুনি সব লইয়া গিন্নী শুধু ঘরে খালি তক্তপোশটা ও এক-চেয়ার মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ভাঁড়ারে ঢুকিয়া দেখিলেন একটা টিনে কয়েকটা আদা আর শুকনো লংকা রহিয়াছে, আর রহিয়াছে এক ঝুড়ি ঘুঁটে। পিতোমবাবু হতাশ হইয়া সাড়ে তিন-আনা পয়সা পকেটে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বশুরালয় ঠাকুর-পুকুর; ট্রামে ও গাড়িতে অনেক মাইল ও অনেক পয়সার মামলা। দারুণ ক্ষুধা, ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেই পয়সা ক'টা ফুরাইয়া গেল; তারপর পিতোমবাবু যূথভ্রষ্ট কোনো উষ্ট্রের ন্যায় শ্বশুরালয়ের পথে দেহটাকে টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন। পথে বহুবার বিশ্রামের জন্য ও জল খাইবার জন্য বসিয়াও শেষের দিকে একটা আলু-বোঝাই গোরুর গাড়ির চালকের কৃপায় তাহার উপর চড়িয়া রাত্রি দুইটার সময় পিতোমবাবু শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলেন। স্বয়ং শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে দরজা খুলিয়া আলো ধরিয়া শয়নাগারের দিকে আগাইয়া দিলেন। শুধু একবার তিনি অনুযোগের সুরে বলিলেন, "ছি বাবাজী, অন্তত ছেলেটার মুখের দিকে চেয়েও তোমার ওসব নেশা-টেশা করা উচিত নয়।"

পিতোমবাবু ক্লান্তি ও অবসাদের তাড়নায় তাঁহার কথার প্রতিবাদও করিতে পারিলেন না। মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বহিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রী

বলিলেন, "কি গো মুনিব ঠাকুর, এসেছ ? বলি হেঁটে হেঁটে তো পায়ের নড়া খইয়ে এসেছ—এখনও কি আমি তোমার দাসীবাঁদী ?" পিতোমবাবু সকল ইচ্ছাশক্তি পত্নীর পদে বিসর্জন দিয়া বলিলেন, "না গো না ; আর কখনও অমন কথা আমি মুখে আনব না, ঘরে কিছু খাবার আছে ?"

ছয়

পিতোমবাবু 'অদ্ভুত ইচ্ছা শক্তি' গ্রন্থটি রাজপথে নিক্ষেপ করিয়া আজকাল ঠিক পূর্বের ন্যায় স্ত্রীর কথামতো ঘুম থেকে ওঠেন, বাজারে যান, ছেলেকে খেলা দেন। আপিসে যান, মাহিনা আনিয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া দেন, ওঠেন বসেন। কিন্তু প্রাণে তাঁহার দারুণ অশান্তি। গিন্নী তাঁহাকে বড়োই কড়া শাসনে রাখেন। তাঁহার সিগারেট খাওয়া বারণ—সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য এক ঘণ্টার সঠিক বাহিরে থাকা বারণ—কোনো প্রকার বদহজমের অর্থাৎ সর্বপ্রকার মুখ-রোচক খাদ্য খাওয়া বারণ, বন্ধু-বান্ধবকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা বারণ, আরও কত কিছু বারণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে মেধোর, খোকার, খুড়োর, আরও কত লোকের মন জোগাইয়া চলিতে হয়,—প্রত্যহ শতবার শুনিতে হয় তিনি অকর্মা, নির্লজ্জ, বেহায়া ও নির্বোধ। মরিয়া হইয়া শেষাবধি পিতোমবাবু একদিন পরমশত্রু নেপেন ভাদুড়ীর শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন, "ভাই নেপেন, জানোইতো ভাই আমার কেমন করে দিন কাটছে। কি করে ভাই বাড়ীতে একটু নিজের মতো সুখে শান্তিতে থাকতে পারি তার একটা উপায় বলতে পারো ? তুমি বুদ্ধিমান লোক, ইচ্ছে করলে পারবে একটা উপায় বলে দিতে।"

নেপেনবাবু তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করিয়া অবশেষে একটা পরামর্শ দিলেন।

দিন কয়েক পরে একদিন রাত্রে তরকারিতে নুন বেশী হইয়াছে বলায় সুভাষিণী পিতোমবাবুর পাতে একহাতা গরমজল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "এবার খাও কম নুন লাগবে এখন। কাজ নেই কোনো, শুধু খুঁতধরা বাই হয়েছে। এবার তুমি হোটেলে গিয়ে চারগণ্ডা পয়সা দিয়ে ভাত খেও।"

পিতোমবাবু রাগ করিয়া না খাইয়া উঠিয়া গেলেন। খাবার ঘরের বাহিরে গিয়াই কিন্তু তাঁর মুখ কী একটা অপূর্ব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিতেই সুভাষিণী দেখিলেন, পিতোমবাবু মন্দারির দিকে পা তুলিয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষিতেছেন। প্রথমে তিনি তর্জন-গর্জন, গালি গালাজ দিয়া দেখিলেন কিছুই হইল না। পিতোমবাবু তক্তপোশের উপর চিত হইয়া শুইয়া এক

বিরাটাকৃতি দৈত্য-শিশুর ন্যায় হাত পা ছুঁড়িয়া ক্রমাগত "মা মা" করিতে লাগিলেন।

গিন্নী ভয় পাইয়া নসু খুড়োকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খুড়া আসিয়া টানা-টানি করিয়া পিতোমবাবুকে মেঝেতে নামাইয়া দিতেই পিতোমবাবু হামা দিয়া ঘরময় "দু দু কাঠ" "দু দু কাঠ" বলিয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

গিন্নী এবার সত্য সত্যই ভয় পাইয়া মহাকান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন। নসু খুড়া দৌড়াইয়া গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার এরূপ ব্যয়রাম কখনও দেখেন নাই। তিনি নিজ অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য বলিলেন, "অ্যাকিউড নার্ভাস ব্রেক-ডাউন, রোগীকে কোনো প্রকার নাড়াচাড়া বা উত্তেজিত করিবে না। দুধ চাহিতেছে, দুধ খাওয়াইয়াই রাখো। পরে আসিয়া দেখিব কি হইল।"

সকলে ধরাধরি করিয়া পিতোমবাবুকে খাটের উপর শোয়াইয়া দিলেন। তিনি শুইয়া শুইয়া কখনও হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিলেন, কখনও বা "গ, গ, গ, গ" বলিয়া চিৎকার বা অযথা হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশুরা যেমন ক্রমাগত চিত হইতে উপুড়, উপুড় হইতে চিত হইয়া দৈহিক এনার্জির সদ্ব্যবহার করে, পিতোমবাবুও সেইরূপ ব্যায়ামের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। একবার নসু খুড়া অনবধানতাবশত পিতোমবাবুর পায়ের কাছে আসিয়া বসাতে ক্রীড়ানিরত পিতোমবাবুর পদসঞ্চালনে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কেহ দেখিল না যে, পিতোমবাবুর মুখখানা ইহাতে কী এক অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সুভাষিনীর কেশ ধরিয়া একবার পিতোমবাবু সহাস্যবদনে ঝুলিয়া পড়িলেন। সুভাষিনীকে বহুকষ্টে সেই দৈত্য শিশুর কবল হইতে রক্ষা করা হইল।

খাওয়া লইয়া আর এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। ঘরময় দুগ্ধের ঢেউ খেলিয়া গেল। দুই তিনটি পেয়ালা, তিন চারিটি বাটি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া মেঝেতে গড়াইতে লাগিল; পিতোমবাবু সেই দুগ্ধ স্রোতে ছপাৎ ছপাৎ করিয়া হামা দিয়া বেড়াইয়া বিছানার উপর হইতে টানিয়া সুভাষিনীর আদরের লক্ষ্ণৌ ছিটের নূতন লেপখানা সেই দুগ্ধ কর্দমে ফেলিয়া মাখামাখি করিয়া এক নব দক্ষযজ্ঞের সূচনা করিলেন। সুভাষিনী আজ প্রথম বিপদের মুখে পরাজিত হইয়া ছলছল নেত্রে এই তাণ্ডব অভিনয় নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

সুভাষিনী বাটি করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইতে না পারিয়া পিতোমবাবুকে অগত্যা খোকার "ফিডিং বটলে" দুগ্ধ খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন। নসু খুড়া নস্য লইতে

লইতে বলিলেন "দুর্গা দুর্গা।"

তিন চারি দিন অতিশয় যত্নের সহিত শুশ্রূষা করিয়া পিতোমবাবুকে ক্রমশ আরোগ্যের পথে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। সুভাষিনী শয়নকালে তাঁহার পা টিপিয়া দেন। নসু খুড়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাওয়া করেন। ডাক্তার বলিয়াছেন, "সম্পূর্ণ শান্তি ও আরাম দেওয়া চাই;—নতুবা পাগল হইয়া যাইবার ভয় আছে।"

সাত

অনেকদিন হইল পিতোমবাবু আবার আপিস যাইতেছেন। নেপেনবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভায়া আছ কেমন? মনে তো হচ্ছে খেয়ে দেয়ে তোফা ফুলছ।"

পিতোমবাবু নিজের বাম চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত করিয়া বলিলেন, "দু দু।"

বনফুল

বৈষ্ণব-শাক্ত

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি—অসম্ভব ভিড়।

তথাপি কিন্তু এক কোণে গাদাগাদি করিয়া বসিয়া পরম শাক্ত কালীকিঙ্কর বর্মা পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ গোস্বামীর সহিত ধর্মবিষয়ক তর্ক করিতেছিলেন। বর্মার কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু, কপালে টকটকে সিঁদুরের টিপ। গোস্বামীর গৌর বর্ণ, ধপধপে সাদা আবক্ষ গোঁফ-দাড়ি, চোখে নীল চশমা, খাঁড়ার মত নাকের উপর শ্বেত চন্দনের তিলক।

মাথা দোলাইয়া গোস্বামী বলিলেন, যাই বলুন আপনি, ধর্মসাধনের প্রশস্ত পথই হ'ল প্রেমের পথ। রক্তারক্তি করাটা পৈশাচিক কাণ্ড। মানুষেও পারে না, পারা উচিতও না।

অট্টহাস্য করিয়া বর্মা বলিলেন, রক্তারক্তির আপনি বোঝেন কতটুকু, শুনি? পৈশাচিক কথাটা যে ব্যবহার করলেন, পিশাচ দেখেছেন কখনও? মুণ্ডমালিনী মহাকালীর কোন ধারণা আছে আপনার?

দুই হাত জোড় করিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, যতটুকু আছে তাই যথেষ্ট মশাই! ওর বেশি ধারণা আমি করতেও চাই না। ছেলেবেলায় পাঁঠা কাটা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম—

এমন সময় ঘটাং করিয়া ট্রেনটা থামিল। গোস্বামী মহাশয় টাল সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া বর্মা মহাশয়ের ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন।

বর্মার কপালের সিঁদুর গোস্বামীর নাকে লাগিল।

স্টেশনে শশা ফেরি করিতেছিল। বর্মা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া কিছু শশা কিনিলেন। একদল যাত্রী আসিয়া গাড়িতে উঠিল। গাড়িতে নিতান্ত স্থানাভাব। সমাগত যাত্রীবৃন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে যাত্রীটি দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড মাদল ঝুলিতেছিল। ট্রেন ছাড়িলে গাড়ির ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে মাদলের একপ্রান্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাসাগ্রে আন্দোলিত হইতে লাগিল। দুই একবার ঠোকাও লাগিল। মাদল খুব উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবীয় বাদ্যযন্ত্র হইলেও নাসাগ্রে তাহা সুখকর নহে। গোস্বামী মহাশয় তাহা বুঝিয়া মৃদুকণ্ঠে মাদলধারীকে কহিলেন, একটু যদি স'রে দাঁড়াতে বাবা দয়া ক'রে—

কিন্তু দয়া করিতে সম্মত হইলেও লোকটার সরিবার উপায় ছিল না। নিরুপায় গোস্বামী তখন নিজের মাথাটাই যথাসম্ভব সরাইয়া মাদল-অন্দোলন হইতে নিজের নাসা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর মাথার তির্যক ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বর্মা মহাশয় বলিলেন, তোমরা ব'সে পড় না হে! দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে বাপু! যে যেখানে আছ ব'সে পড়!

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাদলধারী বসিল।

নাসা-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া গোস্বামী মহাশয় আবার শুরু করিলেন, এই যে মাদল—অপূর্ব জিনিস এ। বৈষ্ণব ধর্মেরও অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে খোল আর খঞ্জনী। আপনার ধর্মে দেখান দিকি এমন জিনিস। আপনারা এক রক্তারক্তি ছাড়া—

নাকের উপর ঠকাস করিয়া আঘাত দিয়া মাদল-বাদক আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে পারিল না। বর্মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আবার দাঁড়ালে কেন গো?

আজ্ঞে, পরের ইষ্টিশনেই নামব।

সে তো এখন দেরি আছে।

মাদল-বাদক কিন্তু আর বসিল না, পরের স্টেশন পর্যন্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাকের সামনে মাদল সমানে আস্ফালন করিতে লাগিল।

পরের স্টেশন আসিল। গাড়ি ঘটাং করিয়া থামিতেই মাদলটা সজোরে গিয়া

গোস্বামী মহাশয়ের নাকে লাগিল। একটুর জন্য চশমাটা বাঁচিয়া গেল।

ট্রেন থামিলে হুড়মুড় করিয়া প্রায় সকলেই নামিয়া গেলেন। রহিলেন শুধু বর্মা আর গোস্বামী। বর্মা বলিলেন, এ হে-হে-হে, আপনার নাক দিয়া রক্ত বেরিয়ে গেল যে! মাদলের আঘাতে বৈষ্ণবের রক্তপাত! এ কি বিড়ম্বনা!

নাকটা মুছিয়া গোস্বামী বলিলেন, আসল জিনিস কি জানেন মশাই? অর্থ, পয়সা নেই ব'লেই না এই থার্ড ক্লাশে ভিড়ে চলেছি, তাই না এ দুর্দশা! অর্থ না থাকলে ধর্ম-টর্ম কিছু টেকে না।

অট্টহাস্য করিয়া শশা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বর্মা মহাশয় বলিলেন, যা বলেছেন। অর্থ নেই ব'লেই না আমার মত শাক্তকে ছুরি দিয়া শশা কেটে খেতে হচ্ছে। খাবেন নাকি শশা?

দিন। সবই অদৃষ্টের রহস্য।

সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা কিন্তু উভয়েরই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। পরের স্টেশনে যখন গোস্বামী মহাশয় শশা খাইয়া নামিয়া গেলেন, তখন ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ বর্মা মহাশয় জানিতেও পারিলেন না যে, গোস্বামীর অভিনয় করিয়া যিনি নামিয়া গেলেন তিনি দুর্ধর্ষ খুনী পলাতক বজ্রধর মিশ্র। অপর কেহ নন।

মাদলই ঠিক বুঝিয়াছিল

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তন্দ্রাহরণ

পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজকুমারী তন্দ্রার মন একেবারে খিঁচড়াইয়া গিয়াছে। মধু-মাসের সায়াহ্নে তিনি তাই প্রাসাদ শিখরে উঠিয়া একাকিনী দ্রুত পায়চারি করিতেছেন এবং গণ্ড আরক্তিম করিয়া ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম?

অনেকদিন আগেকার কথা। ভারতীয় রমণীগণের মন তখন অতিশয় দুর্দমনীয় ছিল; মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে কনৌজে সংযুক্তার স্বয়ংবর হইয়া গিয়াছে।

রাজকুমারী তন্দ্রার বয়স আঠারো বৎসর। ফুটন্ত রূপ, বিকশিত যৌবন, তথাপি মধুমাসের সায়াহ্নে তাঁহার মন কেন খিঁচড়াইয়া গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, তাঁহার আসন্ন বিবাহই একমাত্র কারণ।

কিন্তু আঠারো বছরের বিকশিত যৌবনা কুমারী বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক কেন? একালে তো এমনটা দেখা যায় না। তবে কি সেকালে—

না, তাহা নয়। সেকালেও এমনই ছিল। কিন্তু কুমারী তন্দ্রার আপত্তির কারণ, তাঁহার মনোনীত স্বামী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ চন্দ্রানন মাণিক্য।

কথাটা বোধ করি পরিস্কার হইল না। আসল কথা বর বাঙাল।

যতদিন এই বিবাহ রাজা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর গবেষণার বিষয়ীভূত ছিল, ততদিন কুমারী তন্দ্রা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ শিরে সংক্রান্তি আসিয়া

যুবরাজ চন্দ্রানন বিবাহ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রাজধানীতে ডেরাডাণ্ডা ফেলিয়াছেন।

গোড়া হইতে তন্দ্রার মন বাঁকিয়া বসিয়াছে। তবু তিনি গোপনে প্রিয়সখী নন্দাকে পাঠাইয়াছিলেন—চন্দ্রানন মাণিক্য লোকটি কেমন দেখিবার জন্য। নন্দা আসিয়া সংবাদ দিয়াছে—যুবরাজ দেখিতে শুনিতে ভালোই, চাল চলনও অতি চমৎকার, কিন্তু তাঁহার ভাষা একেবারে অশ্রাব্য। 'ইসে' এবং 'কচু' এই দুইটি শব্দের বহুপ্রয়োগ সহযোগে তিনি যাহা বলেন, তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না।

শুনিয়া কুমারী তন্দ্রা একেবারে আগুন হইয়া গিয়াছেন। এ কী অত্যাচার! তিনি রাজকুমারী বলিয়া কি তাঁহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই? হউক সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ তবু বাঙাল তো? দেশে কি আর রাজপুত্র ছিল না? আর রাজপুত্র ছাড়া রাজকুমারী বিবাহ করিতে পারিবে না—এই বা কেমন কথা!

কুমারী তন্দ্রা রাজসভায় নিজ অনিচ্ছা জানাইয়া তীব্রলিপি লিখিয়াছিলেন। উত্তরে মন্ত্রীগণ কর্তৃক পরামর্শিত হইয়া রাজা কন্যাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, চন্দ্রানন মহা বীরপুরুষ, উপরন্তু বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিয়াছেন; এক্ষেত্রে বিবাহে অস্বীকৃত হইলে নিশ্চয় কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের গোঁ অতি ভয়ানক বস্তু। সুতরাং বিবাহ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তদবধি ক্রোধে অভিমানে কুমারী তন্দ্রার চোখে তন্দ্রা নাই। তাই মধু সায়াহ্নে একাকী প্রাসাদশীর্ষে দ্রুত পায়চারী করিতে করিতে গণ্ড আরক্তিম করিয়া তিনি ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম?

সহসা একটি তীর হাউইয়ের মতো প্রাসাদ পার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া তন্দ্রার পদপ্রান্তে পড়িল। বিস্মিত হইয়া তন্দ্রা চারিদিকে চাহিলেন। রাজপ্রাসাদশীর্ষে কোন্ ধৃষ্ট তীর নিক্ষেপ করিল? তন্দ্রা ছাদের কিনারায় গিয়া নিম্নে উঁকি মারিলেন।

ঠিক নিচেই জলপূর্ণ পরিখা প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পরিখার পরপারে একটি উষ্ণীষধারী যুবক ঊর্ধ্বমুখ হইয়া গুম্ফে তা দিতেছে। তন্দ্রাকে

দেখিতে পাইয়া সে হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিল।

চতুস্তল প্রাসাদের শিখর হইতে যুবকের মুখাবয়ব ভালো দেখা গেল না; তবু সে যে বলিষ্ঠ ও কান্তিমান তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তন্দ্রা বিস্ময়াপন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তীরটি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, তীরের গায়ে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে। লিপি খুলিয়া তন্দ্রা পড়িলেন—

"ছলনাময়ী নন্দা, আর কতদিন দূরে হইতে দেখিয়া অতৃপ্ত থাকিব? তুমি যদি আমাকে ভালবাসো, তবে আমার মনস্কাম সিদ্ধ করো; আমার মন আর বিলম্ব সহিতেছে না, যদি আমাকে বঞ্চনা করো, নিজেই পরিতাপ করিবে। পরদেশী বন্ধু কতদিন থাকে?

সদয়া হও—তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। একবার সাক্ষাৎ হয় না? তোমার অনুগত বন্ধু।"

লিপি পড়িয়া কুমারী তন্দ্রা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে পড়িল, ইদানীং প্রিয় সখি নন্দা যখন তখন ছলছুতো করিয়া ছাদে আসে। এই তাহার অর্থ! ঐ কন্দর্পকান্তি বিদেশী নন্দাকে দেখিয়া মজিয়াছে; নন্দাও নিশ্চয় তাহার প্রতি আসক্ত। দুইজনে কাছাকাছি হয় নাই, দূরে হইতেই প্রণয়। তীরের মুখে প্রেম!

সহসা তন্দ্রার দুই নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়া আবার উঁকি মারিলেন। ধৈর্যশীল যুবক তখনও ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া গুম্ফে তা দিতেছে।

কবরী হইতে কাজললতা লইয়া চুলের কাঁটা দিয়া তন্দ্রা লিপি লিখিলেন, হাত কাঁপিতে লাগিল। লিপি শেষ হইলে তীরের গায়ে জড়াইয়া পরপারে ফেলিয়া দিলেন। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে দেখিলেন, যুবক সাগ্রহে তীর তুলিয়া লইল।

নন্দা ছাদে আসিয়া তন্দ্রাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল, 'প্রিয় সখি, তুমি এখানে?'

তন্দ্রা তপ্তমুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। নন্দা ছাদের এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর বলিল, "কতক্ষণ এখানে এসেছ?"

তন্দ্রা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; 'নন্দা আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না। হয়তো কাল সকালে উঠে আর আমায় দেখতে পাবি না; সখি, তোর কাছে যদি কখনও অপরাধী হই ক্ষমা করিস।'

নন্দা রাজকুমারীকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'ছি সখি, ও কথা বলতে নেই। চলো, নীচে চলো। কাজললতা যে পড়ে রইল, আমি নিচ্ছি। চুলের কাঁটাও খসে পড়েছে দেখছি! সখি, উতলা হয়ো না। তোমার ভাগ্যদেবতা তোমায় নিয়ে হয়তো একটু পরিহাস করছেন, দেবতার পরিহাসে কাতর হলে কি চলে?'

শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অশ্রুভরা স্বরে তন্দ্রা কহিলেন, 'নন্দা, আজ রাত্রে আমি একা শোব, তুই যা। আরো দেখ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সেই বর্বরটাকে যদি তোর পছন্দ হয়, তুই নিস।' —মনে মনে বলিলেন 'অদলবদল।'

নন্দা জিভ কাটিয়া চোখে আঁচল দিল। 'ওমা ও কী কথা! আমি যে তাঁর দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই।'—বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। নন্দার এই পলায়ন একেবারে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া থামিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের যাম-ঘোষণা থামিবার পর, রাজকুমারী তন্দ্রা প্রাসাদের গুপ্তপথ দিয়া পরিখা পার হইয়া বাহিরে গেলেন। তাঁহার বরতনু বেষ্টন করিয়া আছে রাত্রির মতোই নিবিড় নীল একটি ঊর্ণা।

নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে একটি তরুণ সুদৃঢ় হস্ত আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। কেহ কথা কহিল না; দুইটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিল, তরুণ সুদৃঢ় হস্তধারী তন্দ্রাকে একটির পৃষ্ঠে তুলিয়া দিল; তারপর একলম্ফে অপরটির পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল। নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে দুই কৃষ্ণকায় অশ্ব ছুটিয়া চলিল পৌণ্ড্রভুক্তির সীমান্ত লক্ষ্য করিয়া।

দণ্ড কাটিল, প্রহর কাটিল, কত নক্ষত্র অস্ত গেল। সম্মুখে শুকতারা বিস্ময়াবিষ্ট, জ্যোতিষ্মান চক্ষুর মতো জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

দিগন্তহীন প্রান্তরের মাঝখানে প্রভাত হইল; তখন বল্গার ইঙ্গিত পাইয়া অশ্বযুগল থামিল। কুমারী তন্দ্রা মুখের নীলঊর্ণা সরাইয়া পাশে অশ্বারোহী মূর্তির পানে চাহিলেন। দৃষ্টি বিনিময় হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে একটি তরুণ কন্দর্প। পক্ক দাড়িমের মতো তাঁহার দেহের বর্ণ। পেশল অথচ পেশীবদ্ধ দেহ, মুখে পৌরুষ ও লাবণ্যের অপূর্ব মেশামেশি!

নবজাত গুম্ফের নিচে একটু কৌতুকহাস্য ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে দেখিতে কুমারী তন্দ্রার চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত হইয়া আসিল। দূর হইতে যাহা দেখিয়াছিলেন, এ যে তাহার চেয়ে সহস্রগুণ সুন্দর!

সহসা অনুতাপে তন্দ্রার হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, 'আর্যপুত্র, আমার ছলনা ক্ষমা করো। আমি নন্দা নই—আমি তন্দ্রা।'

তরুণ কন্দর্প হাসিলেন, গুম্ফে ঈষৎ তা দিয়া সুধামধুর স্বরে কহিলেন,—ইসে সেডা না জাই নাই কি চুরি কৈরা আনছি? রাজকুমারী, তুমি বড়োই চতুরা; কিন্তু আমার চক্ষে যদি ধুলাই দিতে পারবা তো তোমারে বিয়া করতি আইলাম কিসের লাইগ্যা?'

তন্দ্রা চমকিত হইলেন; বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া স্খলিত স্বরে কহিলেন, 'তুমি, তুমি কে?'

যুবক কলকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, 'আরে কচু—সেডা এখনো বোঝবার পারো নাই? আমি চন্দ্রানন মাণিক্য—ইসে প্রাগজ্যোতিষপুরের যুবরাজ। হ, সৈত্য কইলাম।'

দুইটি অশ্ব অত্যন্ত মেশামেশি মন্থর গমনে পৌন্ড্রবর্ধনের পথে ফিরিয়া চলিয়াছে। তন্দ্রার করতল চন্দ্রাননের দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ। তাঁহার স্খলিত-বেণী মস্তক মাঝে মাঝে যুবরাজের বাম স্কন্দের উপর নত হইয়া পড়িতেছে।

তন্দ্রা কহিলেন, 'যুবরাজ কী সুন্দর তোমার ভাষা—যেন মধু ঝরে পড়ছে! কতদিনে আমি এ ভাষা শিখতে পারব?'

চন্দ্রানন তন্দ্রার মণিবন্ধে একটি আনন্দ-গদগদ চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'ইসে—আগে বিয়া তো করি, তারপর এক মাসের মৈধ্যে তোমারে শিখাইয়া ছারমু। তোমাগোর ও কচুর ভাষা এক মাসে ভুইলা যাইতে পারবা না?'

সুখাবিষ্ট কণ্ঠে তন্দ্রা বলিলেন, 'পারমু।'

সজনীকান্ত দাস

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস

হরিবিলাস রায়ের মনে বরাবরই একটা ক্ষোভ ছিল। ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হইতে আই. এ. পাস করিয়া তিন বৎসর হইল সে কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু এখনও সত্যকার reciprocal (পারস্পরিক) প্রেমে পড়া তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি. এ. পাস করিয়া ইউনি-ভার্সিটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ইংরাজীতে সে এম. এ. পড়িতেছে, সেও প্রায় এক বৎসর হইয়া গেল। স্কটিশের সহপাঠিনীদের মধ্যে অন্তত তিনজন পুরা দুই বৎসর তাহার সহিত একত্র উঠা-বসা করিয়া তৃতীয় বৎসরেও একই সিঁড়ি দিয়া আশুতোষ বিল্ডিঙের তেতলা পর্যন্ত উঠানামা করিতেছে; তাহাদের মধ্যে অশোকা রাহাকে তাহার ভালই লাগে। সেও ইংরাজীতে এম. এ. পড়িতেছে বটে, কিন্তু প্রেমে পড়ার কোনও লক্ষণই তাহাতে দেখা যাইতেছে না। ঢাকা হইতে যখন কলিকাতায় বি. এ. পড়িতে আসার কথা হয়, তখন হইতেই হরিবিলাস মনে মনে কত স্বপ্নই না দেখিয়াছে; ইডেন গার্ডেন, উট্‌রামঘাট, লেক, বালিগঞ্জ, হেদুয়া। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা—উট্‌রাম ঘাটের জেটির পাটাতনে জোড়ায় জোড়ায় যাহারা ঘোরে, তাহাদিগকে অস্পষ্ট সন্ধ্যায় ভাগীরথী জল-

কল্লোলের মধ্যেও বহুদিনের স্বপ্নবাঞ্ছিত নায়িকা বলিয়া ভুল হয় না, লোকের ভিড়ে দম বন্ধ হইয়া আসে ; বালিগঞ্জের পথে দুই দিন হাঁটিয়াই তাহার ডিস্পেপ্সিয়া ধরিবার উপক্রম করে ; হেদুয়ার জলে পড়িয়া সাঁতার কাটিতে ইচ্ছা হয়। প্রেমে পড়া আর হইয়া উঠে না, অথচ কাব্যমার্গে হরিবিলাস তখন ধাপে ধাপে আগাইয়া চলিয়াছে। টেনিসন হইতে কীট্স, কীট্স হইতে শেলী, শেলী হইতে বায়রন, বায়রন হইতে ক্রিশ্চিনা রসেটি, ক্রিশ্চিনা রসেটি হইতে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং। কবিতা লেখার বাতিক তাহার ছিল না, থাকিলে দুই বৎসরে সে অন্তত দুই রীম কাগজ ভরাইয়া ফেলিত। কিন্তু হরিবিলাসের দুঃখের অন্ত নাই। এক একবার তাহার মনে হয়, দূর হোকগে ছাই, মরতে এই কলকাতায় এলাম, মেসের হলুদ-ঝোল, আর কুচো-চিংড়ি খেয়ে খেয়ে প্রাণ যায় যায়! এর চেয়ে বুড়ীগঙ্গার স্নিগ্ধ কোল, সেই ইলিশ আর চাঁই মাগুর আর কই—ভাবিতে ভাবিতে হরিবিলাসের বালিশ ভিজিয়া যায়। পুরানো পল্টনে মামার বাড়ীতে সে মানুষ ; বাবা ছিলেন ময়মনসিংহের সদরালা, সম্প্রতি দিনাজপুরে বদলি হইয়াছেন। বিমাতা সঙ্গে আছেন, তৎসত্ত্বেও হরিবিলাস ভাবিল, একবার দিনাজপুর হইয়া দার্জ্জিলিং ঘুরিয়া আসিবে, এ একঘেয়ে জীবন তাহার আর ভাল লাগিতেছে না।

হরিবিলাস ক্লাসের সেরা ছেলে, বিশেষ করিয়া ইংলিশ পোয়েট্রিতে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে জয়গোপাল বাঁড়ুজ্যে পর্যন্ত ভয় পান। তাহার উদাসীন-ভাব সহপাঠীদের দৃষ্টি এড়াইল না। সকলে শুনিল, হরিবিলাস 'মেঘদূত' পড়িবার জন্য দার্জ্জিলিং যাইতেছে। তখন সেপ্টেম্বর মাস ; ধূসর আকাশ মাঝে মাঝে গাঢ় নীল হইয়া দেখা দিতেছে। কচি রোদে কাঁচা সোনার রঙ ধরিয়াছে।

সকালে হরিবিলাস হোল্ড-অলে খানকয়েক কাপড় ভরিতেছিল, হঠাৎ সুধীরের আবির্ভাব। ভূমিকা না করিয়াই সুধীর বলিল, বাঁচালে ভাই, কি ফ্যাসাদেই পড়েছিলাম। টেলিগ্রাম পেয়ে হঠাৎ মাসীমাকে রংপুরে যেতে হচ্ছে, আমাকেই ধরেছেন নিয়ে যেতে। আমার এ দিকে জরুরী এনগেজমেণ্ট। তুমি যাচ্ছ ভাই, পার্ব্বতীপুর পর্যন্ত একটু কষ্ট ক'রে যদি মাসীমাদের নিয়ে যাও—

হরিবিলাস এতক্ষণ হাঁ করিয়া সুধীরের কথা শুনিয়া যাইতেছিল। আর থাকিতে পারিল না। বলিল, মাসীমাদের ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। মাসীমা আর মীনা—আমার মাসতুতো বোন, লাভ্লি কম্প্যানিয়ন, আশুতোষ কলেজ থার্ড ইয়ার—কিচ্ছু অসুবিধে হবে না ভাই, মীনা খুব চটপটে, নিজেই—

হরিবিলাস সুধীরকে আর কথা বলিতে দিল না। কলিকাতার তিন বৎসরের জীবনে তৃষ্ণার্ত চাতকের মত যে জলবিন্দুর প্রতীক্ষা সে ব্যাকুল আগ্রহে করিতেছিল, এতদিনে কি তার সন্ধান মিলিল? সে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা আচ্ছা, স্টেশনে একটু আগে যেও কিন্তু।

সুতরাং সেদিন শিয়ালদহ স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্লাটফর্মে—সুধীর মাসীমা ও মাসতুতো বোনকে লইয়া একটু আগেই আসিয়াছিল। লাগেজ বিশেষ কিছু ছিল না। গাড়ি প্লাটফর্মে 'ইন' করিতেই সুধীর ও হরিবিলাস ধরাধরি করিয়া মাসীমা ও মীনাকে ইণ্টার ক্লাস মেয়েদের গাড়িতে উঠাইয়া দিল। পাশের কামরায় নিজের মালপত্র চাপাইয়া বিছানাটা বাঙ্কের উপর একটু আলগা করিয়া হরিবিলাস সুধীরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাসীমাকে আগেই প্রণাম করা হইয়াছিল, সুধীর মীনার সঙ্গে হরিবিলাসের আলাপ করাইয়া দিল।

পর পর তিনটা জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠ-ফাটা রোদে যে খড়ের গাদা শুকাইয়া হু হু করিতেছিল, তাহাতে একটি প্রজ্বলিত দেশলাইয়ের কাঠি নিক্ষেপ করিল সুধীর। নিমেষ মধ্যে দাউ দাউ করিয়া আগুন ধরিয়া উঠিল, গোটা শিয়ালদহ স্টেশনটা দুলিতে শুরু করিল, বিরাটকায় লৌহ-সরীসৃপ নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস বাঁকিয়া ধনুকের মত হইয়া গেল—ফুলধনু! সেই ধনুকের বাতায়ন হইতে মনসিজ মীনার মারফৎ নয়নরূপ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হরিবিলাস এক নিমিষে বিলকুল মরিয়া গেল।

মীনা জানালার ধারেই বসিয়াছিল। ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, আপনার নাম শুনেছিলাম সুধীরদার কাছে, আজ দেখলুম। আপনি তো শুনেছি একটা বিদ্যের জাহাজ।

হরিবিলাস আগেই মরিয়াছিল। ভূতের মত জবাব দিল, শুনবেন না সুধীরের কথা ; মিথ্যের চুপড়ি ওটা।

প্রথম আলাপের অস্বাভাবিকতা অনেকটা সহজ হইল। বলিল, গরম লাগছে আপনার, লেমনেড খাবেন?

মীনা 'না' বলিল না। মৃত হরিবিলাসের স্কন্ধে তখন যেন জুনিয়ার ডাগলাসের প্রেতাত্মা ভর করিল, এদিকে ছোটে, ওদিকে ছোটে—লেমনেডের গ্লাসটা মীনার হাতে আগাইয়া দেয়। এলিজাবেথ ব্যারেটের কথা মনে পড়ে। খোঁড়া নয় তো?

দূরে সবুজ আলো, খানিকক্ষণের জন্য বিগড়াইয়া যায় না ওই কলটা? সুধীর হরিবিলাসের কাঁধ ধরিয়া ঠেলিয়া দেয়, হাতল ধরিয়া সে ঝুঁকিয়া দাঁড়ায়।

মীনা ঘাড় বাঁকাইয়া দেখে। ট্রেন ছাড়িয়া দেয়।

সুধীর হাঁকিয়া বলে, দেখো, গাড়িতে সুইন্‌বার্ন খুলে ব'সো না যেন, একটু খোঁজখবর নিও।

সুইন্‌বার্ণ, প্রসারুপিনা। হরিবিলাস জীবনে কখনও গান গায় নাই। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের দরজায় ভর দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হরিবিলাসের মনে গান জাগিল।

মীনাকে দেখা যায় না। তাহার ছায়াটা সবুজ ঘাসের উপর ছুটিয়া চলে, তাহার বসিবার ভঙ্গিটা শুধু অনুভূত হয়—অসাধারণ!

দি লাস্ট রাইড টুগেদার—রাণাঘাট। মীনার মা ছানার জিলিপি কেনেন এক চেঙড়া, হরিবিলাস অবাক হইয়া দেখে। মায়ের কাছে ইশারা পাইয়া সম্ভবত মীনা একটু কৌতুকের হাসি হাসিয়া পাঞ্জাবির হাত-গুটানো হরিবিলাসকে ডাকে, রাত এখনও বেশি হয় নি, আসুন না দুটো জিলিপি খেয়ে এক গেলাস জল খাবেন।

ব্রাউনিঙের কল্পনার বাহিরে ছিল এটা, তিনি শুধু ভাবিয়াছিলেন—

Might she have loved me ? Just as well
She might have hated, who can tell !

ঘৃণা ভালবাসার কথা নয়, জিলিপি—তাও আবার ছানার। হরিবিলাস লাফাইয়া গাড়িতে ওঠে, একটি কামরায় মীনা আর তাহার মা, অন্য যাত্রী নাই।

তাড়াতাড়িতে কামড় দিতে গিয়া জিলিপির রস গড়াইয়া সর্বাঙ্গে পড়ে, মীনার সে কি হাসি!

ঐ যা!

ট্রেন ছাড়িয়া দেয়, ভয় এবং আনন্দ মিশ্রিত এক অদ্ভুত অনুভূতি; রসাতলে যাক টিকিট-চেকার, রসাতলে যাক পৃথিবী,—দি লাস্ট রাইড টুগেদার।

মা আপাদমস্তক চাদর মুড়িয়া শুইয়া পড়েন। ঝড়ের বেগে ট্রেন চলে।

জীবনের একুশটা বৎসর যাহার সহিত দেখা হয় নাই, অথচ যাহাকে কামনা করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের দীর্ঘ পথ বাহিয়া আসিয়াছে সে, দুই ঘণ্টার কথাবার্তা তাহার সহিত নিমেষের পরিচয় মাত্র! ইউনিভার্সিটি প্রোজ সিলেক্‌শনস্‌ দিয়া কথা শুরু, টেনিসনের "come into the Garden Maud" পর্যন্ত সে কী করিয়া কথা অগ্রসর হয়—

পোড়াদহ পার হইয়া যায়, নামা হয় না। মীনা কথা বলিতে বলিতে

চলিতেছে, তাহাকে ওই অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া সে নামিবে কেমন করিয়া! মীনা ঘুমাইয়া পড়ে, ধীরে ধীরে হরিবিলাসের দেহও অবশ হইয়া আসে।

হরিবিলাসের যখন ঘুম ভাঙিল, ট্রেন তখন শান্তাহারের রেল ইয়ার্ড অতিক্রম করিতেছে, ঝকঝক ঘটাঘট শব্দ, শিয়রে অত্যুগ্র বৈদ্যুতিক আলো ঝড়ের বেগে পার হইয়া যাইতেছে। তাহার ঘুম ভাঙিল এক মেমসাহেবের হট্টগোলে। শান্তাহারের কোনও রেলকর্মচারীর পত্নী হইবেন। মেয়েদের গাড়িতে পুরুষ দেখিয়া তিনি তো প্রায় শিকল টানিতে যান। নিদারুণ ভয়ের মধ্যেও হরিবিলাস শুনিল, মীনা বিশুদ্ধ ইংরেজীতে মেমসাহেবের সহিত তর্ক জুড়িয়াছে; তাহার দেহে পুলক সঞ্চার হইল, সে ঘাপটি মারিয়া পড়িয়া রহিল। মীনা বুঝাইয়া দিল, ছেলেটা ডাকাত নয়, তাহারই ভাই, খাবার খাইতে আসিয়াছিল, আর নামিতে পারে নাই। তাহাদের মা সঙ্গে আছেন, মেমসাহেবের আশঙ্কার কারণ নাই।

মেমসাহেব গজগজ করিতে করিতে মীনার পাশেই বসিলেন। স্ত্রীলোক, অনতিবিলম্বে শান্তাহারে চাল-ডাল-দুধ ঘিয়ের অসম্ভব দামের কথা উঠিল। হরিবিলাস আড়চোখে মীনাকে দেখিতে লাগিল।

কিন্তু অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয় নাই—প্রাণটা আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে। পাঁড় সিগারেট খোর সে। সিগারেটের প্যাকেটটা ইতিপূর্বে পাশের কামরায় মনে মনে কাব্য চর্চা করিতে করিতে ধোঁয়া হইয়া গিয়াছে। হরিবিলাস ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ভূমিকামাত্র না করিয়া মেমসাহেবের কাছে অ্যাপলজি চাহিল। মেমসাহেব তখন বাবুর্চির মাংস-চুরির ইতিহাস সরস-ভাবে বর্ণনা করিতেছিলেন, একটু হাসিলেন মাত্র।

হিলি-অন্ধকার ফিকা হইয়া আসিতেছে। শীতের জড়তা। প্ল্যাটফর্মে লোক নাই। হরিবিলাস ছুটিতে ছুটিতে স্টলের কাছে গেল, একটা লোক চাদর মুড়ি দিয়া টেবিলের উপর ঘুমাইতেছিল। তাহাকে নাড়া দিয়া প্রশ্ন করিল, সিগারেট আছে। লোকটা বিরক্তভাবে উঠিয়া বসিল, পাশেই একটা ছোট আলমারির মত ছিল, সেটা খুলিয়া পাসিং শো সিগারেটের একটা প্যাকেট বাহির করিল। দুইটি মাত্র সিগারেট ছিল– দুই পয়সা। হরিবিলাসের কাছে আধুলির নীচে কোন মুদ্রা ছিল না।

চেঞ্জ নাই। মীনা মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছে। নিরুপায় হরিবিলাস প্লাট-ফর্মের ওধারটায় একবার চেষ্টা দেখিতে গেল। কিন্ত মাঝ রাস্তা অতিক্রম না করিতেই দেখা গেল, হঠাৎ হুইস্‌ল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মীনা প্রায়

চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। ট্রেনে চাপার কথা ভুলিয়া হরিবিলাস সেই মধুর কণ্ঠের অস্ফুট আর্তনাদ কান পাতিয়া শুনিল, মীনা তাহার জন্য ভয় পাইয়াছে নিশ্চয়ই।

এ অপরচুনিটি মিস করা নয়, ছুটিয়া যেখানে হউক উঠিতেই হইবে, ছুটিতে ছুটিতে একটা হাতলে হাত লাগিল, পিতলের। হরিবিলাস হাতল ধরিয়াই হাঁপাইতে লাগিল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু লোক নাই। হাতল ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকাটা নিরাপদ নয়। জানালার সার্শি খোলা ছিল। হাত বাড়াইয়া দরজার কাচ খুলিয়া হরিবিলাস ভিতরে প্রবেশ করিল। হ্যাঙ্গারে একটি কোট ঝুলিতেছে। একটা চামড়ার হাতব্যাগ খোলা পড়িয়া আছে। গোল্ডফ্লেক সিগারেটের একটা টাটকা টিন, দেশলাইও এক বাক্স। সাহেব নিশ্চয়ই ল্যাভেটারিতে ঢুকিয়াছেন।

সদ্যজাগ্রত প্রেম ও ধূম্রপান বাসনা ভাল মানুষ হরিবিলাসকে মরিয়া করিয়া তুলিয়াছে। এক রাত্রিতে অনেক অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করিয়াছে। একটা সিগারেট চুরি করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। কৌটা খুলিয়া একটি সিগারেট বাহির করিতে বেশী সময় লাগিল না। তিনবার ঠুকিয়া সেটি সে পরিপাটি করিয়া ধরাইল এবং 'আঃ' বলিয়া বাহিরের আকাশ লক্ষ্য করিয়া ধোঁয়া ছাড়িল। আরাম ইহাকেই বলে। গলা বাড়াইয়া হরিবিলাস মীনাকে দেখিবার চেষ্টা করিল—কিছুই দেখা যায় না।

হাতল ঘুরিবার শব্দ হইল, সাহেবকে একটা জবাবদিহি করিতে হইবে। বাহিরে মুখ রাখিয়া হরিবিলাস জবাবটা মনে মনে ঠিক করিতে লাগিল। মুখ ফিরাইতেই—

বিলাস, তুই এখানে?

সর্বনাশ, বাবা! হরিবিলাসের মনে হইল, অকস্মাৎ ভূমিকম্পে ট্রেনখানা থামিয়া গিয়াছে এবং সে দ্বিধাবিভক্ত ধরণীর অভ্যন্তরে প্রজ্বলন্ত সিগারেট হাতে ধীরে ধীরে নামিতেছে। সিগারেট সে ফেলিয়া দিল, এবং হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবাকে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া ফেলিল। কি বলিতে যাইতেছিল, পার্বতীপুরে আসিয়া ট্রেন থামিল।

কথা বলা হইল না, বাবা তাড়াতাড়ি ব্যাগ হাতে প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পুত্রকে বলিলেন, আমার সঙ্গে এস।

এ কামরা, এ কামরা—এই যে, এস মা, নেমে পড়।

ব্রার্ডনিং ঘুলাইয়া গেল। হরিবিলাস কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

বাবা মীনাকে নামিতে বলিতেছেন, মীনার মা ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছেন। মেমসাহেব মীনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—Here's your brother. (এই যে তোমার ভাই।)। Brother!—হরিবিলাসের বাবা তাহার দিকে একবার চাহিলেন মাত্র, তাহার সর্বাঙ্গ যেন সেই চাহনির আঘাতে হিম হইয়া গেল।

পিতৃবন্ধুর কন্যা মীনা, তাহার পিতার আহ্বানেই মেয়েকে দেখাইতে মীনার মা রংপুরে পিত্রালয়ে চলিয়াছেন। সেখানে হরিবিলাসের পিতা পাত্রী আশীর্বাদ করিবেন।

হরিবিলাস কাব্যমার্গে সুইন্‌বার্ণ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেও এতখানি কল্পনা করিতে পারে নাই। তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে পিতার যে একজন সকন্যা বন্ধু থাকিতে পারে, ততখানি তারুণ্য সে স্বভাবতই পিতার উপর আরোপ করে নাই। কিন্ত যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছিল। পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া কোনও পিতাই আপনার বন্ধুত্ব নিয়ন্ত্রণ করেন না; হরিবিলাসের পিতাও করেন নাই।

সুতরাং পার্বতীপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। লাস্ট রাইড টুগেদারই বটে। কৌমার্য্য-জীবনের শেষ যাত্রা।

রাণাঘাটের ছানার জিলিপি হরিবিলাসের জীবনে অক্ষয় হইয়া রহিল।

মনোজ বসু

একদা নিশীথ কালে

টং—

দেয়াল ঘড়িতে সাড়ে নটা। এখনও অন্ততঃ আড়াই ঘণ্টা। ঘণ্টা-আড়াই পরে বাবার ঘরের আলো নিববে, নীলাদ্রির হাতের পেনাল-কোড বইটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠবে তাকের উপর। তারপর আঁধারে আঁধারে বাবার বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে পা টিপে টিপে…। কিন্তু থাক এখন সে-সব ; সে তো বারটার আগে কোন ক্রমেই নয়—পৃথিবী লয় হয়ে গেলেও নয়।

রোয়াকের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, কুয়াশামগ্ন ম্লান জ্যোৎস্না। নীলাদ্রি বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড় অবধি বার-দুই পায়চারি করল। লোক চলাচল নেই। আর আশ্চর্য,—এ কি অভাবিত কাণ্ড—বাবার উপরের ঘরে আলো তো জ্বলছে না! ব্যাপারটা কি তা হলে? রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে অশোক কাকাদের বাড়ীর গান ও খোলের আওয়াজ আসছে। সংকীর্তন এখনও উত্তাল বেগে চলেছে। মা গেছেন, ইদানিং প্রায় রোজই গিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত নামামৃত পান করে আসেন। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে বয়স যাঁর সবচেয়ে বেশী, ভগবৎ পদে অচলা মতি থাকা একান্ত ভাবে যাঁর আবশ্যক, তিনি কিছুতে এক

পা নড়বেন না, গান শুনলে তাঁর মাথা ধরে—তা সে যে-গানই হোক। বরদা তাই ঘরে বসে এই সময়টা মক্কেলের কাগজপত্র দেখেন। কিন্তু আজ এ হল কি? অশোক কাকা সন্ধ্যার সময় একবার এসেছিলেন, তিনিই টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এই অঘটন ঘটালেন নাকি? বলা যায় না, সংসারে তো কত আশ্চর্য ব্যাপারই নিয়ত ঘটছে।

অতএব নীলাদ্রি নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। তাই-ই বটে! বাবার ঘর অন্ধকার, দরজা ভেজানো।···আচ্ছা, হঠাৎ যদি দরজা খুলে যায়—এবং ছফুট সুদীর্ঘ সেই দেহ-ছায়া চোখের সামনে উদয় হয়—

নীলে!

আজ্ঞে, বই আনতে যাচ্ছি।

তা বুঝেছি। বইয়ের পাখনা বেরিয়েছে—যখন-তখন উপরে উড়ে আসে। বলি, এগজামিনের তারিখটা মনে আছে তো? গেল এগজামিনে নিজের পাখা বেরিয়েছিল। হস্টেল খুঁজে শ্রীমানের পাত্তা মেলে না। হস্টেল ছাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে এলাম তো এবার বই উড়তে আরম্ভ করেছে।

বাদাম-গাছের ফাঁক দিয়ে দরদালানে টুকরো টুকরো অনেক জ্যোৎস্না পড়েছে। এই জ্যোৎস্না-রাত্রে লোকে পেনাল-কোড মুখস্থ করে কাটায়। গভীর নিঃশ্বাস ফেলে নীলাদ্রি শোবার ঘরে ঢুকল। সেখানে আরও মহা মারাত্মক ব্যাপার···দেখ, দেখ, এই জ্যোৎস্না রাত্রে কোন কোন লোক নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কাটায়।

উমা ঘুমুচ্ছে। নীলাদ্রির পড়া শেষ না-হওয়া অবধি শাশুড়ি এই ঘরে বউ আগলে থাকেন। আজ তিনি নেই, কেউ নেই—চারিদিকে চুপচাপ,—পাতলা সবুজ লেপ মুড়ি দিয়ে চোখের দু-জোড়া পাপড়ি মুদ্রিত করে উমারাণী ঘুমুচ্ছে। ঘুমের ভান নয়—সত্যকার ঘুম। শিয়রের খানিকটা দূরে একটা অনুজ্জ্বল দীপ। নীলাদ্রি ফিস ফিস করে ডাকল, উমা-উমারাণী!

ঘুম পেলে উমা আর এক মানুষ। সে পাশ ফিরে পাশ-বালিশটা টেনে আরও আঁটসাঁট হয়ে শুল। হাতের সোনার চুড়ি ঝিনঝিন করে বেজে উঠল। নীলাদ্রি এক টানে লেপ সরিয়ে মুখের কাপড় টেনে ফেলতেই—

কে? কে? কেরে?

এবং ঠিক সঙ্গে সঙ্গে পাশের সেই অন্ধকার ঘর থেকে—কি হয়েছে বউ মা?

সর্বনাশ, স্বয়ং বরদাকান্ত। বরদা ব্যস্ত হয়ে চেঁচাতে লাগলেন, আমি

আসছি। কোন ভয় নেই বউমা, আমি আসছি।···দুত্তোর, আমার খড়ম গেল কোথায় ?

উমা উঠে বসল। ঘুম উড়ে গেছে। পাশে মুখে নীলাদ্রি পালাবার পথ খোঁজে।

পথ একটি মাত্র, দালানের ভিতর দিয়ে। সেই পথেই খট খট করে খড়ম দ্রুতবেগে আসছে। নীলাদ্রি ব্যাকুল হয়ে বলল, উমা, বল যে স্বপ্ন দেখছিলে—কিছু নয়। ঐ এসে পড়লেন যে! শীগগির বল যে একটা বেড়াল—এখানে ওঁর আসতে হবে না—

উমা বলতে গেল, কিন্তু গলা কাঠ হয়ে গেছে, শব্দ বেরোয় না। চৌকাঠের কাছাকাছি খড়মের আওয়াজ প্রত্যাসন্ন। বিছানার ওধারে পড়ে আছে পাশবালিশ—এক মুহূর্ত মাত্র—নীলাদ্রি চক্ষের পলকে সেই পাশবালিশের পাশে গুটি সুটি হয়ে পড়ল, গায়ের উপরে আগাগোড়া লেপ চাপিয়ে দিল।

বরদা ঘরে ঢুকে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ? উমা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। আর, শ্বশুরের সামনে তার একটুও ভয় করে না। বলল, স্বপ্নে দেখলাম, চোর এসেছে—

বরদা রাগে ফেটে পড়লেন।

সব দোষ তোমার শাশুড়ির। এখনও তিনি কীর্তন শুনেছেন। পুণ্যির বস্তা বয়ে আনবেন। ঘরে এক ফোঁটা বউ, একলাটি···দরজা খোলা, চোর তো আসবেই—

মৃদু হেসে উমা বলল, সত্যি সত্যি আসেনি বাবা। স্বপ্ন দেখলাম। তারপর জেগে উঠে দেখি, চোর নয়—বেড়াল।

কিন্তু বরদার রাগ পড়ে না। বললেন, আসেনি, আসতে পারত। গিন্নির আক্কেলটা কি, বল দেখি।

উমা বলল, এবারে দরজা দিয়ে শোব। মা ফিরে এলে তখন খুলে দেব। আমার ভয় করবে না—আপনি যান বাবা। ঘুমুচ্ছিলেন—মিছি মিছি জাগিয়ে দিলাম।

কিছু না, কিছু না। রাতে কি ঘুম হয় ?

দেয়ালের ধারে একটা জলচৌকি ছিল ; সেটা টেনে নিয়ে বরদা বেশ এঁটেসেঁটে বসলেন।

বলতে লাগলেন, ঘুম না হাতি। শরীরটা খারাপ লাগছিল, তাই আলো নিবিয়ে একটু চোখ বুজেছি—সাক্ষীর জবানবন্দীগুলো অমনি কিলবিল করে

যেন মাথার মধ্যে হাঁটিতে শুরু করল। আজকের শেষ কাছারিতে যে মামলাটা হল, যাচ্ছে-তাই ব্যাপার। বস—চুরুট নিয়ে আসি, তার পর বসে গল্প করবো।

বরদা বেরিয়ে যেতে নীলাদ্রি এক টানে লেপ ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, তোমার দোষ!

বিস্ময়ে চোখ বড় করে উমা বলল, আমার?

একশ'বার। তুমি চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

উমা বলল, বারে! আমি কি জানি যে তুমি? আমি তো ঘুমিয়েছিলাম।

অধীর কণ্ঠে নীলাদ্রি বলল, কেন ঘুমোও? সে-ই তো দোষ।

আর নিজে চোরের মত এসে মুখের কাপড় টানবেন, তাতে কিছু দোষ হয় না।

দোষই বটে, উমারাণী। নীলাদ্রির স্বর ভারী হয়ে উঠল, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করেছি, এই তার শাস্তি হচ্ছে।

রাগে রাগে সে ঘর থেকে বেরুল। আবার তখনই ফিরে আসতে হল। উপায় নেই, পালাবার পথ নেই। এবারের বরদার ঘরের দরজা খোলা, আলো জ্বলছে, সামনের দিকে মুখ করে তিনি মোজা পরছেন। এমন সময় মাছি উড়ে গেলেও তাঁর নজর এড়ায় না।

নিঃশ্বাস ফেলে করুণ কণ্ঠে নীলাদ্রি বলতে লাগল, তোমার কোন ক্ষতি হত না উমা। আমি একটা বার শুধু চোখের দেখা দেখে চলে যেতাম। বাবাকে ডেকে এ দুর্ভোগ কেন ঘটালে?

কিন্তু উমারাণীর অনুতাপ নেই। বরঞ্চ মনে হয়, অবস্থাটা সে উপভোগ করছে, যেন সে টিপিটিপি হাসছে। ঘাড় নেড়ে অপরূপ ভঙ্গিমা করে বলল, ঘুমুই, আর মরে থাকি—চোরের দেখা দেখতে কিসে আটকায় শুনি? দুর্ভোগ তো ভারি! নিজে লেপের তলে দিব্যি আরাম করে আছেন, আমি এদিকে শীতে হি-হি করে মরি—

নীলাদ্রি বলল, এ বাড়ীতে আর লেপ নেই কিনা—লেপ মুড়ি দিতে তাই এ ঘরে এসেছি?

অধিক বলবার অবকাশ হল না, ঝনাৎ করে ওদিকে শিকল পড়ল। অর্থাৎ ভাল রকম প্রস্তুত হয়ে দরজা দিয়ে বরদা গল্প করতে আসছেন।

কাতর অনুনয়ের দৃষ্টিতে নীলাদ্রি বলল, সংক্ষেপে সেরো, দোহাই তোমার। নইলে লেপ চাপা পড়ে দম আটকে ওর নীচে ঠিক মরে থাকব।

বরদা এসে কৈফিয়তের ভাবে বললেন, চুরুট পেলাম, কিন্তু দেশলাই খুঁজে

পাচ্ছিলাম না। তার পর শীত শীত করতে লাগল, তাই জামা-টামা এ'টে এলাম। একটু দেরি হয়ে গেছে, ভয় করছিল না তো?

উমা তাচ্ছিল্যের ভাবে বলল, নাঃ—ভয় কিসের? আপনি শুয়ে পড়ুন গে বাবা, আমার ভয় করবে না।

বরদা কথা কানে তুললেন না, নিশ্চিন্তে চৌকির উপর বসলেন। উমা গুটি সুটি হয়ে খাটে বসেছে। বরদা বললেন, হ্যাঁ মা, লেপটা গায়ে তুলে বোসো। পাশ-বালিশের উপর চাপিয়ে রেখেছো কেন?

উমা বলল, বড্ড গরম।

বল কি? একগাদা চাপিয়েও আমার শীত যাচ্ছে না—আর তোমার গরম? তার পর তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ্য করে বললেন, উ'হু, ঐ যে কাঁপছ? শীত লাগছে, বুঝতে পারছ না।

বরদা উঠবার উপক্রম করলেন। কিন্তু তার আগেই তড়িৎ বেগে উমা এসে তাঁর কাছে মেঝের উপর বসে পড়ল। যে ব্যস্তবাগীশ মানুষ, কিছু বিশ্বাস নেই—হয়তো নিজেই লেপ তুলতে যাবেন। উমা বলল, শীত নয় বাবা, ভয় ভয় করছে—তাঁরই কাঁপুনি। চোখ বুজলেই দেখছি,—সেই বেড়াল—বাঘের মত বড় বড় চোখ। আমি আর শোব না, আপনার সঙ্গে বসে বসে গল্প করব। ···আচ্ছা, আজকের কাছারিতে কি মামলা করে এলেন, সে কথা তো বললেন না কিছু!

এ কৌশল, কেবল উমা নয়, বাড়ির ছোট ছেলেটা অবধি জানে। মামলার গল্প বরদাকান্তকে একবার ধরিয়ে দিতে পারলে আর রক্ষা নেই। বরদা আরম্ভ করলেন, সে কি বলবার মত কিছু! বাজে একটা চুরির কেস—আমি একরকম উপযাচক হয়ে বিনি পয়সায় আসামীর তরফে দাঁড়ালাম। হঠাৎ তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, আইনে যা-ই থাক,—আমি বলব, এ কিছুতে অন্যায় নয়। রসগোল্লার হাঁড়ি ছিল কাচের আলমারিতে; দোকানে কেউ ছিল না—লোকটা তিন দিন খেতে পায়নি, কাচ ভেঙে একটি মিষ্টি গালে দিতে যাচ্ছে, অমনি তাকে ধরে পুলিশে চালান দিল।

উমা বলল, যাই হোক, চুরি তো বটে!

বরদা বলতে লাগলেন, হোক চুরি। পেটে আগুন জ্বলছে, সামনে খাবার সাজানো। বলি, মুনি-ঋষি তো কেউ নয়! আমি তাই হাকিমকে বললাম, আমি হলে—

উমা প্রশ্ন করল, আপনি হলে কি করতেন বাবা?

বরদা বললেন, আমি হলে পুলিশ না ডেকে রসগোল্লার হাঁড়ি তার হাতে

তুলে দিতাম। আহা বেচারা, যত খুশি খেয়ে নিক্‌। দোকানদার ব্যাটাদের দয়ামায়া নেই।

উমা মৃদু হেসে বলল, আপনার মত হত যদি সবাই!

লেপের নীচে অনন্তশয্যা থেকে নীলাদ্রির ইচ্ছা করতে লাগল, বেরিয়ে এসে উমার মুখ চেপে ধরে এবং বাবার মুখের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে, আজ্ঞে না, আপনিও কম নন। আপনি হলে চোরকে জগদ্দল-পাথর চাপা দিয়ে দিতেন।

গল্পে বাধা পড়ে গেল। সৌদামিনী এলেন। পিছনে চাকরের হাতে হেরিকেন।

বরদা হেসে বললেন, ও গিন্নি, পুণ্যির বোঝা বয়ে আনতে পারলে? না—হারানচন্দোর আছে বুঝি সঙ্গে! গান শেষ হয়েছে?

সৌদামিনী বললেন, কেন, আমার জন্যে কি কাজ আটকে আছে শুনি?

কি কাজ? উমাকে দেখিয়ে বরদা বলতে লাগলেন, এই যে বউমা, পরের বাড়ীর এক ফোঁটা মেয়ে, একা একা পড়ে আছে—কে পাহারা দেয়!

সৌদামিনী হাসিমুখে একবার উমার দিকে চাইলেন। বরদার কাছে এসে নীচু গলায় বললেন, তোমার ব্যবস্থা ভাল। বউ রয়েছে, ছেলে রয়েছে, পাহারা দেবে পাড়ার লোকে!

বরদা ভ্রু-ভঙ্গি করে বললেন, ছেলের বয়ে গেছে। তার বলে এগজামিন··· কত পড়াশুনো। সে আমার ছেলে—অকর্মা আড্ডাবাজ তো নয়!

সৌদামিনী হেসে ফেললেন।

ছেলে না পারে, বাপ তো পাহারা দিচ্ছে। সে-ই বেশ। তুমি এখন যাও দিকি। নীলুর উপরে আসবার এখনও দেরি আছে, ততক্ষণ আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই।

বরদা চলে গেলে বিছানার দিকে সৌদামিনীর নজর পড়ল। আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ কি বউমা, এ ঠিক হারানের কাণ্ড! দিগ্‌গজ এক বালিশ এনে খাট জুড়ে রেখেছে—শুবি কোথায়?

উমা তাড়াতাড়ি বলল, শুয়েই তো ছিলাম। পাশ-বালিশে শোওয়া আমার অভ্যাস। কিছু অসুবিধে হবে না—

সৌদামিনী শুনলেন না।

না, হবে না বই কি! আর একটা ছোট পাশ-বালিশ দেব এখন···দাঁড়া,

এটা আলমারির মাথায় তুলে দিই—

বলতে বলতে দেখা গেল, পাশ-বালিশ স্বয়ংই উঠে দাঁড়িয়েছে। সৌদামিনী অবাক হয়ে বললেন, নীলু!

নীলাদ্রির চোখে জল আসবার মতো। কিন্তু সে-জল একমুহূর্তে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল, সে বজ্রাহতের মতো দাঁড়াল। হায়রে, বিপদের কি শেষ নেই! বরদা চুরুটের কৌটো ফেলে গিয়েছিলেন, সেটা নিতে মন্থর পায়ে আবার এসে ঢুকলেন। ছেলেকে দেখে দৃষ্টি কুঞ্চিত হয়ে এল। বললেন, এরই মধ্যে পড়া-শুনোয় ইস্তফা দিয়ে এলে? ক'টা বেজেছে?

নীলাদ্রি জড়িত কণ্ঠে বলল, বারোটা—

কক্ষনো নয়। এগারোটা সাত—তার সিকি মিনিট বেশী নয়। পড়তে গেলেই ঘড়ি তোমার ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকে। যাও—নীচে যাও।

সৌদামিনী বাধা দিয়ে উঠলেন, না, নীচে নয়। নীচে বড্ড মশা, শেষে ম্যালেরিয়ায় ধরুক। পড়তে হয়, এখানে বসেই পড়ুক।

বরদা বললেন, কোথায় মশা? ছেলেকে ননীর পুতুল করতে চাও যে। আমরা কাজকর্ম করে থাকি,—মশা-টশা তো দেখিনে—

মায়ের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে এক পলক তাকিয়ে নীলাদ্রি বলল, রাতেই উপদ্রবটা বেশী হয় কিনা।

বরদা বললেন, তাহলে আমার ঘরে বসে পড়গে। বারোটা বাজতে এখনও বাহান্ন-তিপ্পান্ন মিনিট। টিটিঙের চ্যাপ্টার আজ শেষ করতেই হবে। কোনখানে আটকে গেলে আমি বুঝিয়ে দিতে পারব। তোমার সুবিধেই হবে—কি বল?

বরদা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন।

নীলাদ্রি মাথা নেড়ে কাতর কণ্ঠে সায় দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সৌদামিনী রুখে উঠলেন, আমার হবে না। ও আলো জেবলে বসে বসে সমস্ত রাত পড়বে, আলো থাকলে আমার ঘুম হয় না।

বরদা বললেন, তুমি এখানে ঘুমোও। পড়া হয়ে গেলে তারপর যেও। রোজই হচ্ছে, আজ নতুন মানুষ হয়ে গেলে নাকি?

সৌদামিনী জেদ ধরে বসলেন, রোজ হচ্ছে বলেই আজ হবে না। শরীর আমার ভেঙে পড়ছে। আবার যে এক ঘুমের পর ছুটোছুটি করব, সে পেরে উঠব না। তাতে তোমার ছেলের পড়া হোক আর না-ই হোক—

মুশকিল! কি করা যায়? বরদা চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলেন।

তা হলে বউমাকেও নিয়ে চল। নীলে এখানে পড়ুক। বারোটা বাজলে তারপর উনি আসবেন।

সৌদামিনীর তাতেও আপত্তি। না, বউমা যাবে না। তোমার সঙ্গে আজ অনেক কথা রয়েছে, বউমা গেলে হবে না।

অতঃপর বরদার আর ধৈর্য থাকল না। রাগ করে বললেন, হবে না তো কি হবে ? পরের মেয়েকে সত্যি সত্যি তো একটা ঘরে একলা ফেলে রাখা যায় না।

সৌদামিনী প্রস্তাব করলেন, নীলুকে বল, সে যদি—

সে কি করে হবে ? ওর এগজামিন। বলতে বলতে সৌদামিনীর 'পরে একটু করুণাও হল। অবোধ মেয়েলোক—বোঝে না, এগজামিন কি এবং পেনাল কোড কি বস্তু ! ঘাড় নেড়ে বরদা বললেন, সে আমি কিছুতে পারব না। এগজামিন সামনে, ওকে আমি বলব কোন্ হিসাবে ? একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে তো ?

অনুচ্চ তরল কণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, আছে নাকি ? যাক্, দুর্ভাবনা ঘুচল। তিনিই যখন ছেলেকে ডেকে বললেন, নীলু বাবা, তুই আজকের রাতটা এখানে বসে পড়্। বউমা একটা কথাও বলবেন না, খাটে ঘুমিয়ে থাকবেন। অসুবিধে হবে ?

ছেলে খুব মাতৃভক্ত বলতে হবে। ঘাড় নেড়ে সে তখনই রাজী। বরদা সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝেসুজে ঠিক করে বলছ ?

নীলাদ্রি বলল, আজ্ঞে, কোন অসুবিধে হবে না।

হবে না, কি করে বল ? এখন নেই, পরেও তো হতে পারে ! তুমি কি দৈবজ্ঞ হয়ে বসেছ ?

বরদার ধারণা, নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় ছেলে মায়ের কথা ঠেলতে পারছে না। যেতে যেতে আবার মুখ ফিরিয়ে উপদেশ দিলেন, চেঁচিয়ে পড়লে খুব মনঃসংযোগ হয়। আমি ও-ঘর থেকে শুনব। চিটিং আজ রপ্ত করে ফেলতেই হবে। কাল আমি জিজ্ঞাসা করব।

ওঁরা চলে যেতেই নীলাদ্রি দরজায় খিল এঁটে বাঁচল। উমা ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়ে আবার চোখ বুজেছে।

উমারাণী !

উঁ—

নীলাদ্রি বিছানার ধারে এসে অনুনয় আরম্ভ বরল, লক্ষ্মীটি চোখ মেল। দেখ, কি চমৎকার রাত ! একটি বার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ—

উমাও বলল, চমৎকার !

কি ?

আজকের রাত।

তোমার মুখ তো এদিকে। এদিকের দরজা-জানলা বন্ধ।

উমা চোখ মেলে স্বামীর একাগ্র মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে বলল, রাত্তির বেলা বন্ধ ঘরই তো খাসা !

ঘুমোবার মজা হয়—না ?

উমা বলল, আচ্ছা, ঘুমের পরে তোমার অত রাগ কেন বল তো ? নিজের ঘুমোবার জো নেই—বই মুখস্থ করতে হয়—অন্যের ঘুম তাই দেখতে পার না।

নীলাদ্রি গম্ভীর হয়ে বলল, এমন রাত্রে ঘুমোনো অপরাধ।

চপলকণ্ঠে উমা বলল, তোমার পেনাল-কোডে এ-সব লেখা রয়েছে বুঝি !

হ্যাঁ, এবং ঘুমোলে কি শাস্তি, তা-ও রয়েছে। শুনবে ?

উমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, রক্ষে কর মশাই। এখন নয়—কাল। বাবা যখন পড়া জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁকে শুনিয়ে দিও।

দরজায় করাঘাত। বাইরে থেকে বরদা ডাকছেন, নীলে, নীলে—

প্রদীপ উস্কে নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে গিয়ে যা মনে এল চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল।

সর্বনাশ, গোলমালের মধ্যে পেনাল-কোড উপরে আনাই হয়নি।—আইনের কোন বই-ই নেই, খুঁজতে খুঁজতে কুলুঙ্গির কোণে মিলল, মায়ের আধছেঁড়া মহাভারতখানা। সেটা সামনে নিয়ে সে প্রাণপণ চিৎকারে আইনের ধারা মুখস্থ করে চলল।

আরও বিস্তর ডাকাডাকির পর মনোযোগী ছাত্র দরজা খুলে দিল। বরদার প্রসন্ন মুখ, ছেলের পাঠ-অভ্যাস বাইরে থেকে কিছু কিছু ওঁর কানে গিয়েছে নিশ্চয়। তিনি সোজা উমার খাটের কাছে গিয়ে ডাকলেন—অ বউমা, ঘুমুচ্ছ তো ? দেখতে এলাম।

ঘুমন্ত লোকে কথা বলে না, অতএব উমার জবাব পাওয়া গেল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বরদা ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ। শুয়ে শুয়ে তাই মনে হল, মা-লক্ষ্মীর ঘুমের অসুবিধে হচ্ছে কি না দেখে আসি।

নীলাদ্রি বলল, তবে মনে মনেই পড়ি—

বরদা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বললেন, না না, তাতে কাজ নেই—আগাগোড়া মুখস্থের ব্যাপার, ও কি মনে মনে পড়ার কাজ ? বিশেষ, যখন কোন রকম

অসুবিধে হচ্ছে না···কিন্তু সাবধান, সাবধান! পরের মেয়ে এসেছে, গিয়ে নিন্দেমন্দ না করে।

নীলাদ্রি বলল, তা দেখছি বইকি। ঐ তো—খুব অসাড় হয়েই ঘুমুচ্ছে।

তোমার যা কাণ্ডজ্ঞান, তোমার উপর আমি ভরসা করি কি না! আবার এসে আমি খবর নিয়ে যাব।

মনের বিরক্তি গোপন করে সহজ সুরে নীলাদ্রি বলল, শীতের দিনে বার বার কষ্ট করে আসবার দরকার কি বাবা?

বাপ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

কষ্ট হয়, আমার হবে। তোমার তাতে ক্ষতিটা কি শুনি? পরের মেয়ে এসেছে, আমার নিজের মেয়ে নেই—তাকে একটু যত্নআত্তি করব, তাতে তোমার হিংসে হয় বুঝি?

তাড়াতাড়ি কৈফিয়তের ভাবে নীলাদ্রি বলল, বার বার দুয়োর খোলা, পড়ায় মনঃসংযোগের একটু ইয়ে হয় কিনা—

এতক্ষণে বরদার নজরে পড়ল, দালানের দিককার জানালাগুলো বন্ধ। বললেন, সমস্ত এঁটে দিয়ে অন্ধকূপ করে রেখেছো। তাই ঘর থেকে গলা শুনতে পাচ্ছিনে। তোমায় বার বার দুয়োর খুলতে হবে না বাপু, জানালা খুলে রাখ—আমি বাইরে থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাব।

উমা নির্বিকার নিরীহ মানুষটির মতো পড়ে আছে। এবং সে যে ঘুমোয় নি, কোন দিক থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। নীলাদ্রির কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন সন্দেহ হল, চাপা হাসির প্রবাহে ওষ্ঠ তার একটু একটু নড়ছে এবং চোখ দুটো মিটমিট করছে। অথচ এর প্রতিকার নেই। সুঁচ-পড়বার শব্দও খোলা জানালার পথে বাবার শব্দভেদী কানে গিয়ে পৌঁছবে, যে-কোন মুহূর্তে জানালায় উদয় হয়ে তিনি প্রশ্ন করবেন, চিটিং শেষ হল?

নীচের ঘর থেকে সে পেনাল-কোডখানা নিয়ে এল। উমার শিয়রের দিকে খানিকটা দূরে টেবিল টেনে আনল। তারপর যথাসম্ভব উমার কর্ণবিবর লক্ষ্য করে আকাশভেদী কণ্ঠে পড়া শুরু করল। ঘুমের ঘোরে উমা পাশ ফিরল, পড়া আরও তীব্র হল; ঘুমের ঘোরেই বোধ করি সুগৌর হাতখানা কানের উপর চাপা দিয়ে এসে পড়ল, বিপুলতর উৎসাহে নীলাদ্রি আরও গলা চড়িয়ে দিল।

জানালার ওদিকে এসে সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, নীলু, কি আরম্ভ করেছিস? বাড়িসুদ্ধ কাউকে ঘুমুতে দিবি নে?

নীলাদ্রি একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখে মৃদুকণ্ঠে বলল, বাবা যে বললেন।

ও'র কি, একটা কিছু বললেই হল। মা-লক্ষ্মীর জন্য এদিকে দরদ উথলে ওঠে। আরে, এ পাড়ায় যে মরামানুষ ডাক ছেড়ে জেগে ওঠে।

বরদাও সঙ্গে এসেছিলেন। বিরক্তভাবে তিনি বললেন, একজামিন সামনে, সেটা দেখতে হবে তো?···তা নীলে, বরঞ্চ যতটা পড়েছ, এখন মনে মনেই আবৃত্তি কর। চিটিং-এর কত দূর?

নীলাদ্রি বলল, আজ্ঞে, রপ্ত হয়ে গেছে।

সৌদামিনী বলেন, আবার জানালা খুলে দিয়েছিস কেন রে নীলে? চোখে আলো গিয়ে লাগছে, ঘুম হচ্ছে না।

নীলাদ্রি বলল, বাবা যে বললেন—

বরদা সদয় হয়ে বলেন, তা নীলে, এখন বরং জানালা বন্ধ করেই পড়। তোমার মার ঘুম হচ্ছে না—শরীরটে আজ ভাল নেই।

সশব্দে জানালা বন্ধ হতেই বরদা মনের আনন্দ আর গোপন রাখতে পারলেন না। হেসে হাত-মুখ নেড়ে বলতে লাগলেন—দেখছ গিন্নি, একবার ফেল হয়ে তোমার ছেলের কি রকম পড়াশোনায় চাড় হয়েছে। বারোটা কখন বেজে গেছে, পড়তে পড়তে তা হুঁশই নেই। আমি আবার ওদিকে চুরি করে ঘড়ির কাঁটা পনের মিনিট পেছিয়ে রেখেছিলাম। নীলে এবার ঠিক পাশ হয়ে যাবে—

প্রমথনাথ বিশী

চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট

গুজবটা ক্রমে ব্রহ্মার কানে পৌঁছিল ; কোনমতেই আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। তিনি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে গিয়া তাহাকে বলিলেন—ওহে বাপু একি শুনিতেছি।

চিত্রগুপ্ত হিসাবের খাতাটা বন্ধ করিতে করিতে বলিল—আজ্ঞে ওটা গুজব।

ব্রহ্মা বলিলেন—গুজবটা অত্যন্ত প্রবল ; একবার খোঁজ লইলে দোষ কি ?

চিত্রগুপ্ত দু'একবার ঢোক গিলিয়া বলিল—দোষ আবার কি ? তবে কিনা বাজে বৃথা পরিশ্রম। আর পিতামহ, এও কি সম্ভব যে পৃথিবীতে মানুষ নাই।

অসম্ভবটা কি ? একখানা চেয়ারের উপর বসিতে বসিতে ব্রহ্মা বলিলেন।

আজ্ঞে, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি পৃথিবীতে মানুষের অভাব হয় নাই। তার পরে একটু কাশিয়া লইয়া চিত্রগুপ্ত বলিল—জানেন তো প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলা আমার অভ্যাস নাই।

প্রমাণটা কি শুনিতে পাই কি ? ব্রহ্মা দাবী করিলেন।

প্রমাণ যত সহজ ; তত প্রচুর। মানুষ থাকিবার সময়ে যেমন রিপোর্ট

পাইতাম, আজও তেমনি পাইতেছি। মানুষ না থাকিলে এমনটি ঘটিত না। চিত্রগুপ্ত বলিল।

—কি রকম রিপোর্ট আসিতেছে, দু'চারটা বল দেখি—।

চিত্রগুপ্ত দপ্তর ঘাঁটিয়া রিপোর্ট শুনাইতে লাগিল।—এই দেখুন, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, গ্রন্থিচ্ছেদ, নীবীচ্ছেদ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক তস্করবৃত্তি; কত বলিব! পৃথিবীতে মানুষ না থাকিলে এসব কি হইতে পারিত! পশুরা তো এখনও অত উন্নত হয় নাই!

ব্রহ্মার মুখ অনেকটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—এই দেখুন কালই এক রিপোর্ট আসিয়াছে। কলিকাতা সহরের বিশ্বংটন চত্বরে দেশোদ্ধারকারীদের এক সভা হয়! তাহারা সকলে অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া সোডার বোতল, কাপড়ের পাদুকা (আমার নিজস্ব সংবাদদাতা বলিতেছেন চামড়ার পাদুকা নাকি হিংসার পরিচায়ক), কাঁসার গেলাশ, ইটের টুকরা প্রভৃতির দ্বারা কোন রকমে কাজ চালাইয়া লইয়াছি। সংবাদ বলিতেছে, অহিংসদের হাতে এসব জিনিষ অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হইয়াছে। মানুষ না থাকিলে এমনটি কখনোই সম্ভবপর হইত না—কারণ পশুরা এখনো এমন বুদ্ধির প্যাঁচ খেলিয়া মনের সঙ্গে চোখ ঠারিয়া, হিংসাকে এড়াইতে যাইতে শেখে নাই।

ব্রহ্মা বলিলেন—তোমার রিপোর্ট শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। তবু তুমি এক কাজ কর। একবার স্বয়ং পৃথিবীতে গিয়া অনুসন্ধান কর—মানুষ আছে কি নাই। দেবতারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে—আমি প্রহরে প্রহরে বুলেটিন বাহির করিয়াও তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিতেছি না।

অগত্যা চিত্রগুপ্ত ছদ্মবেশে পৃথিবীতে রওনা হইল।

ব্যাপারখানা এই। ব্রহ্মার কানে কিছুদিন হইতে দেবতারা আসিয়া ক্রমাগত বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—পিতামহ, পৃথিবীতে মানুষ আর নাই; কারণ কেহই আর নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেয় না। যতদিন সম্ভব ব্রহ্মা কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, শেষে আর যখন পারিলেন না—তখনই তিনি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন।

আজ কয়েকদিন হইল চিত্রগুপ্ত কাগজ-কলম লইয়া কলিকাতার পথে পথে ঘুরিতেছে। যাহাকে দেখে তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ করে—ফলে তাহার মুখ ক্রমেই শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হইতেছে। তবে কি গুজবটাই সত্য! ব্রহ্মাকে সে কি বলিবে! ভাবে ব্যাপার কি? যদিও ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি

মানুষের মতই—কিন্তু পরিচয় দিবার সময়ে কেহ তো নিজেকে মানুষ বলিয়া উল্লেখ করে না।

—এ কেমন হইল?

কিন্তু চিত্রগুপ্ত অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়—পৃথিবীতে মানুষ আছে—ইহা সে প্রমাণ করিবেই! আবার দ্বিগুন উৎসাহে সে আদমশুমারী আরম্ভ করে।

—মহাশয়, আপনি কি?

—আমি বামপন্থী।

—আপনি কি?

—আমি দক্ষিণপন্থী

—আপনি?

—সেণ্টার বা মধ্যপন্থী

—আপনি?

—বাম-বামপন্থী

—আপনি?

—অতি-বামপন্থী

—আপনি?

—নাতি দক্ষিণপন্থী।

—আপনি?

—প্রলিটারিয়েট।

—আপনি?

—বুর্জোয়া

—আপনি? আপনি? আপনি?

কম্যুনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট, ভেডাবেশনিষ্ট, রিপাবলিকান, কৃষক, শ্রমিক, লালঝাণ্ডা!

আপনি? আপনি? আপনারা?

সমাজতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, সাম্রাজ্যতন্ত্রী, বাণিজ্যতন্ত্রী।

চিত্রগুপ্ত হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করিয়া আবার আদমশুমারিতে লাগিয়া গেল।

—আপনি?

—জার্নালিষ্ট।

—আপনি ?

—রিপোর্টার।

—আপনি ?

—ফুটবলার

—আপনি ?

—সুইমার।

—আপনি ?

—বেকার।

—আপনি ?

—বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—নাতি-বুর্জোয়া

—আপনি ?

—মেজো বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—সেজো বুর্জোয়া

—আপনি ?

—পুঁজিবাদী।

—আপনি ?

—শ্রমিক-বন্ধু।

—আপনি ?

—কৃষক-বন্ধু

—আপনি ?

—ফিল্মষ্টার।

এক জায়গায় একদল সুবেশ যুবক বসিয়া পুস্তকের ক্যাটালগ পড়িতেছিল। চিত্রগুপ্ত তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা ? তাহারা বলিল—আমরা অভিজাত সাহিত্যিক।

আর এক জায়গায় একদল সুবেশ তরুণ বসিয়া নিজেদের বই যথেষ্ট কেন বিক্রয় হয় না সে-সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিল। চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা ? তাহারা বলিল—আমরা লিটারারি সোশ্যালিস্ট।

চিত্রগুপ্ত বলিল—মশায়, এখানে কোথায় মানুষ আছে বলিতে পারেন ?

তাহারা বলিল—মানুষ ছিল উনবিংশ শতকে। এখন মানুষ কোথায় ?

আর একজন বলিল—বঙ্কিমচন্দ্র ছিল শেষ মানুষ।

চিত্রগুপ্ত চলিয়া যাইতেছিল—একজন বলিয়া উঠিল, একখানা বই কিনিবেন ? কমিশন বাদ পাইবেন।

চিত্রগুপ্ত পথে বাহির হইয়া দেখিল, একদল লোক ছুটিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা ছুটিতেছ কেন ?

তাহারা বলিল—'ছুটন'ই আমাদের 'ক্রীড্' আমরা যে প্রগতি-পন্থী।

কিন্তু পাশ হইতে একজন চিত্রগুপ্তকে বলিল—মহাশয়, শুধু 'ক্রীডে' মানুষকে এত ছুটাইতে পারে না—চাহিয়া দেখুন পিছনে একটা পাগলা কুকুরও আছে।

—মহাশয় আপনি ?

সেই লোকটি বলিল—আমি অধোগতি-পন্থী।

একজন বৃদ্ধও যাইতে ছিলেন—চিত্রগুপ্ত একজনকে জিজ্ঞাসা করিল ইহারা কি ?

লোকটা কহিল—ইহারা তরুণ-তরুণী। চিত্রগুপ্ত বসিয়া পড়িল। মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিবার আশা ছাড়িয়া দিল।

কোন দিকে যাওয়া যায় যখন সে ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময়ে একখানা যাত্রী-বোঝাই মোটরবাস পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আর পাঞ্জাবী কন্ডাক্টার আইয়ে বাবু আইয়ে চিড়িয়াখানা, ছে পয়সা বলিয়া তাহাকে টানিয়া উঠাইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে সে ছ'পয়সা গুণিয়া দিয়া চিড়িয়াখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চার পয়সা দক্ষিণা দিয়া চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়া সে জন্তু-জানোয়ার দেখিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যাবেলা হাওয়া অফিসের মাঠে বসিয়া ব্রহ্মার কাছে দাখিল করিবার জন্য রিপোর্ট লিখিয়া ফেলিল—আমরা তাহার নকল দিলাম।

…"আমি পৃথিবীতে আসিয়া মানুষের খোঁজ করিলাম—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, কেহই মানুষ বলিয়া পরিচয় দিল না—কাজেই পৃথিবীতে মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। সন্দেহ এইজন্য বলিলাম যে কলিকাতা শহরে চিড়িয়াখানা নামে এক তাজ্জব ব্যাপার আছে, চার পয়সা দিলেই সেখানে ঢুকিতে পারা যায়। সেখানে ঢুকিয়াও মানুষ দেখিতে পাইলাম না—কেবল জন্তু-জানোয়ার। তবে একটি খাঁচাতে মানুষের মত একটা জানোয়ার আছে দেখিলাম। খাঁচার গায়ে লেখা রহিয়াছে, 'বন-মানুষ'। বোধ করি কেবল

মানুষ নামে পরিচিত হইতে সে লজ্জিত, তাই 'বন' শব্দটা মানুষের আগে জুড়িয়া দিয়াছে ; অন্য কেহ আপত্তি না করাতে আমি উহাকে মানুষ বলিয়া সনাক্ত করিলাম—কাজেই নিবেদন এই যে পৃথিবী মানুষহীন হইয়াছে, এরূপ আশংকা করিবার কোন কারণ নাই। এখন প্রজাপতি ব্রহ্মা একটু কৃপাদৃষ্টি করিলে অচির-কালের মধ্যে ইহার বংশবৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এমন আশা করা যায়।

নিবেদন মিতি···"

রিপোর্ট লিখিয়া সে সাঙ্গুভ্যালিতে চা পান করিবার জন্য ঢুকিল, বাহির হইবার সময়ে কে বা কাহারা তাহার পকেট মারিয়াছিল নিশ্চয় ; কারণ, আমি সন্ধ্যাবেলা এই রিপোর্টখানা বিকবংটন চত্বরের কাছে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে মনুষ্যজাতিকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য কাগজে প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার অসুখ

আপনারা সবাই জানেন আমি মোটেই জনপ্রিয় নই এবং এও নিশ্চয় জানেন কাকে বলে জনপ্রিয়তা।

আমিই বলি, আমিই যখন বলছি।

সে-ই জনপ্রিয়, সব কথাতেই স্বল্প হেসে যে সবিনয় সায় দেয়। সবজজবাবু যদি বলেন কাঁচা ঢ্যাঁড়স খাওয়া ভালো, তাতে নির্বিবাদে হ্যাঁ করতে হবে আর ডিপুটিবাবু যদি বলেন কাঁচা ঢ্যাঁড়স খায় বাঁদরে, তাতেও অপ্রতিবাদে হ্যাঁ করতে হবে। এমনি জনে জনে। 'রাত্রে কখনো কাজ করবেন না মশাই।' বেমালুম বলবেন, 'কক্‌খনো না।' 'আমি তো মশাই রাতেই কাজ করি!' দৃকপাত না করে বলবেন, 'আমিও।' এমনি ক্রমান্বিত। 'সাত দিনে আমি একবার দাড়ি কামাই!' —বললেন সান্যাল মশাই। বলবেন, 'বটেই তো। নইলে মফঃস্বলে থাকার হেতু কী?' 'আমি তো মশাই রাত্রে শুতে যাবার আগে সেভ করি।' —বললেন ব্যারিস্টার-মুন্সেফ। বলবেন, 'বটেই তো। নইলে মফঃস্বলে থাকার আনন্দ কী?' এমনি সর্ববিষয়ে। কংগ্রেসই হোক আর সাভারকারই হোক। দেখবেন আপনার জয়জয়কার। এমন কি, আপনার বদলির সময়ে

এখানে-সেখানে আপনাকে সবাই পার্টি দেবে ও সৌম্য থেকে শুরু করে চরিত্রবান পর্যন্ত বহু বিশেষণে বিভূষিত করে রঙিন কালিতে ছেপে আপনাকে অভিনন্দন দেবে এবং আপনি সেটা পরবর্তী স্টেশনে আপনার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন।

আমি হচ্ছি বিজাতীয় উল্টো। আমার একটা মত আছে আর সেটা পরিষ্কার রকমের স্পষ্ট। তাতে একটুও ঘাড়-হেলানো বা হাত-কচলানো নেই। যেটা 'না', সেটা এক কথাতেই না ; আর যেটা 'হ্যাঁ', সেটা সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও অব্যতিক্রমনীয়। আমি যে ব্যক্তি, শুধু অভিব্যক্তি নই, এটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারতুম না, তাই কেউই দেখতে পারতো না আমাকে।

সেটা আমার পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ছিলো। আগে আগে সোমবার খবরের কাগজ আসতো না, সেদিনটা পৃথিবীব্যাপী পরিপূর্ণ শান্তি অনুভব করতুম—ইদানিং সে সুখটুকু অবিশ্যি অপহৃত হয়েছে। তাই যখন দেখলুম আমি একেবারে একা তখন আমার নিজেকে ভারি উপযুক্ত মনে হলো। উপযুক্ত মানে বাঁচবার উপযুক্ত।

আমার সঙ্গে যে কেউ মেশে না এটা আমার স্ত্রীর ভালো লাগতো না। বলতো : 'তুমি ভারি একরোখা। কথায় কথায় লোকের সঙ্গে ঝগড়া করো। দেখলে তো, কেউ মেশে না তোমার সঙ্গে।'

ঝল্সে উঠতুম : 'কর্তৃবাচ্যে কথা বলো। বলো আমিই মিশি না কারুর সঙ্গে।'

বলা বাহুল্য, আমাকে কেউ-ই পছন্দ করতো না। আর আমি—আমি ওদেরকে অবিমিশ্র ঘৃণা করতুম, ঐ ঠুলি-ঠাসা ঘানি-ঘোরানোর দলকে। আমাদের গ্রামে বাথুয়া পাড়ায় একবার আগুন লেগেছিলো। আগুন নেভাতে সবাইর সঙ্গে দুই মুন্সেফ বাবুও দুই দিক থেকে ছুটে এসেছিলেন। তখন একটা কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড চলছে কল্পনা করুন—'কটা টাইটেল করলেন এ মাসে?'

শেষোক্ত উত্তর করছেন : 'আর টাইটেল? মিস বোসের ঠ্যালাতেই অস্থির।'

এদিকে আগুন জ্বলছে লেলিহান!

আমার কেবলই মনে হতো এরা এবং এদের চেয়েও যারা উপরে, সবাই আমার নিচে বসে। এদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যখন এদের বিদ্যাবুদ্ধির সমতলে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে আসি, স্থানিক বাজার দর, দৈনিক কাজের ফিরিস্তি আর পারস্পরিক স্ত্রী নিয়ে স্বচ্ছ অশ্লীলতা, তখন মনে হতো আত্মহত্যা করতে আর বাকি নেই। আসলে আমি একটু দাম্ভিক। আর সত্য কথা

বলতে গেলে, আমার একটা কিছু আছে এই দম্ভ একটু না থাকলে বাঁচবার কোনই অর্থ থাকে না।

তাই রক্ষা পেলুম যখন পরিচ্ছন্ন একা হয়ে গেলুম। সঙ্গী লোকে নির্বাচন করে নেয় শুনেছি কিন্তু সঙ্গী এখানে নিক্ষিপ্ত হয়। যেহেতু রতিলালবাবু তোমারই চাকরি করছেন সেহেতু তিনিই তোমার বন্ধু, তোমার গত্যন্তর নেই। তা তিনি হাড় কৃপণই হোন বা শুদ্ধ ভাষায় জন্ম-সঞ্চয়ী হোন। ইদানিং তাই আমি বিকেলবেলা বাড়ি থেকে বেরুতুম না। শুনলে অবাক হবেন, আলো জ্বালিয়ে বসে চুপচাপ অংক কষতুম। এ হেন যে আমি, আমার একদিন হঠাৎ ভীষণ অসুখ করে বসলো। একা থাকা যে কতখানি দুর্বল হয়ে থাকা অমলা তাই অভিযোগ করে উঠলো। বললে, 'এখন করি কী? ডাকি কাকে? নতুন জায়গা, কারু সঙ্গে তো ভাব রাখোনি।'

বললুম, 'ডাক্তার ডাকো।'

'কাকে?'

'অসুখটা যখন বড়ো, তখন বড়ো ডাক্তারই ডাকতে হয়।'

'বলো কি', অমলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলো, 'ব্যানার্জির সঙ্গে যে তোমার ঝগড়া। কথা বন্ধ।'

'তা হোক। আমি না বলি, আমার অসুখই দিব্যি কথা কইতে পারবে। তারপর তুমি আছ।' বলে সূক্ষ্ম একটু হাসলুম, 'মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, ছুটি যদি নিতে হয়, একটা সার্টিফিকেট লাগবে, তাই ওকে দরকার। এসেই, গোড়াতে, এই ব্যানার্জির সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'য়ে যায়। অনেকের যেমন সখ থাকে শিকার বা বাগান বা ফটোগ্রাফি, ডাক্তারের ছিলো তেমনি স্ত্রীলোক নিয়ে চড়ুইভাতি করা। ভয় পাবেন না, স্ত্রীলোক কথাটা ব্যাপ্ত্যর্থে ব্যবহার করছি। এতে অবিশ্যি কোন দোষের ছিল না যদি সে-সব চড়ুইভাতিতে স্ত্রীলোকদের স্বামীদের অগ্রিম নিমন্ত্রণ থাকতো। ব্যাপারটা তা হ'লে খোলাখুলিই বলি।

অমলা এক শীতের রবিবার সকালবেলা আমাকে বললে ডাক্তারের স্ত্রী ওকে ও আরো ক'টি স্ত্রীলোককে এক পিকনিক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছে, এই কাছেই, মাইল এগারো দূরে। একটা পাহাড়ের টিপি না পোড়ো মন্দির আছে সেখানে। পার্টি বেশি বড়ো নয়, তিনখানা গাড়িতেই বেশ কুলিয়ে যাবে। খেয়ে নিয়ে বারোটার মধ্যে বেরুনো চাই। হ্যাঁ, যাচ্ছে অমলা।

বললুম, 'একা-একা তোমরা মেয়েরা সব অ্যারেঞ্জ করতে পারবে?'

যা ওর বিশেষত্ব, অমলা তির্যক ভ্রূক্ষেপ করলো। তার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা

হচ্ছে এই, কত কিছুই আমরা করলুম, আর এতো নিতান্ত নিজেদের মধ্যে সামান্য একটু হৈচৈ করে আসা।

বারোটার আগেই মোটর এলো অমলাকে নিতে। হর্ণ শুনে মুহূর্তে পেটিকোট ও ছাড়া শাড়ির মাঝখানে অমলা তালগোল পাকিয়ে কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ছুটাছুটি করতে লাগলো। আমি ওকে মুক্তি দিলুম বারান্দায় চলে গিয়ে।

কিন্তু বারান্দায় গিয়ে দেখলুম কী! দেখলুম ড্রাইভারের পাশে স্বয়ং ডাক্তার।

বললুম, 'একী! আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

ব্যানার্জি দরজা খুলে নেমে এলো। বললো, 'আমিও যাচ্ছি ওদের সঙ্গে এস্কর্ট হিসাবে।'

'আমি তো শুনেছিলুম এটা একমাত্র মেয়েদেরই পার্টি।'

'Mainly তাই।' ডাক্তার আমার বৈঠকখানায় প্রবেশ করলো, 'তবু সঙ্গে একজন পুরুষ না থাকলে এদের অসুবিধা হতে পারে।'

'সেই পুরুষটি আপনি একা কেন?' কটুকণ্ঠে ধমকে উঠলুম, 'আর সব ভদ্রমহিলারা কি বিধবা?'

ব্যানার্জি এক'মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। তারপর মুখে হাসি টেনে এমন একখানা ভাব করলো যেন আমার গোপন মনোভাব সে বুঝতে পেরেছে। বললে, 'বেশ তো আপনিও চলুন না, গাড়িতে জায়গা হবে।'

'সেটা কি আপনার অনুগ্রহে নাকি? আমি যে যাবো, আর সব স্বামীরা কই? তাঁদের বলা হয়েছে? তাঁদের ছাড়া তাঁদের স্ত্রীরাই বা আমাদের সঙ্গে যাবেন কেন?'

'রাখুন মশাই, আপনার মতোন সবাই তাঁরা এমন অনুদার নন।'

'আপনার উদারতা দেখছি সমুদ্রকেও হার মানিয়েছে।' ঝাঁজ গোপন রেখে বললুম, 'বেশ আপনি আপনার উদার মোটরে চড়ে উদার মাঠের দিকে অগ্রসর হোন, আমার স্ত্রী যাবেন না।'

ততক্ষণে অমলা সাজগোজ শেষ করে যাবার মুখে দুয়ারের কাছে এসে পড়েছে।

ওকে দেখতে পেয়ে ডাক্তারের পাংশু মুখ চকিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, 'যাবেন না মানে? উনি না গেলে চলবে কিসে? আপনি না বললেই উনি যাবেন না?'

'হ্যাঁ, তাই তো জানতুম।'

'কিন্তু না আপনি বলবেন কেন?'

'না আমি বলতুম না, যদি সঙ্গে আপনি না থাকতেন। না আমি বলতুম না যদি সব মিসেসেরই মিস্টার সঙ্গে থাকতো।'

বসলুম গিয়ে একটা চেয়ারে। বলবার জন্যে প্রতীক্ষা না করে ব্যানার্জি'ও একটা চেয়ার নিলো।

—'আপনার মতো এমন ছোট মন আজকালকার সভ্য জগতে কোথাও দেখিনি।' ডাক্তার বললে, 'এই সংকীর্ণতা থেকে মিসেস দে নিশ্চয়ই মুক্ত। তাঁর নিজের কোনোই আপত্তি নেই, শুধু আপনি আপনার স্বামিত্বের গায়ের জোরে ওঁকে বাধা দিচ্ছেন। এমনি জোর-খাটানো স্বামীগিরিকে আমি hate করি।'

ক্রোধে ক্লান্ত হয়ে বললুম, 'বেশ, মিসেস দে'কেই জিগগেস করুন।'

ডাক্তার প্রায় একটা বক্তৃতা ফেঁদে বসলো: 'বেশ, মিসেস দে। আপনিই বলুন, এতে কি ওঁর মহত্ত্বের কোনোই পরিচয় পাওয়া যায়? আমার স্ত্রী একটা পার্টি অর্গানাইজ করেছেন, তাতে আপনারা ছ'সাতটি লেডি যোগ দেবেন জানিয়ে সম্মানিত করেছেন আমাদের, আপনাদেরই সবাইর সুবিধের জন্যে আমি এস্কর্ট-স্বরূপ শুধু চলেছি। তাতে এমনি কী ওঁর গাত্রদাহ উপস্থিত হবার কথা। এটা কি সভ্যতা, না এটিকেট? বেশ তো, সন্দেহ থাকে, উনিও চলুন না। তা, নিজেও যাবেন না, স্ত্রীকেও যেতে দেবেন না, শুধু গায়ের জোরে পথ আটকে থাকবেন। বলুন এটা আধুনিকতা? এটা কেউ মানতে পারে?'

একমুহূর্ত মনে হলো অমলা যেন আমার স্ত্রী নয়। যেন ও কুমারী, আর ওর স্বয়ম্বর-সভায় আমরা দুই পাণিপ্রার্থী আছি বসে।

ডাক্তার কী বলতে যাচ্ছিলো, অমলা হঠাৎ আর্তশব্দ করে হেসে উঠলো।

'রক্ষে করো বাবা, তার চেয়ে লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমুইগে যাই।' বলে সে উড্ডীন আঁচলে দ্রুত অন্তর্হিত হলো।

সেই থেকে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বন্ধ।

এলো ডাক্তার এবং ডাক্তারিমতে যতক্ষণ থাকা উচিত তারো অতিরিক্ত সে রইলো, আর, আমার মনে হলো, অনর্গল কথা বলতে পেরে, আমার সঙ্গে অবিশ্যি নয়, অপরিমিত সে খুসি হতে পেরেছে। যাবার সময় চিকিৎসা সংক্রান্ত এইটুকুই সে বলে গেল: 'ওষুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণ মাথায়

একটু আইসব্যাগ দিন। আইসব্যাগ হেডমাষ্টারবাবুর কাছে আছে, আনিয়ে নিন চট করে।'

ডাক্তার চলে গেলে বললুম, 'চাইতে হবে না, দোকান থেকে কিনে আনুক আইসব্যাগ।'

অমলা বললে, 'বাড়িতে এসে একবার অধিষ্ঠান করলে থেকে-থেকেই কেবল মাথায় উঠবে। কেন, আনিয়ে নিলে দোষ কী? দেবে না ভাবছ?'

চুপ করে রইলুম, কেন না অমলা জানতো হেডমাষ্টারের সঙ্গেও আমার বাক্যালাপ নেই।

তারজন্যে দায়ী সম্পূর্ণ আমি, স্বীকার করতে আমার কুণ্ঠা নেই। কেননা এর মাঝে মাস্টারবাবুর গৃহিনীটি ছিলেন জড়িত। আমার ত্রুটি হয়েছিলো হেডমাস্টারের স্ত্রীকে আমি বেহেড ভেবেছিলুম।

কার স্ত্রীর কি রকম হওয়া উচিত দড়ি টেনে-টেনে মফঃস্বলে তার বেড়া দেয়া আছে। আশ্চর্য রকম লাফ দিয়ে মিসেস্ ভৌমিক অনেকগুলি বেড়া একসঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন বলেই আমার সহ্য হতো না। সহ্য হতো না যখন তিনি তাঁর বাড়িতে হাই-টির আসর বসাতেন ও পাঁচজন হোমরা-চোমরার সঙ্গে সমস্বরে বাক্যালাপ করতেন—বর্তমানে তিনি হেডমাস্টার-এর স্ত্রী হলেও চিরকালই তিনি রায়বাহাদুর রিটায়ার্ড জজের কন্যা এটাই তাঁর দীপ্ত ললাটিকা ছিল।

তা-ও হয়তো সহ্য হতো যদি না তিনি আমাকে সেদিন গম্ভীর মুখে বলতেন যে, ইস্কুলের পলিসি তিনিই আগাগোড়া চালিত করছেন। পরীক্ষার খাতায় কোন প্রশ্নোত্তরে কত নম্বর দিতে হবে তাও তিনিই বলে দেন এবং কোন গ্রন্থকারের কোন বই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তাও তাঁরই রুচিম্বারা প্রণোচিত হয়। এক কথায়, আমি শুধু বলেছিলুম, 'তবে আর কি, আপনি বেত হাতে নিয়ে মাস্টাবাবুকে খুন্তি নিতে বলুন।'

রায়বাহাদুরের কন্যা মুখ ফেরালেন যার যোগফল হলো এই যে, মাস্টারবাবু করলেন মুখ বন্ধ। কিন্তু আসলে ওঁরা লোক ভালো, আইসব্যাগটা পাঠাতে কার্পণ্য করলেন না।

সন্ধ্যের দিকে জ্বরের ঘোরটা ঈষৎ হালকা হয়ে এলো। চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম ঘরে তিনজন লোক বসেঃ মোহিনী। পূর্ণানন্দ আর আমাদের সবজজবাবু।

এরা কেউ-ই আমাকে দেখতে পারতো না, কিন্তু কী আশ্চর্য মহানুভবতা,

আমি বিপন্ন শুনে সবই এসেছে আমার তত্ত্বাবধানে। এমন কি মোহিনীই আমার মাথার উপরে আইসব্যাগটা ধরে আছে।

মোহিনীর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় এই ভাবে: কোর্ট থেকে ও বাড়ী ফিরছিলো, রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা। ঠাট্টা করে বললুম, 'এত দেরি। পকেট বোঝাই না হওয়া পর্যন্ত বুঝি ফিরতে মন চায় না।' ভেবেছিলুম বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস শুনবো। কিন্তু মোহিনী পকেট থেকে এক খাবলায় কতকগুলি কাঁচা টাকা বের করে বললে, 'না, বেশী নয়। বাইশ কিংবা বত্রিশ হবে, ঠিক গুনে দেখিনি। তবু তো দুটো কেস আজ হলো না।'

হতভম্ব হয়ে গেলুম। বাইশ না বত্রিশ তা পর্যন্ত গুনে দেখেনি।

'ঠিকই বলছেন, গুনেই দেখা যাক।' বলে রাস্তায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মোহিনী টাকা গুনতে লাগলো। আমিও চোখ রাখলুম; দেখলুম নোটে-টাকায় সুগোল বিয়াল্লিশ টাকা।

বিনীত গলায় বললুম, 'এক দিনের পক্ষে এ আয়টাও কি যথেষ্ট মনে করেন না?'

'করলে চলে কি করে? খরচ কত।' মোহিনী হাসলো, 'আপনাদের কি! আয় বুঝে খরচ করেন, আর আমাদের খরচ বুঝে আয় করতে হয়।'

'এত খরচই বা কিসে? পরিবারের মধ্যে তো দুই—খাই আর শুই।'

'এই প্রথমেই ধরুন না কেন ফার্ণিচার—আপনাদের ওসবের কিছুই বালাই নেই, দু'খানা কাঁঠাল-কাঠের চেয়ার আর আম-কাঠের একখানা তক্তপোশ হ'লেই চলে গেল। এই দেখুন না কেন, মফস্বলে নতুন হুজুগ, সম্প্রতি একটা রেডিয়ো কিনতে হয়েছে। গিন্নির প্যান-প্যানানির চেয়ে রেডিয়ো অনেক ভালো মশাই—তার বাকি দামটা আজ শোধ করে দিতে হবে। আয় না করলে চলবে কেন? চলুন না, আজকের লক্ষ্ণৌর প্রোগ্রামটা একটু শুনে আসবেন।'

ইচ্ছে করেই গেলুম এবং যেটাকে যখন যা বললো, লক্ষ্ণৌ না দিল্লি, চীন না জাপান, সব অম্লান বদনে শুনে এলুম।

কতদিন পরে গিয়েছিলুম আবার, দেখলুম রেডিয়োটি অন্তর্হিত হয়েছে।

'একি, রেডিয়ো কোথায়?'

'ও। ছোট ভাই রমণী সেটাকে রাজসাহিতে নিয়ে গেছে।' মোহিনী যেন চমকে উঠলো, 'বিয়ে-থা করলো না, এখন বলে—রেডিয়ো না হলে দিন কাটানো ভার হয়ে উঠেছে। মা-মরা ভাই, তাই দিয়ে দিয়েছি ওকে।'

'ভালোই করেছেন।'

'হ্যাঁ, থাকলেই কাজ-কর্মের ব্যাঘাত। সন্ধ্যেবেলা মক্কেলের কাজ করবো, না, রেডিয়ো শুনবো ?'

এর পরদিনই মোহিনীকে আমি চায়ে নিমন্ত্রণ করলুম। সঙ্গে আরো ক'জন গদিওয়ালা ভদ্রলোক, যাদের দেখলে অন্তত একবার ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর দোকান থেকে বেছে বেছে পছন্দসই একটা রেডিয়ো নিলুম ভাড়া করে।

বাজনা শুনে সবাই উচ্চকিত হয়ে উঠলো। মোহিনী বললে, 'এ—কি, রেডিয়ো কিনেছেন নাকি ?'

প্লাগ ঘোরাতে ঘোরাতে উদাসীনের মতো বললুম' 'ঠিক কিনিনি। রাজসাহিতে আপনার ছোট ভাই রমনীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।'

'রাজসাহি থেকে!' মোহিনী নয়, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা অবর্ণনীয় বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো। 'হ্যাঁ, মোহিনীবাবুই বলুন, এটাই সেইটে কিনা। ওর সন্দেহ থাকে, আমি স্বয়ং ডিলারকে নিয়ে এসেছি, সেই বলতে পারবে মোহিনীবাবু কিনবেন এই আশ্বাস দিয়েছিলেন বলে মেসিংটা সে কয়েকদিনের জন্যে তাঁকে ট্রায়েলে দিয়েছিল। নিখরচায় ধর্মশালায় তিনদিন থাকা যায়, তেমনি নিখরচায় তিনদিন এটা তিনি রেখেছিলেন ট্রায়ালে। তারপর সেটা হঠাৎ রাজসাহি উড়ে গেল।'

আজ জ্বরো চোখ তুলে দেখলুম জ্বলন্ত প্রতিহিংসায় মোহিনী যেন আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার যে অসুখ তারি প্রচ্ছন্ন আনন্দটা যেন ওর মুখে পরিস্ফুট।

পূর্ণানন্দ ছিল এ-শহরের একটা মূর্তিমান আবর্জনা। ছেলেবেলা থেকেই একটা কু-অভ্যাস অর্জন করেছিলো যেখানে-সেখানে উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বক্তৃতা করা। সভা-সমিতিতে যোগদান করা নিষেধ, সবেধন নীলমণি ছিলো টি-পার্টি ; তাতেই না-হক লাফিয়ে উঠে লম্বা বক্তৃতা ঝেড়ে বসতো, যেটা চায়ের সঙ্গে চালতের চিলতের মতো অপ্রাসঙ্গিক। তাও থেমে পড়া, বেঁচে যাওয়া, আছাড় খাওয়া, কটমটে ইংরিজি। তিন তিনবার সহ্য করেছিলুম, চোখ বুজে, দম বন্ধ করে, মনে-মনে উদ্যত ঘুষি বাগিয়ে। কিন্তু চারবারের বার ভেটারিনারি সার্জনের বদলি উপলক্ষে শোক করতে উঠে যখন সে গরুর উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে সুরু করলো তখন আর আমার সহ্য হলো না ; ও থামলে পরে আমি অম্লান কণ্ঠে বলে উঠলুম, গরুর উপকারিতা তখনই সবচেয়ে বেশী যখন সে মনুষ্য আকারে দেখা দেয়।

দেখলুম পূর্ণানন্দ একটা হাত-পাখা নিয়ে বসে ধীরে ধীরে আমাকে হাওয়া

করছে। কিন্তু মনের গভীর অন্তস্থল থেকে আশা করছে আমি যেন আর ভালো হয়ে না উঠি।

আর সবজজবাবু। কে জানে ইহজীবনে ইলিশমাছ আর খেতে পাবো কিনা।

ব্যাপারটা শুনুন :

একদিন হেরম্ববাবুর চাকর কলাপাতায় করে কয়েক টুকরো ইলিশমাছ নিয়ে উপস্থিত। বললে, 'বাবু পাঠিয়ে দিলেন।' অন্যকোন মাছ হলেও বা বুঝতে পারতুম, কিন্তু ইলিশমাছের টুকরো, ভদ্রলোকের এ কী বিজাতীয় স্নেহ, চট করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলুম না।

চাকরটা জল করে দিল, বললে, 'বাবু বললেন, মস্ত বড় মাছ, সাড়ে চার আনা দাম পড়েছে, ছোট পরিবার, ওঁতে আপনাতে সমান ভাগ করে নেবেন— ন'পয়সা করে। আপনার ভাগ এই পাঠিয়ে দিলেন।'

আশ্চর্য রকম স্থির থেকে বললুম, 'বাবুকে গিয়ে বলো যে ইলিশমাছ আমরা আস্ত খাই, কেটে খাই না। আর শোনো এই নাও ন'টা পয়সা।'

দেখলুম সবজজবাবু আমার দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছেন—যেন এযাত্রায়ই আমার শেষ যাত্রা হয়। কে জানে, আমিই হয়তো একান্ত সংকুচিত হয়ে গিয়েছি অসুখে, তাই এদের মহানুভবতাটা উপলব্ধি করতে পারছি না। আমাকে এঁরা পছন্দ না করতে পারেন, কিন্তু যেই শুনেছেন, অসুখে আমি শয্যা নিয়েছি অমনি তাঁরা পরোপচিকীর্ষু হয়ে ছুটে এসেছেন। ওরা কী ভদ্র, আমারই মন নিতান্ত ছোট, সঙ্গ-বিতৃষ্ণ। ওরা তখন মাদুলির উপকারিতা থেকে সুরু করে হাঁসের ডিমের দর নিয়ে আলোচনা ফেঁদেছেন, আমি মনের গভীরতর অন্তস্থল থেকে গোঙাচ্ছি। নিচে হঠাৎ কার গলা শুনলুম। পূর্ণানন্দ ডুকরে উঠলো : 'জি-পি।'

কিন্তু যিনি এলেন তিনি গভর্ণমেণ্টের উকিল নন, আমারই প্রতিবেশী ললিত বিশ্বাস। রবারের জুতো পায়ে দিয়ে কোর্টে যান ও মোক্তারী করেন। অসুখ না হলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। ললিত বিশ্বাস আমার বাড়ী এসেছে। কী রকম প্রতিবেশী নিয়ে বাস করি শুনুন। মফঃস্বলের যা সহজাত উপসর্গ, আমার একটা গ্রামোফোন ছিল এবং মফঃস্বলে থেকেও সেটাকে বেজায় প্রিভিয়ান মনে করতুম বলে একটু বেশী রাতে—দশটাই সেখানে বেশী রাত—লুকিয়ে লুকিয়ে বাজাতুম। দেখলুম মোক্তারবাবুর তাতে ঘোরতর আপত্তি এবং একদিন সে-আপত্তিটা রাস্তার উপরেই বক্তৃতাকারে স্ফীত ও স্ফারিত হয়ে

উঠলো। কর্ণপাত করে বুঝলুম আপত্তিটা তাঁর এই কারণে যে, গানটা ফিল্মে থেকে তোলা এবং গায়িকাটি স্বৈরিনী। আপত্তিটা যদি শুধু সাহিত্যিক হতো আমি অম্লান কণ্ঠে সায় দিতুম, কিন্তু সাংস্কারিক বলেই যত গোল বাধলো। ফলে আমি আপত্তি জানালাম, সেই একই ডিস্‌ক্ রাত বারোটা পর্যন্ত চালিয়ে। যখন বন্ধ করলুম, শুনলুম আমার রান্নাঘরের টিনের চালের উপর থান-থান ইঁট পড়ছে। ব্যাপারটা প্রায় আদালত পর্যন্ত গড়াতো যদি না এর মধ্যে একটু ট্রাজেডির সঞ্চার হতো। অমলার মুখে শুনলুম মোক্তারের আপত্তি গ্রামোফোন বাজানোতে তত নয়, যত ওর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কুসুমলতার গ্রামোফোন শোনাবার বিনিদ্র আকুলতাতে। মুখর ডিস্‌ক্ ঘুরে উঠলেই কুসুমলতা বিছানা ছেড়ে জানলায় উঠে আসত আর যতক্ষণ না আমি স্তব্ধ হতুম ততক্ষণ শত ধস্তাধস্তি করেও তাকে সরিয়ে নেয়া যেত না। এই খবরটুকু সংগ্রহ করে এনেই অমলা সব মাটি করে দিল। কেননা তারপর থেকে অমলাই নিত্য জাগতে আরম্ভ করলো। গোপনে দেখবার জন্যে, কুসুমলতাকে জাগিয়ে রাখবার মতলবে কতক্ষণ, কটা পর্যন্ত বাজিয়ে যেতে পারি একটানা। অতএব বন্ধ করে দিলুম গ্রামোফোন। কুসুমলতাও ঘুমুক, আমিও ঘুমুই। ছোট ঘর, আমার খাটে ওষুধের টিপাইয়ে আর বিচ্ছিন্ন তিনখানি চেয়ারেই প্রায় মুমূর্ষু। ললিত আর স্থান না পেয়ে আমারই বিছানার পাদদেশে বসবার উদ্যোগ করছে দেখে আমি নিরুদ্দেশ চাকরের অভিমুখে প্রবল চিৎকার করে উঠলুম, 'এই গদাধর, শিগগির একটা চেয়ার নিয়ে আয়।'

'না, চেয়ার কী হবে, আমি এইখেনেই বসছি।' বলে ললিত মোক্তার বিছানাতেই বসলো ও পূর্ণানন্দের হাত থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলো।

কলেবর খানিকটা স্নিগ্ধ করে নিয়ে বললে, 'নার্সিং করবার জন্যে লোক দরকার হয় আমি এনে দিতে পারবো। সাত থেকে সতেরো—যতজন চাই। চোখে দেখেই আমি বলে দিচ্ছি টাইফয়েড, আর টাইফয়েডে মশাই সেফ নার্সিং। আমাদের দেশে এসে নার্সিং-এর অভাবে কিছু একটা হয়ে গেলে শেষে যে উনি অভিযোগ করবেন সেটি হতে দিচ্ছি না। লোক আমি যুবসঙ্ঘ থেকে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অকাট্য মোক্তারি সওয়াল। নিতান্তই পরহিতব্রতী, তাই পা গুটিয়ে তাকে বসতে দিতে হলো। পাশের ঘর থেকে গদাধর অবশিষ্ট চেয়ারখানা তুলে নিয়ে এলো। রাখবারই জায়গা করা কঠিন। পারস্পরিক সঙ্গতিতে সরে-সরে গিয়ে

ভদ্রলোকেরা জায়গা করে দিচ্ছিলো চেয়ারের। কিন্তু চেয়ার তার সংকোচ লুকোতে গিয়ে ঢলে পড়লো টিপাইয়ের গায়ে। ফলে যা হল তা এই :

ভাঙলো কাচের প্লাস, থার্মোমিটার, ওষুধের শিশি আর মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়লো দামী টাইমপিসটা। আমার মনে হলো কেন আমার এত শক্তি নেই যে সব নিয়ে—টেবিল চেয়ার দেয়াল ছাদ সবজজ মোক্তার—সব নিয়ে ভূমিকম্পে ভেঙে পড়তে পারছি না।

হেরম্ববাবু ঘড়িটা তুলে নিলেন। বললেন, 'শুধু কাচটাই ভেঙেছে, আসলে চলছে ঠিক।'

আমার এতগুলি ক্ষতি হওয়াতে মোহিনীর যে প্রচণ্ড উল্লাস হয়েছিল সেটা সে চমৎকার গোপন করলে। বিজ্ঞের মতো বললে, 'চলা নিয়েই হচ্ছে কথা। অসুখে একেকটা শরীর একেবারে ভেঙেচুরে যায়, শেষ পর্যন্ত চলতে পারলেই সার্থক।'

ললিত বিশ্বাস দাঁত বার করে বললে, 'যা বলেছেন। জীবনটুকু থাকলেই সব।'

পায়ের এতকাছে ওকে বসতে দিতে সাহস হচ্ছিলো না। বললুম, 'চেয়ারে গিয়ে আরাম করে বসুন না।'

'না, এই তো দিব্যি আছি।' ললিত আরাম করেই বসলো, 'আমার মশাই অমন ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় নেই। 'পক্সের' রুগীর বিছানাতে বসে পর্যন্ত আমি রাত কাটিয়েছি।'

কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আমি চোখ বুজলুম। মনে হলো এখুনি আমি মরে যাবো এবং তারি প্রতীক্ষায় এই সব নৃশংস পরোপকারীরা কাঁধ বাড়িয়ে রয়েছে। যাবার আগে অমলাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করলো। গধাধর তখন একটা কাগজ বিছিয়ে কাঁচের টুকরো কুড়োচ্ছে, তাকে বললুম, 'হ্যাঁ রে গদাধর, তোর মা কী করছে রে?'

গদাধর বললে, 'নিচে ভাঁড়ার-ঘরে বসে গল্প করছেন। মোহিনী তার নাকে ও পূর্ণানন্দ তার চোখে কুঞ্চিতে একটু হাসলো। রাগ করার শক্তি ছিলো না, বললুম, 'এটা কি তার গল্প করবার সময় নাকি? আমাকে ওষুধ দেবে না?'

হেরম্ববাবু এবার দাঁতেই হেসে উঠলেন, 'ওষুধ! ওষুধ তো নিঃশেষে নিঃশিশি।'

তা আমিও জানতুম। তবু ভেবেছিলুম, স্ত্রীর সান্নিধ্য সন্ধান করছি, এই হয়তো যথেষ্ট সংকেত ভদ্রলোকদের গাত্রোত্থান করার। কিন্তু যেমন ওরা

গদিয়ান হয়ে বসেছে, মনে হলো ওদের দু'জোড়া তাস এনে দিলেই ভালো হয়।

'এতক্ষণ ধরে কিসের গল্প!' ধমকে উঠলুম, 'এসেছে কে?' ভীতমুখে গদাধর বললে, 'অনেক বাড়িই এসেছেন বাবু।'

'কোন কোন বাড়ি ?'

গদাধর কড় গুণতে বসলো, 'দ্বিতীয় বাবুর বাড়ি, হেড মাস্টারের বাড়ি, বুড়ো জজবাবুর বাড়ি, জঙ্গল সাহেবের বাড়ি, আরো কোন কোন বাড়ি—সব চিনি না।' বুঝলুম, অমলা আমারই মতো নিরুপায়।

কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করলুম। বললুম—একটু ব্যস্ততার সুরে, 'ডাক তোর মাকে, আমি একবার বাইরে যাবো।'

এতক্ষণে ভদ্রলোকেরা উঠলেন।

তখন রাত ন'টা, অমলাকে পেলুম একটু হাতের কাছে।

বললুম, 'সদরটা শিগ্‌গির বন্ধ করে দাও।'

'কেন ?' অমলা পাশে বসে কপালে হাত রাখলো।

'ওরা আসছে।' যেন খুব ভয় পেয়েছি এমনি সুরে বললুম।

'কারা ?'

'আমার শ্মশানযাত্রীরা। ঐ শোনো, ঐ আরেকজন আসছে।' অমলার হাত চেপে ধরলুম, 'আমাকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে চলো। আলো নিবিয়ে দাও, দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দাও, বাড়ির বাইরে টু-লেট দাও ঝুলিয়ে, হাউস-টপ থেকে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলো, কারুর আসবার দরকার নেই। আমি মরে গেছি। চেয়ার সরিয়ে নিচ্ছিস কেন রে, হতভাগা ?' গদাধরের উপর উঠলুম মুখিয়ে, 'শুনতে পাচ্ছিস না, ওরা আসছে, এখনো আসছে। দলে-দলে আসছে!'

অমলা ব্যস্ত হয়ে উঠলো! জ্বরের ঘোরে বুঝি প্রলাপ বকছি।

কিন্তু পরক্ষণেই শোনা গেল, 'গদাধর! গদাধর!'

সত্যি কেউ আসছে জেনে অমলা আশ্বস্ত হল, কেন না আমি তাহলে প্রলাপ বকছি না।

গদাধরের উত্তরের প্রতীক্ষা করার সময় নেই, আমার অসুখটা যখন সাংঘাতিক এবং মানদাবাবুর সামাজিক কর্তব্যবোধটা যখন অত্যুগ্র।

মানদাবাবু সিনিয়র ডেপুটি। দু-চক্ষে লোকটাকে দেখতে পারতুম না, কেননা লোকটার কখনো কথার ঠিক নেই। তার মানে এই নয় যে, তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন না। তার মানে হচ্ছে এই যে, একটা কথা শেষ না করেই

আরেকটা নিঃসম্পর্কিত কথাতে তিনি ছিটকে পড়েন।

'কী অসুখ হে ছোকরা ?' মানদাবাবু একটা চেয়ার টেনে দরজার সামনে বসলেন, সেই সঙ্গে আমার বুকের ভিতরটা কনকনিয়ে উঠলো—বললেন, 'জানো, ফ্রি এয়ার চাই। এ তোমাদের ফ্রি-লভ নয়। খাবে সিগারেট, অসুখ করবে না ? ইয়ং ম্যান, আমি হলে অসুখের সময়ও অমন ফর্সা কাপড় না পরে সটান গিয়ে এক্ষুনি পুকুরে গোটা-কতক ডুব দিতুম। চুল রাখবে বড়-বড়, তাইতেই তো মেনিনজাইটিস হয়। এক্সারসাইজের মতে তো দেখি আজকাল রাইবেশে নাচ—তার চেয়ে দড়ি টেনে কুয়ো থেকে জল তোলাও অনেক ভালো। আর, শুনি পাঞ্জাবির পকেট হয়েছে কি কোঁচা গোঁজবার জন্যে ? আরে ছোঃ, বালিশের ওয়াড়ে আবার ফ্রিল…

এমনি অনর্গল। তন্দ্রার মতো এসেছিলো কখন চলে গেছেন টের পাইনি। তবে যাবার আগে আর একটা আতংক তিনি আমার জন্যে রেখে গেছেন।

'আলো নিবিয়ে দাও অমল, এরপর এস-ডি-ও আসছে সস্ত্রীক।'

'ভালোই তো। বিপদের সময় আসাই তো দরকার।'

অমলা আমার একজেৌসিকতাকে তিরস্কার করে উঠলো: 'তোমার মতো সবাই তো আর অসামাজিক নয়…তাদের ভদ্রতা আছে, কর্তব্য জ্ঞান আছে…'

'কর্তব্য। ভালো থাকতে আমি যদি ওদের থেকে একশো হাত দূরে ছিলুম। ওদের অসুখের সময় থাকতুম দেখো একশো মাইল দূরে। রুগীর ঘরে বসে ভিড় করে আড্ডা জমাতুম না।'

'দেখতেও যেতে না তাকে ?'

'না। সে চিড়িয়াখানার জিনিস নয়।'

'এমন কথা কখনো শুনিনি। আমরা তো জানি অসুখ হলে বন্ধু-বান্ধব সব দেখতে আসে।'

'যেন নতুন বউ বা নতুন খোকা, না ?'

'কিন্তু রুগীরাই তো শুনেছি অসুখের সময় সঙ্গ কামনা করে।' অমলা কাছে এসে বসলো।

'মিথ্যে কথা—অন্তত এ হেন সঙ্গ কখনো নয়। এই ধরনের শুষ্ক ভদ্রতা নিষ্ঠুর অত্যাচার—cruelty to patients। হাঁসপাতালের সামনে মোটরের হর্ণ বাজানো পর্যন্ত বন্ধ, আর এ তোমারই কানের কাছে বসে ঢাক পেটানো চলেছে।' গায়ের স্বর আরো বেড়ে গেল: 'এই সঙ্গ একটা পাপ, একটা বীভৎসতা। সুস্থ থাকতে আমি সম্পূর্ণ সভ্য হতে পারি নি, তাই এরা দল

বেঁধে এসে আমার রোগটাকে উপভোগ করছে।'

'বুঝি না বাপু তোমার কথা।' নিঃস্বের মত অমলা বললে, 'কিন্তু অফিসার ছাড়া অফিসারকে কে রাখবে?'

'এ দুঃসময়ে আর বাঙ্কমচন্দ্র মনে করিয়ে দিয়োনা।' অমলার অন্যদিকে পাশ ফিরলুম, 'আলোটা নেবাও। আমাকে ঘুমুতে দাও।'

অমলা পাখা করছিলো টের পাচ্ছিলুম, তারপর কখন ঘুম এসেছিলো মনে নেই। হঠাৎ দেখি সে আমাকে টানাটানি করছে, যেন খানিকটা ভয় পেয়ে, বলছে, 'ওগো ওঠ, ডাক্তার এসেছে।'

'কে, এস-ডি-ও? সস্ত্রীক?'

'তারা এসে চলে গেছে। তারা নয়, ডাক্তার।'

'চলে গেছে? কেন গেল?'

'দেখলো তুমি ঘুমিয়ে আছ। কিন্তু বিশেষ লাভ হলো না।' অমলা হাসলো, 'আবার কাল আসবে বলে গেছে।'

'আবার সস্ত্রীক?'

'হ্যাঁ, আবার।'

'তবে জাগলে কেন?'

গলা নামিয়ে অমলা বললে। 'ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

'কেন এসেছেন, তাঁকে তো এখন আসতে বলিনি।'

'আসতে না বললেও আমাদের আসতে হয়।' চোখ তুলে দেখি ব্যানার্জি। ব্যাগ ও টুপি একটা চেয়ারের উপর রেখে আরেকটা চেয়ারে সে বসলো। বললে, 'চিকিৎসাটা দায়িত্বের কাজ ব্যবসাদারি নয়। আপনার ভালোমন্দ দেখাটা এখন আমার ডাক্তারি দায়িত্বের মধ্যে।'

'কিন্তু আমি এখন দিব্যি ভালো আছি।'

'তা আছেন, কিন্তু ওঁকে তো বিশেষ ভালো দেখছি না।' বলে ব্যানার্জি আমার স্ত্রীর দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করলে। বললে, 'খুব মাথা ধরেছে বুঝি?'

অমলা কুপিত না হয়ে লজ্জিত হলো। বললে, 'ওঁর বুকটা এখন দেখবেন?'

'প্যাচ-ফ্যাচ কিছু নেই—ও আমি দেখেছি।' বলে ডাক্তার তার মোটা আঙুলে আমার পাঁজরায় সজোরে একটা টোকা দিলে। বললে, 'কিন্তু রাত-ফাত জেগে আপনি দেখবেন ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবেন না। ওয়েদার ভালো

নয়, চোরা সর্দি হয়ে যেতে পারে।'

নিজের মনেই বললুম, 'রাত এখন কটা? 'এগারোটা বাজে'। অমলা কথার মাঝে একটু প্রচ্ছন্ন বিস্ময় রাখলো।

—'এগারোটা! Night is not yet forn. 'ব্যানার্জি এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করলে যেন এটা সবে সূর্যাস্ত। বললে, 'এই হচ্ছে সময় ক্লাবের দরজা খোলবার, আমাদের ইণ্ডিয়ান ক্লাব, নামে কিন্তু ইউরোপিয়ান, গাঁজাখোরের নাম শিবচন্দ্র—এ-সময় কেউ দরজা বন্ধ করে। ভাবলুম কোথায় যাই এসময়? মনে পড়লো রুগীকে একবার দেখে আসি।'

অমলা আমার উদ্যত কথাটাকে চাপা দিলে। বললে, 'কিন্তু এমন কাণ্ড, এক দাগ ওষুধ থাকতে শিশিটা ভেঙে গেছে। নতুন আর কোনো ওষুধ দেবেন?'

'না', অন্যমনস্কের মতো বা অনন্যমনস্কের মতো ব্যানার্জী বললে, 'না, আপনি শুধু একটা য়্যাসপিরিন খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

'আর আমাকে বুঝি শুতে হবে না?'

ব্যানার্জি হাসলো, অস্বচ্ছ হাসি। বললে, 'আপনি তো শুয়েই আছেন।'

'তা তো আছি, কিন্তু আমাকেও ঘুমুতে হবে তো?'

'হ্যাঁ, ওঁর ভালো ঘুম নেই।' অমলা বললে।

'আপনি তার জন্যে নার্ভাস হবেন না। ব্যানার্জি ব্যাগ খুলে ইনজেকসনের সরঞ্জাম বের করতে লাগলো: 'কতকগুলি কারণে নার্ভ খুব বিচলিত হয়—worry, fear, rush, confusion, hate—আর সবচেয়ে বেশি হয় Jealousy-তে। নার্ভ বেশ cool রাখবেন।

'কিন্তু আমি সম্প্রতি রাখতে পারছি না। মানে, গলায় একটা দলা গিললুম। 'মানে আপনার ঐ ইনজেকশানের সূঁচ দেখে।'

এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ব্যানার্জি বললে, 'হ্যাঁ। একটা আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেব।'

হঠাৎ অমলাকে জিগগেস করলুম: 'তুমি খেয়েছ?'

'না'।

'খেয়ে নাও গে। তুমি খেয়ে এলে পর ইনজেকসান হবে।' ঠাট্টার সুরে বললুম, 'বেশ পেট ভরেই খেয়ো কিন্তু।'

'আমার দু'মিনিটও লাগবে না। 'য়্যালকোহল দিয়ে সিরিঞ্জটা ডাক্তার পরিষ্কার করতে লাগলো।

'আর খেয়ে নিতে অমলার দু'মিনিটেরো কম লাগে। ততক্ষণে রাতের আঁতুড়ও উঠবে না। যাও', অমলাকে একটু ঠেলে দিলুম : 'ইনজেকসনের পর ঘুম যদি আর না ভাঙে।'

'না, দরকার নেই ইনজেকসানে। অমলা সমস্ত শরীরে হঠাৎ কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

'তার অর্থ ?' ডাক্তার হাসতে হাসতে জিগগেস করলে, কিন্তু হাসিটা তার ইনজেকসানের সূঁচিমুখের মতো সূক্ষ্ম।

'তার অর্থ আমি সারা রাত হাওয়া করে, বরফ দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে, যেমন করে পারি ওঁর ঘুম পাড়িয়ে দেবো। ইনজেকসান আপনি রেখে দিন।'

'আমাদের চিকিৎসাই যে ইনজেকসান।' ব্যানার্জি হেসে উঠলো : 'আপনি একেবারে ছেলেমানুষ।'

আপনি মানে অমলা।

'আপনারো কি সেই মত ?'

এবার আমি।

আমার মতটা আরো সংক্ষিপ্ত। আমার মত হচ্ছে এই যে, কাল থেকে আমি হোমিয়োপ্যাথি করাবো। গুড নাইট। Night is jnst on the cradle. পরদিন সকালে হাসপাতালের দ্বিতীয় ডাক্তার পরেশ ঘোষকে ডাক দিলুম।

ভদ্রলোক কিছুতেই বুঝতে চায় না, বলে, 'সেকি কথা, ব্যানার্জির রুগী আমি ছোঁব কি করে ?'

'তার মানে আপনি বলতে চান, যাই-হোক হেস্ত-নেস্ত ব্যানার্জির হাতেই হতে হবে ? রুগী রোগ পছন্দ না করতে পারুক, ডাক্তার পছন্দ করতে পারবে না ? টোটকা কি হাতুড়ে, হেকিমি কি উনানি—সব আমার ইচ্ছাধীন। আমি যদি আপনার চিকিৎসায় নিজেকে ছেড়ে দিতে চাই, আপনার কোনো অধিকার নেই আমার ভার না নেবার। বেশ তবে তাই বলুন, আমার চিকিৎসা আপনি নেবেন না, আমি ঠিক কেস করবো জেনে রাখবেন।'

পরেশ আমতা-আমতা করে বললে, 'তবে জানেন কি, সিনিয়র থাকতে তাঁর রুগী আমরা ধরি না। অন্তত সেটা এটিকেট নয়।'

'কিসের ছাই আপনার সিনিয়র! ওঁকে আমি ত্যাগ করেছি এবং একমাত্র এটিকেটের ভয়ে আর কিছু করতে পারিনি। আজ থেকে আমি আপনার হাতে নিজেকে সমর্পণ করলুম।' দিলুম হাত বাড়িয়ে : 'এখন দেখুন, অসুখটা আমার কী, টাইফয়েড, না মেনিনজাইটিস, না হোকাস-পোকাস বা ঐ জাতীয়

একটা কিছু নাম ?'

অনেক টেপাটোপি ঠোকাঠুকির পর পরেশ ডাক্তারি ঔদাসীন্যে বললে, 'ও কিছু নয়, দু'দিন বিশ্রাম করলেই সেরে যাবে।' পরে হেসে বললে, 'কিন্তু আমার সারাই মুশ্কিল।'

'তার মানে ?'

'তার মানে ব্যানার্জি যদি দেখে ফ্যালে আমি আপনার চিকিৎসা করছি তবে ভীষণ চটে যাবে। আর জানেন তো, আহত বাঘ বরং ক্ষমা করে কিন্তু ব্যক্তিগত-কারণে চটা সুপিরিয়র অফিসর কখনো ক্ষমা করে না।'

'ও-জানবে কি করে যে আপনি চিকিৎসা করছেন ? ওকে আর ঢুকতে দেবে কে এ বাড়িতে ?'

'হ্যাঁ, না জানতে পারলেই হলো।' পরেশ টুপি তুলে নিলো : পাউডারটা এক্ষুণি খেয়ে ফেলুন। আর কিছু নয়, খানিকটা বিশ্রাম আর নিরিবিলি।'

একটা শুধু দীর্ঘশ্বাস মোচন করলুম।

বার্লির বাটি হাতে নিয়ে অমলা সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে মিছরির প্রলোভন দেখাচ্ছে আর আমি আখুখুটে ছেলের মতো অনুনাসিক প্রতিবাদ করছি এমন সময় যুগল পদশব্দ শুনলুম। পা তো দুটোই থাকে, কিন্তু যুগল পদশব্দ মানে চতুষ্পদ-শব্দ।

বাটিটা তাড়াতাড়ি মেঝের উপর নামিয়ে রেখে অমলা বললে, 'এস-ডি-ওর বউ।'

প্রথমত গণ্যমান্য লোকের সামনে বার্লি খাবো সেটা লজ্জার কথা, দ্বিতীয়ত উল্লিখিত ভদ্রমহিলা আমার সামনে বেরোন বলে ছন্দ রেখে অমলাকেও এস-ডি-ওর সামনে প্রকাশিত হতে হয়, কিন্তু সম্প্রতি তার বেশবাস কিঞ্চিৎ অসম্ভ্রান্ত।

এস-ডি-ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় চাকর নিয়ে। চাকরটা কিছুকাল ধরে আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিলো কেননা আমরাই স্কেল অনুসারে তার মাইনেটা ক্রমান্বিত বাড়াচ্ছিলুম না। অতএব মহাপাত্র যখন এখানে নতুন এলো, কি করে তার সন্ধান পেয়ে চাকর গিয়ে সেখানে চাকরির আবেদন করলে এবং বললে, আমার ওখানে যে ছিলো আর আমার সাবেক চাকর বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে বলে অনাবশ্যকবোধে তাকে আমি পরিত্যাগ করেছি। মহাপাত্র আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলে না। চাকরটাকে বহাল করলে এবং আমার চেয়ে সে অধিকতর মর্যাদাবান প্রতিপন্ন করবার জন্যে আমি যা মাইনে দিতুম তার চেয়ে আটগণ্ডা পয়সা মাইনে সে বাড়িয়ে দিলে। অবশ্য এর কারণ আমার

প্রতি কোনো বিদ্বেষ আমি বলছি না, কেননা পরস্পর আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত ; এর কারণ চাকরটাই আপাত আকর্ষণীয় ; বংশে নেপালি, বয়সে ছোকরা, দেখতে শুনতে ভারি চটপটে আর ফূর্তিবাজ। চাকরের এ অকৃতজ্ঞতা আমাকে বিশেষ বাজেনি। কারণ এর চেয়ে ঢের বড়ো অকৃতজ্ঞতা আমি দেখেছি, কিন্তু একপুরুষনিষ্ঠা অমলার কাছে এ-অকৃতজ্ঞতার যেন তুলনা ছিল না। সে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলো এবং তারই পরামর্শে মহাপাত্রকে আমি ব্যাপারটা বিশদ করে চিঠি লিখলুম। লিখলুম যে এ অবস্থায় চাকরকে রাখা তার শিষ্টাচার নয়। সাধারণ ভদ্রতার নিয়মে মহাপাত্র সেটা বুঝতো না তা নয়, কিন্তু আমার মতো আরো পরামর্শদাত্রী আছে। তারই প্ররোচনায় সে লিখলে : প্রত্যেক মানুষেরই নিজের অবস্থার উন্নতি করার সহজাত অধিকার আছে। চাকর বলেই সেটাকে অগ্রাহ্য করতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই।

স্ত্রীর প্ররোচনায় বলছি কেননা স্ত্রীটি আই-সি-এস্-এ জন্যে তৈরী হতে-হতে দৈব-ক্রমে ডিপুটির হাতে এসে পড়েছে এবং হয়ে উঠেছে স্কন্ধবাহিনী। মহকুমা সে-ই শাসন করছে শোনা যাচ্ছে। মহাপাত্র নাকি না জানতো হাসতে, না জানতো বসতে, মহাপাত্রীই তাকে সব লিখিয়ে-লিখিয়ে শিখিয়েছে। অফিস অতিরিক্ত কোনো ব্যাপারে যেখানেই মহাপাত্রের যাবার দরকার সেখানেই দীর্ঘ ঈ-কারটি তার শিরোভূষণ হয়ে বিরাজমান থাকবে। কোথায় কোন পার্টিতে স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ না করার অজুহাতেই নাকি মহাপাত্র যায়নি। আমার এখানে যে ওরা এল, শুধু ওরা দু'জনে বলেই এল।

চাকরের ব্যাপারটা সেখানেই ছেড়ে দিতে পারতুম, কিন্তু লোক যে আমি সুবিধের নই, এ না-জেনেও সবাই বলে থাকে। তাই একদিন চাকরের সন্ধান নিলুম বাজারে এবং তার অভাবে কতদূর আমরা ম্রিয়মাণ আছি তার এক পর্ব গৌরচন্দ্রিকা করে তার হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললুম, 'তোর মা তোকে ডেকেছে। বলেছে পুরো এক টাকাই তোর বাড়িয়ে দেবে মাইনে।'

চাকরটা প্রত্যাবর্তন করলে এবং সেদিন সন্ধ্যায়ই মহাপাত্রকে লিখে পাঠালুম : 'এত দ্রুত উন্নতি কোনো চাকরেরই হয় না।'

তারপর চাকরটার বিরুদ্ধে মহাপাত্রের চাপরাশি একটা মামলা পর্যন্ত বাধিয়েছিলো। তার ফলে শেষপর্যন্ত সে শহর ছেড়ে পালিয়েছিলো বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিই জিতেছিলুম।

এরপরে মানুষের মুখ দেখাদেখি চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি যখন রুগ্ন, বিপন্ন, নিপতিত তখন মহাপাত্র কি করে বসে থাকবে

পারে ? এমন সুযোগ আর সে কবে পাবে তার মহত্ব ও মহানুভবতা প্রমান করে দেখাবার ?

'মফস্বল থেকে ফিরেই কাল শুনলুম আপনার deadly অসুখ। হয়েছে কী ? বিলিয়ারি কলিক ?' মহাপাত্র অমলাকে লক্ষ্য করলো, 'কাল রাত্রে যে এসেছিলুম বলেছিলেন ?'

'একদম সময় নেই, not a tick,' বললেন মহাপাত্রী—'তিনটের সময়ই আবার টুরে বেরোতে হবে। তাই বললুম ভদ্রলোকের এত মারাত্মক অসুখ, চলো দেখে আসি।'

মনে-মনে সংশোধন করলুম : দেখিয়ে আসি।

নচেৎ বেলা ন'টার সময় সংসার ফেলে ভদ্রমহিলা কেউ বেড়াতে আসে না, এবং ঠোঁটে রং ঘষে। 'ডায়গনোইজ করতে পারছে না এমন অসুখ।' এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়ালে মহাপাত্র ফটোগুলি দেখতে লাগলো : ছুটি নিন মশাই, কোলকাতায় চলে যান। এখানে ফোড়া কাটালে য়্যাম্পুটেট করাতে হয়। দেখছে কে ?

'হোমিয়োপ্যাথি করাচ্ছি।'

'ভালো, রোগ নির্ণয়ের দরকার হয় না। মাঝখান থেকে লাইফ-ইনসিওরের পলিসিগুলি খোয়াবেন।'

'ওকি ? খাচ্ছিলেন বুঝি ?' বাটিটা খাটের তলায় সম্পূর্ণ ঠেলে দিতে পারিনি, তারই দিকে এস-ডি-ও গৃহিনীর নজর পড়লো। অমলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বিছানায় শোয়া রুগীকে বাটি করে খেতে দেন ? কেন, ফিডিং কাপ নেই ?'

'এখনো উঠে বসে খেতে পারি।'

'খবরদার ওটি করবেন না মশাই।' মহাপাত্র ডান হাতের আঙুলে শূন্যময় ভঙ্গি করলে : 'ফট করে হার্টটি ফেল করে যাবে দেখবেন।'

'কী খাওয়াচ্ছিলেন ?' এস্-ডি-ও গৃহিনী অমলাকে পুনরায় উদ্দেশ করলো : 'good god, বার্লি। কেন, হরলিকস নেই ? গ্লুকোজ ? ভাইটামিন ডি ? আমার বাড়িতে তো এক কোটো পচছে। দিতে পারি পাঠিয়ে।'

ওরা চলে গেলে অমলা ফের বার্লি করে আনলো। আর অনুনাসিক প্রতিবাদ করলুম না।

তবু স্বস্তি নেই। লোকের পর লোক আসছে ; ইনকামট্যাক্স অফিসার, ডিস্ট্রিক ইনজিনিয়র, হেল্‌থ অফিসার, প্রোবেশ-ডিপুটি কালেক্টর—যাদের সঙ্গে

ঝগড়া করেছিলুম, সবাই—যাদের সঙ্গে ভাব করিনি—তারাও। আমি নীচ হতে পারি, কিন্তু তারা তো তা নয়, তারা তো আমাকে আজ অসুস্থ—অক্ষম দেখে ত্যাগ করতে পারলো না! অমলা গা-টা স্পঞ্জ করে দিচ্ছে—দুপুরবেলা —বাইরে থেকে কে চেঁচিয়ে উঠলো : 'কেমন আছে রে বাবু?'

রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলুম, 'রায়বাহাদুর।'

বিরক্তির শেষ সীমায় পেঁছে অমলা বললে, 'হা ঈশ্বর!' শুনতে পাচ্ছি গদাধর বলছে 'ভিতরে আসুন।'

'না, ভিতরে যাবো না, শুনলুম একটু ভালো আছে তাই শান্তি। রুগীর ঘরে গিয়ে তাকে ব্যস্ত-বিব্রত করা আমি মোটেই পছন্দ করি না।'

'এ বলে কী অমলা?' আমি আনন্দে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলুম 'ডাকো, ডাকো ওঁকে শিগগির। উনিই একমাত্র লোক যাকে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। কেননা উনিই একমাত্র লোক যিনি বুঝেছেন রুগীর দুঃখ।' বলে নিজেই গলা ছাড়লুম, 'গদাধর, গদাধর।'

বাইরে থেকে রায়বাহাদুর বলছে : 'যা শিগগির, বাবু ডাকছেন। অত চেঁচিয়ে ডাকতে হয় কেন? সব সময়ে কাছে কাছে থাকবি। আমি এখন চলি। কাল আবার এক সময় এমনি খবর নিয়ে যাবো'খন।'

গদাধর এলে প্রশ্ন করলুম, 'বাবু চলে গেল?'

'গেল, বাবু'

'ভিতরে নিয়ে আসতে পারলিনে হতভাগা!'

'আর কত আনবো বাবু? এই তো দেখছি একমাত্র ভদ্রলোক যিনি আসতে চাইলো না।'

ভাবলুম দুপুরটা বুঝি কাটবে নিরিবিলিতে, অমলার পাশটিতে। কিন্তু আসকেই শুধু দেখেছি, ফোঁড় গুনিনি! দুপুরটা দিদিদের এলেকায়, যদিও তার চৌহদ্দিটা আমার চৌকাঠ পর্যন্ত এসেই থেমে গেছে। তারা এসেছে ম্লান-মনা অমলাকে সঙ্গ দিতে, সাহায্য করতে একটু বা ব্যাপৃত রাখতে। যাতে না খুব মুষড়ে পড়ে, যাতে না সিন্দুরের বিন্দুটা অস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, না মাছের বাজারটা সংক্ষিপ্ত হয়। তাই কাউকে দাও জল ঢেলে, কাউকে দাও পান সেজে, কাউকে দাও সেলাইয়ের ঘর তুলে। শেষ কালে কে এমনও বললে, 'কমলা ঝরিয়ার সেই গানটা শুনবো।'

অমলা বললে শুনলুম : 'তোমার কাকাবাবু রাগ করবেন।' কাকাবাবুর বউদিদি এতে ভীষণ অবাক হয়ে বললেন, 'রাগ করবে কি গো। রুগী মানুষের

জন্যেই তো গ্রামাফোন। আমাদের কর্তার তো অন্তত তাই।'

ছোট মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'গান দেবো, কাকাবাবু?'

বললুম, 'দেবে বৈকি।'

আর বিরক্তিতে নয়, পরম ভক্তিতে ডাকলুমঃ 'হে ঈশ্বর!' ফিকে-হয়ে আসা বিকেলের আলোয় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম কে এমন আছে যে এখনো আসেনি। কে এমন আছে যার আসার প্রত্যাশায় আমি এখনো রোমাঞ্চিত কণ্টকিত হতে পারি।

বাঁচবে বহুদিন। ধ্যান করতে করতে এসেই উদয় হয়েছেন আমাদের মুন্সেফবাবু—সদানন্দ দাদা! ভুতো-ভুতো মানুষটি, ছোটোখাটো দেখতে, কিন্তু কুটিলতায় ভরা। কোঁচাটা মুঠোয় ধরে হাঁটেন না, গোছা করে বাঁ হাতের উপর আলগোছে ফেলে দিয়ে হাঁটু দেখিয়ে হাঁটেন। আমাদের যেটা ফতুয়া সেইটে ওঁর সার্ট আর আমাদের যেটা সার্ট সেটা ওঁর ক্লক-কোট। সব সময়ে লোকের দোষ খুঁটে বেড়ান; একমাত্র তাকেই মার্জনা করেন যে নিতান্ত সাময়িক-ভাবে কাছে বসে তাঁর কথা শুনছে। আর স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে দৃষ্টি তাঁর বড়ো উগ্র, যদিও তাঁর মতের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন সঙ্গতি পেলুম না। এক কথায়, যেটা তিনি যখন-তখন করছেন সেটাই তখন-তখন করণীয়। তাঁকে মোটামুটি বুঝতে এই বললেই হবে; আর খুঁটিনাটি যদি বুঝতে চান, আমার অসুখটা যদি সারে, একদিন আপনাদেরকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যাবো। আজ দেখি কোঁচার খুঁটটা মুঠোয় নয়, নাকের উপরে রাশীভূত হয়ে আছে! বুঝলুম, দাদা কোনো একটা গন্ধ টের পাচ্ছেন যা তাঁর মতে অস্বাস্থ্যকর, কিম্বা হয়তো সিদ্ধান্ত করেছেন আমার যা অসুখ তা নাকের মধ্যে দিয়েই প্রবেশ লাভ করে। অতএব দ্বাররক্ষা করতে হচ্ছে। যার জন্যে জনপ্রিয় হতে পারলুম না, সেই নির্লজ্জ অপরাঙ্মুখতায় জিগ্গেস করলুম; 'ব্যাপার কী? দম আটকে যাবে যে।'

'কিসের গন্ধ বলুন তো আপনাদের বাড়ীতে?'

গন্ধ! ভাবলুম অমলাকে ডেকে এনে দেখাই এ নির্গন্ধ বলে কী। অমলার এত নিখুঁত পরিচ্ছন্নতার এমন নির্মম বদনাম।

বললাম, 'ব্লিচিং-পাউডারের হয়তো। নিচে নর্দমার মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে হয়তো।

দাদা দার্শনিকের মতো সানুকম্প হাসলেন। বললেন, 'ব্লিচিং-পাউডার!

ও আমি দু'বেলা প্রায় গায়ে মাখি বলতে পারেন। এই তো বেতের চেয়ারটা গরম জলের সঙ্গে ব্লিচিং-পাউডার দিয়ে আচ্ছা করে ধুয়ে এলাম।

'কি জানি ফিনাইলেরো হতে পারে।'

'বললেই হলো? আমি চিনি না ফিনাইল? রোজ নথি-পত্র ঘেঁটে বাড়ি গিয়ে আমি ফিনাইলে হাত ধুই। একি আপনি হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন নাকি?'

'তবে মরা ইঁদুর-টিদুর—'

'কী সর্বনাশ!' দাদা দেহটাকে উৎক্ষিপ্ত না করেই উঠলেন। কিন্তু নিজেই পরক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে বললেনঃ 'না তেমন যেন নয়। এ গন্ধটাকে ঠিক পচা বলা যায় না, কেমন যেন ঝাঁঝালো।'

ও! মরা ইঁদুরের গন্ধও আপনার নাকস্থ।' আবার জনপ্রিয়তা আহত করলুমঃ 'কিন্তু এ হয়তো গান্ধিপোকার গন্ধ। ঘসা লেগে কোথাও মারা পড়েছে।' পোকার মধ্যেও মহাত্মা আছে দাদার জানা ছিল না। তিনি ভাবলেন তাঁর বেশ-বাসের সংক্ষিপ্ততাকে ব্যঙ্গ করছি। কিন্তু পরক্ষণেই পরম উল্লসিত হয়ে উঠলুম, বিদ্যুৎঝলকের মতো অমলা যখন একবার বারান্দা দিয়ে চলে গেল। বললুম, 'নাসিকা স্বচ্ছন্দে বিস্ফারিত করুন দাদা, গন্ধটা ইভনিং-অফ-প্যারিসের। ম্রিয়মাণ আছে বলে বউকে আজ সাজিয়েছিলুম জোর করে, আর স্নেহের আতিশয্যে সেন্টের অর্ধেক শিশিটাই ওর ওপরে অপচয় করে ফেলেছি। এই গন্ধটা তাই রোগের গন্ধ নয়, ভালোবাসার গন্ধ।'

দাদা বাতাসে নাক ফুলিয়ে হাসলেন। তারপর তিনি খাগড়াই বাসন, ঢ্যাঁড়সের বিচি ছেড়ে চিনে-বাদামের উপকারিতা নিয়ে বক্তৃতা ফাঁদছেন, শোনা গেল ডাক্তার এসেছে। বড্ড আগে এসেছে। প্রথমটায় বিরক্ত হয়েছিলুম, কিন্তু প্রথমটাতেই আশ্বস্ত হলুম দাদা দ্রুত তিরোহিত হলেন বলে। মদ থেকে যেমন আরেকটা জিনিষ সূচনা করে, তেমনি ডাক্তার থেকেই নাকি ডায়বেটিস সংক্রামিত হয়। অতএব দুর্জন সঙ্গ পরিহার করাই সমীচীন।

পরে আরো পরিতৃপ্ত হলুম যখন শুনলুম ভিতরে ডাক্তার আছে জেনে অনেকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে গেছে। গদাধরকে তাই বলে দিলুম কেউ এলে যেন বলে দেয় যে, বাবুর অসুখ বেড়েছে, ডাক্তার তাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত, এমন অসময়ে যেন কেউ ঘরে না ঢোকে। আর পরেশবাবুকে বললুম, 'যদি আপনার আর কোনো রুগী বা রোগ না থাকে, দয়া করে আপনি এখানে একটু বসুন। আপনার ওষুধের কী গুণ তা জানিনা, কিন্তু আপনার উপস্থিতির ফল হাতে হাতেই পাচ্ছি।' পরেশ বললে, 'হ্যাঁ, ক্ষাণিকক্ষণ বসেই যাবো।

যদি কেউ আসেন স্পষ্ট বলে দেবো তাঁকে, যেন কিছুদিন না আসেন। কেননা এ রোগের ওষুধই হচ্ছে বিশ্রাম, কথা-না-বলা, আলো-নিবিয়ে থাকা। ভিড়-ভিড় সবতাতেই আমাদের ভিড়!

কিন্তু কে জানতো রাত্রির জন্মাবার আগে, মাত্র সাড়ে-আটটার সময় পৃথিবীর সকল লোকের মধ্য থেকে ব্যানার্জি এসে আবির্ভূত হবেন। গদাধর আমাদের ঠিক গদা ধরে আছে। জিজ্ঞাসিত হবার অপেক্ষা না করেই সে বললে, 'ভেতরে যাবেন না, বাবুর অসুখ আজ বেড়েছে, ডাক্তার তাকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত।'

এমন কথায় মড়া পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠে, তায় কিনা জলজ্যান্ত ডাক্তার। এক লাফে ব্যানার্জি গদা প্রত্যাহার করে বললেন, 'বাবুর অসুখ বেড়েছে, আর আমি যাবো না ভেতরে! তার মানে? বলেই সে ভিতরের বারান্দায় চলে এল: 'কই হলো কী?' 'ব্যানার্জি!' ভূমিকম্প হলে চারতলার লোক যেমন করে ওঠে তেমনি দিশেহারার মতো পরেশ এ-দরজা থেকে ও-দরজায় ছুটোছুটি করতে লাগলো। তীব্র আলোতে অন্ধ পোকা যেমন দেয়াল থেকে দেয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে তেমনি।

'পাশের ঘরটা খুলে দাও, আমলা। ও ওস্ক চাকরি নিয়ে আত্মরক্ষা করুক।' নিম্নকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলুম: 'আর দাগ-কাটা ওষুধের শিশি, মেজারগ্লাস, পিল-পাউডার সব সরিয়ে নিয়ে যাও। আর হোমিয়োপ্যাথি, আমাদের সেই হোমিয়োপ্যাথির বাক্সটা গেল কোথায়?'

স্বর্ণ-ঝলকিত দ্রুত হাতে পাশের ঘরের দরজটা অমলা খুলে দিল, আর পালাবার প্রাবল্যে পরেশের পদাঘাতে টিপাইটা আবার ছিটকে পড়লো।

ব্যানার্জি ঢুকে পড়ে জিগগেস করলে: 'হোলো কী হঠাৎ?' চিৎ হয়ে চোখ বুজে নাতি দীর্ঘ একটি তপ্তশ্বাস মোচন করে বললুম, 'ক্যাটারিজম্।

'আমি ভাবলুম বুঝি কার্ডিয়াক সিম্পটম কিছু হয়েছে।' ব্যানার্জি চারদিকে, মানে আমার, এখনো আমার, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু আপনাদের ডাক্তারটি গেল কোথায়?'

ততক্ষনে, মানে, তার আগেই, অমলা টিপায়ের ঢাকনিটা দিয়ে শিশি-গেলাশের ভগ্নাংশগুলিকে লুকিয়ে ফেলেছে। হাসি-মুখে বললে, 'হোমিয়ো-প্যাথি কিনা, তাই স্পোরিটউলের মতো উবে গেছেন। হুঁ। দেখুন, আমি চিকিৎসক হিসেবে আসিনি, as a friend একটু drop করেছিলাম মাত্র।' ব্যানার্জি ধরা-গলায় বললে, "কিন্তু আপনার চাকর বললে, অসুখটা নাকি

serious turn নিয়েছে, তাই শুধু কর্তব্যের ডাকে চলে এসেছি। কাঠগড়ার আসামী যদি ডাক্তার হয়, আর স্বয়ং জজ যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন সেই আসামীরই ডাক পড়ে বিচারকের তত্ত্বাবধান করতে। বিপদ সামনে দেখলে ত্রাণকর্তার তারতম্য নিয়ে বিচার করা হয় না! তাই যখন শুনলুম, অবস্থা সঙিন, তখন দিগ্‌বিদিক না তাকিয়ে ছুটে এসেছি, যদি কিছু কাজে লাগতে পারি। যাক, কেমন আছেন সত্যি ?

সত্য কথাই বললুম, 'ভালো নয়।'

তবু ব্যানার্জি যেন কাজে লাগবার কোনো কারণ দেখতে পেলো না। কি বলবে কিছু না বুঝে কেবল বললে, 'গুড নাইট।'

ও-ঘরের খবর নিতে গিয়ে দেখলুম পরেশ জানলা টপকে খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে বাড়ি পালিয়েছে।

তিনদিনের দিন আমার জ্বরটা কমে গেল, নেমে গেল, ছেড়ে গেল। বুঝলুম, সবাই খুব হতাশ হয়েছে, না মেনিনজাইটিস, না টাইফয়েড, না আর কিছু। সাধারণ সামান্য একটু ইনফ্লুয়েঞ্জা। 'আমাদের বেলায় হলে অত সহজে ছাড়তো নাকি? সবজজ-গৃহিণী আপত্তি করেছিলেন শুনেছিঃ 'আমাদের হলে মাথায় রগ ছিঁড়ে একেবারে চিৎপটাঙ। ওদের বরাত ভালো—অল্পেতেই কেমন সেরে উঠলো—কিছু খরচ হলো না। আমাদের হলে রোজ বেদানাই লাগতো তিন সের।'

সার্কাসে এসে বাঘের খেলা না দেখতে পেলে লোকে যেমন অভিযোগ করে, তেমনি হিতৈষী দাদারা বলাবলি করতে লাগলোঃ 'আরে ছোঃ। এরি জন্যে এত ঢাক-ঢোল। কী একটু সর্দি হয়েছে, না, একেবারে ডবল-নিমোনিয়া! এমন একখানা ভাব করলে যেন ডিয়োডোন্যাল আলসার হয়েছে, শেষকালে দেখা গেল আমেশা! লেকেটা ক্রুশেড।'

সবুজ মাছের ঝোলের সঙ্গে লাল আটার রুটি ছিঁড়ে কয়েক টুকরো মুখে পুরতেই বাস আসতে লাগলো, জিভে স্বাদ নেই স্পৃহা নেই; তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে অমলাকে বললুম 'পান সেজে দাও। পান খেতে ইচ্ছে করছে ভারি।'

অমলা পান সেজে দিল। বললে, 'মিঠে পান।' এই নিয়ে একটু গার্হস্থ্য কবিত্ব করে ডিবে থেকে দুটি পান তুলে নিয়ে মুখে পুরলুম। প্রথম ঢোঁক গিলবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণ আমার যায়। যায় মানে গিয়েছে! প্রচণ্ড বিষম খেয়ে কাশতে-কাশতে মূর্চ্ছিত হয়ে আমি মেঝের উপর ছিটকে পড়লুম।

কানে এলো অমলার চাপা চীৎকার, সীতা-নাটকে হতপতি তুঙ্গভদ্রার মতো। আর দুটো বিছিন্ন শব্দ। গদাধর, ডাক্তার।

এ দুটো শব্দের সংমিশ্রনেই আমি বুঝলুম, আমার হয়ে গেছে। সেটা আরো দৃঢ় হলো যখন রাস্তায় গদাধরের মুখে একটা ধাবমান আর্তনাদ শুনলুম 'বাবুগো—

মুহূর্তে সহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল, খড়ের গাদায়-লাগা আগুনের শিখার মতো যে, হঠাৎ হার্ট-ফেল করে আমি মরে গেছি। কেউ বললে লো ব্লাড্‌প্রেসার ছিলো ; কেউ বললে ধোঁয়া খেত বিস্তর ; কেউ বললে, ধোঁয়া নয় হে, আসল। বুঝলুম, সবাই একটা স্বাভাবিক অনুপাত পেয়েছে, এমন একটা সাড়ম্বর আরম্ভের রাজকীয় পরিণতি হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। দেখলুম পিঁপড়ে জাঙালের মতো পিল-পিল করে লোক আসছে, ইস্কুল থেকে, আপিস থেকে আদালত থেকে। দাদারা, দিদিরা, বউদিদিরা—সব এসে প্রায় হাজির, সবাইর মুখে সেই অদ্ভুত উত্তেজনা, যার বাইরেটা উদ্বেগ ভিতরটা উৎসাহ, বাইরেটা 'কী ভয়ানক, 'ভিতরটা 'যাকগে চুলোয় !' কবে বা কার সঙ্গে দেখা, কে বা কাকে মনে রাখে ! কত ছিলো পোস্ট্যালে, প্রভিডেন্ড ফাণ্ডে, ইনসিওরেন্সে, ক'টি আছে পোষ্য, ঘাড়ে পড়ে আছে নাকি কেউ, স্ত্রীর সত্যি বয়েস কত, এই নিয়ে চুপিচুপি কানাঘুষা ! দুনিয়াটাই এই—সব ট্রেনের প্যাসেঞ্জার—কে কোথায় নামে ওঠে, কে কোথায় ছিটকে খসে পড়ে যায়—সব শেষে এই একটু কোমল দার্শনিকতা।

কিন্তু সবাই আবার হতাশ হলো, যখন দেখলো, কবোষ্ণ শীতের রোদে বাইরের বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে মৃদু ও মন্থর একটি সিগারেট সেবন করছি !

সবাই আহত বিস্ময়ে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো, আর যারা তখনো আসছিলো ছুটে তাদের বললে ফিরে যেতে।

'আশ্চর্য', সবাই বলাবলি করতে লাগলো : 'নিজে তো এযাত্রা বেঁচেই গেল, মাঝখান থেকে মরার গুজব রটিয়ে আয়ুটাও নিলে বাড়িয়ে।'

ছোট সহরের পক্ষে ব্যাপারটা এমন রোমহর্ষক যে বিকেল বেলা স্বয়ং খোদ সাহেবকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করলো। বুঝুন কে—একেবারে মহাপ্রভু, আমারই দীনালয়ে। যত না দীন তার চেয়ে হীন করে রাখতে হয় যে-আলয়। আর স্বয়ং মানে একা নয়, সে-মেমসাহেব। সস্ত্রীক বলতে পারতুম, কিন্তু কেমন মধ্যবিত্ত শোনাতো। শিষ্ট বাঙলা হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু শিষ্ট আচার হতো না।

স্নায়ুর উপর আবার প্রবল অত্যাচার সুরু হলো : আনো চেয়ার, জ্বালো আলো, আঁচড়াও চুল, পরো হাফ-সার্ট, দাও চোঁচায় দুটো টান, সন্ধান করো কোথায় গেল স্যাণ্ডেল। তাতেও কি শান্তি আছে? বিছানার চাদরটা ময়লা, টেবিল-ক্লথের ঢাকনাটা ছেঁড়া, চেয়ার-কুশানটাতে অড় নেই। একসঙ্গে সমস্ত বিশৃঙ্খলা যেন কদাকার দাঁত দেখিয়ে হাসছে। এক ভরসা অমলা, তা তার এখনো বৈকালিক গা ধোয়াই সারা হয়নি। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় কোন শাড়ি, কোন মুখে কী পাউডার। এ-বাক্সটা খোলে তো ওটার কথা মনে পড়ে যায়, ওটা খোলে তো এটাকেই ফের মন টানে। সব মিলে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এ-জানলাটা বন্ধ করে তো ওখানে লোক, ও-দরজাটা ভেজায় তো এখানে লোক। লতিয়ে পরা দূরে থাক—ভাঁজ ভাঙা মসমসে শাড়িটা থিতিয়ে পরতেই প্রাণান্ত। ঘর পরিষ্কার করবে না মুখ পরিষ্কার করবে, অমলা ভেবে হঠাৎ ঠিক করতে পারছে না। চাহনিটা কেমন ভীত, ত্রস্ত, বিপন্ন। দেখলেই নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। কিছুতেই যেন স্বাভাবিক হওয়া যায় না, কেননা দৈব এই আবির্ভাবটাই যে অস্বাভাবিক।

ঘুড়ি কাটা পড়লে তার পিছনে যেমন লোক ছোটে তেমনি সাহেবের পিছনে জড়ো হয় এসে মোসাহেব। অতএব আমার ছোট ঘরটা আমার দাদাদের ও আমার স্ত্রীর দাদাদের দিয়ে দেখতে দেখতে ভরে গেল। আমার ঘোরতর অসুখ, আকস্মিক মৃত্যু ও অলৌকিক পুনরুজ্জীবন নিয়ে সাহেব একটু টিপ্পনি কাটলেন আর সমবেত জনতা থেকে একটা বৈদগ্ধ্যাত্মক হাস্য উত্থিত হল। আর পাশের ঘরে মেমসাহেব অমলাকে প্রায় মনে-মনে কাঁদিয়ে ছাড়লেন এই কথা বলে : 'সত্যি-সত্যি মরে গেলে এখন কী করতেন বলুন তো?'

ওঁরা বেশিক্ষণ বসতে পারেন না, সার্কাসের পাশ পেয়েছেন। কিন্তু যাওয়া নয়, ওঁদের আসাটাই হচ্ছে কীর্তি। জেনে রাখুন এই হচ্ছে জনপ্রিয়তার চেহারা।

ওঁরা চলে গেলে আমার ও আমার স্ত্রীর দাদাদের মধ্যে থেকে স্তবগুঞ্জন উঠতে লাগলো কী উদার, কী অমায়িক, কী সময়নিষ্ঠা দেখুন চেয়ে ওঁর মহত্ত্ব, ওঁর ত্যাগ, ওঁর সরলতার দিকে। যেমন গম্ভীর, তেমনি কোমল, যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি সচ্চরিত্র। ইত্যাদি ইত্যাদি। লোকে দুই অবস্থায় বিশেষণ প্রয়োগ করে—এক মুগ্ধ হলে আরেক ক্রুদ্ধ হলে। আমি শেষোক্ত অবস্থায় উপনীত হয়েছি বলে আমার বিশেষণগুলো অত্যন্ত রোখো, খেলো, গেঁয়ো—অথচ প্রাঞ্জল বাঙলায় মন থেকে জিহ্বায় ও জিভ থেকে মনে কুণ্ডলী পাকাতে লাগলো।

আর, বুঝতেই পারছেন, অমলার দাদাদের উপরেই আমার ক্রোধ। ইনফ্লুয়েঞ্জাটা ভারি পাজি রোগ। তিনদিনেই শরীরটাকে একেবারে শুষে নিয়েছে। ভেবেছিলুম বিস্তীর্ণ বিশ্রামে সুস্থ হয়ে উঠবো আস্তে আস্তে। এখন হাঁটা-ওঠা করছি, আপিস যাচ্ছি, অমলাকে নিয়ে নদীর পাড়েও গিয়েছিলুম।

শুনলুম, ভীষণ কেলেঙ্কারি, আমার নামে প্রচণ্ড একটা অভিযোগ উঠেছে। আর অভিযোক্ত্রী স্বয়ং মেমসাহেব। দু'চোখে অন্ধকার দেখলুম। পেনালকোড না সিভিলস্যুট। টর্ট না ইজমেণ্ট, কিছুই কিনারা করতে পারলাম না।

কী ভীষণ অন্যায় দেখুন ওঁর। দিব্যি ভালো হয়ে উঠলেন অথচ একটা রিটার্ণ ভিজিট দিলেন না।' কর্ণপরম্পরায় শুনতে পেলুম নালিশটা।

অমলা বললে, 'ঠিকই তো। অসুখের সময় ওঁরা এসেছিলেন, ভালো হয়ে একবার যাওয়া উচিতই তো ওঁদের ওখানে। সেইটেই সাধারণ ভদ্রতা।'

সাধারণ হবার ভদ্র নিয়মকানুনের মূল নীতিগুলি শিখবো প্রতিজ্ঞা করলুম। হেসে বললুম, তুমিও চলো তা হলে। Must be paid back in their own coin.'

ভাবলুম এতেই বুঝি হবে।

কিন্তু সবজজ-গৃহিনী মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠেছেন : ঈস, আগেই গিয়ে বড় গাছে বাসা বাঁধা হয়েছে। কেন, আমরা কিছু করিনি ওর ? ছুটে-ছুটে যাইনি বারে বারে ? ঈশ্বর না করুন, সেদিন ভালোমন্দ কিছু একটা হলে ওর স্ত্রীকে দেখতো কে ?

অতএব গেলুম ওখানে কাল বিলম্ব না করে। মুন্সেফীদিদিটিও কম যান না। গাল বেঁকিয়ে বলেছেন, 'বুঝলে না দিদি, দেমাক ! গলাফুলো কোলাব্যাঙ। শহরে আছি কিনা কেউ চিনতে চায় না। থাকতুম চৌকিতে পোস্টেড, নাজির-পিওন সব হাতের মুঠোয়, তখন দেখে নিতুম একবার।'

অতএব নাকে কাপড় গুঁজে সেখানেও গেলুম পরদিন।

এ-দিকে ডেপুটিরা ঘোঁট পাকাচ্ছে, তাদের অশ্রদ্ধা করছি ভেবে শাসাচ্ছে বয়কট করবে বলে। অতএব ওদেরো স্বারস্থ হলুম একে-একে। হেডমাস্টারকে ভয়, ছেলেটার পরীক্ষার নম্বর না কেটে নেয়, অতএব তাকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এলুম। দেখি ঋণের চেয়ে সুদই হয়েছে বেশি। এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া, শ্মশান থেকে ইস্টিশান, সকালে বিকেলে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে রিটার্ন ভিজিট দিতে লাগলুম। মোহিনী আর ললিত মোক্তার, রায়-বাহাদুর আর রায়-সাহেব, পি-ডব্লিউ-ডি ইঞ্জিনিয়ার আর ইনকামট্যাক্স-অফিসার, সাবরেজিস্ট্রার থেকে

পুলিশ-দারোগা, ভেটারিনারি সার্জন, ট্রেজারির পোদ্দার, বি-ও-সির পেট্রোলের এজেন্ট পর্যন্ত।

তারপর, রাত্রি-দিন এই অবিশ্রান্ত ঘোরাঘুরির পর ; শুনলে কি আপনারা একটুও বিস্মিত হবেন যে, আমি আবার অসুখে পড়েছি। আর আমার রোগ-শয্যায় দুই পাশে দুই ডাক্তার ভয়ংকর স্তব্ধ হয়ে মুখোমুখি বসে আছে ? আর কাকে পাবো, পরেশ ঘোষ আর ব্যানার্জিই দুই ডাক্তার। পরেশ এসেছে তাকে ডেকেছি বলে, আর ব্যানার্জি এসেছে এই ভীষণ অসুখে তাকে এখনো কেন ডাকিনি তারই খোঁজ নিতে। তৃতীয় নেত্রে মহাদেব যেমন করে মদনের দিকে চেয়েছিলো পরেশকে দেখে ব্যানার্জির চোখে সেই দৃষ্টি বহ্নিমান হয়ে উঠলো।

ব্যানার্জিকে দেখে পরেশ পালিয়ে যাচ্ছিলো, ধরে ফেললুম। বললুম, 'বসুন। দুজনের মাঝে ভাগাভাগি করে দিচ্ছি। আপনি দেখুন হাত, উনি দেখুন জিভ। আপনি দেখুন বুক, উনি পেট। আপনি দেখুন ব্লাড, উনি স্পুটাম।'

বলুন, এরপর আপনারা কি আমার বাঁচবার আশা রাখেন ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভারতযুদ্ধে পিঁপড়ে

ভারত-যুদ্ধে পিঁপড়ে। সে আবার কি?

শুনে হাসি পাচ্ছে ত? কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না? কাঠবিড়ালীরাও যেমন কাজে লেগেছিল, ভারতযুদ্ধে মানে কুরুক্ষেত্রের সেই মহাযুদ্ধে পিঁপেড়েদের সেইরকম কোনো মদৎ ছিল বলে মনে হচ্ছে হয়ত।

না, সরাসরি ভারতযুদ্ধে পিঁপড়েদের কোন পার্ট ছিল বলে জানা নেই। তবে—যাক, বলেই ফেলা যাক—পিঁপড়েদের—না, বহুবচনটা ভুল, আসলে—একটি ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে তার কেরামতিটুকু না দেখালে ভারতযুদ্ধের প্রামাণিক ইতিহাসে ওই পাঁচলহমার ফাঁক মানে ফাঁকিটুকু থাকত না।

ক্ষণজন্মা পিঁপড়ে! তার কেরামতিতে ভারতযুদ্ধের ইতিহাসে ফাঁক?

—কেরামতিটা কি?

তা বোঝাবার জন্যে গোড়া থেকে সুরু করা উচিত। একেবারে বাহাত্তর নম্বরের সেই দোতলার আড্ডাঘরে বত্রিশ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে সুরু এক রবিবারের গুমোট সকালবেলায়।

কাগজে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দিয়েছেঃ—সারাদিন ভ্যাপসা গরম,—বিকালে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচুর বৃষ্টির সম্ভাবনা।

কাগজে ত' হপ্তাভোর রোজই ওই ভাঁওতা দিচ্ছে। কিন্তু সব ভরসাই ফরসা। না আকাশ, না টঙের ঘর থেকে এক ছিটেফোঁটা বর্ষণের লক্ষণ পাচ্ছি।

আকাশে কি টঙের ঘরে বজ্র-বিদ্যুৎ অবশ্য নেই। কিন্ত তাতেই ত' আরো জ্বালা।

বজ্রবিদ্যুতের জায়গায় দু-বেলা কোকিলের বদলে দাঁড়কাক-গিলে-খাওয়া গলার অমৃতসমান মহাভারতের কথা শুনেছি।

কখনো— গোপালের চরিত্র দেবের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দশ লোকে।
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোমকূপে ॥
তিল অর্ধ কোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট যার নিঃশ্বাসে প্রলয় ॥

কখনো বা—

অশ্বত্থামা নামে হস্তী তার তুল্য অন্য নাস্তি
এমনি উত্তম গজবর।
বর্ণে তিনি জলধর, ঈষা সম দণ্ড সর
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
তাহে আরোহণ করি, আসে কুরু অধিকারী
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, রোষযুক্ত নৃপবর
ভীমসনে করিতে সমর ॥

গলাটি কার তা আর বলে দিতে হবে না নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ তেতলার টঙের ঘরের তিনি কিছুদিন ধরে আর সব ছেড়ে মহাভারত ধরেছেন। আমরাও সেই সঙ্গে পথে বসেছি।

সময়ে অসময়ে তাঁর নিজস্ব ট্রেডমার্ক-মারা গলার ওপর থেকে কাশীরাম দাসের পয়ার ভেসে আসে। সে পয়ারের ঢেউ ঠেলে কোন রকমে যদি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছোই তিনি যেন মহাভারতের অমৃতরসে ডুবে আমাদের দেখতেই পান না।

তাঁর মতিগতি একটু ফেরাবার আশায় স্বস্ত্যয়নের উপচার যোগাতে আমরা কিছু ত্রুটি করিনি এ পর্যন্ত। কখনো আমিষ, কখনো নিরামিষ, সাত্ত্বিক বা তামসিক বেশ কিছু আমাদের সমভিব্যাহারে গিয়েছে।

নৈবেদ্য সামনে ধরে দিয়ে আমরা একান্ত বশংবদ হয়ে এধারে ওধারে বসেছি। তাঁর শূন্য দৃষ্টি দু-একবার আমাদের দিকে ফিরলেও এ স্থূল বর্তমান ভেদ করে সেই সুদূর হস্তিনাপুরেই বোধ হয় চলে গেছে। আমরা যে তাঁর গোচরীভূত তার কোনো প্রমাণ পাইনি।

শুধু দক্ষিণহস্তটা তাঁর নিজের অজান্তেই প্লেটের প্রত্যক্ষ বর্তমানের ওপর প্রসারিত হয়েছে। অচেতন ভাবেই মুখে গিয়ে পেঁছেছে তারপর।

সেখানে যান্ত্রিক দন্ত নিষ্পেষণ চলতে চলতে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য থামায় আমরা শশব্যস্ত হয়ে বলার সুযোগ পেয়েছি—কবিরাজীটা কি জুৎ হয়নি ঘনাদা? একেবারে টাটকা ভাজিয়ে এনেছি কিন্তু?

ঘনাদার কর্ণকুহরেই বোধ হয় কথাগুলো প্রবেশ করেনি। সাড়ে তিন হাজার বছর ছাড়িয়ে গিয়ে কৃষ্ণার্জুনের কাছে অগ্নিদেবের ক্ষিদের বায়নাই তিনি তখন শুনছেন।

হাসিয়া কহেন পার্থ, কহ বিচক্ষণ।
কোন ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবা এক্ষণ॥
আমি অগ্নি, বলি দিয়া নিজ পরিচয়।
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি মহাশয়॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।
নিব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর॥
খাণ্ডব বনেতে বহু জীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে কর ধনঞ্জয়॥
উদর পুরিয়া খাই এই অভিরুচি।
কোনো পশুপক্ষী মৎসে নাহিক অরুচি॥

অগ্নিদেবের ক্ষিদের আবদার শোনাতে শোনাতে খাণ্ডববনের অভাবে সামনে ধরে দেওয়া প্লেটগুলো ঘনাদা চেটেপুটে সাবাড় করেছেন। আমাদের উপস্থিতি টের পাবার কোনও লক্ষণই কিন্তু দেখা যায়নি।

মনে মনে গজরাতে গজরাতে নিচে নেমে এসেছি সবাই। আর তারপরই ঘনদাকে কাৎ করবার এই নতুন মতলব ভাঁজা হয়েছে।

ফন্দিটা বিষে বিষক্ষয়, মানে যাকে বলে অটোভ্যাক্সিন। যা দিয়ে আমাদের জ্বালাচেছন। তাই দিয়ে ঘনাদাকে জব্দ করাই অর্থাৎ তাঁর ওপরই মহাভারত চাপানো।

সকাল থেকেই আমাদের তর্কটা সুরু হয়েছে। ঘণ্টার কাঁটা ছটা থেকে সাতটার দিকে যত এগিয়েছে আমাদের গলা ধাপে ধাপে তত তেতালার টঙ পর্যন্ত পৌঁছেছে নিশ্চয়।

একদিকে শিবু আর আমি অন্যদিকে গৌর আর শিশির। তর্ক ত' নয় যেন দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র।

ছটা একুত্রিশে শিবুর হাঁক ন্যাড়া সিঁড়িটা বোধ হয় পেরিয়ে গেছে—আলবৎ হারত পাণ্ডবেরা।

কখখনো না।—শিশিরের প্রতিবাদ খোলা ছাদ পর্যন্ত নিশ্চয়।

কচু কাটা হত তাহলে।—আমি গলাটা টঙের ঘরে পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পেরেছি বোধহয়।

ওপরে ঘনাদার সুরেলা মহাভারত শোলোক আওড়ান হঠাৎ যেন থেমেছে! এই 'জিরো আওয়ার' বুঝে নিজেদের গলার পেছনে আমরাও এবার ন্যাড়া সিঁড়ি বেয়ে টঙের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি। পেছন দিকে তাকিয়ে খাবারের ট্রে সমেত বনোয়ারী ঠিক হিসেব মত হাজির হবার জন্য তৈরী কিনা দেখে নিতে ভুলিনি।

তারপর টঙের ঘরে গিয়ে দোতলার তর্কটা একেবারে যেন তপ্ত খোলা থেকে নামিয়ে দিয়েছি ঘনাদার সামনে।

গৌর প্রায় বিধানসভার মেজাজ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ঘনাদার কাছে স্পীকারের রুলিং চেয়েছে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে—শুনেছেন, শুনেছেন এদের কথা! বলে পাণ্ডবরা নাকি গো-হারান হারত কুরুক্ষেত্রে!

হারতই ত'—শিবু তাল ঠুকেছে ঘনাদার তক্তপোষটাই চাপড়ে—দুর্যোধন অমন গবেট না হলে তুলোধোনা হত পাণ্ডবেরা।

তুলোধোনা হত পাণ্ডবেরা!—শিশির আর গৌর যেন অর্জুনের গাণ্ডীব আর ভীমের গদা-ই হাতে নিয়ে হুংকার দিয়েছে—কে তুলোধোনা করত, কে? দুর্যোধনের নিরানব্বই-এর বদলে আরো ন'শ নিরানব্বইটা ভাই থাকলেও, তা'তে কুলোত না।

দুর্যোধনের ভাইদের আবার ডাকা কেন?—আমি গলায় একেবারে লংকাবাটা মাখিয়ে বলেছি,—তাদের মাঠে নামবার দরকারই হত না। গ্যালারিতে বসেই তারা ফাইন্যাল দেখতে পেত। দেখত কর্ণ—হ্যাঁ একা সূতপুত্র কর্ণ কেমন করে কুরুক্ষেত্রের কাঁকুরে মাটিতে পাঁচ ভাই পাণ্ডবের নাকগুলো ঘসে দেয়। নেহাৎ দুর্যোধন নিজের আহাম্মকীতে রেফারীকেই খচিয়ে দিলে তাই।

কথাগুলো বলতে বলতে আড়চোখে ঘনাদার দিকে অবশ্য নজর রেখেছি। এত পাঁয়তাড়া যে জন্যে কষা সে মতলব একটু হাসিল হচ্ছে কি?

কোথায়—

ঘনাদা তাঁর কাশীরাম দাসের বিরাট গন্ধমাদনটি সামনে খুলে ধরে শোলোক আওড়ানো থামিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজে যেন তাঁর এই টঙের ঘরেই আর নেই। দেহটা শুধু ফেলে রেখে কুরুক্ষেত্রেই বুঝি চরতে গেছেন।

তা গেছেন যান। ফিরতে যাতে হয়, তার জন্য নারাচ, নালিক, পাশুপত থেকে ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্ত সবরকম অস্ত্রের ব্যবস্থা না করে আজ আমরা আসিনি।

দু'এক সেকেন্ডের ফাঁক যা পড়েছিল 'রেফারী' কথাটার খেই ধরে তা ঢেকে গৌর খিঁচিয়ে উঠল—রেফারী! রেফারী আবার কে?

রেফারী কে জানো না।—সঙ্গে সঙ্গে শিবুর টিটকিরি—আমার নব মহাভারত পাঠ শুরু।

শিশির আর গৌরের দিকে চেয়ে কানমলা দেওয়া গলায় বললাম,—মহাভারতটাও পড়িস নি! শোন তাহলে—

মহাভারতের কথা কি কহিব আর।
কি হলে যে কি হইত অন্ত পাওয়া ভার ॥
দুর্যোধন দুর্ভাগার মতিচ্ছন্ন হইল।
পদতল ছাড়িয়া বুদ্ধু শিয়রে বসিল ॥
তাই না চটে চতুর কৃষ্ণ গাড়োয়ান হইয়া।
পাণ্ডুবয়েজ টীমকে দিলেন ম্যাচটা জিতাইয়া ॥
চালের ভুলে রুষ্ট যদি না হতেন রেফারী।
কুরুক্ষেত্রে যায় কুরুরা পেনাল্টিতে হারি? ॥

ঘনাদার দিকে চোখ রেখেই পদগুলো আওড়াচ্ছিলাম, কিন্তু শুভলক্ষণ কিছু দেখলাম না। ঠিক কুরুক্ষেত্রে না থাকলেও এখন হস্তিনাপুর ছেড়ে তিনি আসতে প্রস্তুত নন মনে হল। ঠিক ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিটে বনোয়ারী তখন ঘরে ঢুকে ঘনাদার সামনে খাস্তার কচুরি আর অমৃতির প্লেট দুটো ট্রে থেকে নামিয়ে রাখছে।

ঘনাদার মুখের ভাব দেখে মনে হল এবারে তাঁর হস্তিনাপুরের প্রবাস থেকেই তিনি আনমনে সে প্লেটে হাত বাড়াতে দেরী করবেন না।

ব্রহ্মাস্ত্রটা চটপট তাই প্রয়োগ করতে হল এবার। ঘনাদার লুব্ধ হাত প্লেটে এসে পৌঁছোবার আগেই দুদিক থেকে গৌর ও শিবু চক্ষের নিমেষে দুটি প্লেট

তুলে নিয়ে বনোয়ারীকে ধমকে উঠল—কি, হচ্ছে কি এসব ! যখন তখন খাবার দিলেই হল ! এখন এসব কে আনতে বলেছে !

বনোয়ারী অভিনেতা নয় ! আগে থাকতে অনেক শেখানো পড়ানো সত্ত্বেও গৌর শিবুর ধমক খেয়ে সে সব ভুলে তোতলা হয়ে গিয়ে দুবার শুধু 'হামি··· হা···মি···ত' গোছের কিছু একটা উচ্চারণ করল। আমাদের মতলব হাসিলের পক্ষে তাই কিন্তু যথেষ্ট।

ঘনাদার মুখের চেহারাটা তখন সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার হস্তিনাপুর থেকে এক ঝটকায় উনিশশ' পঁচাত্তরের বাহাত্তর নম্বরে এসে পড়ার জন্যেই বোধহয় বেশ একটু ভ্যাবাচাকা আর যাই হোক এরকম একটা অবস্থার কথা তিনি কল্পনা করতেই পারবেন না জেনে মতলবটা ভাঁজা হয়েছিল।

কচুরি অমৃতির প্লেট দুটো বনোয়ারির ট্রেতে তুলে তাকে চলে যাবার হুকুম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ যা হবার হল।

ঘনাদা অবশ্য এইটুকুর মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছেন। সেই ভ্যাবাচাকা ভাবটা মুখ থেকে মুছে এতক্ষণে যেন আমাদের সম্বন্ধে সচেতন আর বনোয়ারীর প্রতি করুণাময় হয়ে উঠলেন,—আহা বেচারাকে মিছে কষ্ট দেওয়া কেন ? আবার ত' সেই আনতেই হবে ওকে।

ওগুলো রেখে যেতেই বলছেন !—আমাদের গলায় একটু মৃদু প্রতিবাদের সুরই ফোটালাম—কিন্তু আমাদের জরুরী কথাগুলো···

কি তোমাদের জরুরী কথা বলো না !—ঘনাদা বনোয়ারীর হাত থেকে পুরো ট্রেটা একরকম কেড়ে নামিয়ে নিলেন—এগুলোর ত' আর গলা নেই যে গোলমাল করবে। বলে ফেলো কি তোমাদের জরুরী কথা !

ঘনাদার শেষ কথাগুলো মুখে ঠাসা কচুরি ভেদ করে একটু জড়ানো অবস্থাতেই বার হল। আবার পাছে মুখের গ্রাস ফসকে যায় এই ভয়ে তিনি তখন প্রায় দুহাতে কচুরি আর অমৃতি মুখে বোঝাই করছেন।

তা যা করেন করুন। আমরা এতদিনে তাঁকে বাগে পেয়েই খুশি। বেশ একটু জমিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলাম,—জরুরী কথাটা কি, তা এখনো বোঝেননি ? শুনুন না ওই আহাম্মকদের কথা। বলে কিনা কৌরবরা কিছুতে হারুত না !

আহাম্মকেরা মানে শিশির, গৌর। তারাও ঠিক সিনেরিও মাফিক ঝাঁপিয়ে উঠল,—কখখনো হারত না, কিছুতেই হারত না।

শুনলেন ? শুনলেন ত !—একটা জমজমাট বৈঠকের আশায় জ্বলজ্বলে

চোখে ঘনাদার দিকে তাকালাম—এই ওদের মহাভারতের বিদ্যের দৌড়! কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের জিৎ নাকি হতই! আপনিই বলুন ত' ঘনাদা!

ওই উসকানিটুকু দিয়েই আমরা চুপ। ঘনাদার বাঁধানো দাঁতে মচমচে অমৃতি চিবানোর শব্দ ছাড়া ঘরে আর আওয়াজ নেই। যে খেইটা জুগিয়ে দেওয়া গেছে তা থেকে কি গুলগল্পের গালিচা ঘনাদা বুনে তোলেন তা দেখবার জন্যে আমরা একেবারে উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু ঘনাদা অমন করে শোধ নেবেন তা কি জানি! শোধ তাঁর মুখের খাবার সরিয়ে নিয়ে তাঁকে দাগা দেবার।

গালচের আশা একেবারে খণ্ডপোশে কুঁকড়ে দিয়ে ঘনাদা যেন মর্ম কেড়ে জানালেন,—তাই!

তাই! কি তাই?—আমরা যেমন হতাশ তেমনি অস্থির।

—পাণ্ডবদের জিৎ হত-ই বলতে চান?

হ্যাঁ।—এবার ঘনাদার সংক্ষিপ্ত সরল জবাব।

দুর্যোধন যদি দলে টানতে গিয়ে ঘুমন্ত শ্রীকৃষ্ণের শিয়রে না বসে পায়ের দিকে বসত তবুও!—আমরা শেষ আশায় যেটুকু সাধ্য চাগাড় দিলাম।

যদি কেন, পায়ের দিকেই ত বসেছিল দুর্যোধন!—ঘনাদা এতক্ষণে বোমাটি ছাড়লেন।

পায়ের দিকেই বসেছিল দুর্যোধন?—চোখগুলো যতটা পারি ছানাবড়া করে বললাম,—কিন্তু মহাভারতের কোথাও ত নেই! পায়ের বদলে মাথার দিকেই দুর্যোধন বসেছিল বলে ত' লেখা আছে।

লেখা যা আছে তাও ঠিক।

তাও ঠিক?—ঘনাদার ধাঁধায় এবার একটু কাবু হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—পায়ের দিক মাথার দিক হয় কি করে?

হবার কারণ অতি সোজা!—ঘনাদার মুখে যেন একটু অনুকম্পার হাসি,—শ্রীকৃষ্ণ ঘুমের মধ্যে উল্টে শুয়েছিলেন বলেই পায়ের দিকটা মাথার দিক হয়ে গিয়েছিল।

ঘুমের মধ্যে উল্টে শুয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ?—এবার আমাদের অবাক হবার ভান করতে হল না।

হ্যাঁ, উল্টে শুয়েছিলেন।—ব্যাখ্যা করলেন ঘনাদা, দুর্যোধন বোকা যেমন নয়, তেমনি গড়িমসি আলসেমিও তার ধাতে নেই। অর্জুন রথে ঘোড়া জুতে রওনা হতে না হতেই দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শিবিরে এসে হাজির। বাসুদেব

ঘুমোচ্ছেন শুনে সে শোবার ঘরেই গেল অপেক্ষা করতে। ঘরে ঢুকেই সে কিন্তু একটু ফাঁপরে পড়ল। ঘুমন্ত বাসুদেবের মাথার দিকে যেমন পায়ের দিকেও তেমনি একটি করে আসন পাতা। এখন কোথায় তার বসা উচিত। ভেবে চিন্তে শেষপর্যন্ত সে পায়ের দিকেই বসল।

শ্রীকৃষ্ণ এবার পড়লেন মুস্কিলে। তাঁর ত' কপট নিদ্রা। যা ভেবেছিলেন দুর্যোধন তার উল্টোটা করেছে জেনে আর কোনো উপায় না পেয়ে নিজেও তিনি ঘুমের মধ্যেই যেন স্বপ্নে উঠে পড়ার ভান করে উল্টো শুলেন।

দুর্যোধন আহাম্মক নয় কিন্তু অহংকারী। শ্রীকৃষ্ণকে ঘুমের মধ্যে উল্টে শুতে দেখে তার দেমাকে একটু সুড়সুড়িই লাগল। ভাবল, বাসুদেবের ঘুমের মধ্যেও তার মত রাজাগজাকে পায়ের দিকে রাখতে বাধছে। এই দম্ভই হল তার মরণ। নইলে মাথা থেকে আবার পায়ে গিয়ে বসতে পারত না।

কিন্তু ?—আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব কথা মহাভারত থেকে সরালে কে? সেই আপনার ভীমসেন দারুক আর বনবরা মার্কা মুষিক কোম্পানি ?

না।—ঘনাদা বনোয়ারীর সদ্য এনে হাজির করা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটু হাসলেন,—এ বৃত্তান্ত সরাবার দরকার হয়নি, কারণ লেখাই হয়নি মহাভারতে।

লেখাই হয়নি!—আমরা সত্যিই তাজ্জব—কেন?

কেন জানতে চাও?—ঘনাদা শিশিরের ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটে রামটান দিয়ে তার ধোঁয়ার সঙ্গেই চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন।

এ ধ্যান কি ভাঙবে?

আমরা গরুড়পক্ষী হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছি।

ধ্যান শেষ পর্যন্ত ভাঙল আর চক্ষু উন্মীলন করে সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে তিনি ত্রিকালদৃষ্টির যে নমুনা দেখালেন তাতে আমরা হাঁ।

কেন লেখা হয়নি তা,—সামনের ফাঁকা দেয়ালটার দিকে সিগারেট ধরা আঙুল দুটোই উঁচিয়ে তিনি বললেন, ওই ওর তস্য তস্য আদি সপ্তশত সংঘ ভ্রাতা হয়ত বলতে পারত!

মাথাগুলো তখন ঘুরতে সুরু করেছে। ঘোরার আর অপরাধ কি? সংঘ ভ্রাতা, তস্য তস্য, আদি সপ্তশত—এসব কি বলছেন ঘনাদা! আর বলছেন কিনা ওই সেদিনের চুনকাম-করা শাদা দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে।

ওখানে ওসব বলে সম্বোধন করছেন কাকে? যাকে করছেন অনেক কষ্টে

তাকে আবিষ্কার করা গেল এরপর।

আবিষ্কার যা করলাম চক্ষু তাতে চড়কগাছ। ঘনাদার দিকে ফিরে হতভম্ব হয়েই তাই বলতে হল,—ওখানে ত একটা শুধু সুড়সুড়ে পিঁপড়েই দেখছি।

হ্যাঁ, ওই।—ঘনাদা ধ্যাননিমীলিত হয়েই বললেন।

হ্যাঁ, ওই! সুড়সুড়ে পিঁপড়ে! ওরই কি বললেন, তস্য তস্য সার্ধতিনসহস্র-আদি……

হ্যাঁ, হ্যাঁ।—ঘনাদা আমাদের থামিয়ে দিয়ে জ্ঞান দিলেন। ব্যাখ্যা করে বোঝালেন,—কুরুক্ষেত্রের ভারতযুদ্ধের আগে পরে যা যা হয়েছে দিব্যদৃষ্টিতে সবই ব্যাসদেবের জানা। তিনি রেখে ঢেকে কিছু বলবার মানুষ নন আর যত ঝড়ের বেগেই বলুন গণেশ ঠাকুরের সর্টহ্যান্ডে তা ধরা না পড়েই পারে না। তবু যে মহাভারত থেকে ওই মোক্ষম খবরটুকু বাদ পড়েছে তার মূল হল ওই সুড়সুড়ে পিঁপড়ে। ও মানে, ওরই সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার তস্য তস্য কোনো বাসাতুতু ভাই। পরমায়ু ওদের চার থেকে সাত বছরের বেশী নয় বলে গড়পড়তা হিসেব আদি সপ্তশত সংঘভ্রাতা বলছি। কথায় কথায় বুকের মধ্যে যিনি বিশ্বরূপ দেখান, বিশ্বচরাচর যাঁর রেফারীগিরিতে চলে সেই চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মান বাঁচাতে ওই সামান্য পিঁপড়েটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। পিঁপড়ে ত নয়, ও আদি কীটাবতার, একাই পৃথিবীর প্রথম পঞ্চম বাহিনী।

ঘনাদা থামলেন। আমাদের ধরা গলায় আর টুঁ শব্দটিও নেই দেখে ঘনাদা শেষ জ্ঞানটুকুও দিলেন।

দুনিয়া যাঁর নখের টেলিভিশনে, কোথায় কি হচ্ছে তা ত আর তাঁর জানতে বাকি থাকে না। দ্বারকায় বসেই তিনি টের পেলেন ব্যাসদেব তাঁর কপট নিদ্রার বৃত্তান্ত এবার বলতে শুরু করছেন। গড় গড় করে বলে যাচ্ছেন ব্যাসদেব, সড় সড় করে কলম চলছে গণেশঠাকুরের, এমন সময় লেখার চৌকির ওপরই গড়িয়ে রাখা গণেশঠাকুরের শুঁড়টা সুড়সুড়িয়ে উঠল। অনেক চেষ্টা করেও সামলাতে পারলেন না গণেশ ঠাকুর। দুর্দান্ত একটি হ্যাঁচ্চোতে পুঁথির পাতা উড়ল, কলমও থামল ক'টি পলকের জন্য। আবার যখন চলল ব্যাসদেবের ডিক্টেশন, তখন কেষ্টঠাকুরের কারসাজি পার হয়ে গেছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

স্ত্রীর দিদি

নির্মলের স্ত্রী শেফালী রূপে গুণে লক্ষ্মী। শুকতারার মতো স্থিরোজ্জ্বল তার চক্ষু, শারদ প্রভাতের মতো স্বচ্ছ সুধৌত তার মুখ, তার দেহছন্দ শরতের নদীর মতো শান্ত।

এমন মেয়েকে দেখে কার না পছন্দ হয়? নির্মল তাকে এক নিঃশ্বাসে বিয়ে করে ফেললে। বিয়ের রাত্রে প্রথম দেখলে তার স্ত্রীর দিদি সোহিনীকে।

শেফালী যেমন শরৎ ঋতুর প্রতিমূর্তি, সোহিনী তেমনি বর্ষাঋতুর। আর চোখ দিয়ে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে। বিদ্যুৎ তার স্মিত হাস্যে। বিদ্যুৎ তার পরিহাসে, রসোক্তিতে। শ্যামা মেয়ে। সতেজ স্বাস্থ্য তাকে সুদর্শন করেছে, নইলে রূপ তার বাস্তবিক নেই। চাপা খসখসে তার কণ্ঠস্বর, তবু কী যেন সম্মোহন আছে তাতে। বোধ হয় খোট্টার দেশে বিয়ে করার দরুন স্নিগ্ধতা খুইয়েছে, কিন্তু কেমন শক্ত গাঁথুনি। গড়নে বজ্র, ধরনে বিদ্যুৎ। তার একটা না একটা অঙ্গ সমস্তক্ষণ কথা কইছে। যেন তাকে গড়বার সময় বিধাতা পারদের খাদ মিশিয়েছিলেন।

সোহিনী নির্মলের সংগে আলাপ করে, অন্য দিকে হাসিমুখ ফিরিয়ে থেকে

থেকে নির্মলের দিকে চেয়ে চাউনিতে কৌতুক বিচ্ছুরিত করে। যেন নির্মলের মনের ভিতরটা দেখতে পায়, যেন ওখানটাতে তামাসার কিছু আছে। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা কইতে থাকে নির্মলেরই সঙ্গে, অন্যান্যদেরকে একেবারে বঞ্চিত না করে।

কালো মেয়ের ভালো বর জোটেনি। মধ্যবয়সী দোজবর, এলাহাবাদের নেটিভ ডাক্তার। আর শেফালীর স্বামীভাগ্য তার গায়ের মতো ফরসা। নির্মল ঢাকার তরুণ লেকচারার। দেশের কাছে দশের কাছে তার একটা প্রতিষ্ঠা আছে। তবু সোহিনী নির্মলকে গণনার মধ্যে আনে না। তার ছোট বোনের বর—সম্বন্ধে ছোট। মানুষটিও শিষ্ট সুশীল—ছাত্রসমাজের আদর্শ যদি না হল তবে আর অধ্যাপক কিসের?

নির্মল গম্ভীরভাবে দন্ত বিকাশ করে। যেন উপস্থিত ভদ্র তনয়ারা তার ছাত্রী ও এই বাসর ঘর তার ক্লাস রুম। দুটি কানের উপর রকমারী অত্যাচার যেন একটা মায়া।

সোহিনী ওদের নিষেধ করে একটা হাত তুলে, মাথাটাকে ঈষৎ দুলিয়ে বলে, "তোরা তো বেশ। মাষ্টারের কাছে কোথায় কানগুলি গছিয়ে দিবি, না মাষ্টারের কান দুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি। এবারে জন্মাষ্টমীর মিছিলে তোদের সং বেরবে দেখিস।"

নির্মল ভরসা পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখেছেন?"

সোহিনী অন্যদিকে চেয়ে এমন ভংগীতে মাথা নাড়লে ও তার ঠিক পরে নির্মলের দিকে এমন দৃষ্টিতে চাইলে যে নির্মলের দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি তড়িৎ ছুটে গেল।

স্ত্রীকে একা পেয়ে নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার দিদি কতদূর পড়েছেন?"

"ফোর্থ ক্লাস অবধি"—শেফালী বললে কোন মতে মুখ ফুটে। নব বধূত্বের শরমে সে অন্ধ হয়েছিল, কিন্তু মূক হয়নি, তা বোঝা গেল।

"ফোর্থ ক্লাস, মোটে ফোর্থ ক্লাস!" প্রোফেসার বিস্ময়াবিষ্ট হলেন।

স্ত্রীর সংগে এক শয্যায় শুয়ে সে ধ্যান করল স্ত্রীর দিদিকে। ফোর্থ ক্লাস, তবু কী দীপ্তি, কী স্ফূর্তি, কী সপ্রতিভতা! শেফালী তো ম্যাট্রিক পাশ। কিন্তু সোহিনীর কাছে লাগে না। শেফালী না হয়ে সোহিনী যদি আমার স্ত্রী হত—নির্মল ভাবলে—তাহলে বিধাতার এমন কী ভুল হতো! বছর তিনেক

আগে এই পরিবারের সংগে পরিচয় ঘটে থাকলে শ্বশুর মশাই কি আমাকে না দিয়ে নগেন্দ্রবাবুকে ও মেয়ে দিত? তবে তিন বছর আগে আমার চাকরী হয়নি। আমি রিসার্চ স্কলার। বিবাহের প্রস্তাবে বদন বিকৃত করেছি। স্বামী না হয়ে স্বামীজী হবার দিকে ছিল আমার ঝোঁক। স্ত্রীজাতি না বলে মাতৃজাতি বলতুম। আনন্দ দাদাদের সংগে ছাড়া অন্য কারুর সংগে আড্ডা দিতুম না। ওঁরাও আমাকে নিজেদের একজন বলে ধরে নিয়েছিলেন। In anticipation ডাকতেন নির্মলানন্দ বলে। হায়—নির্মল ভাবলে—সেই মোহে হারালুম ঐ দীপ্তি, ঐ স্ফূর্তি, ঐ সপ্রতিভতা! সেই তো বিয়ে করলুম, সংসারী হলুম, মাতৃজাতিকে সন্তান জোগানোর দায়িত্ব নিলুম, চাকরীটি পেয়েই ব্যাস বদলে গেল মতটা, মায়ের অনুরোধের কাছে জারিজুরি খাটল না। তিন বছর আগে করলে স্ত্রীর সংগে সম্বন্ধ অন্যরকম হ'তো, এই মেয়ে আমার কান ধরে টান দিত, এত লজ্জা কোথায় থাকত।

স্ত্রীর সংগে সে রাত্রে যত কথা হল তার বারো আনা দিদি সংক্রান্ত। অবোধ শেফালী সন্দেহ করলে না—অদ্বৈতবাদী নির্মল অন্যায়টা কিছু দেখলে না।

বৌ নিয়ে নির্মল ঢাকায় ফিরল। মা যারপর নাই আহ্লাদিত হলেন। বোনেরা বৌদিকে ঘিরে রইল। বন্ধুরা বৌভাত খেয়ে শেফালীর স্বামীকে অভিনন্দন করে গেলেন। পাড়ার মেয়েরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে রাশি রাশি উপহার দিলেন।

নির্মল কিন্তু সোহিনীকে ভুলতে পারলে না।

শেফালীকে দেখলে সোহিনীর কথা মনে পড়ে। শেফালীতে সোহিনীর দীপ্তি কই? স্ফূর্তি কই? সপ্রতিভতা কই? শুধু সৌন্দর্য, শুধু শরম, শুধু স্নিগ্ধতা। এ সব তো জগতে দুর্লভ নয়, নির্মলের বাড়িতেই কিছু কিছু আছে। এর জন্য অমন জমকালো স্বামীজীত্ব বিসর্জন দিয়ে একটা সুলভ স্বামী হবার সার্থকতা কোথায়?

স্ত্রীর দিকে চেয়ে নির্মল ভাবে, এ তো মাতৃজাতি। একে স্ত্রী বলে কল্পনা করতে সংকোচ আসে।

নির্মল পড়ার ঘরে বিছানা পাতল। পাড়ার লোকে ওকথা শুনে বললে, "অমন স্ত্রীর স্বামী হয়ে এমন জিতেন্দ্রিয়! পুরুষ তো নয়—মহাপুরুষ।"

আনন্দদাদারা বললেন—"কত গৃহী পরমহংসদেবের আরাধনা করে। তাঁর অনুসরণ করে ক'জন?"

মা-র মনে কাঁটা ফুটল। তিনি বৌমাকে নিয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে নাতির

বিনিময়ে পাঁঠা মানত করে এলেন।

ওদিকে জিতেন্দ্রিয় ধ্যান করে—স্ফটিক স্বচ্ছ নয়নে পতঙ্গ চপল চাউনি, চোখে কপালে অধরে উচ্ছল নিঃশব্দ স্মিতহাস, দীঘল সবল গড়ন, ইস্পাতের মতো রং, চাপা খসখসে কণ্ঠস্বর।

স্ত্রী-কে জিজ্ঞাসা করে—"দিদি চিঠি লেখেননি ?"

শেফালী বলে—"তাকে দশখানা না লিখলে কি সে একখানা লিখবে ?"

নির্মল ক্ষুণ্ণ হয়। জানে না যে চিঠিতে সোহিনীর অন্য মূর্তি। হিজি-বিজি কী যে লেখে, নিজেই পড়তে পারে না। হয়তো লেখে—বহুদিন যাবৎ তোমাদের কুশল সংবাদ না পাইয়া বড়ই ভাবিত আছি। কুশলের বানান মুষলের মতো। সংবাদেও তালব্য শ।

অবোধ শেফালী সুবোধ হবার জন্য আই. এ. পড়া করছে। দেবর বিমল তার সহপাঠী। তার দিদিকে তার স্বামী কেন এতবার স্মরণ করেন তা যদি সে বুঝত তবে অত পড়াশুনার দরকার থাকত না।

নির্মল স্থির করে ফেললে—পুজার ছুটিতে এলাহাবাদ যেতেই হবে।

মা'কে বললে, "তুমি পুরী দেখতে চাও, বিমলের সংগে যাও। শেফালীকে তার পিত্রালয়ে দিয়ে আমি একলা যাই পশ্চিমে। আমার সেই Military Strategy of the Mughols, বইখানা লিখতে হলে আগ্রা দিল্লী গোয়ালিয়র এলাহাবাদের দুর্গগুলো চাক্ষুষ করতে হয়।"

ডক্টর না হয়ে নির্মলের নিষ্কৃতি নেই, শুধু পি, আর, এস্ যে তার পক্ষে অশোভন, কে এ কথা না জানে ? মা বললো, "তাই হোক্।"

এলাহাবাদের নগেন্দ্রবাবু পৈতৃক অট্টালিকা ভাড়া দিয়ে নেটিব ডাক্তারের উপযুক্ত পাড়ায় ছোটখাট বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, যা দেখে রুগী ভরসা করে ভিড়বে। বাপ বড় ডাক্তার ছিলেন, বাপের নামডাকের প্রতিধ্বনিতেই তাঁর পসার। প্রথম পক্ষের তিনটি ছেলেমেয়ে, তিনি ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ এই কয়জনের সংসার। ভাড়ার টাকা ও রুগী দেখার টাকায় এক রকম চলে যায়। তবে সাবেক কালের চাল আর নেই, এই যা দুঃখ।

"বেশ, বেশ, তুমি এলে, দেখা হলো, খুশী হলুম", নগেন্দ্রবাবু বললেন।

"আমাদের কি কোথাও যাবার যো আছে, ভায়া ? ঐ দ্যাখ না, রাত না পোহাতেই পাঁচ-পাঁচটা রুগী এসে ধন্না দিয়ে পড়েছে। নগিন ডাক্তার—নগিন ডাক্তার না ছাড়াব্বে ওদের বিমার ছাড়বে না। ক্যা ভইল রে রাম খেলাতা ন, ক্যা ভইল্ রে বুধন কী নানী ?"

ভায়রাভাইকে দেখিয়ে দিয়ে তিনি ওদের একজনের বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে দিলেন, একজনের মুখে হাত পুরে দাঁতগুলো নাড়লেন।

একটা চাকর এসে খবর দিলে, "মাইজী বোলাতে হেঁ।"

নির্মল তার পিছু পিছু গেল। নমস্কার করতেই সোহিনী ফিস ফিস করে শুধালে..."ক' দিন থাকা হবে?" তার দু'হাত জোড়া। সে নির্মলের জন্যই লুচি ভাজছিল।

"সেটা", নির্মল সুগম্ভীর স্বরে বললে, "এখানকার ফোর্ট-এর দ্রষ্টব্য তার উপর নির্ভর করছে।"

"কি—কিসের উপর?" সোহিনী নির্মলের চোখের উপর কৌতুক দৃষ্টি স্থাপন করলে।

নির্মল দৃষ্টি এড়িয়ে বললে, "এখানকার ফোর্টে দেখবার জিনিস বেশী থাকলে বেশী দিন, কম থাকলে কম দিন।"

"তবু", সোহিনী পুনরায় প্রশ্ন করলে, "কম করে হলেও ক'দিন শুনতে পাই?"

"নিশ্চয়।" নির্মল বিব্রত হয়ে বললে, "ধরুন তিন দিন।"

"উঁহু", সোহিনী বিদ্যুৎ বর্ষণ করে বললে, "অত কম কিছুতেই হতে পারে না।"

নির্মল তো তাই চায়। গম্ভীর ভাবে মুচকি হাসল। তারপর চুপ করে সোহিনীর সুগঠিত হাত দুটির নিপুণ ব্যস্ততা, তার চুড়ির নিরন্তর ওঠা-নামা সপ্রশংসভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যেন সামান্য লুচি ভাজা নয়, নুরজাহানের মতো সাম্রাজ্য পরিচালনা চলেছে ঐ দু'খানা সুবলিত করে। পারে এমন লীলার সহিত কাজ করতে শেফালী? হুঁ হুঁ। খালি দড়া আর পড়া।

"ওকে আনলে না কেন?"

"কাকে?"

"ছবিকে—শেফালীকে?"

"ওঃ ওর মা বাবা আসতে দিলেন না।"

"বিরহ সইতে পারছ?" সোহিনী লুচিগুলি দুটি থালায় সাজাতে সাজাতে অপাঙ্গে চাইল।

নির্মল ভয়ে ভয়ে বললে, "ঐতিহাসিককে আরো কত কী সইতে হয়।"

"ঐতি—ঐতিহাসিক কী?"

"যে ইতিহাস লেখে।"

সোহিনী মাথা দুলিয়ে বললে, "তাই বলো। আকবরের ছেলে বাবর না বাবরের ছেলে আকবর এই তোমরা খুঁজে বের করো। না?"

"আচ্ছা, আমাদেরও তো ইতিহাস লেখা হবে হাজার হাজার বছর পরে। হবে না?"

"হবে বই কি।"

"এই ভিটে খুঁড়ে আজকের থালা বাটির খোঁজ একদিন পাওয়া যাবে। না?"

"যাবে বই কি!"

"এখনকার দিনের ঐতিহাসিকের জন্য খানকয়েক লুচি তুলে রাখতে হয়। না, মাষ্টার মশাই?"

নির্মল ভাবলে প্রফেসর ও মাষ্টারের মধ্যে তফাৎ এ জানে না, সিবিল সার্জন ও নেটিব ডাক্তার দুই-ই এর কাছে ডাক্তার। বললে, "আমি মাষ্টার নই, প্রোফেসর।"

সোহিনী ভ্রূভঙ্গী করলে। "প্রোফেসর তা হলে মাষ্টার নয়? পড়ায় না ছেলেদের?"

নির্মল ভাবলে, "যাক্ গে। জ্ঞানের চেয়ে ঐ ভঙ্গীটুকু মহার্ঘ।"

লুচি চিবোতে চিবোতে নগেন্দ্রভূষণ বললেন, "গোরাকে নিয়ে জ্বালাতন হচ্ছি, ভায়া। গোয়ালিয়রের গাইকবাড়, ইন্দোরের সিন্ধিয়া এঁদের কীর্তি-কলাপের আমি কি জানি।" নির্মল মুখ টিপে বললে, "সে হবে এখন। আমি ওকে ইতিহাসে পাকা না করে দিয়ে নড়ছি নে!"

গোরা, কালা, টুনী এই তিন ছাত্রছাত্রীকে পাকা করে তোলবার ভার নিয়ে, নির্মল স্থায়িত্ব লাভ করলে। দুপুরের দিকে একবার দুর্গে যায়, খাতার পাতায় নকশা এঁকে আনে। মহাগ্রন্থের খসড়া তৈরী করে। আর খুব লুচি হালুয়া ধ্বংস করে।

উপরন্তু চা।

"মাষ্টার—না, না, প্রোফেসার মশাই", সোহিনী চা দিয়ে যাবার সময় বলে, "এই নাও তোমার চা।"

"নগেনদা খেয়েছেন?"

"উনি তো অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন।"

চায়ে চুমুক দিয়ে নির্মল বলে, "ওঃ!"

"চা খুব ভালোবাসো না?"

"খ্-উ-ব। যদি তেমন হাতের হয়।" নির্মল ক্রমে সাহসী হয়েছিল। মেয়েদের কাছে মুখচোরা বলে আর দুর্নাম দেওয়া চলে না।

সোহিনী তার দিকে অবাক হয়ে তাকালে। তার সব সময় স্থির চপলার হাসি। বললে, "কেমন হাতের?"

নির্মল খপ্ করে তার একটা হাত চেপে ধরে বললে, "এমন হাতের।"

সোহিনীরই গায়ে জোর বেশী। সে হাতটা ছাড়িয়ে না নিয়ে সেই হাতে নির্মলের গালে ঠোনা মেরে বললে, "এ খাদ্য কেমন লাগল?"

"আরো ভালো।"

আর একটি ঠোনা আর একটু জোরে—"এবার কেমন লাগল?"

"আরো ভালো।"

ক্ষিপ্রতার সহিত প্রোফেসারের কানটাতে পাক দিয়ে সোহিনী শুধালে, "এটা কেমন?"

"উপাদেয়।"

দিন দুই পরে।

সোহিনী বললে, "এখানকার দুর্গ দেখা শেষ হয়ে গেছে বুঝি?"

নির্মল বললে, "না।"

—"তবে যে আর যাওনা দেখতে?"

—"যতটা দেখেছি, ততটার বিবরণ গুছিয়ে লিখি আগে। তারপর যাবো আবার।"

"কই লিখতেও তো তোমার তাড়া নেই?"

নির্মল বুঝলে এর তাৎপর্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোহিনীর ঠোনা ও কানমলা খাওয়া। নগেন্দ্র একটা দাবাখানা খুলেছেন, সেইখানে সারা দুপুর আড্ডা দেন, সেইখান থেকে কল-এ যান। ছেলে দুটো স্কুলে, মেয়েটি পাড়ার বড় বাড়িতে।

"হ্যাঁ এইবার লিখব। অনেক চিন্তা করতে হয়, তোমরা তো বোঝ না।"

"চিন্তা করার ঢং বুঝি এই?"

"আহা, মস্তিষ্ক যে সর্বক্ষণ ক্রিয়া করছে, তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ সোহিনী?"

"দিদি বললে না যে?" সোহিনী কটাক্ষপাত করলে।

"কেন দিদি বলব?" নির্মল নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললে, "সত্যিকারের দিদি তো নও, সম্পর্কে দিদি।"

"সম্পর্ক বুঝি কিছুই নয়?"

"সম্পর্কটা অন্য রকম হতে পারত।"

এ কথায় সোহিনী আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকলে।

নির্মল ঠাওরাল সে চোখের জল চাপা দিচ্ছে। আহা, কী অসুখী এই মেয়েটি! দোজবরে পড়েছে। ও ছাড়া আর কী হতে পারে।

নির্মল উঠে দাঁড়াল। সোহিনীর কাঁধে একটি হাত রেখে আর একটি হাতে ওর চোখ থেকে আঁচল সরালে। ও হরি। কই তার চোখে জল?

সোহিনী চুপি চুপি হাসছিল। খিল খিল করে হেসে উঠল। হতভম্ব নির্মলকে ঠেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। বললে, "আমাকে একজনের বাড়ি যেতে হচ্ছে। কিছু মনে কোরো না, প্রোফেসার। বাসা পাহারা দিও।"

নির্মল পরদিন ফোর্টে গেল। মন দিয়ে লিখলেও কিছু। স্ত্রীকে কুশল সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখেছিল, তার উত্তর পেয়ে প্রত্যুত্তরে লিখলে, খুব খাটতে হচ্ছে! একটা নকশা পাঠিয়ে দিলে নমুনা হিসেবে।

তারপর যথাপূর্বং।

বললে, "কাল রাত্রে নগেনদা তোমাকে এতো বকছিলেন কী নিয়ে?"

"তুমি জানলে কী করে?"

"বা, আমার বুঝি কান নেই?"

"কিন্তু তখন তো তুমি ঘুমিয়ে।"

"আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শুনতে পাই।"

সোহিনী গ্রীবাটি বেঁকিয়ে বললে, "তুমি অবাক করলে। যারা ম্যাজিক করে তারাও তো প্রোফেসার! তুমি বুঝি তাদের একজন?"

সোহিনী স্বীকার করলে না যে তার স্বামী তাকে বকছিলো। "ও কিছু না। ওঁর মিষ্টি কথার ছাঁচই ঐ। বকুনির মতো শোনায়।"

নির্মল হেসে উড়িয়ে দিলে।

"হাসছ কী মশাই? স্বামী কি স্ত্রীকে বকতে পারেন?"

নির্মল হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর সোহিনীর হাত ধরে উঠে বসল। সহসা সোহিনীকে টান দিয়ে নিজের পাশে বসাল। বললে, "সত্যি বলো। ওঁকে তুমি ভালোবাসো?"

এই প্রথম সোহিনীকে গম্ভীর হতে দেখা গেল। "বলো, বলো সোহিনী। ওঁকে তুমি ভালবাসো?"

সোহিনী ঝাঁঝের সঙ্গে বললে—"কেন, ওঁর অপরাধ কী? উনি প্রোফেসার নন—এই?"

"দূর। তা কেন হবে ? উনি তোমার যোগ্য ?"

"আমি কী ও'র যোগ্য ?"

নির্মল আবেগের সঙ্গে বললে, "সোহিনী তুমি কী জানো তুমি বিদুষী রূপসী কল্যাণীদের চেয়েও শ্রেয় ? সোহিনী আমার একমাত্র দুঃখ—কেন আমি তিন বছর আগে তোমাকে দেখিনি। দেখলেই বিয়ে করতুম নিশ্চিত।"

সোহিনী আবার স্বাভাবিক হেসে ভ্রূ-বাণ হেনে বললে, "কিন্তু আমি যদি এ বিয়েতে অমত করতুম ?"

"কেন অমত করতে ?"

"কেন করতুম না ? প্রোফেসার বুঝি পুরুষ ?"

"কী ?"

"যাও, বলব না।',

"প্রোফেসর বুঝি কি ?"

"জিরাফ।"

নির্মল মিনতি করলে। তখন সোহিনী পুনরুক্তি করলে, "প্রোফেসর বুঝি পুরুষ ?"

এ কথা শুনে নির্মল সোহিনীকে একেবারে বুকের কাছে টেনে আনলে। সোহিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে না। শুধু ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, "ছাড়ো ছাড়ো। ছি, ছি।"

নির্মল বললে, "আর বলবে ও-রকম কথা ?"

"কী রকম কথা ?"

"ঐ যে প্রোফেসার নয় পুরুষ ?"

"পুরুষ নাকি ?"

নির্মল এর যা উত্তর দিলে তা ভয়ানক।

আরো দিন চার পরে সোহিনী বললে, "লক্ষ্মীটি, এই বেলা যাও।"

নির্মল বললে, "যাব, কিন্তু তোমাকেও আসতে হবে।"

সোহিনী ঘাড় নাড়ল, "বোনের বাড়িতে তুমি বোনের, আমার নও।"

"পাগল ? আমি কি আর ওর পুরুষ হতে পারি ?"

"না না। ওকে অসুখী করতেও যে পারবে না তুমি ?"

"কিন্তু তোমাকেও অসুখী করতে পারব না, রানি।"

"একজনকে অসুখী করতেই হবে ?"

"তা যদি হয়, তবে তোমাকে নয়।"

সোহিনীর স্বভাব বদলে গেছল। স্বতঃস্ফূর্ত স্মিত হাসির স্থান নিয়েছিল করুণ গভীর আভা। সে বললে, "আমাকে অসুখী করলে ও অসুখী হবে না, কিন্তু ওকে অসুখী করলে আমিও অসুখী হবো।"

"না সোহিনী, তোমাকে অসুখী করব না।" নির্মল বার বার এই কথা বললে। আর ছেলেমানুষের মতো সোহিনীর বুকে মুখ গুঁজল। শিশুর মতো আধো আধো সুরে বললে, "না-আ সোহিনী, তোমাকে অসুখী করব না—আ।"

সোহিনী খিল খিল করে হেসে উঠল—"যাও! খোকা প্রোফেসার।"

এর উত্তরে সেই ভয়ানক কাণ্ড।

এমন সময় এসে পড়ল নগেন্দ্রভূষণের কন্যা টুনী। বয়স ছয়-সাত বছর হবে। তাকে দেখে সোহিনী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিলে। তখনো তার মুখে কৌতুকের হাসি। সে কি কাউকে ডরায়?

নির্মল তো মুখটাকে অসম্ভব লম্বা করে টুনীর ভয়ে টুনীর পুতুলের মতো ঠায় বসে রইল।

"মেসোমশাই", টুনী জিজ্ঞাসা করলে, "মা-কে কামড়াচ্ছিলে কেন? তুমি কি কুকুর?"

মেসোমশাইর মুখ কতকটা কুকুরের মতো লম্বা দেখাচ্ছিল বটে। তিনি কি যেন জবাব দিতে চেষ্টা করলেন। একটা অস্ফুট ধ্বনি তাঁর কণ্ঠমূলে আটকে গেল।

মা ও-ঘর থেকে ডাকলেন—"টুনী"—

ছুটে গেল টুনী।

মা তাকে একটা পয়সা ঘুষ দিলো—"যা কুল কিনে খা।"

তখনকার মতো টুনীর মুখ বন্ধ হল। কিন্তু রাত্রে বাবার সামনে খুলল। "জানো বাবা—"

সোহিনী তাকে চোখের ইশারায় নিষেধ করলে।

"জানো বাবা, মেসোমশাই—"

সোহিনী চোখ দিয়ে অগ্নিবর্ষণ করলে। নির্মলের তো তখন যায় যায় অবস্থা। তার মুখ মড়ার মতো সাদা হয়ে আসছিল।

নানা কারণে সেদিন নগেন্দ্রবাবু খিট্ খিট্ করছিলেন। তিনি ভেঙিয়ে বললেন—"জানো বাবা! কী জানো বাবা!" টুনীর অমনি অভিমান হল। আর দাদারা তো হো হো করে হেসে উঠল। "জানো বাবা, কী জানো বাবা!"

"এই টুনী!"

"যাও, বলবো না।" এই বলে টুনী হন্ হন্ করে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে থাকল।

পরদিন টুনী ঠিক সেই সময়টিতে পাড়া বেড়িয়ে ফিরল। উঁকি মেরে দেখলে, ওরা পাশাপাশি শুয়ে আছে। ঘরে ঢুকতেই নির্মল 'আঃ উঃ' করে উঠল। ভারি মাথা ধরেছে তাঁর।

টুনী ডাকলে, "মেসোমশাই।"

মেসোমশাই সাড়া দিলেন, "আঃ, উঃ, টুনু রে মারা গেলাম রে।"

টুনী বললে, "বাবাকে খবর দিই? ওষুধ নিয়ে আসি?"

নির্মল কাতরাতে থাকল, "আঃ। আঃ। ইঃ। ইঃ। উঃ। উঃ।"

সোহিনী সকৌতুকে নির্মলের মাথা টিপে দিতে দিতে বললে, "ওষুধ আমার কাছে আছে। তোকে যেতে হবে না।"

টুনীও মেসোর পা টিপতে বসল। কিছুতেই ও ঘর থেকে সরলো না। অগত্যা নির্মলের অসুখ সারল।

রাত্রে বাবাকে টুনী বললে, "মেসোমশাই আজ খুব কষ্ট পেলে। এমন মাথা ব্যথা। হবে না? মানুষকে কামড়ালে মাথা ব্যথা করবে না?"

মানুষের কামড়ানোর সংগে মাথা ব্যথার সম্বন্ধ শুনে নগেন্দ্রভূষণের ডাক্তারী কৌতূহল উজ্জীবিত হল। অমন একটা কার্যকারণ জেনে রাখা ডাক্তারমাত্রেরই কর্তব্য। এবার যখন কোন রোগী এসে বলবে, "মাথা ব্যথা করছে," তিনি গম্ভীরভাবে শুধোবেন, "মানুষকে কামড়েছ বুঝি?"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে কাকে কামড়াল?"

নগেন্দ্র একবার তাকালেন নির্মলের দিকে, আর একবার সোহিনীর দিকে। ইন্দ্র আর অহল্যা। ইন্দ্রটি কম্পমান। অহল্যা বেপরোয়া।

ঋষি না হোন; ঋষির বংশধর। ধ্যানে সমস্ত জানলেন। প্রথমত কিছু বললেন না। পেট ভরে খেলো চেঁছে পুঁছে। আঁচিয়ে তোয়ালাতে হাত মুছে ঢেকুর তুললো বার কয়। পান মুখে দিয়ে কয়েকবার মুখ বিকৃত করে নির্মলের ঘরে ঢুকে খানাতল্লাস করলেন। দেখা যাক্ তার গবেষণা সত্য না ধাপ্পা।

নোটবুক নয়, কবিতার খাতা। নির্মলও কবিতা লেখে—অন্তত সবে লিখতে সুরু করেছে।

"তোমার আমার মিলন হবে বলে / আসছি কবে থেকে
(প্রেমের) পসরাটি মাথায় করে হায় / চলছি হেঁকে হেঁকে।"

নগেন্দ্রভূষণ উল্‌টিয়ে দেখলেন এই চোদ্দ দিনে সাতাশটি কবিতা জাল হয়েছে।

"তুমি ছলকিয়া চল জলকে / আমি থমকিয়া থাকি পলকে
মম অন্তরে গাহে বল কে / সখি জাগো সখি জাগো।"

অতঃপর—

"মম চুম্বন স্বাদি' লো সজনি / ঝঙ্কৃ উঠিলি বীণার মতো
বক্ষ তুহার' উচ্ছ্বসিয়া 'উচ্ছ্বসিয়া / ক্লান্তিতে হলো মূর্চ্ছাহিত।
দ্বাবিংশবার দ্রুত চুম্বনি' / অধর তুহার দিলাম প্লাবনি'
এই ভুজনীড়ে তখন আপনি / পুলকে হইলি কূজনরত।"

খাতাখানার মধ্যে গোটা চার-পাঁচ লম্বা চুল আবিষ্কার করে নগেন্দ্রভূষণ সশব্দে গলা পরিষ্কার করলেন। ডাকলেন, "ভায়া হে, এদিকে এসো।"

নির্মল প্রাণের মায়া চৌকাঠের ওধারে রেখে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে এলো।

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—"কতদূর এগিয়েছ, ঠিক বলো তো?"

নির্মল বললে, "আ-আ-জ্ঞে।"

"ন্যাকা সাজছ কেন হে? আমি কি তোমার মাথা কাটছি? তবে আমার মাথাটা তুমি কতো দূর কেটে রেখেছ জানতে ইচ্ছে করে। চুম্বন-আলিঙ্গনের পরিখাপারে থেমেছে, না...

"আ-আ-জ্ঞে!"

"তুমি ত বড্ড ভালোমানুষ হে।"

নির্মল কাঁদো কাঁদো সুরে কী বললে শোনা গেল না। বাইরে সোহিনী হেসে লুটিয়ে পড়ছিল।

নগেন্দ্র আশ্বাস দিয়ে বললেন, "শ্বশুরমশাই সেই শ্বশুরমশাই থাকবেন, জামাই অদল বদল হলেও। অতএব এতে ভয় পাবার কী আছে?"

নির্মল দু'হাতে চোখ ঢাকল। সোহিনীও উঁকি মেরে তার দশা দেখে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

নগেন্দ্র গর্জে উঠলো—"যাও, এটিকে নিয়ে যাও। গিয়ে ওটিকে দাও পাঠিয়ে।"

ওদিকে সোহিনীর হাসি গেল দপ্ করে নিভে। এদিকে নির্মল ফণা তুলল।

(১৯৩৩)

সৈয়দ মুজতবা আলী

বেঁচে থাকো সর্দিকাশি

ভয়ংকর সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে যা জল বেরুচ্ছে তা সামলানো রুমালের কর্ম নয়। ডবল সাইজ বিছানার চাদর নিয়ে আগুনের কাছে বসেছি। হাঁচছি আর নাক ঝাড়ছি, নাক ঝাড়ছি আর হাঁচছি। বিছানার চাদরের অর্ধেকখানা হয়ে এসেছে, এখন বেছে বেছে শুকনো জায়গা বের করতে হচ্ছে। শীতের দেশ, দোর জানলা বন্ধ, কিচ্ছু খোলার উপায় নেই। জানলা খুললে মনে হয় গৌরীশংকরের চুড়োটি যেন হিমালয় ত্যাগ করে আমার ঘরে নাক গলাবার তালে আছেন।

জানি, একই রুমালে বার বার নাক ঝাড়লে সর্দি বেড়েই চলে, কিন্তু উপায় কি? দেশে হলে রকে বসে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়তুম, এ নোংরামির হাত থেকে রক্ষা তো পেতুমই। নাকটাও কাপড়ের ঘষায় ছড়ে যেতো না। হঠাৎ মনে পড়ল পরশু দিন এক ডাক্তারের সঙ্গে অপেরাতে আলাপ হয়েছে। ডাকসাইটে ডাক্তার—ম্যুনিক শহরে নাম করতে পারাটা চাট্টিখানা কথা নয়। যদিও জানি ডাক্তার করবে কচু, কারণ জর্মন ভাষাতেই প্রবাদ আছে, 'ওষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, না খেলে এক সপ্তায়।' তবু

গেলুম তাঁর বাড়ি। আমার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি। আমি শুধালুম, সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরুচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার।'

ডাক্তার যদিও জর্মন তবু হাত দুখানি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন ফরাসিস্ কায়দায়। বললেন, 'অবাক করলেন স্যর! সর্দির ওষুধ নেই? কত চান? সর্দির ওষুধ হয় হাজারো রকমের।' বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুললেন লালকেল্লার সদর দরজা পরিমাণ এক আলমারি। চৌকো, গোল, কোমর-মোটা, পেট-ভারী বাহান্ন রকমের বোতল-শিশিতে ভর্তি। নানা রঙের লেবেল আর সেগুলোর উপর লেখা রয়েছে বিকট বিকট সব লাতিন নাম।

এবারে খানদানী ভিয়েনীজ কায়দায় কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে বাও করে বাঁহাত পেটের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় দেরাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি দেখিয়ে বললেন, 'বেছে নিন, মহারাজ (কথাটা জর্মন ভাষায় চালু আছে); সব সর্দির দাওয়াই।'

আমি সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকালুম। ডাক্তার মুখ ব্যাদন করে পরিতোষের ঈষৎ হাস্য দিয়ে গালের দুটি টোল খোলতাই করে দিয়েছেন—হা'টা লেগে গিয়েছে দু'কানের ডগায়।

একটা ওষুধের কটমটে লাতিন নাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বললুম, 'এর মানে তো জানিনে।'

সদয় হাসি হেসে বললেন, 'আমিও জানিনে, তবে এটুকু জানি, ঠাকুরমা মার্কা কচু-ঘেঁচু মেশানো দিশী দাওয়াই মাত্রেরই লম্বা লম্বা লাতিন নাম হয়।'

আমি শুধালুম, 'খেলে সর্দি সারে?'

বললেন, 'গলায় একটু আরামবোধ হয়, নাকের সুড়সুড়ি হয়ত একটু আধটু কমে। আমি কখনো পরখ করে দেখিনি। সব পেটেন্ট ওষুধ—নমুনা হিসেবে বিনা পয়সায় পাওয়া। তবে সর্দি সারে না, এ কথা জানি।'

আমি শুধালুম, 'তবে যে বললেন সর্দির ওষুধ আছে?'

বললেন, 'এখনো বলছি আছে কিন্তু সর্দি সারে সে কথা তো বলিনি।'

বুঝলুম, জর্মনি কান্ট হেগেলের দেশ। 'বললুম 'অ'।

ফিসফিস করে ডাক্তার বললেন, 'আরেকটা তত্ত্বকথা এই বেলা শিখে নিন। যে ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন, সে ব্যামো ওষুধে সারে না।'

ততক্ষণে আবার আমি হাঁচ্ছো হাঁচ্ছো আরম্ভ করে দিয়েছি। নাক চোখ দিয়ে এবার রাইন ওডার না এবারে পদ্মা-মেঘনা। ডাক্তার ডজন দুই কাগজের রুমাল আর একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ধাক্কাটা সামলে উঠে প্রাণভরে জর্মন সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম!

দেখি, ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন।

আমার মুখে হয়ত একটু বিরক্তি ফুটে উঠেছিল।

বললেন, 'সর্দি কাশির গুণও আছে।'

আমি বললুম, 'কচু, হাতী, ঘণ্টা।'

বললেন, 'তর্জমা করে বলুন।'

আমি বললুম, 'কচুর' লাতিন নাম জানিনে; 'হাতী' হল 'এলেফাণ্ট' আর 'ঘণ্টা' মানে 'গ্লকে।"

'মানে?'

'আর বুঝে দরকার নেই; এগুলো কটুবাক্য।' আকাশ পানে হানি যুগল-ভুরু বললেন, 'অদ্ভুত ভাষা। হাতী আর ঘণ্টা গালাগালি হয় কি করে! একটা গল্প শুনবেন? সঙ্গে গরম ব্রাণ্ডি?'

আমি বললুম, 'প্রথমটাই চলুক। মিক্‌স্ করা ভালো নয়।'

ডাক্তার বললেন, আমি ডাক্তারি শিখেছি বার্লিনে। বছর তিনেক প্র্যাকটিস করার পর একদিন গিয়েছি স্টেশনে, বন্ধুকে বিদেয় দিতে। ফেরার সময় স্টেশন-রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি একটা ব্রাণ্ডি খাব বলে।

'ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। দেখি, এক কোণে এক অপরূপ সুন্দরী। অত্যন্ত সাদাসিদে বেশভূষা,—গরীব বললেও চলে—আর তাই বোধ হয় সৌন্দর্যটা পেয়েছে তার চরম খোলতাই। নর্থ সী দেখেছেন? তবে বুঝতেন হব-হব সন্ধ্যায় তার জল কি রকম নীল হয়—তারই মত সুন্দরীর চোখ। দক্ষিণ ইটালিতে কখনো গিয়েছেন? না? তবে বুঝতেন সেখানে সোনালি রোদে রুপালি প্রজাপতির কি রাগিনী। তারই মত তাঁর ব্লণ্ড চুল। ডানয়ুব নদী দেখেছেন? না? তা হলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা।'

আমি বললুম, 'বলে যান, রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।'

'না, থাক। ওরকম বেয়ারিং পোস্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না। আমরা ডাক্তার-বদ্যি মানুষ, ভাবাবাবদে মুখ্যু-সুখ্যু। অনেক মেহন্নত করে যে একটি মাত্র বর্ণনা কব্জায় এনেছি সেইটেও যদি না বোঝেন তবে আমার শোকটা কোথায় রাখি বলুন তো।'

কাতর হয়ে বললুম, 'নিরাশ করবেন না।'

'তবে চলুক ট্রিলেগেভ্ রেস। ডানয়ুব নদীর শান্ত-প্রশান্ত ভাবখানা তাঁর মুখের উপর। অথচ জানেন, ডানয়ুব অগভীর নদী নয়। আর ডানয়ুবের উৎপত্তিস্থল দেখেছেন? না। তাহলে বুঝতেন সেখানে তন্বঙ্গী ডানয়ুব যে রকম লাজুক মেয়ের মত এঁকে বেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত, এ-মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকুবাঁকু ভাব।

'এই লজ্জা ভাবটার উপরই আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লজ্জা-সরম বলতে আমরা যা কিছু বুঝি সে সব মধ্যযুগের পুরোনো গল্প থেকে। বেয়াত্রিচে দান্তেকে দেখে লাজুক হাসি হেসেছিলেন—আজকের দিনে এসব তো আর বার্লিন শহরে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের নাইটদের সিভালরি গেছে আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে মেয়েদের মুখ থেকে সব লজ্জা সব ব্রীড়া।

'কিন্তু আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই এখনো এই মধুর জিনিষটি দেখতে পাওয়া যায়, আর তার চেয়েও নিশ্চয়, আপনাদের দেশের লোক এখনো অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে।

'তাই আপনি বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আমি নিজে এখনো ঠিক করতে পারি নি, কি করে যে আমার তখন মনে হল, এ-মেয়েকে না পেলে আমার চলবে না।

'হাসলেন না যে? তার থেকেই বুঝলুম, আপনি ওকীবহাল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন; কিন্তু জর্মনরা আমার এ-অবস্থার কথা শুনে হাসে। আর হাসবেই বা না কেন? চেনা নেই, শোনা নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মেয়েটা হয়ত অফিসবয়ের চেয়েও আকাট, হয়ত মাতালদের আড্ডায় বিয়ার বিক্রি করে পয়সা কামায়, কিংবা এও তো হতে পারে যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এ-সব কোনো কিছুর তত্ত্ব-তাবাস না করে এক ঝটকায় মনস্থির করে ফেলা। এ-মেয়ে না হলে আমার চলবে না। আমি কি খামখেয়ালির চেঙ্গিসখান, না হাজারো প্রেমের ডন্ জুয়ান্?

'ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়ছি—কোন্ অজুহাতে কোন্ অছিলায় এঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়। কিছুতেই কোনো হদিস পাচ্ছিনে, আমাদের মাঝখানে তিনখানা মাত্র ছোট্ট টেবিলের যে উত্তাল সমুদ্র সেটা পেরিয়ে ওঁর কাছে পেঁছিই কি প্রকারে। প্রবাদ আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হয়ে যায়—প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তখন তার ফন্দি-ফিকির আর আবিষ্কার কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায়, আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম

গবেট—এমন সব কাণ্ড তখন করে বসে যে দশজন তাজ্জব না মেনে যায় না, এ লোকটা এ-সব পাগলামি করছে কি করে।

'এ জীবনে সেই সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে আমি বুদ্ধিমান। কারণ পূর্ণ একঘণ্টা ধরে ভেবেও আমি সামান্যতম কৌশল আবিষ্কার করতে পারলুম না, আলাপ করি কোন্ কায়দায়। কিন্তু এহেন হৃদয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না। তখন বরঞ্চ বোকা বনতে পারলেই হয়ত কোনো একটা কৌশল বেরিয়ে যেত।

'ক্লাইন উঠে দাঁড়ালেন। কি আর করি। পিছু নিলুম। তিনি গিয়ে উঠলেন ম্যুনিকের গাড়িতে। আমিও ছুটে গিয়ে টিকিট কাটলুম ম্যুনিকের। কিন্তু এসে দেখি সে কামরার সীটই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আরো প্রমাণ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধিমান, কারণ এ কথা সবাই জানে, বুদ্ধিমানকে ভগবান সাহায্য করলে এ-পৃথিবীতে বোকাদের আর বাঁচতে হত না। আমি ভগবানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলুম না।'

আমি বললুম, 'ভগবানকে দোষ দিচ্ছেন কেন? এতো কন্দর্প ঠাকুরের ডিপার্টমেণ্ট।'

বললেন, 'তাতেই বা কি লাভ? তিনি তো অন্ধ। মেয়েটাকে বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরই মত অন্ধ। এই যে আমি একটা এত বড় অ্যাপলো, আমার দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকালো না। ওঁকে ডেকে হবে—'

আমি বললুম, 'কচু, হাতী, ঘণ্টা।'

এবার ডাক্তার বাঙলা কটুকাটব্যের কদর বুঝলেন। বললেন, 'আহা-হা-হা।' তারপর জর্মন উচ্চারণে বললেন, 'কণ্ড, হাটী, গণ্টা! খাসা গালাগাল।'

আমি বললুম, 'কামরাতে আটজনের সীট ছিল তো বয়েই গেল। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি কোনো গতিকে ধাক্কাধাক্কি করে—'

বললেন, 'তাজ্জব করলেন। একি আপনার ইণ্ডিয়ান ট্রেন, না সাইবেরিয়া-গামী প্রিজনার-ভ্যান। চেকার পত্রপাঠ কামরা থেকে বের করে দেবে না?

দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের করিডরে ঠায়। দেখি, মেয়েটি যদি খানা-কামরায় যায়। স্টেশনে তো খেয়েছে শুধু কফি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল, কত লোক কত কামরা থেকে উঠলো নামলো কিন্তু আমার স্বর্গপুরী থেকে কোনো—(কটুবাক্য)—নামলো না। সব ব্যাটা নিশ্চয়ই যাচ্ছে ম্যুনিক। আর কোথাও যেতে পারো না? ম্যুনিক কি পরিস্থান না ম্যুনিকের ফুটপাত সোনা দিয়ে গড়া? অবাক করলে এই ইডিয়টগুলো।

'প্রেমে পড়লে নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। এক-বেলার জন্য হয়ত পায়। আমি লাঞ্চ খাইনি, ওদিকে ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে—আমার পেটের ভিতর হুলুধ্বনি জেগে উঠেছে। এমন সময় মা-মেরির করুণা হল। মেয়েটি চলল খানা-কামরার দিকে। আমিও চললুম ঠিক পিছনে পিছনে। আহা, যদি একটা হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে যায়। দুত্তোর তারও উপায় নেই—উঁচু হিলের জুতো হলে গাড়ির কাঁপুনিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—এ পড়েছে ক্রেপ-সোল্।

'ঠিক পিছনে পিছনে গিয়ে খানা-কামরায় ঢুকলুম। ওয়েটারটা ভাবলে স্বামী-স্ত্রী। না হলে তরুণ-তরুণী এরকম মুখ গুমসো করে খানা-কামরায় ঢুকবে কেন? বসালো নিয়ে একই টেবিলে—মুখোমুখি। হে মা-মেরি, পত্রদাম গির্জেয় তোমার জন্য আমি একশ'টা মোমবাতি মানত করলুম। দয়া করো, মা, একটা কিছু ফিকির বাৎলাও আলাপ করবার।

'বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কোনো সন্দেহ নেই আমি বুদ্ধিমান। কোনো ফিকিরই জুটলো না, অথচ মেয়েটি বসে আছে আমার থেকে দু'হাত দূরে এবং মুখোমুখি। দু'হাত না হয়ে দু'লক্ষ যোজনও হতে পারত—কোনো ফারাক হ'ত না।

'জানালা দিয়ে এক ঝটকা কয়লার গুঁড়ো এসে টেবিলের উপর পড়ল। মেয়েটি ভুরু কুচকে সেদিকে তাকাতেই আমি ঝটিতি জানলা বন্ধ করতে গিয়ে করে ফেললুম আরেক কাণ্ড। ঠাস করে জানালাটা বুড়ো আঙুলের উপর পড়ে সেটাকে দিল থেৎলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত।

'মা-মেরির অসীম দয়া কাণ্ডটা যে ঘটলো। মেয়েটি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "দাঁড়ান আমি ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসছি।"

'আমি নিজে ডাক্তার, বিবেচনা করুণ অবস্থাটা। রুমাল দিয়ে চেপে ধরলুম আঙুলটাকে। মেয়েটি ছুটে নিয়ে এল কামরা থেকে ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ। তারপর আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্রসম্মত ডাক্তারি পদ্ধতিতে। বুঝলুম মেডিকেল কলেজে পড়ে। ঝানু ডাক্তার ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ বয়ে বেড়ায় না আর আনাড়ি লোক এরকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারে না।

আমি তো, 'না, না' 'আপনি কেন মিছে মিছে', 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ', 'উঃ, বড্ড লাগছে,' 'এতেই হবে,' 'ব্যস ব্যস' করেই যাচ্ছি আর সেই লিলির মত সাদা হাতের পরশ পাচ্ছি। সে কি রকম মখমলের হাত জানেন? বলছি; আপনি কখনো রাইন ল্যাণ্ড গিয়েছেন? না? থাক, ভুলেই গিয়েছিলুম, প্রতিজ্ঞা

করেছি, আপনাকে কোনে বর্ণনা দেব না।

'প্রথম পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুত খেলে যায়, বলে না ? বড় খাঁটি কথা। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার হাতে কোনো প্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকার কথা নয় তবু আমার যে কী অবস্থাটা হয়েছিল আপনাকে সেটা বোঝাই কী করে ? মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল, কারণ একবার চকিতের তরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।

'তাতে ছিল বিস্ময়, প্রশ্ন এবং হয়ত বা একটুখানি, অতি সামান্য খুশীর ঝিলিমিলি। তবে কি আমার হাতের স্পর্শ—? কোন্ সাহসে এ বিশ্বাস মনের কোণে ঠাঁই দিই, বলুন।'

আমি গুন্ গুন্ করে বললুম,

"জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে।"

ডাক্তার বললেন, 'খাসা মেলডি তো। মানেটাও বলুন।'

বললুম, 'আফ্‌টার ইউ। আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

বললেন, 'গল্প নয়, স্যার, জীবন মরণের কথা হচ্ছে।'

আমি শুধালুম, 'কেন, সেপ্টিকের ভয় ছিল নাকি ?'

রাগের ভাব করে বললেন, 'ইয়োরোপে এসে আপনার কি সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে ? আমাকে হেনেছে প্রেমের বাণ আর আপনি বলছেন অ্যাণ্টিসেপ্টিক্ আন।'

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না।'

বললেন, 'তারপর আমি সুযোগ পেয়ে আরম্ভ করলুম নানা রকমের কথা কইতে। গোল গোল। আমি যে পরিচয় করার জন্য জান-কবুল সেটা ঢেকে চেপে। সঙ্গে সঙ্গে কখনো নুনটা এগিয়ে দি, কখনো ক্রুয়েটটা সরিয়ে নি, কখনো বা বলি, 'মাছটা খাসা ভেজেছে, আপনি একটা খান না ; ওহে খানসামা, এদিকে—'ইত্যাদি।

'করে করে সুন্দরীর মনটা একটু মোলায়েম করতে পেরেছি বলে মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল। 'মেয়েটি লাজুক বটে কিন্তু ভারি ভদ্র। আমার ভ্যাজর ভ্যাজর কান পেতে শুনলো, দু'একবার ব্লাশ্ করলো। সে যা গোলাপি —আপনি কখনো, না, থাক।

'কিন্তু খেল মাত্র একটি অমলেট আর দু'স্লাইস রুটি। নিশ্চয়ই গরীব। ক্ষীণ আশাটার গায়ে একটু গন্ডি লাগল।' এমন সময় ডাক্তারের অ্যাসিস্টাণ্ট

এসে জানালো রুগী এসেছে। ডাক্তার বললেন, 'ম্যানিকে নাবলুম এক বস্তে। এমন ভান করে কেটে পড়লুম যাতে মেয়েটি মনে করে আমি ভ্যান থেকে মাল নামাতে গেলুম। যখন 'গুড্‌বাই' বলে হাত বাড়ালুম তখন সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। প্রেমে পড়লে নাকি মানুষের পাশ গজায়—হবেও বা, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি মানুষ তখন চোখে মুখে এমন সব নূতন ভাষা পড়তে পারে যার জন্য কোনো শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্ত করতে হয় না। তবে সে পড়াতে ভুল থাকে বিস্তর, কাকতালীয় এন্তার।

'আমি দেখলুম, লেখা রয়েছে 'বিপদ' কিন্তু পড়লুম, 'এই কি শেষ' ?'

আমিও অবাক হয়ে শুধালুম, 'বার্লিন থেকে ম্যুনিক অবধি হামলা করে স্টেশনে সেই ছেড়ে দিলেন ?'

ডাক্তারদের বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আদপেই না। কিন্তু কি আর দরকার পিছু নিয়ে ? মেডিকেল কলেজে পড়ে, ওতেই ব্যাস্।

'সেদিনই গেলুম মেডিকেল কলেজের রেস্তোরাঁয়। লাঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই আসবে। এবারে মেয়েটি আর লজ্জা দিয়ে মনের ভাব ঢাকতে পারল না। আমাকে দেখা মাত্র আপন অজানাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে যে খুশী ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না, ভগবান মাঝে মাঝে বুদ্ধিমানকেও সাহায্য করেন।

ততক্ষণে মেয়েটি তার আপন-হারা আবরণটাকে সামলে নিয়েছে—লজ্জা এসে আবার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে।'

ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানেই যদি শেষ করা যেত তবে মন্দ হত না কিন্তু সর্দি-কাশির তো তা হলে কোনো হিল্লে হয় না। তাই কমিয়ে কমিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দি।'

আমি বললুম, 'কমাবেন না। তালটা একটু দ্রুত করে দিন। আমাদের দেশের ওস্তাদরা প্রথম খানিকটা গান করেন বিলম্বিত একতালে, শেষে ধরেন দ্রুত তেতালে।'

ডাক্তার বললেন, 'দুঃখিনী মেয়ে বাপ-মা নেই। এক খাণ্ডার পিসির বাড়িতে মানুষ হয়েছে। দু'মুঠো খেতে দেয়, ব্যাস্। কলেজের ফীজটি পর্যন্ত বেচারী যোগাড় করে মাস্টারী করে।

'তাতে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি এভাকে বুড়ী এমনি নজরবন্ধ করে রেখেছে যে, চকিতা হরিণীর মতো সমস্তক্ষণ সে শুধু ডাইনে বাঁয়ে তাকায়, ঐ বুঝি পিসি দেখে ফেললে, সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা

কইছে। আমি তো বিদ্রোহ করে বললুম, 'একি বুখারার হারেম, না তুর্কী পাশার জেনানা? এ অত্যাচার আমি কিছুতেই সইব না।' এভা শুধু আমার হাত ধরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ, তুমি একটু বরদাস্ত করে নাও; আমি তোমাকে হারাতে চাইনে।' এর বেশী সে কখখনো কিছু বলেনি।

'এই মোকামে পেঁছিতে আমার লেগেছিল ঝাড়া একটি মাস। বিবেচনা করুন। সাত দিন লেগেছিল প্রেম নিবেদন করতে। পনের দিন লেগেছিল হাতখানি ছুঁতে। তারো এক সপ্তাহ পরে সে আমায় বললে কেন সে এমন ভয়ে ভয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়।

'থিয়েটার সিনেমা মাথায় থাকুক, আমার সঙ্গে রাস্তায় পর্যন্ত বেরুতে রাজী হয় না — পাছে পিসি দেখে ফেলে। আমি একদিন থাকতে না পেরে বললুম, তোমার পিসির কুইনটুপ্লেট আছে নাকি যে তারা ম্যুনিকের সব স্ট্র্যাটেজিক পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে তোমার উপর নজর রাখছে, উত্তরে শুধু কাতর স্বরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ'।

যা-কিছু আলাপ পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা সব ঐ কলেজ রেস্তোরাঁয় বসে। সেখানে ভিড় সার্ডিনটিনের ভিতর মাছের মতো। চেয়ারে চেয়ারে ঠাসাঠাসি কিন্তু হাতে যে হাতখানা রাখব তারও উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে।'

আমি বললুম,

'সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।'

ডাক্তার বললেন, 'মানে বলুন।'

আমি বললুম, 'আপ যাইয়ে, পরে বলবো।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই ভিড়ের মাঝখানে, কিম্বা করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপচারি। করিডরে কথা কওয়া যায় প্রাণ খুলে, কিন্তু তবু আমি রেস্তোরাঁর ভিড়ই পছন্দ করতুম বেশী। কারণ সেখানে দৈবাৎ, কচিৎ কখনো এভা তার ছোট্ট জুতোটি দিয়ে আমার পায়ের উপর দিত চাপ।

তার মাধুর্য আপনাকে কি করে বোঝাই? এভাকে পরে নিবিড়তর করে চিনেছি কিন্তু সেই পায়ের চাপ যে আমাকে কত কথা বলেছে, কত আশ্বাস দিয়েছে সেটা কি করে বোঝাই?

হয়ত তার চেনা কোনো এক ছোকরা স্টুডেণ্ট এসে হাসিমুখে তাকে দুটি

কথা বললে অত্যন্ত হার্মলেস্, আমি কিন্তু হিংসেয় জরজর। টেবিলের উপর রাখা আমার হাত দুটো কাঁপতে আরম্ভ করছে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে—

এমন সময় সেই পায়ের মৃদু চাপ।

সব সংশয়ের অবসান, সব দুঃখ অন্তর্ধান।

ডাক্তার বললেন, 'তাই আমার দুঃখ আর বেদনার অবধি রইল না। এই বিরাট ম্যুনিক শহরে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিভৃতে মনের ভার নামাচ্ছে, নিষ্ঠুর সংসারে লড়বার শক্তি একে অন্যের সঙ্গসুখ স্পর্শসুখ থেকে আহরণ করে নিচ্ছে, আর আমি তারই মাঝখানে এমন কিছু করে উঠতে পারছিনে, যাতে করে এভাকে অন্তত একবারের মতো কাছে টেনে আনতে পারি।

শেষটায় আর সইতে না পেরে একদিন এভাবে কিছু না বলে ফিরে গেলুম বার্লিনে। সেখান থেকে লিখে জানালুম, 'ওরকম কাছে থেকে না পাওয়ার দুঃখ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আমার নার্ভস একদম গেছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা আমার কিছুতেই হয়ে উঠত না। —তোমার মুখের কাতর ছবি আমার চলে আসার সব শক্তি নষ্ট করে ফেলত।'

আমি বললুম, 'আপনি তো দারুণ লোক, মশাই। তবে হাঁ, আপনাদের নীচশেই বলেছেন, কড়া না হলে প্রেম মেলে না।'

ডাক্তার বললেন, ঠিক উল্টো। কড়া হতে পারলে আমি ম্যুনিক থেকে পালাতুম না। পলায়ন জিনিষটা কি বীরের লক্ষণ? তা সে কথা থাক।

'উত্তর পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই। সে চিঠিটা আমি এতবার পড়েছি যে তার ফুলস্টপ, কমা পর্যন্ত আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সে চিঠিটির বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকলো।

'আপনাদের দেশে অবিশ্বাস্য বলে কোনো জিনিষ নেই—ভিখিরিকে মাথায় তুলে নিয়ে আপনাদের দেশে হাতী হামেশাই রাজা বানায়। কিন্তু জার্মানিতে তো সে রকম ঐতিহ্য নেই। চিঠিতে লেখা ছিল :—

'বেশী লিখব না—আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থির করেছি, তোমার ইচ্ছামত তোমায় আমায় একবার নিভৃতে দেখা হবে। তারপর বিদায়। যতদিন পিসি আছে ততদিন আমি আর কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আসছে বুধবার দিন আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাতে অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসব।'

ডাক্তার বললেন, বিশ্বাস হয় আপনার? যে মেয়ে পিসির ভয়ে আমার

সঙ্গে কলেজ রেস্তোরাঁর বাইরে পর্যন্ত যেতে রাজি হত না, সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আপন ঘরে ?

আমি বললুম, 'পীরিতি সায়রে ডোবার পূর্বে যে রাধা সাপের ছবি মাত্র দেখেই অজ্ঞান হতেন সেই রাধাই অভিসারে যাওয়ার সময় আপন হাত দিয়ে পথের পাশের সাপের ফণা চেপে ধরেছেন পাছে সাপের মাথার মণির আলোকে কেউ তাঁকে দেখে ফেলে।' ডাক্তার বললেন 'তাই বটে। তবে কি না আমি রাধার প্রেমকাহিনী কখনো পড়িনি। সেকথা থাক।

আমি ম্যুনিক পৌছলুম, বুধবার দিন সন্ধ্যের দিকে। কয়লার গুঁড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল বলে ঢুকলুম একটা পাবলিক বাথে স্নান করতে। টাবে বসে সর্বশরীর ডলাই-মলাই করে আর গরম জলে সেদ্ধ হয়ে চিংড়িটার মত লাল হয়ে যখন বেরলুম তখন হাতে আর বেশী সময় নেই। অথচ টাব থেকে ও রকম হুট করে ঠাণ্ডায় বেরলে যে সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে সর্দি হয় সেকথাও জানি। চানটা না করলেও যে হত সে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম রাস্তায় বেড়িয়ে কিন্তু তখন আর আপশোষ করে কোনো ফয়দা নেই। সেই ডিসেম্বরের শীতে চললুম এবার বাড়ির দিকে—মা-মেরির উপর ভরসা করে, যে এ যাত্রায় সর্দিটা নাও হতে পারে।'

আমি বললুম 'আমরা বাংলায় বলি 'দুর্গা বলে ঝুলে পড়লুম।'

ডাক্তার বললেন 'সাড়ে এগারোটার সময় গিয়ে দাঁড়ালুম এভার বাড়ির সামনের রাস্তায়। টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নিচে—আপনার পাগলা ফারেন-হাইটের হিসেবে বত্রিশের ঢের নিচে। রাস্তায় একফুট বরফ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর আমার চতুর্দিকে যে হিম ঘনাতে লাগলো তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে পারি আমাকে যেন কেউ বিরাট ফ্রিজিডেরের ভিতর তালা বন্ধ করে রেখে দিল।

'তিন মিনিট যেতে না যেতে নামল মুষলধারে—বৃষ্টি নয়—সর্দি। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনামাইট ফাটার হাঁচি—হাঁচ্চো, হাঁচ্চো, হাঁচ্চো। আপনার আজকের সর্দি তার তুলনায় নস্যি, অর্থাৎ নস্যির খোঁচায় নামানো আড়াই ফোঁটা জল। হাঁচি আর জল, জল আর হাঁচি।

কি করি, কি করি ভাবছি, এমন সময় এভা এসে নিঃশব্দে হাত ধরলো—বরফের গুঁড়োর উপর পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তার উপর সে পরেছে সেই ক্রেপ-সোলের জুতো—বেচারীর মাত্র ঐ একজোড়াই সম্বল।

'কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে, করিডরের খানিকটা পেরিয়েই তার কামরা। নিঃশব্দে আমাকে সে

ঢুকিয়ে দরজায় খিল দিয়ে মাথা নিচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

এভার গোলাপি মুখ ডাচ্ পনিরের মত হলদে, টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটি রু ডানয়ুবের মত ঘন বেগুনী নীল—ভয়ে, উত্তেজনায়।

'আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আবার আমার সেই ডাইনামাইট ফাটানো হাঁচ্চো, হাঁচ্চো।

'এভা আমাকে ধরে নিয়ে আমার মাথা গুঁজে দিল বিছানায়। মাথার উপর চাপালো বালিশ আর সব ক'খানা লেপ-কম্বল। বুঝতে পারলুম কেন, পাশের ঘরে পিসি যদি শুনতে পান তবেই হয়েছে।

আমি প্রাণপণ হাঁচি চাপবার চেষ্টা করছি আর লেপ-কম্বলের ভিতর বম্-সেল ফাটাচ্ছি।

কতকক্ষণ এরকম কেটেছিল বলতে পারব না। হাঁচির শব্দ কিছুতেই থামছে না। এভা শুধু কম্বল চাপাচ্ছে। আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম কিন্তু নিবিড় পুলকে বারবার আমার সর্বশরীর পুলকিত হচ্ছে—এভার হাতের চাপ পেয়ে।

'এমন সময় দরজায় ধাক্কা আর নারী কণ্ঠের তীব্র চিৎকার দরজা খোল।'

'পিসি।'

'আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি লেপের ভিতর থেকে বেরলুম। এভা ভয়ে ভিরমি গিয়েছে, খাটের উপর নেতিয়ে পড়েছে।

'আমি দরজা খুলে দিলুম। সাক্ষাৎ শকুনির মত বীভৎস এক বুড়ী ঘরে ঢুকে আমার দিকে না তাকিয়েই এভাকে বললো, 'কাল সকালেই তুই এ বাড়ি ছাড়বি।'

'সঙ্গে সঙ্গে আর কি সব বকুনি দিয়েছিল, ঘেন্না, কেলেঙ্কারি, শোবার ঘরে পরপুরুষ, 'রাস্তার মেয়ের ব্যাভার' এই সব, সে আমার আর মনে নেই। বুড়ী আমার দিকে তাকায় না, গালের উপর গাল চড়ছে যেন ছ-গজী পিয়ানোর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি কেউ আঙুল চালাচ্ছে।

আমি আর থাকতে পারলুম না। বুড়ীর দুই বাহু দুহাত দিয়ে চেপে বললুম,

'আমার নাম পেটার সেলবাখ্। বার্লিনে ডাক্তারি করি! ভদ্রঘরের ছেলে। আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই।'

ডাক্তার বললেন, মা-মেরির সাক্ষী, আমি এভাবে বিয়ে করার প্রস্তাব এতদিন করিনি পাছে সে 'না' বলে বসে। আমি অপেক্ষা করছিলুম পরিচয়টা ঘনাবার জন্য। বিয়ের প্রস্তাবটা আমার মুখ দিয়ে যে তখন কি করে বেরিয়ে

গেল আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

'পিসি আমার দিকে হাবার মত তাকালো—এক বিঘৎ চওড়া হাঁ করে। পাকা দু'মিনিট লেগেছিল ব্যাপারটা তার বুঝতে। তারপর ফুটে উঠল মুখের উপর খুশীর পয়লা ঝলক। সেটা দেখতে আরো বীভৎস। মুখের কুঁচকানো এবড়ো-খেবড়ো গাল, ভাঙা চোরা নাক-মুখ-ঠোঁট যেন আরো বিকৃত হয়ে গেল।

'আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল করিডরের দিকে। চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে।'

'এভা তখনো অচৈতন্য।

'বুড়ী ফিরে এল বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে। তার চেহারার খুশীর পিছনে দেখলুম সেই ভীত ভাব—এভার মুখে যেটা অষ্টপ্রহর লেপা থাকে। বুঝলুম, পিসির দাপটে এবাড়ির সকলেরই কণ্ঠশ্বাস। মনে হল বুড়ো খুশী হয়েছে, এভা যে এবাড়ির অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার জন্য। হায়, তার তো নিষ্কৃতি নেই।

ডাক্তার বললেন, 'সেই দুপুররাতে ওয়াইন এল, শ্যাম্পেন এল। হোটেল থেকে সসেজ কটলেট্ এল। হৈ-হৈ রৈ-রৈ। এভা সম্বিতে ফিরেছে। বুড়ো শ্যাম্পেন টানছে জলের মত। বুড়ী এক গেলাসেই টং। আমাকে জড়িয়ে শুধু কাঁদে আর এভার বাপের কথা স্মরণ করে বলে, ভাই বেঁচে থাকলে আজ সে কী খুশীটাই না হ'ত।

আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে কানে বলল, 'জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো।'

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঢুকলেন এক সুন্দরী—হাঁ সুন্দরী বটে।

এক লহমায় আমি নর্থ সীর ঘন নীল জল, দক্ষিণ ইটালির সোনালি রোদে রুপালি প্রজাপতি, ডানয়ুবের শান্ত প্রশান্ত ছবি, সেই ডানয়ুবেরই লজ্জাশীল দেহছন্দ, রাইল্যাণ্ডের শ্যামলিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সব কিছুই দেখতে পেলুম।

আর সে কী লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

আমি মাথা নিচু করে ফরাসিস কায়দায় তাঁর চম্পক করাঙ্গুলিপ্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে মনে বললুম,

'বেঁচে থাকো সর্দি-কাশী
চিরজীবী হয়ে তুমি।'

শিবরাম চক্রবর্তী

পরিবার-পরিকল্পনা

কথায় কথায় কথাটা উঠল। পরিবার-পরিকল্পনার কথা। খুব গুরুত্ব দিয়ে পাড়লাম কথাটা। 'পরিবার-পরিকল্পনা আর এমন কী কথা!' বললেন শ্রীহর্ষবর্ধন। 'পরিবারকে পরী বলে সবাই কল্পনা করে। বিশেষ করে পরের পরিবারকে।'

'—না না'। বাধা দিয়ে বললাম আমি : 'পরস্ত্রীকাতরতা কোন কথা নয়। পরিবার-পরিকল্পনা মানে পরিবারের পরিকল্পনা…'

—'সব পরিবারেরই থাকে। কতো রকমের কল্পনা যে তাদের মাথায় খ্যালে মশাই…!'

—'আরে না না! সে কথাই নয়। আপনার পরিবার নয়, শ্রীমতীর কথা বলছি নে। আপনি করবেন পরিকল্পনাটা! আপনাদের পারিবারিক প্ল্যান কি রকম হবে না হবে…'

—'কিন্তু পরিবারের তো একটা পরিকল্পনা আছে, তার নিজস্ব আইডিয়া আছে একটা? সেটা আপনি ধরছেন না কেন?'

—'ধরব না কেন? দুজনে মিলে যুক্তভাবে—যুক্তিযুক্তভাবেই ত করতে হবে প্ল্যানিং। ফেমিলি প্ল্যানিং তো বলেই দিয়েছে।'

—'কিন্তু আপনি যে প্ল্যানই করুন না, আপনার ফেমিলি সেটা ভেস্তে দেবেই। ফেমিলি মানে আপনার পরিবার মানে আপনার ইয়ে...' তিনি বিশদ করে দিয়ে ছাড়েন।

আমি তখন অন্যদিক দিয়ে এগুলাম ঃ 'আপনার পরিবারে ছেলেপুলে ক'টি ?'

—'বলতে গেলে মোটামুটি আড়াইজন।'

উনি বললেন ঃ 'ছেলে বলতে আমি, মেয়ে বলতে উনি আর গোবরা সে পিলের মধ্যে গণ্য।'

'আড়াইজন বলছেন কেন ?'

'মোটামুটি বলতে গেলে তাই। আমি মোটা, আমার বৌ মুটী আর গোবরা ? সে তো একটা শুঁটকো। নিতান্তই আধখানা।'

'এ তো গেল আপনাদের কথা। আমি সে কথা বলছি না। বলছি আপনার বংশধরের কথা। আপনাদের ছেলেমেয়ে ?'

'নাস্তি। একটিও না। হয়নি, হবে না, হবার আশা নেই।'

'সে কি! তাহলে কাউকে পোষ্যপুত্র নিন। আপনার এই বিপুল সম্পত্তি খাবে কে ?'

তিনি সন্দিগ্ধ নেত্রে আমার দিকে তাকালেন—'সে গুড়ে বালি।'

মনে হল তিনি আমাকেই তাঁর পোষ্যপুত্রের আবেদনকারী বলে ঠাওর করেছেন। তাড়াতাড়ি তাঁর সন্দেহ নিরসনের জন্য বললাম—'আমি বলছিলাম কি, সদ্বংশজাত পছন্দসই কোন বাচ্চা দেখে...'

'সেই কথাই ত বলছি।' তিনি বললেন—'বলেছিলাম গিন্নিকে কথাটা। তিনি বললেন—'ছেলে মানুষ করা ভারী শক্ত।'

'ঠিকই বলেছেন উনি। কিন্তু সে তো দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা। দুধ খেতে চায় না। দিনরাত্তির চ্যাঁ ভ্যাঁ করে। কান্নার জ্বালায় প্রাণ যায়। ভারী বিরক্তিকর। কিন্তু কচি ছেলে ত নয়, আমি বলেছিলাম—কোন বড় সড় ছেলে, মানে খুব বড় নয়, সে হলে আবার পোষ মানবে না। এই ধরুন, এই বালক।'

'তাঁর ধারণায়, বালকদের মানুষ করা কঠিন।' তারপর ধীরে ধীরে তাঁর মুখে তাঁর পারিবারিক পরিকল্পনার কাহিনী ব্যক্ত হতে থাকে। '...আমার পরিবারের মত হচ্ছে ছেলেদের মানুষ করা যায় না, তারা মানুষ হতে চায় না। ছেলে না পুষে তার চেয়ে হাঁসমুরগী পোষা ঢের ভালো।'

'হাঁসমুরগী পুষে তো ডিম হবে।' গিন্নিকে আমি বলেছিলাম।

'হ্যাঁ ডিম হবে। সেই ডিমের জন্যেই তো পোষা। ডিম থেকে আয় দেয়। আর ছেলের থেকে? ঘোড়ার ডিম।'

'ছেলে বড় হলে উপায় করবে। রোজগার করে টাকা আনবে। ডিমের থেকে কি আয় দেবে শুনি?' আমি বললাম।

'খেলেই আয়। ডিমের ওমলেট, পোচ, ডিমের হালুয়া, ডিমের কারি...' কাঁড়ি কাঁড়ি কথা এনে ফেললেন উনি। হাঁড়ি হাঁড়ি হালুয়া!

'আর ছেলের থেকে যে পিণ্ডিম?' আমি তখন পাড়লাম: 'মরে গেলে গয়ায় কে পিণ্ডি দেবে আমাদের? ভূত হয়ে থাকতে হবে যে!'

'সেও ভালো। ভূত হওয়া যায়—কিন্তু ভূতদের মানুষ করা যায় না। চোখের উপরই দেখছি ত! বাপ-মা কতো চেষ্টা করছে—ছেলে মানুষ হচ্ছে না! এই পাড়াতেই দেখছি ত! ভগবান দেননি ভালো করেছেন। বাড়ি বয়ে আবার সেই ঝঞ্ঝাট ডেকে আনা কেন?'

'আমাদের ছেলেও মানুষ হত না, বলছ কি তুমি?'

'কি করে হত? বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বিগড়ে যেতো না? সঙ্গদোষে লোহা ভাসে শোনোনি?'

'বলো কি? আমাদের সঙ্গে থেকেও?'

'বাড়িতে আর থাকত কতক্ষণ? খালি খাবার সময় আর শোবার সময়। পাড়াতেই ত কাটাত সারাদিন। কেলাসের বন্ধুরা সিগ্রেট খেতে শেখাত, বই বেচে দিয়ে সিনেমা দেখত। ইস্কুলের মাইনে ইস্কুলে না জমা দিয়ে...'

'যাও যাও, অমন কথা বল না।'

'তার ফলে ইস্কুল থেকে ওর নাম কেটে দিত। আমরা টেরও পেতুম না। ঠিক দশটায় ইস্কুলের নাম করে বেরিয়ে যেতো, কোথায় যেতো কে জানে। সারা দিন পাড়ায় পাড়ায় টই টই করে বেলা পাঁচটায় ফিরতো বাড়িতে, জলখাবার খেয়ে ফের উধাও। এদিকে ছেলে বছরের পর বছর কেলাসে উঠে যাচ্ছেন, বইও কেনা হচ্ছে বছর বছর, আর ইস্কুলের মাইনেও দেওয়া হচ্ছে মাস মাস। ছেলে টেষ্ট দিল, ম্যাট্রিকও দিল, কিন্তু গেজেটে নাম নেই। পরে ইস্কুলে খবর নিয়ে জানা গেল, সিক্সথ্ ক্লাস থেকে সে ইস্কুলে ইস্তফা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভিখিরি হয়ে গেল ছেলেটা...'

'ভিখিরি? আমাদের ছেলে ভিখিরি হতে যাবে কোন্ দুঃখে? তাই বলে কে! ছেলেদের যে কতো দুঃখু আমরা তার কী জানি?'

'তা বলে আমাদের ছেলে ভিখিরি হবে না! এত টাকা থাকতে আমাদের!'

'ভিখিরি কি আর। ভিক্ষে নয়, চাঁদা আদায় করে বেড়াবে। আজ সরস্বতী পুজো, কাল কালীপুজো, পরশু শেতলা পুজো, তারপর দিন নেতাজী পুজো, রবি ঠাকুরের পুজো, তারপরে থিয়েটার, সংস্কৃতি সম্মেলন কত কি। এই সবের জন্য চাঁদা দাও। খাওয়া নেই দাওয়া নেই দরজায় দরজায় ঘুরবে আমাদের ছেলে। একে ধরবে, ওকে সাধবে, রিক্সাওয়ালা, কয়লাওয়ালা, গয়লা, মুচি কেউ বাদ যাবে না। সবার কাছেই চাঁদা চাইবে। আর চাঁদা চাওয়া মানেই ত ভিক্ষে চাওয়া।'

তারপর আর আমি কথা কইতে পারলুম না। বললুম, বেশ তবে আর পোষ্যপুত্র নিয়ে কাজ নেই। হাঁসমুর্গীই পোষ তাহলে। বাড়ির পেছনে খানিকটা জায়গা ত ফাঁকা পড়ে আছে। গোবরাকে সঙ্গে নিয়ে টেরিটি বাজারে চলে যাও। সেখান থেকে কিনে আনোগে হাঁসমুর্গী'...

এই ত আমার পরিবারের পরিকল্পনা মশাই।

আমি বললাম ঃ 'চমৎকার।' এতক্ষণে ফোড়ণ কাটবার একটা ফুরসৎ পেয়ে।

তিনি বলতে লাগলেন—'চমৎকার আর বলতে। তারপর থেকে ঘুমোবার দফা রফা। গিন্নির পোষ্যপুত্তুররা রাত্তিরে টু" শব্দটি করে না বটে, কিন্তু ভোর না হতেই কী তাদের সোরগোল। কোঁকর কোঁ কোঁকর কোঁ কোঁকর কোঁ... সবার সেরা ঘুম হচ্ছে গিয়ে ভোরবেলায়— বিধাতার সৃষ্টি এমন মিষ্টি ঘুম আর হয় না। সেই ঘুমটাই মাটি। আট্‌টা অব্দি বিছানায় গড়ানো আমার অভ্যেস। পাঁচটা না বাজতেই আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেয়। দু'ডজন মুর্গীর সে কী আওয়াজ মশাই। চোখের পাতা বুজব তার যো কি!

দিনকতক গেলে বললাম একদিন গিন্নীকে—'তোমার পুষ্যিপুত্তুররা ঝাড়ে বংশে বেজায় বেড়েছে মনে হচ্ছে। বড্ডো বাড় বেড়েছে।'

'কেন বল তো?'

'হাঁকডাকের তো কমতি দেখছি নে। দিনকের দিন বেড়েই যাচ্ছে তাদের চেঁচামেচি। সেই দু'ডজন বোধ হয় নেইকো আর? দুশো হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই না?'

'হতে দিলে ত। রোজ যা ডিম পাড়ছে পাড়তে না পাড়তেই, তোমরা দু-ভাইয়েই তো সাবাড় করে দিচ্ছ...'

'তা বটে!' আমি সায় দিই ঃ 'সকালের চা-তে ডিম, দুপুরের ভাতে ডিম, রাতে ডিম...অতিথি এলে তার পাতে ডিম। তবে আমি হলফ্‌ করে বলতে পারি তুমিও এর মধ্যে রয়েছ। নাতিদের বংশলোপের এই নাতিবৃহৎ কাণ্ডে

তুমিও আছ মশাই !'

গিন্নি ঘাড় নেড়ে বলল ঃ 'আছিই তো। বারে, আমি বাদ যাবো না কি ? আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি ? তবে…তাছাড়া…তাছাড়া…'

'তাছাড়া আবার কে ? আবার কারা ?'

গিন্নি একটু ইতস্ততঃ করে বলেন—'পাড়ার ছেলেরাও আছে। যখন তখন ফাঁক পেলেই বেড়া ডিঙিয়ে চলে আসে। যারা আমাদের কাছে চাঁদা চাইতে আসত তারাই। এখন তারা মুর্গীদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়।'

'বটে ! চলো তো দেখিগে বাগানটার অবস্থা। বেড়াটা উঁচু করে দেয়া যায় কিনা দেখা যাক। কিংবা কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে দিলে কেমন হয় !'

'না, না থাক্‌গে যাক্‌গে' বাধা দিলেন উনি—'থাক্ না ! কতো খাবে। খেলে ওদের চেহারা ফিরবে। যা চেহারা ওদের !'

তবু গেলাম একবার ওঁর চিড়িয়াখানাটা দেখতে।

দেখি গিয়ে, কুক্কুট বংশীয় গোটা চব্বিশেকই বটে, তবে তার বারোটা মুর্গী আর বারোটা মোরগ। বাগানময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

'এত গুলো মোরগ কেন ?' অবাক হয়ে আমি শুধোলাম ঃ 'করেছ কি !'

'কেন আবার ! প্রত্যেক মুর্গীর একটা করে মোরগ। কেন, কী হয়েছে ?'

'তার কোন দরকার ছিল না। বাইশটা মুর্গীর জন্য গোটা দুই মোরগ রাখলেই কাজ দিত। তাই যথেষ্ট।'

'আমি ওসব নোংরামো একদম পছন্দ করিনে।' তিনি মুখ বেঁকিয়ে বললেন।

'কেন নোংরামোটা কী হল ? এই নিয়ম ত ?'

'এই নিয়ম ! কেন মুর্গী বলে কী ওরা মানুষ নয় ? ওদের বুঝি সতীত্ব বলে কিছু থাকতে নেই ?' তিনি ঝংকার দিয়ে উঠলেন।

'মুর্গীর সতীত্ব ! শুনে তো আমার তাক লাগে মশাই।'

'এক একটা মোরগের এগারোটা করে মুর্গী ?' তাঁর দুই চোখে আগুনের হল্‌কা দেখা যায়—'তোমরা পুরুষরা তাই চাও ! তাই চাইবেই তো ! কিন্তু আমি তা হতে দেব না !'

হয় তাহলে অকুস্থানকে নাগালের মধ্যে পেতে কতটা সময় লাগতে পারে ভেবে দেখুন।

অথচ এটা ঠিক যে ইংরেজ আমলের হুড়োহুড়ি করার অভ্যেসটা আমরা ছেড়ে ভদ্দরলোক হয়েছি, এখন আর চট করে এসে পট করে কিছু ব্যবস্থা করার জো নেই, যদি অবশ্য পয়সা না থাকে—তাহলে আমার মত রেস্তবিহীন গেরস্ত একটা লোক কত জায়গায় লাইন লাগাবো বলতে পারেন? প্রত্যহ রেলওয়ে জংশনে গিয়ে যদি সব লাইনেই আমাকে যেতে হয়, তাহলে কি হয়? অত সময় পাচ্ছেন কোথায়?

ভটচাযিমশাই সেদিন বললেন, মশাই পনেরো দিন ক্যাজুয়েল লিভ, একমাস প্রিভিলেজ লিভ, সব খুইয়েছি শুধু লাইন লাগাতে, এরপর একটা রোগ হয়ে হাড়মুড় গুঁজে পড়লে স্রেফ আধা-কড়িতে কাজ করতে হবে। তার পরের অবস্থা যা হবে তাও দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আমি লাইনেই দাঁড়িয়ে থাকবো আর জুলজুল করে দেখবো চাকরি, সংসার সব-কিছু বে-লাইনে চলে গেছে। আমার জন্য লাইন লাগিয়ে তো আর কেউ বসে থাকবে না; বয়ে যাচ্ছে।

বুঝলুম, কথাটা মিথ্যে নয়—অবস্থা দিনের দিন যা হচ্ছে তাতে করে মনে হয় বিধাতা বোধ হয় আমাদের জন্যে সেই ব্যবস্থাই বিধিবন্ধ করে রেখেছেন।

ওঃ! ব্যবসা না করে যে কী ভুল করেছি তাই সময় সময় ভাবি। যে-কোন ব্যবসা ফাঁদলে স্বরাজের পর কিছু ভাল মাফিক হয়ে যেতেই অমন যে নুন--তাও মনে করুন, গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে আমার সহৃদয় দেশবাসী দিন তিনেকে তিন তিরিক্ষে প্রায় ন-গুণ দাম বাড়িয়ে মবলক কিছু পকেট মেরে বেরিয়ে গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি, পড়ি কি মরি করে পনেরো 'কিলো' নুন পনেরো টাকায় কিনে ভবিষ্যতকালের সঞ্চয় করতে গেলুম—এখন যে-গুলো বর্ষার স্যাঁত-সেঁতে জ'লো হাওয়ায় জ'রে আমার শরীর শ্বর শ্বর করে তুলেছে, আর তাড়াতাড়ি সেই ফাঁকটা বুজে যেতে এখন দেখছি আবার পনেরো পয়সায় 'কিলো' চালু হয়ে গেছে।

অথচ খামকা আমার মত নিরীহ প্রাণীকে স্রেফ কটাদিন এই 'কিলো' কিলিয়ে দড়কচা মারিয়ে দিয়ে গেল কেন বলতে পারেন? গজগজ করতে করতে বাধ্য হয়ে চুলো ধ্বালিয়ে রান্নার বন্দোবস্ত করতে দেশলাইয়ের প্রয়োজন হল, মোড়ের

মাথার দোকানী মুলোর মত একজোড়া সাদা দাঁত বের করে তার দাম চেয়ে বসলো—সাত পয়সা। অথচ মার্কায় দাম লেখা ছ-পয়সা।

জিজ্ঞেস করলুম, এক পয়সা বাড়ল কেন ?

সে একটু টিপ্পনী কেটে আধা ভেংচে জবাব দিলে, ট্রামের ভাড়া বাড়ল, বাসের ভাড়া বাড়ল, কর্পোরেশনের টেক্সো বেড়ে গেল, কৈ তার বেলায় তো কিছু বললেন না, আর দেশলাইয়ের দাম এক নয়া পয়সা বাড়তেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ? আপনি কি রকম লোক মশাই। ইচ্ছে হয় নেন, নয় তো অন্য দোকানে সস্তায় কিনে আনুন, তারপর বুঝবেন কটা কাঠিতে তার বারুদ লাগানো আছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, সে কি হে। ছ-পয়সার দেশলাইয়ে বারুদ থাকে না সব কাঠিতে ?

সে বললে, আজ্ঞে না—সব গোলা বারুদ তৈরীর জন্যে চলে যাচ্ছে। আমরা সেভাবে লোক-ঠকানো দেশলাই বেচি না।

বাধ্য হয়ে সৎ ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই সাত পয়সার মাল খরিদ করতে হল, যদিও মনে মনে বুঝলুম যে এরা বোঝে, আমাদের কি করে ঘায়েল করতে হয়, কারণ জানে বাবুরা সবাই ঢাল তলোয়ারবিহীন নিধিরাম সর্দার—এরা শুধু চেঁচাতে পারে তার বেশী কিছু করার ক্ষমতা নেই।

সত্যি চেঁচানো ছাড়া আমরা আর কি করছি ? দেশের জন্যে দেশবাসীদের আক্ষেপের অন্ত নেই কিন্তু দিগন্তব্যাপী দস্যুবৃত্তি অভিনব উপায়ে আত্মপ্রকাশ করছে। কাউকে বিশ্বাস করার উপায় নেই—অথচ কাঁহাতক প্রত্যেক লোকটাকে অবিশ্বাস করি। ট্রামে-বাসে-ট্রেনে মনে করুন লিখে জানিয়ে দিচ্ছে, পকেটমার থেকে সাবধান, আপনার পাশেই আছেন কিন্তু তারা ছাড়াও বড় বড় আবাসে যারা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে সিগারেট ফুঁকছেন তাঁরা আইনসম্মতভাবে সকলেই কি উজীর, ওমরাহ, শেঠজী হয়েছেন বলে মনে হয় ? যে পাচ্ছে সেই দু-পয়সা সুবিধে করে নিচ্ছে, আমরা খবরের কাগজে জোর সম্পাদকীয় নিবন্ধ পড়ে খুশীতে ভরপুর হয়ে বসে আছি।

এতদিন চুরি জিনিসটা বড় বড় জায়গায় চলতো কিন্তু এখন সর্বত্র ওটা রেওয়াজ হয়ে গেছে দেখছি। মনে করুন, বাড়িতেও রেহাই নেই।

সেদিন ভবানীপুর থেকে অপদস্থ হয়ে বাস থেকে নেমে বেলগেছেতে হেঁটে চলে আসতে হল আমাকে। কেন জানেন ? বাসভাড়া দিতে গিয়ে দেখলুম ব্যাগ আছে। ব্যাগে ডাইং ক্লিনিংয়ের বিল রয়েছে, নেই শুধু সম্বল চার

আনা পয়সা। অথচ রাত্তিরে চার আনা পয়সা আমি তাতে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি। তারপর জামাটি পরে বেরিয়ে গেছি, তার আগে কখন কোন ফাঁকে গিন্নী সেটি গায়েব করে ছেলেদের বিস্কুট আনতে দিয়েছেন, আমায় বলারও প্রয়োজন মনে করেননি—ফলে বুঝুন, এক গাড়ি লোকের সামনে কী বেইজ্জত!

যদি বলেন, ওটা ঠিক চুরি নয় ওটায় ও'র অধিকার আছে কিন্তু আমি আলবৎ বলবো, কভি নেই! তোমাকে তো মাইনে কড়ি সব দিয়েছি কিন্তু আমার পকেটের চার আনা ছ'আনা পয়সা যদি না বলে গাপ কর, আর আমার চলন্ত বাস থেকে হনুমানের মত মান বাঁচাতে লাফ মেরে পালাতে বাধ্য কর, তাহলে সেটাকে আমি চুরিই বলবো!

সেদিন মেজবাবুর ছেলে খোন্তাটা মনে করুন তার বাপের ক্যাশ বাক্স থেকে পাঁচসিকে সরিয়ে সিনেমা দেখে এসে ধরা পড়ল সিনেমা থেকে বেরুবার সময়, তার মামা ধরলে। সবাই বললে, আহা ছেড়ে দাও, ওরই তো জিনিস। বাপ মলে ত সব ওরই হবে—তা শুনে আমি বললুম, তা ত হবে কিন্তু তোরা মরবার টাইমটা দে। আমরা ত আর বড় বড় লোকের মত বরাত করে আসিনি যে, খবরের কাগজে বেরুবে, গতকল্য রাত্রে অমুকের সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার পরলোকের পথে যাত্রা করিবার সুগম ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। আমাদের ধরতে ত সেই ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মত। আসন্নকালে শুয়ে পড়ে, মুখ দিয়ে গেঁজলা বেরুলেও চাবুক মেরে তাকে উঠিয়ে গাড়িটাকে অন্ততঃ আস্তাবল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার জন্য ত চেষ্টা করবে সকলে। অতএব এসব চুরিকে মাপ করি কি করে?

কিন্তু এগুলোর সমর্থনে বলার লোকও নেই কোথাও। মশাই, আমাদের আপিসের বুড়ো নন্দী মশাই ত তিনবেলা যত বেটা চোর বাটপাড় জুটেছে দেশে. দেশটা উচ্ছন্ন যাবে, এতটুকু বিশ্বাস করা যায় না কাউকে, এখানে ভদ্দর লোকে থাকে, বলে চিৎকার করতে করতে গভর্ণমেন্টের বাপান্ত করেন, সারাদিন ঘণ্টা দুয়েক টেবিলের কাজ করেন, বাকি সময়টা হয় খেলা নিয়ে—তর্ক-বিতর্ক করে, নয় ইউনিয়ন ও কর্তৃপক্ষের মুণ্ডুপাত করতে করতে আফিসময় বিচরণ করে পাঁচটা আটান্নর ট্রেনে শ্রীরামপুরের যাত্রী হন। কিন্তু সম্প্রতি খবরের কাগজে তাঁর কাণ্ডকারখানা যা বেরিয়ে গেছে দেখলুম তাতে তো আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

তিনি শ্রীরামপুর যাচ্ছেন, এমন সময় এক টিকিট চেকার উঠলেন গাড়িতে। এবং নিয়ম মাফিক টিকিট দেখাতে বললেন—বুড়ো তাঁর দিকে না চেয়েই গম্ভীর

ভাবে বলে উঠলেন, মান্থলি।

টিকিটবাবু বললেন, দেখান একটু।

তিনি রাগতঃ স্বরে বলে উঠলেন, বললুম, বিশ্বাস হল না।

টিকিটবাবু একটু মৃদু হেসে বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না, আমাদের যা ডিউটি তাই আমরা কচ্ছি।

হুঃ!—বলে তীব্র দৃষ্টিতে তাঁর মুখের ওপর একবার চেয়ে তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন। টিকিট চেকার ছাড়বেন কেন, তিনি তাগিদ দিতে লাগলেন, আশপাশের ভদ্রলোকরাও বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, আরে মশাই দেখান না।

নন্দীমশাই অবিচলিত সংকল্প নিয়ে অনড় অবস্থায় বসে রইলেন—চেকারের জেদ বাড়তে লাগলো। আশে পাশের লোকেরাও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

সেই সময় হঠাৎ নন্দীমশাই তড়াক করে উঠে, বুক পকেট থেকে তাঁর মান্থলি টিকিটটা বার করে টিকিট চেকারের চোখের সামনে ঘন ঘন আন্দোলন করতে করতে রেগে ক্ষেপে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, এই দেখ, টিকিট আছে কি না। কিন্তু এ তোমায় আমি দোব না, দূর করে ফেলে দিয়ে আবার কাল একখানা মান্থলি কিনবো সেও ভি আচ্ছা, তবু তোমার মত লোকের হাতে এটা দোব না! দোব না! যা করতে পার কোরো।

এ বলে চকিতে চলন্ত ট্রেন থেকে মান্থলি টিকিট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার সিটে চেপে বসলেন।

টিকিট চেকার হাঁ—অন্য যাত্রীরাও তথৈবচ। বুড়ো পাগল নাকি! ডেলী প্যাসেঞ্জাররা এক বিচিত্র চিজ এবং এদের সঙ্গে আর বেশী গোলমাল করলে কোন সুবিধে হবে না বুঝে আর বৃদ্ধের কিম্ভূত আচরণ দেখে চেকারবাবু একটু হেসে পরের স্টেশনে নেমে গেলেন।

আবার ট্রেন চলতে একটি ছোকরা প্যাসেঞ্জার জিজ্ঞেস করলে, তাই তো দাদু, মাসের সাত দিন না যেতেই টিকিটটা ফেলে দিলেন? এ কি বোকামি করলেন আপনি?

বুড়ো নন্দীমশাই তার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তা কি করবো? চেকারটা এদ্দিন কিছু দেখতে চায় নি, আজ আবার ঢং করে চেয়ে বসল কেন? অথচ জানে আমি মান্থলি টিকিট হোল্ডার, এসব বজ্জাতি নয়?

ছোকরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সঙ্গে এত পরিচয় থাকতেও

টিকিট দেখতে চাইলে কেন তাহলে ?'

—বুঝছো না, নন্দ বোধ হয় ঠেলা মেরেছে, তাই কাজ দেখাচ্ছে, চুরি ধরছে। আরে বাবা, আমাদের কি ধরবি, রাঘব বোয়ালদের আগে ধর, তারপর ত আমরা।

বিরক্ত সুরে কথাগুলো নন্দী মশাই উগড়ে দিলেন।

ছোকরা তবু বলে উঠলো, তাহলে এখন স্টেশনের গেটে ধরলে কি হবে ?

আরে সেখানকার গেটওয়ালারা দশ বছর দেখে দেখে আর জিজ্ঞেসও করে না। শুধু একবার 'মা' বলে হাঁ করলেই বুঝে নেয় এ রোজের খদ্দের—কিন্তু ইনি জেনেও আজ বাহাদুরী করতে গেলেন যে।

ছোকরা বললে, তা দাদু আপনার তাহলে অতটা রাগ করা ঠিক হয় নি—একবার টিকিটটা দেখালেই পারতেন।

নন্দীমশাই মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন, বটে আর কি! ও টিকিট কি আজকের ? অন্ততঃ বছর দশেক আগে কেনা! আমি ওকে ঐটি দেখিয়ে শেষে ঘানি টানতে যাই আর কি।

কামরা শুদ্ধ লোক তাজ্জব—লোকটা বলে কী! নন্দীমশাই সবার মুখ-চোখের ভাব দেখে বোধ হয় বুঝলেন যে, তাঁর কথাটা বোধ হয় সকলে সমর্থন-যোগ্য বলে মনে করছে না, তাই পুনরায় বেশ চেঁচিয়েই সকলকে শুনিয়ে বলে উঠলেন, ওরে বাবা, স্বরাজ পাওয়া এস্তোক তো কোন সুখ-সুবিধেই পাওয়া গেল না, তার মধ্যে যেটুকু হাতের তেলোয় বুদ্ধি খাটালে পাওয়া যায় তা পেলে দোষটা কি ? দেশের রেল, দেশের লোকে চড়ছে, তাতে দু-চারজন পয়সা না দিয়ে চড়লে কি রেলের নড়ন চড়ন বন্ধ হয়ে যাবে ? কয়লা সেই সমানই পুড়বে, চাকাও সমানই ঘুরবে, তাহলে আর ক্ষতিটা আমি কার কি করলুম ?

সকলেই বুঝলে যুক্তি অকাট্য। স্বরাজ যখন আমরা পেয়েছি, তখন দেশের সরকারকে ও জনসাধারণকে দেশের বহু অদ্ভুত, উদ্ভট ও বিচিত্র মানুষের কাছে খেসারৎ দিতে হবেই।

সতীনাথ ভাদুড়ী

করদাতাসংঘ জিন্দাবাদ
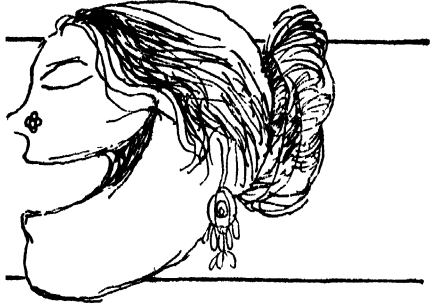
'আ গয়া' এসে গেল ; এসে গেল আবার।

কী আবার এল ?

ভোট। ভোট। মিউনিসিপ্যালিটির ভোট। 'সজ্জনো!'

ভদ্রমহোদয়গণ!—'সাথিয়োঁ!' ভাইসব!

চলবে না। চলবে না। আর ওসব চলবে না।

সহ্যের সীমা পার হয়ে গিয়েছে, করদাতাদের যেমন প্রতিবার যায়। দরকার একটা দল তয়েরের। 'কাজেই প্রতিবারের মত এবারেও জন্ম নিতে হল রেট্‌-পেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনকে।' আর পি এ। মরসুমী ফুল এবার রং বদলেছে ; হিন্দীতে নামকরণ হয়েছে 'করদাতাসংঘ'। 'নাগরিকো!' নগরবাসী ভাই বোনরা! মনে রাখবেন!

ছোট্ট শহর বাভনগামা। এখানকার সকলেই সকলকে চেনে।

রামখড়ম সিং মুর্দাবাদ! করদাতাসংঘ জিন্দাবাদ! মরা মানুষকে আর মেরে লাভ কি। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে রামখড়ম সিং। এতকাল ঐ লোকটাই ছিল আর পি এ-র জয়যাত্রার পথের সবচেয়ে বড় বাধা গদিয়ানপার্টির

লিডার। যাদের হাতে মিউনিসিপ্যালিটির শাসনভার, আর পি এ-র লোকেরা তাদের দলের নাম দিয়েছে গদিয়ানপার্টি। তাদেরই হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে।

গদিয়ান-পার্টি মুর্দাবাদ!

এবার বুঝি ভগবান সদয়। নইলে রামখড়্গ সিংয়ের ভীমরতি ধরবে কেন এই বয়সে।

লোকে থুতু দিচ্ছে তার গায়ে। দেয়ালে দেয়ালে তার ব্যঙ্গচিত্র বার হয়েছে। ছড়া বাঁধা হয়েছে তাকে নিয়ে। সাধে কি আর গদিয়ান-পার্টির সদস্য ক্ষেপেছে তার উপর। এত ক্ষেপেছে যে, কালকের পার্টি-মিটিং-এ তারা ঠিক করেছে, রামখড়্গ সিংকে আর দলপতি রাখা হবে না। গলা-ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া আর কাকে বলে।

এই উল্লাস ও উদ্দীপনাময় পরিবেশে আজ করদাতাসংঘের মিটিং বসেছে। সদস্যদের ঘরোয়া বৈঠক। মুখ্য কাজ দলপতি নির্বাচন। এমন লোকের হাতে নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে, যিনি ভোটযুদ্ধে পার্টিকে জয়যুক্ত করাতে পারবেন এবং তারপর চেয়ারম্যান হয়ে আর পি এ-র আদর্শ অনুযায়ী মিউনিসিপ্যালিটি চালাতে পারবেন।

মিটিং-এর সভাপতি মহাশয় বললেন—শান্তি! শান্তি! চুপ করুন সকলে। রামখড়্গ সিং-এর গল্প অনেকক্ষণ ধরে করা হল। এইবার কাজের কথা হোক। রামখড়্গ সিং-এর সংগঠনশক্তি থেকে গদিয়ান-পার্টি এবার বঞ্চিত হবে, এটা আমাদের পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা ঠিকই; কিন্তু তবু জয়যাত্রার পথ বড় বন্ধুর। অতি সাবধানে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। প্রাথমিক প্রস্তুতিটার উপরই আমাদের ভবিষ্যতের সাফল্য নির্ভর করছে। এটা ঠিকভাবে করা হয়নি বলেই আমরা এর আগে প্রতিবার মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশানে অসফল হয়েছি। কেন আর. পি. এ প্রতিবার পরাজিত হয়? এদল উঁচু আদর্শ থাকা সত্ত্বেও কেন গদিয়ান-পার্টির সঙ্গে পেরে ওঠে না? এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে সাহস ও সততার সঙ্গে। আমার ধারণা আমরা হেরেছি উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে। আমার ধারণা ভুল হতে পারে; কিন্তু তাহলে আপনারা বলুন কোথায় আমাদের গলদ। রোগ নির্ণয় ঠিক হলে চিকিৎসা সহজ হয়। স্পষ্টভাবে জানান আপনাদের নিজের নিজের অভিমত; কারও মুখ চেয়ে কথা বলবার দরকার নেই।"

সায় দিলেন সভ্যরা সভাপতির কথায়। দেখা গেল, উপযুক্ত নেতার

অভাবই এদলের আসল দুর্বলতা, এ সম্বন্ধে কারও সন্দেহ নেই।

প্রথমে বলতে উঠলেন মুন্সী নাকছেদীলাল।

"আমি বক্তাও নই; কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংস্রবও রাখি না। আমার জন্মভূমি ও কর্মভূমি এই শহরটাকে ভালবাসি। এখানকার নাগরিকদের সেবা করে যেতে চাই শুধু। কিন্তু সেবা করবার সুযোগ পাচ্ছি কই! গদিয়ান-পার্টি, ভিতরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিয়েছে; নূতন আর কাউকে ঢুকতে দেবে না। আমাদের উপর ট্যাকস্ বসিয়ে নিজেরা মজা লুটছে। সভাপতিমশাই ঠিকই বলেছেন, উপযুক্ত নেতা ছাড়া এর প্রতিকারের আর কোন উপায় নেই। এখন উপযুক্ত বললেই কথা ওঠে, কি রকমের যোগ্যতা দরকার, করদাতাসংঘের দলপতি হবার জন্য? করদাতাদের দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ কম করবার যোগ্যতা থাকা চাই; করদাতাসংঘের মহান আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা থাকা চাই; হিসাব রাখতে জানা চাই; ট্যাক্স্ সংক্রান্ত আইন-কানুনের পুরো জ্ঞান থাকা চাই; আর চাই নিজের কাজে লেগে থাকবার অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহ। এই সব গুণসম্পন্ন লোককেই আমাদের দলের নায়ক হিসাবে বাছতে হবে। নইলে আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। সত্য অপ্রিয় হলেও তা লুকিয়ে লাভ নেই। এর আগে আমরা যাঁদের বেছেছিলাম তাঁদের কেউ বা জানতেন শুধু কোদাল পাড়তে, কেউ শুধু আকাশের তারা গুণতে পারতেন, কেউ বা ছিলেন মেনি-মুখো পণ্ডিত।"

তিনটি সম্মিলিত কণ্ঠের প্রতিবাদ শোনা গেল।

"থাবড়ে মুখ ভেঙে দেবো।"

"মুখ সামলে কথা বলবেন।"

"কথাবার্তায় একটু সংযম মুন্সীজি।"

শান্তি! শান্তি! করদাতাসংঘ জিন্দাবাদ!

সভাপতিমশাই সভায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন।

মুন্সী ছেদীলাল সুর নরম করতে বাধ্য হলেন।

"কাউকে উদ্দেশ্য করে আমার কথাগুলো বলা নয়।"

"নয় আবার কি! মিথ্যাবাদী কোথাকার।"

"আমার অজ্ঞাতে যদি কারও মনে দুঃখ দিয়ে থাকি তাহলে আমি করজোড়ে তাঁর কাছে ক্ষমা—"

কথা শেষ করবার আগেই বাধা পড়ল। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! রামখড়ম সিং এসে ঢুকলেন ঘরে। কী আস্পর্ধা লোকটার।

নমস্তে !

নমস্তে !

একখানা কাগজ তিনি দিলেন সভাপতিমশায়ের হাতে। বিশজোড়া চোখের অপলক দৃষ্টি তাঁর দিকে। চাহনিতে কৌতূহলের চেয়ে উৎকণ্ঠা বেশী।

চিঠি ! চিঠিখানা তুলে ধরে পড়বার সময় সভাপতি মশায়ের হাত কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। পড়া শেষ হল। এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছেন সভাপতিমশাই। ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটোকে আবার গুটিয়ে নিয়েছেন ভিতরে। "বসুন রামখড়্মজী ! সভার কাজ আবার আরম্ভ হক। শান্তি ! শান্তি ! মুন্সী নাকছেদীলাল বলছিলেন যে, তিনি কারও মনে আঘাত দিতে চান নি। এইবার আপনার বাকি বক্তব্যটুকু বলুন মুন্সীজি।"

"না না, আমার আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। মনের কথা বলতে গেলেই বিপদ। উপযুক্ত ব্যক্তিকে দলপতি বাছুন আপনারা। আমি সে পদের প্রার্থী নই। যাঁকে আপনারা সকলে মিলে লিডার বলে বাছবেন, তিনিই আমার অকুণ্ঠ সহযোগিতা সব সময় পাবেন।"

"অর্থাৎ মুন্সীজি চেয়ারম্যান হতে চান না। ভাইস-চেয়ারম্যান হতে চান।"

এই বিদ্রূপের কোন উত্তর না দিয়ে মুন্সী নাকছেদীলাল বসে পড়লেন।

"শান্তি ! শান্তি !"

এইবার উঠলেন মৌলবী মোক্তার আলী।

"ভাইসব ! যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজে নামবার মনস্থ করেছি, তার মধ্যে সংকীর্ণতা ও পরশ্রীকাতরতার স্থান নেই। চরম পরীক্ষার সময় এসে গিয়েছে। সকলেই চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান হতে পারবেন না। অধিকাংশকেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে নিজের নিজের দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ কমিয়ে ! আমাদের জাত নেই, ধর্ম নেই—আমরা শুধু করদাতা। দাতা নই—করদাতা। দিতে চাই না, তবু দিতে হয় বাধ্য হয়ে। কি করে নিরাপদে কর না দিয়ে বা ন্যূনতম কর দিয়ে থাকা যায় এইটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। দুনিয়া জাহান্নামে যাক, অন্য কোন দিকে তাকাবার দরকার নেই, ফুরসত নেই। সাহসের অভাব আমাদের কারও নেই ; থাকলে আর. সি. পি-এর ক্যাণ্ডিডেট হয়ে ভোটে দাঁড়াতে চাইতাম না। কিন্তু শুধু সাহস থাকলেই আর. পি. এ-র লিডারের চলবে না। এক পয়সা ট্যাক্স দেবার সময়ও, ট্যাক্স দেবার অযৌক্তিকতা যে অন্তর থেকে অনুভব করে সেইরকম লোককে আমাদের লিডার বাছতে হবে। এই মাপকাঠি দিয়ে মেপে খাঁটি লোক খুঁজে বার করতে হবে। নিজের

যোগ্যতার কথা নিজ মুখে বলতে কুণ্ঠা আসা স্বাভাবিক। তার চেয়ে অপরের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা যে যা জানি তা যদি এখানে বলি, তাহলে সম্ভাব্য নেতাদের সামর্থ্যের একটি তুলনামূলক বিচার এখনই করে ফেলা যেতে পারবে। এই পন্থাই আমার মতে সবচেয়ে সহজ হবে উপযুক্ত দলপতি বাছবার কাজে। এখন আপনারা বিবেচনা করে দেখুন।

সভ্যরা সকলে একবাক্যে মৌলবী সাহেবের প্রস্তাবের সমর্থন করলেন। সভাপতি মহাশয় সকলকে অনুরোধ জানালেন, নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম সুপারিশের জন্য।

দারোগা মহতো বললেন—"আমি দলপতি পদের জন্য বাঙালী মহতোর নাম প্রস্তাব করছি। এঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। এত বড় এঁর মোটরগাড়ি মেরামতের কারখানা, এত বড় এঁর মোটর পার্টস-এর দোকান; কিন্তু গত এগার বছরের মধ্যে এক পয়সাও সেলস্-ট্যাক্স দেননি গভর্ণমেন্টকে। গভর্ণমেন্ট চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; কিন্তু পেরে ওঠেন নি এঁর সঙ্গে কূট-বুদ্ধিতে। যেমন এঁর সংগঠন-শক্তি, তেমনি এঁর কর্মতৎপরতা। সাফল্যের সঙ্গে ইনি করদাতাসংঘ চালাতে পারবেন বলেই আমার ধারণা।"

এবার উঠলেন মুসিকলাল মণ্ডল।

"বাঙালী মহতো যোগ্য ব্যক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁর চেয়েও যোগ্যতর ব্যক্তি এই সভায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আমি শ্রীরসিকলাল মণ্ডলের কথা বলছি। ইনি বাভনগামা শহরের সবচেয়ে বড় ব্যবসাদার। এত বড় ব্যবসায়ের হিসাবের খাতা লেখেন নিজে। আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন নিশ্চয় যে, ইনকামট্যাক্সের হাকিমরাই সরকারী অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতায় সবচেয়ে বড়। ভারতের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেও ইনকামট্যাক্স আদায় করবার ক্ষমতা রাখে তারা। এহেন ইনকামট্যাক্স বিভাগকেও নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছেড়েছেন রসিকলাল মণ্ডলজী! এত ফলাও যাঁর কারবার, তাঁর কাছ থেকে এক পয়সা ইনকামট্যাক্স আদায় করতে পারেনি গভর্ণমেন্ট আজ পর্যন্ত। ভারত সরকারের ইনকামট্যাক্স যিনি এড়াতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রাদেশিক সরকারের সেলট্যাক্স এড়ানো লোকের চেয়ে অধিক যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তি। এই কারণেই আমি রসিকলালজীর নাম প্রস্তাব করছি করদাতা সংঘের দলপতি পদের জন্য।"

নিজের প্রশংসা শোনবার লজ্জায় লাল হয়ে, নিজের ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন রসিকলালজী।

এইবার উঠে দাঁড়িয়েছেন 'অনোখী দবাখানা'র স্বত্বাধিকারী অনোখী ঝা।

"ভাই সব! মণ, সের দিয়ে সোনা মাপা হয় না। একতাল গিল্টি-সোনার চেয়ে, কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া এক ভরি খাঁটি সোনার কদর বেশী। লোকের গুণ মাপতে হয় তার গভীরতা দিয়ে। করদাতাসংঘের অধিনায়ক হবার জন্য আমি প্রস্তাব করছি শ্রী পল্টন চৌধুরীর নাম। ইনি পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, নিষ্ঠায় অবিচলিত, সংক্ষেপে স্থির। পূর্বোক্ত প্রার্থীদের ন্যায় পয়সার গরম এঁর নাও থাকতে পারে, দেয় করের পরিমাণ সে রকম উল্লেখযোগ্য না হতে পারে; কিন্তু এঁর একমুখী মনকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা অসম্ভব। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী বারোমাস এঁকে প্রত্যহ দুটো করে ওষুধের ট্যাবলেট কিনতে হয়। বারো পয়সা করে এক একটা ট্যাবলেটের দাম। আমার ওষুধের দোকান থেকে প্রতিদিন ইনি চব্বিশ পয়সা দিয়ে দুটি করে ট্যাবলেট কিনে নিয়ে যান। ও'র ভালোর জন্যই একদিন ওঁকে বলেছিলাম যে, যদি একসঙ্গে বড়শিশি কেনেন তাহলে ট্যাবলেটের দাম অনেক সস্তা পড়বে; আর প্রত্যহ দোকানে ছুটোছুটি করবার পরিশ্রমও বেঁচে যাবে। পল্টন চৌধুরীজী কি উত্তর দিয়েছিলেন জানেন? উনি বলেছিলেন যে, পঁচিশ পয়সা বা তার চেয়ে বেশীর জিনিস কিনলে সেলট্যাক্স দিতে হয়। সেটা তিনি দিতে চাননা বলেই প্রত্যহ দুটো করে ট্যাবলেট কেনেন। উত্তর দেবার সময় তাঁর মুখ চোখে দৃঢ়সংকল্পের ছাপ দেখে বুঝেছিলাম, তিনি একটা মজ্জাগত সিদ্ধান্তের প্রেরণায় এত কষ্ট স্বীকার করেন। এহেন ব্যক্তিকে দলপতির সম্মান দিলে আমরা নিজেরাই সম্মানিত হব। আপনাদের সম্ভাব্য আশংকা নিরসনের জন্য জানিয়ে দিই, ইনি নিজে সম্পূর্ণ নীরোগ; এঁকে প্রত্যহ ওষুধের গুলি কিনতে হয় রুগ্না স্ত্রীর জন্য।"

সকলে একবার নড়েচড়ে বসলেন। আর. পি. এ-র অধিনায়ক হবার যোগ্যতাসম্পন্ন এতগুলিলোক যে চোখের সম্মুখে রয়েছেন, একথা আগে কারও জানা ছিল না। এতকাল এঁরা লুকিয়ে রেখেছিলেন কি করে নিজেদের? কাকে বাছা যায় এক বিরাট সমস্যা।

সভাপতিমশাই নিরুপায় হয়ে বললেন—"ভোটে না ফেলে, একটা সর্বসম্মত নাম ঠিক করতে পারলেই ছিল ভাল।"

জটিল সমস্যা সমাধানে অভিনিবিষ্ট থাকায় সভ্যরা রামখড়্ম সিং-এর কথা ক্ষণিকের জন্য ভুলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ মনে পড়ল, তাঁকে করজোড়ে সভাপতি মহাশয়ের কাছে কিছু নিবেদন করতে দেখে।

"সভাপতিমশাই, আমার আবেদনপত্রটা সম্বন্ধে কি করলেন ?"

"হাতের বিষয়টা আগে হয়ে যাক ; তারপরই আপনার আবেদনপত্রটা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।"

"আমার গোস্তাকি মাপ করবেন সভাপতিমশাই। তাহলে যে আমার আবেদনপত্র আলোচনা করবার দরকার আর থাকবে না। দেখুন, রেখে ঢেকে কথা বলতে আমি চাই না। পার্টি-টিকিট দিতে অস্বীকার করেছে আমাকে ওরা কালকের মিটিং-এ। সেই জন্যই আমার এখানে আসা। নিজের ওয়ার্ড থেকে স্বাধীনভাবে দাঁড়ালেও আমি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হতে পারব। তার জন্য কোন পার্টিতে ঢোকবার দরকার নেই আমার। পার্টির প্রয়োজন আমার সমাজসেবার পূর্ণ সুযোগ পাবার জন্য। দলের পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত না হলে করদাতাদের সেবা করবার অবাধ সুযোগ আমি পাব না। সেইজন্যই আমার দরখাস্তখানা সম্বন্ধে সভার মতামত আমি জানতে চাইছি, দলপতি নির্বাচনের আগেই।"

"ও, আপনিও বুঝি করদাতাসংঘের দলপতি পদের একজন প্রার্থী ?"

"তা না হলে আর বললাম কি এতক্ষণ।"

"তাহলে আগে আপনি আমাদের দলের প্রতিজ্ঞা-পত্রে একটা নাম দস্তখত করে দেন। ওহে, রামখড়মজীকে একখানা প্রতিজ্ঞাপত্র দাও।"

কাগজে নাম সহি করা হল।

"সভাপতিমশাই, তাহলে এবার দলপতি পদের অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে আমার যোগ্যতার বিচার করা হক।"

"সে তো আপনাকে নিজমুখেই বলতে হবে। আপনার কর্মকুশলতা ও সংগঠনশক্তির কথা আমাদের সকলেরই জানা। জানি না শুধু কেন ওরা আপনাকে এতকাল পরে—"

ঢোক গিললেন সভাপতিমশাই।

সভ্যদের মধ্য থেকে গলা খাঁকারের শব্দ শোনা গেল।

এতক্ষণে মুখ ছোটালেন রামখড়মজী।

"জানেন না বলবেন না ; বেশ জানেন কেন ওরা আমাকে দল থেকে বার করে দিয়েছে। আমার মাথার চুল রোদ্দুরে পাকেনি। গলা খাঁকারের মানে বোঝবার বয়স আমার হয়েছে। বহুকাল থেকে জনসেবার কাজ করছি ; লোকের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে অবিচলিত থাকবার মত মনের জোর আমার আছে।"

"সে আমরা ভালভাবেই জানি।"

"জানেন তো সব, শুধু জানেন না কেমন করে পার্টি চালাতে হয়। এর আগে বহুবার গদিয়ান-পার্টির সঙ্গে লড়ে দেখেছেন তো, কত ধানে কত চাল? আচ্ছা এইবার কান খাড়া করুন আপনারা সকলে; ভাল করে শুনে নেন আমার মুখ থেকে, কেন ওরা আমায় পার্টি-টিকেট দিতে অস্বীকার করেছে। কয়েকদিন মাত্র আগে, আমি বিয়ে করেছি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে। তাই শহরসুদ্ধ লোক আমাকে নিয়ে হাসি-টিটকারী দিচ্ছে। যাকে নিয়ে সকলে হাসিঠাট্টা করে, তেমন লোককে ওরা লিডার রাখতে চায় না। বুঝেছেন? না আরও পরিষ্কার করে বলতে হবে?"

হ্যাঁ না কোন উত্তর বার হল না কারও মুখ দিয়ে।

"আগে বিয়ে করতে ইচ্ছা হয়নি তাই করিনি; এখন বিয়ে করতে ইচ্ছা গিয়েছে, তাই করেছি। এর সঙ্গে পৌরসংস্থার পার্টি সঞ্চালনের কী সম্বন্ধ থাকতে পারে তা আমার মাথায় ঢোকে না। আমার ব্যক্তিগত জীবনকে টেনে আনাই বা কেন এর মধ্যে সে কথাও আমি বুঝি না। আমার সন্দেহ হয় ও দলের একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির উপর; আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলেই স্বার্থসিদ্ধি হয়। তিনিই আমার বিবাহের ঘটনাকে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আমি তাঁকে উচিত শিক্ষা দিতে চাই। নিমকহারাম গদিয়ানপার্টির উপরও আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। কী না করেছি আমি ওই দলের জন্য! এখন আমি করে দেখাতে চাই, কেমনভাবে ওদের দলের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হয়। মরা করদাতাসংঘে আমি প্রাণসঞ্চার করব। তারপর এমন ব্যবস্থা করব যাতে ভবিষ্যতেও কখনও এই দল গদিচ্যুত না হয়। আপনারা শুধু একবার আমাকে দলপতি করে দেখুন। তারপর আর আপনাদের কোন কাজ করতে হবে না দলের জন্য; সে সব দায়িত্ব আমার। এই হল আমার অভিলাষ। দলে নূতন আসছি বলে আমার উপর অবিশ্বাস করবেন না। আপনাদের যাচাই করবার সুবিধার জন্য এইবার নিজের যোগ্যতার কথাটা বলি। এ সম্বন্ধে এই সভার সদস্যদের যে বক্তৃতা ও আলোচনা আমার অল্পক্ষণের জন্য শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে তার থেকে বুঝেছি, দেয় কর আইন বাঁচিয়ে এড়িয়ে যাবার নৈপুণ্যকেই সর্বোচ্চ যোগ্যতা বলে ধরা হবে দলপতি পদের জন্য; আর কে নিজের জীবনে সেই নিপুণতাকে কিরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন তার উপরও সম্যক গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই তো? আপনাদের নির্ধারিত এই মানদণ্ড দিয়েই আমার যোগ্যতা মাপতে অনুরোধ করছি। যে জিনিসটাকে গদিয়ানপার্টি আমার অপকীর্তি বলে ঘোষণা করেছে সেইটাই আমার

সবচেয়ে বড় প্রশংসাপত্র। আমার বিবাহের কথাটা বলছি। কেন বিবাহ করলাম সে কথাটা কেউ জানে না। সবাই নিজেরা যে কারণে বিয়ে করেছে, আমার বেলাতেও সেইটাকেই কারণ বলে ধরে নিচ্ছে। ভুল; মস্ত ভুল করছে তারা। গদিয়ানপার্টির লোকে এ ভুল করতে পারে; কিন্তু করদাতা সংঘের সদস্যদের আন্দাজ করা উচিত ছিল আসল কারণটা। এতকাল বিয়ে না করে যদি আমার চলেছে, তাহলে জীবনের বাকি দিন কয়টাও অতিবাহিত জীবন যাপন করে যেতে পারতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু তা যে হবার নয়। আপনাদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমায় বাধ্য করেছে, আমার জীবনের ধারা বদলাতে। ইনকামট্যাক্স সংক্রান্ত সব রকম তথ্য আপনাদের নখদর্পণে সে কথা আমি জানি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বিবাহিত লোকদের তুলনায় অবিবাহিত লোকদের উপর কিরূপ অবিচার করে ইনকামট্যাক্স আইন। আয়কর এড়াবার জন্যই আমি এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বিয়ে করেছি।......”

আর বলতে হল না।

'রামখড়ম সিং কা জয়।' 'পার্টি লিডার কা জয়।'

'গদিয়ান পার্টি মুর্দাবাদ।' 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ।'

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিথ্যার উপকারিতা
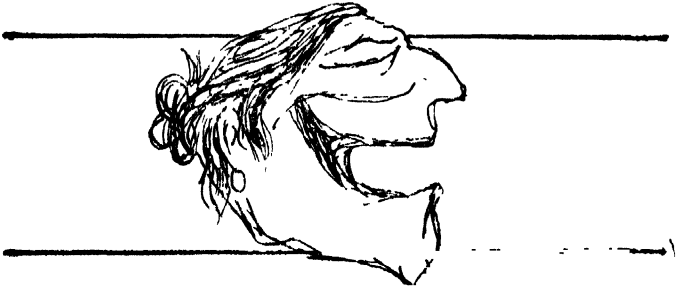
নেশাই বলুন, আর পাগলামি বলুন, অল্পবিস্তর আছে 'প্রায় সকলকারই, কিন্তু' আমাদের সুধীরের মত সেটা এমন কাজে লাগিয়াছে কয় জনের ?

ভ্রমণের নেশাটা ধরিয়াছে তাহাকে বহুদিন, এমন কি বিড়ির নেশারও পূর্ব হইতে, কিন্তু সেটা বিড়ির মত সুলভ নহে বলিয়াই বোধ হয় আর ক্রিয়ায় পরিণত হইতে পারে নাই, দীর্ঘদিন ধরিয়া মগজে বৃথা মাথা কোটাকুটি করিয়া ক্রমশ তাহা পাগলামিতে পর্যবসিত হইয়াছে। অর্থাৎ টিকিট কাটিয়া রেলে চাপা তাহার জীবনে অদ্যাপি ঘটিয়া ওঠে নাই বটে, তবে ভ্রমণ-কাহিনী, টাইম-টেবল, পাঁজি ও ভারতের মানচিত্রের সাহায্যে মানস ভ্রমণ একটি দিনের জন্যেও বন্ধ থাকে নাই। বাংলা ভাষায় যত ভ্রমণ-কাহিনী আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই সে বাদ দেয় নাই এবং বোধ করি প্রত্যেকটিই সে কোন না কোন উপায়ে সংগ্রহ করিয়া বার তিন চার করিয়া পড়িয়াছে। থিয়েটার বায়স্কোপের শখ তাহার ছিল না, পয়সা জমাইয়া সে রাস্তার ধারের পুরাতন বইয়ের গাদা হইতে শুধু টাইমটেবল কিনিত। আর এই ভ্রমণ-কাহিনীও টাইমটেবলের সাহায্যে সে বিরাট একটা বাঁধা খাতায় ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি তীর্থস্থান, প্রত্যেকটি শহর ও

দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির ধারাবাহিক তালিকা, কোন্ রেল পথে সেখানে পেঁাছিতে হয়, কোন্‌টার পর কোন্‌টায় গেলে সুবিধা হয়, কোথায় ক'টা ধর্মশালা আছে, হোটেলের খরচা কত, ঘুরিয়া দেখিবার জন্য কত গাড়ি ভাড়া লাগে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত। ইদানীং পুরানো দরেও টাইমটেবল কিনিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া সে অবসর কালে হাওড়া স্টেশনে গিয়া কাঠের ফলকে আঁটা টাইমটেবল দেখিয়া তাহার নোটবুকের সহিত বিভিন্ন ট্রেনের সময়ের পরিবর্তনগুলি মিলাইত এবং রবিবার দিন সারা দুপুর ধরিয়া সেগুলি মুখস্থ করিত।

কিন্তু এই নেশাটা করিত সে খুব গোপনে। তাহার আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে, তাহার নামের সহিত এই নেশাটার কথা একত্রে উচ্চারণ করিলেও লোকের উপহাস পাইবার সম্ভাবনা ছিল। তাহার বাবাও দরিদ্র কেরানী ছিলেন, মৃত্যুকালে কিছু রাখিয়া যাইতে ত পারেনই নাই, ছেলেকেও মানুষ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সুধীর বার দুই ম্যাট্রিক ফেল করিয়া কিছুদিন ঘরে বসিয়া থাকিবার পর সবে এক মার্চেণ্ট অফিসে কুড়ি টাকা মাহিনার চাকুরিতে ঢুকিয়াছে এমন সময়ে তিনি মারা যান, অর্থাৎ বিধবা মা ও ছোট দুইটি ভাইয়ের ভার পড়ে সুধীরের মাথায়। তাহার পর বছর আষ্টেক কাটিয়াছে, কিন্তু অভাব তাহার ঘোচে নাই, কারণ ইতিমধ্যে অফিসও তাহাকে দুই-তিনবার বদলাইতে হইয়াছে। এখন সে যেখানে কাজ করে, সেখানে প্রায় চল্লিশ টাকা বেতন, তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র চলে, শখ মেটানো চলে না।

সুতরাং তাহার এই উদ্ভট শখটার কথা সে খুব গোপনেই রাখিত। তবে হঠাৎ সেদিন যে সে এই সম্পর্কে অমন মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলিল, তাহা নিতান্তই তাহার ভাগ্য বলিয়া ধরিতে হইবে!

সেও এমনি এক পূজার সময়, ছুটির মাত্র তিন চারিটি দিন বাকী আছে। অফিসের বাবুরা কেহ দেশে যাইবেন, কেহ যাইবেন বিদেশ-ভ্রমণে তাহারই তোড়জোড় ও আলোচনায় অফিস মুখরিত, সেই গণ্ডগোলের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'সুধীরবাবু কোথাও যাবেন নাকি ?—বিদেশে-টিদেশে ?'

একে এই সময়টায় এইসব আবহাওয়ার মধ্যে বসিয়া কাজ করিতে বরাবরই সুধীরের মাথা খারাপ হইয়া যাইত, তাহার উপর এই প্রশ্নে তাহার কান মাথা যে ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। তাহার অবস্থা যে কী এবং সে যে কত মাহিনা পায় তাহা সকলেই জানে, সুতরাং প্রশ্নটা যে নিছক বিদ্রূপ, এই কথাটা মনে করিয়াই আরও তাহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। সে এক রকম মরীয়া হইয়াই

কথাটা বলিয়া ফেলিল।

খাতাটা সামনের দিকে খানিকটা ঠেলিয়া দিয়া, চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুধীর জবাব দিল, 'বিদেশে ?······না্-না !—কোথায় আর যাব। পুরোনো জায়গায় বার বার যেতে ভাল লাগে না !'

প্রশ্নকর্তা ত বটেই, অফিসের অন্যান্য বাবুরাও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মহেশবাবু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, 'পুরোনো জায়গা মানে ? আপনার কি সব ভারতবর্ষটা বেড়ানো শেষ হয়ে গেছে ?'

হাতের পাশা তখন ফেলা হইয়া গিয়াছে, ফিরাইবার আর উপায় নাই। সুতরাং তাহাকে অভিনয়টা ভাল করিয়াই করিতে হইবে বুঝিতে পারিয়া সুধীর প্রস্তুত হইল। বিনয় করিয়া জিভ কাটিয়া কহিল, 'পাগল ! তাই কখনও সম্ভব ? তবে ঐ মোটামুটি জায়গাগুলো সবই একরকম শেষ করেছি—'

মহেশবাবুর মুখটা যে পরিমাণ হাঁ হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর বুজিল না। কিন্তু এবারে প্রশ্ন করিলেন কার্তিকবাবু ; পশ্চিমে তিনি নিজে বছর-বছরই যান বলিয়া ঐ দিকটা সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল বেশী, তিনি কহিলেন, 'দিল্লী, আগ্রা, ও সব সাইডে গিয়েছেন ?'

সুধীর হাসিয়া জবাব দিল, 'বিলক্ষণ ! ওসব না দেখলে আর কি দেখলুম বলুন। আগ্রা দিল্লী গেছি আমি যখন, তখন আমার বোধ হয় সতের বছর বয়স, ইস্কুল পালিয়ে চলে গিয়েছিলুম।'

বিনয় একটু খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু এত ঘুরলেন কি ক'রে সুধীরদা, আগে কি ভাল চাকরি করতেন ? না, বাপের পয়সা সব ঐ ক'রে উড়িয়েছেন ?'

সুধীর প্রশান্ত মুখেই গলাটা নামাইয়া জবাব দিল, 'আরে পাগল, মামা যে রেলে কাজ করতেন, হরদম পাশে ঘুরেছি। পয়সা লাগত কি ?'

ইহার পর আর কিছুই বলা চলে না। কিন্তু বলা বাহুল্য যে অন্যান্য বাবুরা অত সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। তাহার পর ক্রমাগত নানারকম ভাবে চলিল তাহার পরীক্ষা। যিনি যেখানে গিয়াছেন তিনি সেখান সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করেন, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কখনও অতর্কিতভাবে, কখনও বা কথার ছলে।

সুধীরকে সেজন্য প্রতিমুহূর্তেই প্রস্তুত থাকিতে হয়, সে আজকাল রাত জাগিয়া তাহার নোটবুক ঝালাইয়া লয়।

অবশ্য মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও তাহাকে এক একসময় দারুণ বিপদে পড়িতে

হয়। একদিন কার্তিকবাবু কাশীর গল্প করিতে করিতে বলিয়া বসিলেন, 'আচ্ছা বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকতে বাঁ হাতি সেই মসজিদটা মনে আছে ত সুধীরবাবু ?······সেই যে ছোট্ট মসজিদটা বড় রাস্তার ওপরেই ?'

কোন কাঁচা মিথ্যাবাদী হইলেই হয়ত তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিত, কিন্তু সুধীর গত কয়েক মাস যাবৎ মিথ্যা কহিতে কহিতে পাকিয়া গিয়াছিল, সে জানিত সঠিক না জানিয়া কোন ফাঁদে পা দিতে নাই। সে অনেকক্ষণ কার্তিক-বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'মস্‌জিদ', কই মনে ত পড়ছে না ! হয়ত আছে, লক্ষ্য করিনি তখন ভাল করে—'

মহেশবাবু কার্তিককে ধমক দিয়া কহিলেন, 'কার্তিকটার যত গাঁজাখুরি, বিশ্বনাথের গলির মোড়ে আবার মসজিদ !······থাকলে তো তোমার নজরে পড়বে সুধীর।'

সুধীর সুস্থ হইল। ভাগ্যিস !······সে সবিনয়ে হাসিয়া কহিল, 'ও, কার্তিকবাবু পরীক্ষা করছিলেন আমায় !······তা বটে, আমার মত অবস্থার লোক এত ঘুরেছে, এটা বিশ্বাস করা কঠিনই বটে, কার্তিকবাবুর আর দোষ কি—'

ফলে কার্তিকবাবু বিষম অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন—

কিন্তু এসব ত গেল ছোটখাটো পরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত হইল ডিসেম্বর মাসে, যখন খোদ বড়বাবু দুই মাসের ছুটি লইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুধীরকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ভাই সুধীর, তোমার ত ওসব জায়গা ঘোরা আছে, দাও দিকি ভাল ক'রে একটা ছক কেটে, কোথা দিয়ে গেলে সুবিধে হয়, আর কোথায় কি থাকা-টাকার ব্যবস্থা—।'

সুধীরের মুখ এক মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল। গেঞ্জিটা বোধ করি সেই শীতের দিনেও ঘামে ভিজিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার পরই দুর্গানাম স্মরণ করিয়া সে দৃঢ়হস্তে কাগজ কলম টানিয়া লইয়া বসিয়া গেল বড়বাবুর ভ্রমণের প্ল্যান তৈরী করিতে। বিস্তৃতভাবে প্রত্যেকটি তথ্য লিখিয়া বড়বাবুর হাতে দিয়া বলিয়া দিল, 'মোটামুটি যতটা মনে পড়ল লিখে দিলুম বড়বাবু, তবে অনেকদিন যাওয়া, দু-একটা ভুল হতে পারে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাতে আটকাবে না—' বলিয়া বড়বাবু তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বিদায় লইলেন।

ইহার পর দুইটা মাস যে সুধীরের কি দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। বড়বাবুকে সে চিনিত, যদি তাহার প্ল্যানের কোন গোলমাল হয়, এবং

সেজন্য তাঁহার কোন অসুবিধে ঘটে, তাহা হইলে 'পারমানেন্ট' হইবার জন্য আশা ত সুদূরে পরাহত হইয়া যাইবে বটেই—চাকরি লইয়াও টানাটানি পড়িতে পারে। তাহার দিনেরাত্রে ঘুম হইত না।

কিন্তু বড়বাবু ফিরিলেন হাসিমুখে। প্রথম দিন অফিসে আসিয়া বসিতেই স্তাবকবৃন্দ যখন চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিল, তখন তিনি সুধীরের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, উপকার করেছে বটে আমার সুধীর ভায়া! এমন ছক্‌টি দিয়েছিল সে, কোথাও আমাকে কোন বেগ পেতে হয়নি। মায় গাড়ি ভাড়া-টাড়া সব ও ঠিক ঠিক লিখে দিয়েছিল।'

সুধীরের এতক্ষণে নিশ্বাস পড়িল। সে কহিল, 'মাদুরাতে গিয়ে ছত্রে জায়গা পেয়েছিলেন বড়বাবু ঠিক?'

'নিশ্চয়ই! ঐ আট আনাই নিলে ঘরের ভাড়া, সব ঠিক-ঠাক পেয়েছি ভাই। ......আচ্ছা, হ্যাঁ, কিন্তু তোমার রামেশ্বরের পাণ্ডা তোমাকে চিনতে পারলে না কেন? নাম করলুম, কোথায় তোমার বাড়ি বললুম, তবু কিছুতেই বুঝতে পারলে না!'

সুধীর হাসিয়া কহিল, 'মূলেই যে ভুল বড়বাবু, ওখানে গিয়েছিলুম আমি যে মামার সঙ্গে। মামারই নাম লেখা আছে কিনা, তাঁর নাম করলেই ওরা ধরতে পারত।'

'ওঃ, তাই হবে।......তাই ত বলি—'

ইহার পর মাস পাঁচেকের মধ্যেই সুধীরের চাকরি পাকা হইয়া যাইতে কিংবা একলাফে মাসিক পাঁচটাকা মাহিনা বাড়িতে কোথাও বাধা পাইল না, শুধু তাই নয়, এত বড় প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরও আর তাহাকে পরীক্ষা করিবার সাহস কাহারও রহিল না, সুধীর জবাবদিহির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিল।

কিন্তু যে ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করিয়া তাহার এই গৌরব তাহার অন্তঃসার শূন্যতা তাহাকে ইদানীং বড় পীড়া দেয়। নেশাটা এতদিন শুধু পাগলামিতেই ঠেক খাইয়াছিল, এখন তাহা যেন তাহাকে অহর্নিশ খোঁচাইতে শুরু করিয়াছে। অথচ উপায়ই বা কি? মোটে পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতন, তাহার মধ্যে চারিটি প্রাণীর ভরণপোষণ এবং ভায়েদের ইস্কুলের খরচা—তাহার দেশভ্রমণের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার মিথ্যা ভাষণই তাহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার এতদিনের বাঞ্ছিতবস্তু মিলাইয়া দিল। কেমন করিয়া তাহাই বলি—

পূজার মাত্র তিনটি দিন বাকী আছে, এমন সময় চাপরাসী আসিয়া সংবাদ

দিল, বড়সাহেব সেলাম দিয়েছেন। বড়সাহেবের নামটা শুনিবামাত্র তাহার বুকের ভিতরটা গুরগুর করিয়া উঠিল। তবে কি কোথাও সে বড় রকমের একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে ? কিন্তু বলির ছাগলের মত কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন দেখিল যে, সাহেবের মুখ প্রসন্ন এবং বড়বাবুও হাসি-হাসি মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন সে কতকটা সুস্থ হইল। ঘটা করিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, 'হুজুর তলব করেছেন ?'

সাহেব পরিষ্কার বাংলা বলিতে পারিতেন। কহিলেন, 'ওয়েল চৌধুরী, বড়বাবু বল্‌ছিলেন যে, সারা ভারত তোমার ঘোরা আছে, সব জায়গারই খবর তুমি রাখ !'

সুধীরের এতক্ষণে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল, সে আবারও সেলাম করিয়া কহিল, 'ঐ সামান্য সামান্য—'

সাহেব কহিলেন, 'আমি ফি-বছরই দার্জিলিং যাই, এবার ঠিক করেছি যে, ইণ্ডিয়াটা একটু দেখব, কোথায় যেতে বলো তুমি আমাকে ? Best sight ?'

সুধীর ঠিক এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু দেরী করাও মারাত্মক। সে চট্ করিয়া কহিল, 'সাহেব যদি মাপ করেন ত একটা প্রশ্ন করি—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো—'

'শুনেছি সাহেব হিস্ট্রির স্কলার ছিলেন, আপনার কি হিস্ট্রিতে ইনটারেস্ট আছে এখনও ?'

সাহেবের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি জবাব দিলেন, 'oh, enormous !'

'তাহ'লে আমি বলি সাহেব, ই-আই-আর দিয়ে আগ্রা দিল্লী হয়ে রাজপুতোনা ঘুরে আসুন। হিস্টরিক্যাল ইম্পর্টেণ্ট জায়গা অনেকগুলো দেখা হয়ে যাবে। নইলে 'সাইট' দেখতে গেলে হুজুর, আসাম যেতে হয়, কিন্তু এই কালাজ্বরের টাইম হুজুর, এসময় ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না।'

সাহেব কহিলেন, 'অল্‌রাইট, আমি রাজপুতানাই যাবো। তুমি একটা প্ল্যান করে দাও দেখি, কোথায় কতদিন লাগবে—'

একখানা বড় কাগজ ও কলম তাহার দিকে সরাইয়া দিয়া কহিলেন, 'তুমি বসতে পারো। বোস বড়বাবু—'

সুধীরের এ স্থানটায় কোন ভয় ছিল না। সে বিস্তৃতভাবে সব বিবরণ মায় সাহেবদের হোটেল কোনটা ভাল, সুবিধাজনক ট্রেনের সময়, কোথায় কি 'সুভ্যনির' কিনিতে হইবে সব লিখিয়া দিল। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া প্ল্যান তৈরী

করিয়া যখন সাহেবের হাতে দিল তখন সাহেব খানিকটা পড়িয়া তাহার অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয়ে খুশী হইলেন। কহিলেন, 'Thanks চৌধুরী, বড় সুন্দর লিখে দিয়েছ, এইতেই আমার গাইডের কাজ করবে—'

তাহার পর সে যখন সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, সাহেব পুনশ্চ ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কোথায় যাবে চৌধুরী ছুটিতে ?'

সুধীর মুখ ম্লান করিয়া কহিল, 'কোথায় যাব স্যার, আমার ওপরই সংসারের সব ভার এখন, মাইনে পাই মোটে পঁয়তাল্লিশ টাকা, এখন আর কোথাও যাবার উপায় নেই।'

সাহেবের চক্ষু দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল। কহিলেন, 'কোথায় যাবার ইচ্ছে হয় তোমার চৌধুরী ?'

আশা ও আকাঙ্ক্ষায় সুধীরের বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। সে কোন মতে ঢোক গিলিয়া জবাব দিল, 'অনেকদিন কাশী যাইনি হুজুর, বড্ড যেতে ইচ্ছে করে—'

আর কোনো নাম চট্ করিয়া মনে আসিল না। সাহেব প্রশ্ন করিলেন, 'কত টাকা হ'লে তোমার কাশী যাওয়া যায় ?' মনে মনে হিসাব করিয়া সুধীর জবাব দিল, 'অন্তত পঁচিশ টাকা লাগে স্যার।'

সাহেব ড্রয়ার খুলিয়া পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া কহিলেন, 'অল্ রাইট, তুমি ঘুরে এস। তুমি আজই চলে যেতে পার, তোমায় বাড়তি দু'দিনের ছুটি দিতে আমি বলে দিচ্ছি বড়বাবুকে।'

সুধীর যে সেদিন বাড়ী ফিরিল কি করিয়া তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। কতবার যে মোটরের তলায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। বাড়িতে যখন সে শেষ অবধি পেঁাছিল, তখন তাহার পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া মা শিহরিয়া উঠিলেন।

'কি ব্যাপার রে! এমন চেহারা কেন ? অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি ত ?'

তাঁহার আসল আশঙ্কা হইল চাকরি সম্বন্ধে, কিন্তু ভয়ে সে কথাটা মুখে পর্যন্ত আনিতে পারিলেন না।

কিন্তু সুধীর কহিল, 'চেহারা ? কৈ না, অসুখবিসুখ ত কিছু হয়নি।...

তুমি এক কাজ কর দিকি, চট করে খানকতক লুচি ভেজে দাও দিকি! আমাকে এক্ষুনি, এই সন্ধ্যের ট্রেনেই একবার কাশী যেতে হবে। অফিসের কাজে—'

'কাশী যাবি ? সে কি! এক্ষুনি—!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, জরুরী কাজ, সাহেব পাঠাচ্ছেন। না গেলে চাকরি থাকবে না। যাও, যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না—'

তাহার পর সে বিছানা বাক্স প্রভৃতি লইয়া পাগলের মত টানাটানি শুরু করিয়া দিল। ভায়েদের একজনকে বলিল জুতাটায় কালি লাগাইয়া দিতে, আর একজনকে পাঠাইয়া দিল মনিহারী দোকানে। অবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ কোনমতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে যখন ট্রেনে আসিয়া বসিল, তখন আর তাহার নড়িবার সামর্থ্য নাই—দারুণ উত্তেজনার পরে দারুণ অবসাদ আসিয়াছে। সে কোথায় এবং কি করিতেছে, কোন জ্ঞানই যেন তাহার আর নাই!

বহুক্ষণ গাড়ির জানালাটায় মাথা রাখিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার পর সে চোখ মেলিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিল ট্রেনটা সত্যই চলিতেছে, কত মাঠ, কত ঘর-বাড়ি হু-হু করিয়া চোখের সামনে দিয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে, ঠিক যেমন করিয়া সে এতদিন কল্পনা করিত, তেমনি করিয়াই। সে সত্যই দেশভ্রমণে চলিয়াছে তাহা হইলে!

ভ্রমণ সম্বন্ধে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে সে এতদিন পরে জীবনে ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিল।

আশাপূর্ণা দেবী

ঘুষ

পাথরকুচি সাপ্লায়ার মদন মাইতি, সরকারী ইঞ্জিনীয়ার মুখার্জি'কে ধরে পড়লো সাহেবকে একবার তার চাঁইবাসার নতুন কেনা 'পাথরকুঠি' বাংলোয় পদধূলি দিতেই হবে। এবং হবে সস্ত্রীক।

ওই যুগল পদধূলি না পড়লে নাকি মদন মাইতির নতুন বাড়ি কেনাই ব্যর্থ। চাঁইবাসারই আশপাশের পাহাড় থেকে মদন মাইতির অন্নজল। অনেক পাহাড় লীজ নিয়ে রেখেছে সে। কাজেই ওখানে একখানা বাংলোও কিনে ফেলেছে দাঁও পেয়ে। কিন্তু তার জন্যে সস্ত্রীক মুখার্জি সাহেবের পায়ের ধুলোর দরকারটা পড়ে কেন?

কেন?

কেন সে-কথা মদন বলতে লজ্জা পাচ্ছে, তবু বলে ফেলে। মদন স্বপ্ন দেখেছে ওনাদের পায়ের ধুলো না পড়লে নাকি ওই বাড়ি তার সইবে না।

'কিন্তু আমরা কে?'

মুখার্জি সাহেব অবাক হয়ে বলেন।

মদন হাত কচলে বলে, 'কী করে বলবো বলুন স্যার। যা ফ্যাক্ট তাই বললাম।'

'স্বপ্ন' আর 'ফ্যাক্ট' এই দুটো যে পরস্পর-বিরোধী শব্দ, সেটা লোকটার মুখের ওপর বলতে বাধে, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সেণ্টিমেণ্টের, অন্ততঃ সেই চেহারাই নিচ্ছে মদন মাইতি। অতএব সেখানে আঘাত দিতে চক্ষুলজ্জায় বাধে।

এই চক্ষুলজ্জার অবকাশে মদন মাইতি সেখানের প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে শুরু করে মিহি চাল, খাঁটি দুধ, টাটকা ঘি, পুরুষ্টু মুরগী এবং পাখি শিকারের সুবিধের এমন লোভনীয় বর্ণনা দেয় যে, ব্যাপারটাকে 'ঘুষ' বলে চিনতে দেরি হয় না।

কিন্তু এটা হচ্ছে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। এ ঘুষে নগদ টাকার রূঢ়তা নেই, কিন্তু নগদ কারবারের ইশারা আছে।

সম্প্রতি যে মুখার্জির হাত দিয়ে একটা 'নয়া ব্রীজে'র পত্তন হচ্ছে, তার মালমসলার জন্যে সরকার থেকে টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। মদন মাইতি তার প্রার্থীদের মধ্যে একজন! আর পাথরকুচি পছন্দর দায়িত্ব সরকারী ইঞ্জিনীয়ার মুখার্জি সাহেবের।

অতএব দুইয়ে দুইয়ে চার।

মদন মাইতি যদি নিজের পেট্রল পুড়িয়ে সাহেব মেমসাহেবকে কলকাতা থেকে চাঁইবাসায় তার নিজ বাসায় পায়ের ধুলো দেওয়াতে নিয়ে গিয়ে, খাইয়ে দাইয়ে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়ে, উপরন্তু পাখি শিকার করিয়ে, ফের আবার পেট্রল পুড়িয়ে যথাসময়ে সাহেবকে স্বস্থানে ফেরত দিয়ে যায়, এবং ফেরত গাড়িতে কোন্ না মণখানেক সরু চাল, টিন দুই খাঁটি ঘি, আর ডজনখানেক পুরুষ্টু মুরগী তুলিয়ে দেয় (দেবেই অবধারিত!), তা'হলে সাহেব সরকারী অর্ডারটা মদন মাইতিকে পাইয়ে না দিয়ে কি অন্য ফালতু লোককে দেওয়াতে যাবেন? যাবেন না। যাওয়া সম্ভব নয়।

মদনের পাথরকুচিই মুখার্জি সাহেবের পরীক্ষার চশমায় 'প্রথম শ্রেণী'র বলে গণ্য হবে।

মুখার্জি সাহেব জেনে বুঝেই টোপটি গেলেন।

কারণ প্রস্তাবটা বেশ লোভনীয় লাগে।

অনেকদিন এমন একটা প্রমোদভ্রমণের সুযোগ আসেনি। কিন্তু এককথায় তো রাজী হওয়া যায় না।

তাই যদিও মনে মনে বলেন, 'তুমি মদন মাইতি, তুমি হচ্ছো একটি ঘুঘু নম্বর ওয়ান, তাই তুমি স্বপ্ন দেখবার আর সাবজেক্ট খুঁজে পেলে না,

আমাদের পায়ের ধুলোয় স্বপ্ন দেখতে বসলে।' তথাপি মুখে ভারী একটা বিপন্ন ভাব দেখান।

'একী মুশকিল বল দেখি? তুমি কিনলে বাড়ি, আর তাকে পয়মন্ত করতে যেতে হবে আমাদের! আমরা কে? তুমি বরং তোমার গুরু-টুরুকে নিয়ে যাও।'

ঘুঘু নম্বর ওয়ান মদন মাইতি করজোড়ে বলে, 'আপনারাই আমাদের গুরু গোবিন্দ একাধারে সব সাহেব। তবু অকারণে আপনাকে এ জ্বালাতন করতাম না, যদি না স্বপ্নটা ঠিক ভোরের হতো!'

অর্থাৎ স্বপ্নটা মাঝরাত্তিরের হলে যদিবা ছাড়ান ছিল সাহেবের ভোরের হওয়ায় ছাড়ান ছোড়ন নেই!

সাহেব অবশ্য মনস্থই করে ফেলেছেন প্রস্তাবটা গ্রহণ করবেন, তবু কিছুটা খেলান। কথার খেলায় খেলাতে থাকেন। 'রাতে একটু হালকা করে খেও মাইতি, যাতে ভোর পর্যন্ত পেট ভার না থাকে।……ভয় আর কুসংস্কার এরা দুটি হচ্ছে কুকুরের জাত, বুঝলে মাইতি? যত প্রশ্রয় দেবে ততো বাড়বে।…

……ওহে মাইতি, স্বপ্নই যদি দেখলে, তো আর একটু বেশি দেখলে না কেন? এমন একটা স্বপ্ন দেখলে পারতে, মুখার্জি সাহেবকে লাখ দু-তিন টাকার চেক্ লিখে দিচ্ছো!'

কিন্তু খেলা আর কতক্ষণ চলে?

তাছাড়া অপরপক্ষ তো খেলছে না। সে তো শুধু হাত কচলাচ্ছে।

তার মানে খেলোয়াড়কে হাতে পুরছে।

অতএব শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হয় মুখার্জি সাহেবকে। অর্থাৎ পরাজিতের ভঙ্গিতে বলতেই হয়, 'নাঃ, তোমার 'পাথরকুঠি' না দেখে আর উপায় নেই দেখছি। আচ্ছা বাতিকগ্রস্ত লোক বটে। একটা স্বপ্ন দেখে—আশ্চর্য!' মদন মাইতি মনে মনে বলে, 'তুমিও আচ্ছা ঘুঘু! সেই যাবেই, শুধু এতোক্ষণ আমায় ল্যাজে খেলালে!' কিন্তু মুখে বলে 'সাহেব, "হাতে চাঁদ পাওয়া" কথাটা শুনেই এসেছি চিরকাল, মানে বুঝতাম না। আজ সেটার মানে বুঝছি।'

'তুমি তো বলে বসছো চাঁদ পেলে, এখন তোমাদের মিসেস মুখার্জি রাজি হন কিনা দেখি।'

'হবেন স্যার। স্বপ্নদর্শনের কথাটা বুঝিয়ে বলবেন।'

'ওই রাবিশ মার্কা লোকটার সঙ্গে কী এতো কথা হচ্ছিল?'

মিসেস ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেন, 'কথা আর ফুরোয় না।'

'আরে ও হচ্ছে মদন মাইতি। একটা মজার স্বপ্ন দেখেছে সেই কথা বলছিল।'

'চমৎকার! তোমার বুঝি চাকরি গেছে? তাই বসে বসে স্বপ্ন-কথা শুনছিলে?'

'স্বপ্নটা ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

বলে মুখার্জি সাহেব 'টাই' কোট খুলতে থাকেন।

মিসেস নির্লিপ্ত গলায় বলেন, 'কিছু খাবে? না স্বপ্নেই পেট ভরে গেছে?'

'তা সত্যি বলতে, 'পেট না হোক মনটা বেশ ভরা-ভরা লাগছে—' মুখার্জি সাহেব স্ত্রীর পাশে বসে পড়ে বলেন, 'শুনলে তুমিও খুশি হবে।'

অতঃপর শোনান মদন মাইতির প্রস্তাবটা, ধীরেসুস্থে মজার সুরে। যেন তিনি এটাকে কৌতুক বলেই ধরছেন, তবে মিসেসের যদি ইচ্ছে হয়।

আধুনিকতার অভিশাপ!

নিজের স্ত্রীর কাছেও অকৃত্রিম হতে দেয় না মানুষকে।

ভেবেছিলেন মিসেস উল্লসিত হয়ে উঠবেন। কারণ মিস্টার সব কথার শেষে একটা কথা বলে নেন, 'আমাদের বিয়ের পর প্রথম যখন তোমায় নিয়ে ট্যুরে বেরোই, মনে আছে তোমার মীরা, আমাদের চক্রধরপুরের বাংলো থেকে চাইবাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম? তাই নামটা শুনে মনটা একটু ইয়ে হয়ে উঠেছিল!'

মনে মিসেসেরও ছিল।

'মিস্টার'দের থেকে স্মৃতিশক্তি বেশিই থাকে মিসেসদের। মনটা তাঁরও 'ইয়ে' হয়ে উঠেছে বৈকি নামটা শুনে। তবু সেদিনের মত উৎসাহে লাফিয়ে উঠতে পারেন কই? তখনকার মত ভারমুক্ত জীবন কি আছে আর এখন?

এখন অনেক ভার।

তাই ভারীমুখেই বলেন মিসেস, 'ইয়ে হলেই বা কী হচ্ছে! আমি আর কী করে যাবো?'

প্রথমে যে এই প্রশ্নটা আসবে, তা জানতেন সাহেব, কারণ 'বেবি' বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত মিসেসের জীবনের জটিলতা যে অনেক বেড়ে গেছে তা টের পান।

তবে মিসেস মুখার্জি ওই 'বড় হয়ে ওঠা'টাকে যতটা গুরুত্ব দেন, মিস্টার ততোটা দেন না। ওঁর ধারণা খাটো স্কার্ট পরা, এবং রাতদিন লাফিয়ে বেড়ানো ওই বাচ্চার মত আহ্লাদী মেয়েটার জন্যে অতোটা কেয়ার না নিলেও চলে।

ভাবেন, মীরা একটু বাড়তি করছে। মীরা তিলকে তাল ভাবে, মীরা চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলে।

ভাবেন, দু'ঘন্টার জন্যে দু'জনে একটু সিনেমা দেখতে গেলেও বেবিকে পাহারা দেবার জন্যে বাড়িতে কাউকে এনে বসিয়ে রাখা, অথবা বেবিকেই মামার বাড়ি কি মাসীর বাড়ি কোথাও বসিয়ে রেখে আসার এই পদ্ধতিটা মীরার বাড়াবাড়ি। ড্রাইভারের সঙ্গে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে 'স্কুলবাস'-এর ব্যবস্থা করাটা মীরার শুচিবাই। তবু বেবি যে বড় হয়ে উঠেছে সেটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না বয়েসের হিসেব শুনে।

মিসেস যখন বলেন, 'সতেরো বছরটা এমন কিছু কম নয়। ও বয়সে আমার বিয়ে হয়েছে তা মনে রেখো।'

তখন চুপ করে যেতেই হয়।

ত'াছাড়া নিজেও তিনি একটা ব্যাপারে বিরক্ত হন। মুখার্জি সাহেবের বন্ধুর ছেলে সুজিতের সঙ্গে বড্ড বেশী যেন মাখামাখি করে বেবী, বড্ড বেশী হুড়োহুড়ি।

সুজিত অবশ্য ছেলেবেলা থেকে এ বাড়ীতে আসে, বলতে গেলে বাড়ীর ছেলেরই মতো। কিন্তু বেবির মধ্যে সেই ভ্রাতৃভাবটা যেন আর নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অন্য ভাব দেখা দিচ্ছে।

অথচ খুকী ভাবটি বজায় রেখেছে ঠিক।

নাচবে, লাফাবে, কথায় কথায় 'সুজিত সুজিত' করে বেপরোয়া সব ফরমাশ করবে তাকে, যেন কোনো গলদ নেই দুজনের মধ্যে।

কিন্তু গলদ যদি না থাকবে, এতো মাখামাখির বাসনা কেন? এতো গায়ে গা ঠেসিয়ে বসা কেন? এতো এক সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার ঘটা কেন? বন্ধু? বন্ধুত্ব? মেয়েছেলের আবার বন্ধুত্ব!

অত্যন্ত প্রগতিশীলের ভান করলেও, মনের মধ্যে বদ্ধমূল আছে চির সংস্কার। তবু—মীরা যে ওই মেয়ে আগলানো মেয়ে আগলানো করে নিজেদের জীবনের সমস্ত স্বচ্ছন্দ গতির উপর পাথর চাপাচ্ছে, নিজেদের দাম্পত্য জীবনের গোপনতম এবং গভীরতম সম্পর্কটির পরিসর ক্রমশই সংকুচিত করে আনছে, জীবনের পরমতম রসটি শুকিয়ে ফেলেছে, এটা যেন বরদাস্ত হয় না।...স্বার্থে আঘাত পড়লেই মনে হয়, মীরা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছে। এখনো সেই কথাই বলেন, 'দু'তিন দিনের জন্যে বৈ তো নয়। বেবিকে যদি তোমার দিদির বাড়ী—'

'সে হলে তো কোনো কথাই ছিল না—' মিসেস মুখার্জি ঝংকার দিয়ে ওঠেন, 'মেয়েটি কেমন হয়েছেন আজকাল, জানো তা ? এখন কোথাও রেখে আসার কথা বললে কী চোটপাট করে ! বলে, "কেন আমি কি জড়োয়া গহনা যে রাতদিন আগলাতে হবে ?" বলে, "আমি কি ঘর ভেঙে পালিয়ে যাচ্ছি যে পাহারাদার রাখতে হবে ?" বলে, "তোমাদের ছোট মন, নীচু মন, তাই সব সময় সব কিছুর মধ্যে কালো ছায়া দেখতে পাও। দু'ঘণ্টা একা থাকলে চোরে আমায় চুরি করে নিয়ে যাবে ?"...আরো সব কত বলে।' 'হুঁ, কথা শিখেছে খুব !'

বলে পায়চারি করতে করতে বলেন মুখার্জি সাহেব, 'তোমার ওই বয়সে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তুমি অতো পাকা ছিলে না। মনে আছে মীরা, চাইবাসায় যাবার সময় আমি বলেছিলাম, এখানে বাঘ বেরোয়, শুনে তোমার কী ভয় ! একেবারে খুকীর মতো—'

'আচ্ছা হয়েছে, থামো '!

বলে ভ্রূভঙ্গী করে মিসেস মুখার্জি।

কিন্তু ক্রমশ মনটা তরলিত হতে থাকে। ক্রমশই যেন সেই নবযৌবনের স্মৃতির ঢেউ এই কঠিন হয়ে যাওয়া হৃদয়-বেলায় আছড়ে আছড়ে এসে পড়তে থাকে...ক্রমশই মনে হয় যেন ওই উদ্দাম সুখের স্বাদটার জন্যে মনটা তৃষিত হয়েছিল এতোদিন।

'কতোদিন আমরা দু'জনে একলা হইনি বলো তো মীরা ? কতোদিন শুধু আমরা দু'জনে কোথাও বেড়াতে যাইনি ?'

কতোদিন আর !

যতোদিন বেবি জন্মেছে।

তবু শিশু বেবিকে নিয়ে তেমন কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য রহস্য।

এখন যখন যেখানেই যান, যেন বেবিই মুখ্য হয়ে ওঠে, নিজেরা গোণ হয়ে যান। বেবি অত্যন্ত 'মুডি' মেয়ে, কখন যে কী মুড্-এ থাকে ! ও আগ্রায় গিয়ে তাজমহল দেখতে যেতে রাজী হয় না।

বলে কি, 'আমার একটা বন্ধু বলেছে, তাজমহল দেখলে তার সব মহিমা মন থেকে মুছে যায়। না দেখাই ভালো।'

'তাই বলে তুই আগ্রায় এসে তাজমহল দেখবি না ?'

'নাঃ।'

'তার মানে আমরাও দেখবো না ?'

'তোমাদের কে যেতে বারণ করেছে ?'

'এই রাত্তিরে তোকে একা হোটেলে রেখে যাবো ?'

'তাতে কি ? ভূতে খেয়ে ফেলবে ?'

শেষ পর্যন্ত দুঁদে ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার মুখার্জি, ঠিকেদারদের কাছে যিনি ব্যাঘ্রতুল্য, তিনি তাঁর পনেরো বছরের ধাড়ি মেয়েকে খোসামোদ করতে বসেন, ছ-খানা ক্যাডবেরি চকোলেটের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে রাজী করান।

বেবির ইচ্ছে, বেবির পছন্দ, বেবির রুচি, এই তালেই তাঁদের যুগল জীবন নিয়ন্ত্রিত, যেন বেবিই তাঁদের জীবনের প্রভু।

বেবির অশোভনতাকে তাঁরা তীব্র শাসনে সংযত করে তুলতে সাহসী হন না, শুধু সামলে বেড়ান, আগলে বেড়ান। সেই নীরস, কঠিন কার্জটি মিসেস মুখার্জির।

তাই হঠাৎ আজ যখন মুখার্জি সাহেব বলে উঠলেন, 'কতোদিন আমরা শুধু দু'জনে কোথাও বেড়াতে যাইনি মীরা !'

তখন সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা আলোড়ন এলো মীরা মুখার্জির। নাঃ, 'নিজেদের জীবন' বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তাঁদের—তাঁরা যেন একটা দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে বসে আছেন। যেন তাঁদের প্রভুকন্যাকে পালন করছেন।

তাই বেবি যখন ভিজে বেড়াল সুজিতটাকে টেনে টেনে 'ল্যা ল্যা' করে বেড়ায়, যখন নিজের স্বাস্থ্যসম্পন্ন ভরাট যুবতী দেহটাকে খুকীর পোশাকে ঢেকে অশোভনভাবে ধিঙ্গীপনা করে বেড়ায়, তখন মীরা মুখার্জি চোখ রাঙিয়ে 'খবরদার' বলে উঠতে পারেন না। বলে উঠতে পারেন না, 'ফের যদি তুই ওই গোঁফ-গজানে ছেলেটার সঙ্গে অমন হুড়োহুড়ি করে বেড়াবি তো দেখাবো মজা।'

না, এসব সাহস হয় না।

মীরা মুখার্জিকে তখন কেবলমাত্র ললিতমধুর কণ্ঠে বলতে হয়, 'ছিঃ বেবি, সুজিতকে তুমি এতো জ্বালাতন করছো কেন ?' ...নয়তো বা বলতে হয়, 'সুজিত, সোনা ছেলে তুমি ওই রাক্ষুসীটার সব জবরদস্তি শোনো কেন ? শুনো না তো !'

উপায় কি ?

এছাড়া আর উপায় কি ?

এই নাকি যুগের হাওয়া।

এই উদ্ধত অবিনয়ী অবাধ্য যুগে ওরাই হচ্ছে যুগের রাজা। তবু বেবি যে এতোটা রাজাগিরি করবে তা ভাবেননি মীরা মুখার্জি।

মদন মাইতির প্রস্তাবের বিবরণ শোনা মাত্র প্রথমেই বলে উঠলো, 'ও মাই গড্! স্বপ্নালু ব্যাপার। ও বাপী, বাপী গো, তোমার ওই লোক এ কথা বলেনি তো, স্বপ্ন দেখেছে আমার মা ওর পূর্বজন্মের মা ছিল?'

মুখার্জি হেসে ওঠেন, 'নাঃ অতোটা বলে নি।'

'যাক্। বললেও ক্ষতি ছিল না। বেচারী মার একটিও পুত্তুর নেই, থাকার মধ্যে এই এক ধিঙ্গী অবতার গুণবতী কন্যে। তবু একটি পুত্ররত্ন লাভ হতো। ...যাক—ওনার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তো?'

মিস্টার ও মিসেস অলক্ষ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অপ্রতিভ গলায় বলেন, 'এতো করে বললো, "না" করা গেল না।'

বেবি একটা গোড়ালির উপর ভর করে বার-তিনেক পাক খেয়ে ফ্রকের ঝালর নাচিয়ে বলে ওঠে, 'গুড! না করবেই বা কেন? এমন একটা চার্মিং ব্যাপার! গাড়ীতে যাওয়া আসা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, তদুপরি পক্ষীশিকার। আহ্ হা হা! কী মজা কী মজা!'

বেবি পাঁচ বছরের শিশুর মতো হাততালি দিয়ে বলে, 'উঃ বাপী, আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। সুজিতটা শুনে একেবারে "থ" বনে যাবে! আচ্ছা বাপী—', যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এই ভাবে বলে ওঠে, 'সুজিতটাকেও তো সঙ্গে নিলে হয়। বেশ মজা হবে।'

মজাটা কার হবে, এবং কিসে হবে তা অবশ্য বোঝা গেল না। কিন্তু কর্তা-গিন্নী প্রমাদ গোনেন।

সর্বনাশ! বেবি তাহলে ধরেই নিয়েছে তিনজনেই যাওয়া হবে। সেরেছে!

মুখার্জি সাহেব অসহায়ের মতো মেমসাহেবের মুখের দিকে তাকান, ভাবটা যেন—নাও এখন তুমি বোঝো!

মেমসাহেব বোঝেন।

তাই মেমসাহেব অপ্রতিভ থেকে সপ্রতিভে আসেন।

'ওমা তুই কী করে যাবি? তোর পরীক্ষা!'

'পরীক্ষা! কিসের আবার পরীক্ষা এখন? না না, পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছু নেই আমার। বা-পী তুমি এক্ষুনি আমার স্কুলে চিঠি দিয়ে দাও; চারদিন ছুটি চাই!'

মুখার্জি সাহেব হতাশদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকান। বোঝেন 'দুজনে একলা'র সুখস্বাদের আশা খতম। ···কিন্তু মেয়েমানুষ সহজে আশা ছাড়ে না, মীরা মুখার্জিও ছাড়েন না। তিনি শক্তহাতে হাল ধরেন, 'না, দেখ নেহাত লোকটার কথায় পড়ে যাওয়া। বাড়ীসুদ্ধু গেলে হয়তো হাসবে। আমরা এমন ভাব দেখাবো যেন, আমোদ-আহ্লাদ কিছু নয় বাবা, নেহাত তুমি বলেছ তাই— তুই এ-দুদিন তোর বড়মাসীর কাছে—'

বেবি খুকীপনা করে বলে সত্যি কিছু আর খুকী নয় যে, এই কাঁচা যুক্তিতে তাকে ভোলানো যাবে। সে হঠাৎ বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে ওঠে, 'আহ্লাদ পেয়েছে! নিজেরা মজা করে নাচতে নাচতে চাইবাসায় বেড়াতে যাবেন আর আমি বড় মাসীর বাড়ী—কক্ষনো না। কারো বাড়ী-ফাড়ী গিয়ে থাকতে পারবো না আমি।'

'তাহলে আমারও যাওয়া হয় না।'

মীরা মুখার্জি বলেন।

'কেন, তোমায় যেতে কে বারণ করেছে?' বেবি কড়া গলায় বলে, 'তুমি কি বসন্তকেও নিয়ে যাচ্ছো?'

'বাঃ, ওকে কেন'

মিয়োনো গলায় বলেন মীরা মুখার্জি।

'তবে আমার কি? বেবির কণ্ঠ উচ্চগ্রামে, 'বসন্ত রাঁধবে, কুসুম বাসন মাজবে, আমি মনের আনন্দে হাত-পা ছড়িয়ে থাকবো।'

'চমৎকার! একা বাড়ীতে রেখে যাবো তোকে?'

'তা তোমাদের যখন যাওয়াটা বিশেষ দরকার! তোমাদের পায়ের ধুলো না পড়লে তার বাড়ী ভূমিকম্পে পড়ে যাবে, তখন তাই থাকতে হবে।'

'তবে তুইও চল। দু'জন আর তিনজন।'

সমস্ত বাসনার মূলে কুঠারাঘাত করেন মীরা মুখার্জি।

কিন্তু করলে কী হবে?

বেবির তো তখন মন ঘুরে গেছে। ও একবার যখন 'না' শুনেছে, আর যায়? এমন হ্যাংলা নয় বেবি মুখার্জি!

'ঠিক আছে, আমি যাবো না—', বললেন মীরা মুখার্জি, অন্তরালে গিয়ে, তুমি একাই যাও।'

মিস্টার মুখার্জি উধর্বনেত্রে বলেন, 'কেউই যাবে না।'

'বাঃ, লোকটা এতো প্রোগ্রাম করলো, কী বলবে?'

'আমিও মনে মনে অনেক প্রোগ্রাম করে ফেলেছিলাম।'

'সে তো আমারও! কিন্তু দেখলে তো মেয়ের মেজাজ! আমি আর কী করে—'

হঠাৎ কী হয়।

মুখার্জি সাহেব চড়া গলায় বলে ওঠেন, 'না তুমিও যাবে। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কোনো লাভ নেই।' ওই একটা মেয়ের জেদের জন্যে আমাদের সব গেল! থাক ও একা।'

'ওর তো তাতে বড় ক্ষতি! মীরা মুখার্জি বলেন, 'চিন্তা আমাদেরই।'

'চিন্তাটা একটু কমাও। যাবার ঠিক করো। কুসুমকে একটা দিন রাখো।'

মীরা মুখার্জি স্বামীর এ মূর্তি চেনেন।

দৈবাৎই এ রূপ দেখা যায় তাঁর, কিন্তু তখন আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও টলাতে পারে না তাঁকে। অতএব যাত্রার গোছ করতেই হয় তাঁকে।

কিন্তু বেবি যেন সতীন-ঝির মতো ব্যবহার করছে। এই বলছে, 'খিদে পেয়েছে,' তক্ষুণি বলছে, 'খাবো না।' এই বলছে, 'মাথা ধরেছে', তক্ষুণি এমব্রয়ডারি নিয়ে বসছে। মীরা মুখার্জি যা কিছু দেখিয়ে দিয়ে যেতে চাইছেন তাকে, কিছু দেখছে না, এলোমেলো করে বেড়াচ্ছে।

রীতিমতো ইচ্ছাকৃত উৎপাত।

ব্যাপার কি রে বাবা! একা বাড়ীতে কিছু করে বসবে না তো! কিংবা বাড়ী থেকে পালিয়ে-টালিয়ে যাবে না তো!

মীরা মখার্জি চিন্তিত হন। মীরা মুখার্জি উপায় খোঁজেন। মীরা মুখার্জি সুজিতকে ডেকে পাঠান। মিনতি করে বলেন, 'সুজিত, বিশেষ কাজে দিন চারেকের জন্যে তোমার কাকাবাবুকে আর আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে, তোমার এই পাগলা বোনটিকে একটু সামলিও। তোমার ওপরই ভার দিয়ে গেলাম বাপু। তুমি একটু একটু এসে এসে ওকে দেখে যাবে।'

বেবির মুখের চামড়ার নীচে হাসির হিল্লোল খেলে, তবু বেবি চড়া গলায় বলে, 'ও "ভার"! ভারী মানুষ, তাকে আবার ভার! এই সুজিত, খবরদার তুমি এই চারদিন আসবে না।'

এই সময় মদন মাইতির গাড়ি এসে দাঁড়ায়।

মুখার্জি-দম্পতি উঠে পড়েন।

গাড়ি ছেড়ে দিলে সুজিত দুই হাত উল্টে বলে, 'তাজ্জব! হঠাৎ কী হলো

বল দেখি বেবি ? শ্রীমতী কাকীমা এমন উদার হয়ে গেলেন যে ? বাবা, ইদানীং তো ওঁকে দেখলেই আমার হৃৎকম্প হতো। যা জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে তাকান, যেন ভস্মীভূত করে ফেলবেন। আর এ একেবারে বেড়ালকে ডেকে মাছ রক্ষার দায়িত্ব স্থাপন !'

'ওঃ, ভারী যে কথা শেখা হয়েছে ! বেড়াল, মাছ,—অসভ্য কোথাকার।' বেবির গায়ে একটা গায়ে-লেপটে-থাকা হাত-কাটা টিউনিক। বেবি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সেটাকে আরো চোস্ত করতে করতে বলে, 'ব্যাপারটা বুঝতে আটকাচ্ছে কেন তোমার ? ব্যাপার তো একেবারে জলের মতো সোজা। বাবার ওই মদন মাইতি যে-জন্যে মা-বাবাকে নিয়ে গেল, মা-ও সেই জন্যেই তোমার ওপর আমার ভার দিয়ে গেল। স্রেফ ঘুষ !'

দেবেশ দাশ

বাঙ্গালী বিয়ে আর বার্নার্ড শ'

কলা।

স্রেফ কলা! চিত্রকলা নয়।

শিল্প সরণীতে ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে। মোটে ক'দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। কত বন্ধু-বান্ধব, আড্ডার আস্তানা, আত্মীয়-স্বজন আছে। সে সব ছেড়ে বেগার দিতে এলাম এই এগজিবিশনে। কলার পূজারী নই আমি। কিন্তু এসব জায়গায় না এলে মুখ থাকে না আজকাল। বলকে পাওয়া যায় না বৈঠকে।

কিন্তু সে যে বুকফাটা ব্যাপার হয়ে যাবে। আড্ডাই হচ্ছে আমাদের কালচারের শেষ ঘাঁটি। বাঙ্গালীর সব যেতে বসেছে। কিন্তু বেঁচে থাক, বাবা আড্ডা।

তাছাড়া আজ সন্ধ্যায় একটা চা-পার্টি আছে। জমজমাট ব্যাপার হবার কথা। এই ডেমোক্র্যাসির যুগেও চা-পার্টির আড্ডা হচ্ছে যাকে বলে জাতে নৈকষ্য কুলীন।

বিশেষ করে আজ সংস্কৃতির খই ফুটবে সেখানে। বার্নার্ড শ'কে নিয়ে

জন্মবার্ষিকী হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। আমাদের নেমন্তন্নে অবশ্য শ'র উল্লেখ ছিল না। কারণ তাহলে কেউ হয়ত সত্যি সত্যিই ভাষণ ঝাড়তে শুরু করবে। নিদেন পক্ষে জ্ঞান বিতরণ।

আমরা চাই যে আলাপ আলোচনার বিষয় বস্তুটা রেস্‌পেক্টেবল অর্থাৎ ভারী হোক আপত্তি নেই। কিন্তু হাওয়াটা হোক হাল্কা।

তার আগে একবার শিল্প সরণীটা ঘুরে যাই। তাতে পজিশান বাড়ে। তাছাড়া জমাটভাবে কিছু চাল ঝাড়বার মশলা পাব ফাঁকতালে।

কিন্তু যা সব ছবি! অসহ্য! অথচ বুঝি না বা পছন্দ করি না এহেন বাক্য উচ্চারণ করলেই তুমি গেলে।

বলে ফেললাম—কলা, স্রেফ কলা। চিত্রকলা নয়।

পাশের ছবিটার সামনে দাঁড়ালাম। নীচে লেখা—শিল্পীর দৃষ্টিতে বার্নার্ড শ'।

অথচ মোটেই তাঁর মত দেখতে নয়।

আগের ছবিটা দেখে বলেছিলাম—কলা। এটা তার তুলনায় চিচিঙ্গে।

যেন আঁকা নয়। আঁকা বাঁকা।

ফস করে টিপ্পনী কেটে ফেললাম। ভাবের আবেগে। আর্টের অত্যাচার সইতে না পেরে। বললাম—এমন সব কিম্ভূত কিমাকার ছবি! খোদাই জানে, কেন কত্তারা এ সব ঝোলায়।

—সম্ভবত খোদ শিল্পীকে হাতের কাছে পায় না বলে।

এ হেন চমকলাগা জবাব শুনে পেছন ফিরে তাকালাম। একজন বুড়ো ভদ্রলোক একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সাহেবী পোষাক, একমুখ ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, চোখ দুটি হাসি-হাসি। বুড়ো হাড়, কিন্তু কাঁচ মন।

বেশ একটু বার্নার্ড শ' মার্কা চেহারা!

খুশী হয়ে গেলাম। ভাবলাম এক সঙ্গে ছবি দেখা যাক। চাই কি কয়েকটা চটকদার টিপ্পনী বা জুতসই অভিমতও পেয়ে যেতে পারি। পার্টিতে নিজের বলে চালিয়ে নেব। চালাক লোক যখন আমি।

একজন মহিলা ছবি দেখতে দেখতে যাবার সময় আমাদের দিকে একটু যেন হেসে গেলেন। ব্যাপার কিছুই নয়। এমনি একটু ভদ্রতা। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি মাথার টুপীটা খুলে নোয়ালেন।

বললাম—বাঃ বেশ চমৎকার ত! আপনি ঠিক ইংরেজদের মতই ইংরেজী ভদ্রতার ধারা বজায় রেখেছেন। কিন্তু দেখুন, আজকাল এসব কেউ মানে না।

যারা মহিলাদের দেখে মাথা থেকে টুপী খোলে না তাদের ভদ্রতা নেই।

—অথবা চুল নেই! মিষ্টি হেসে বললেন উনি।

তাক লেগে গেল।

তবু বললাম—দেখুন, ওদেশে, মানে বিলেতে ভদ্রতা, রাজনীতি এসবে ত লোকে সব সময়ই নজর দিয়ে থাকে বলে শুনেছি।

উনি মানলেন না। বললেন—উহুঃ। যখন বেকায়দায় পড়ে, বেফাঁস অবস্থা হয় তখনি শুধু ওসব করে। যতক্ষণ মোটরগাড়ী হাঁকাবার পয়সা আছে ততক্ষণ কোন্ ইংরেজ পলিটিক্স করে?

তর্ক তুললাম—তা হোক। তবু দেখুন ত ইংরেজরা কেমন চালিয়ে চলেছে। এত বড় ইণ্ডিয়া হাতছাড়া হয়ে গেল কিন্তু দিব্যি 'গেটিং অন', চালিয়ে চলেছে।

—'গেটিং অন' মন্ত্রের বড় পূজারী হচ্ছে ওরা! প্রায় সারাটি জীবন ওদের দেশে কাটিয়েছি। হাড়ে হাড়ে চিনি।

উনি আবার বললেন—নিশ্চয়ই জানেন যে এই জমানায় যারা যুক্তি বা ন্যায় অন্যায় মেনে চলে তাদেরই বারোটা বেজে যায়! ন্যায় অন্যায় বোধকে যারা পকেটস্থ করতে না পারে ওই দুর্বলতাটা তাদেরই পকেটে পুরে ফেলে। ইংরেজরা ত ঐ করেই ম'ল।

ভাল করে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। বেশ তাজা মুচমুচে মন। বাংলা দেশের বাদলায় মিইয়ে যাওয়া বিস্কুট নয়। চা-পার্টিতে নিয়ে গেলে কেমন হয়? পরিচয়টা অন্তত নিই।

ইন্দ্রজিৎ রে'র নাম শোনেন নি? যিনি সেই বোমার মামলাগুলির যুগে পুলিশের নজর এড়িয়ে আয়ার্ল্যাণ্ডে পালিয়েছিলেন। এত বছর গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়েছিলেন। কোন নাম করা কলেজে প্রফেসারও হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ঘরের ছেলে এতদিনে ঘরে ফিরেছেন।

ওকে বেশ সমীহ করে চা পার্টিতে পায়ের ধুলো দেবার জন্য অনুরোধ করলাম।

উনি খুশি মনে রাজী হলেন। বললেন—আজ আর কোনো এনগেজমেন্ট নেই। স্বচ্ছন্দে আসব। হালের বাঙ্গালীদের একটা নির্ভেজাল আবহাওয়া দেখে আর চেখে নিতে চাই।

আমিও পার্টিতে ওঁকে দেখিয়ে দিতে চাই—বন্ধুরা আমায় নাক উঁচু মনে করে। দেখিয়ে দেব যে সত্যি আমার নাক অনেক উপরে নাগাল পায়।

টাটকা বিলেত ফেরৎ। আবার বিপ্লবী। তায় বার্নার্ড শ' মার্কা। অর্থাৎ তেরোস্পর্শের ফলে খোদ ত্রিমূর্তি।

ওঁকে একটু 'আপ' দিয়ে বললাম—এত বিজ্ঞ আপনি। বলুন না এত জ্ঞান কেমন করে অর্জন করলেন ?

উনি সটান হয়ে দাঁড়ালেন। চোখে মজার আমেজ। দাড়িতে তার ছায়া যেন চক চক করছে। হেসে জবাব দিলেন—বুঝলেন না, কচি বন্ধু। বিজ্ঞতা আসে অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু অভিজ্ঞতা আসে বোকামি থেকে।

বন্ধুরা বলে—অবশ্য পিছনে বলে, সামনে নয়—যে আমার বিজ্ঞতাও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই। তা না হয় নাই রইল। তা বলে বোকা সাজব কেন ?

বুদ্ধি করে সোজা ওঁকে পার্টিতে নিয়ে এলাম। বিনা নেমন্তন্নে আচমকা এমন একজন গুণীকে এনে হাজির করার গৌরব আমার।

বেশ মিষ্টি অথচ মুরুব্বিয়ানা ঢঙে মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখলাম। ভদ্রলোকের পাশ থেকে একটুও সরলাম না। হিংসার চোটে একজন ত বলেই ফেললেন—দেখ দেখ ডক্টরের কাণ্ড ! যেন প্রফেসর সাহেব ওঁর নিজের তৈরী। একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি।

তা বলুক। যাদের কিছু আছে লোক তাদেরই হিংসে করে। নিজেকে বেশ ইম্পর্টান্ট মনে করতে লাগলাম।

দুজন নতুন সভ্য ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম—ইনি হচ্ছেন বিনু বন্দো। তরুণদের মধ্যে এঁর মত বক্তা মেলা ভার। রোজ দুটো তিনটে করে মিটিং করছেন। কবিতাও লেখেন। বাংলা কাব্যে বেশ নাম।

উনি শুনে খুব খুশী। বললেন—এই ত চাই। তবে আশা করি ওল্ড ফুলদের মত ছন্দে বাঁধেননি কবিতাকে। সিঁড়ি ভাঙ্গা করে কবিতা সাজাবেন। অবশ্য গদ্য কবিতাই মোক্ষম। তাতে কবির লাগে না কণ্ঠ। পাঠকের থাকে না ভাবনা।

বিনয়ে গলে গিয়ে বিনু বলল—আচ্ছা, আপনার মতে কবিতা লেখার জন্য সবচেয়ে বেশী কি দরকার ?

চশমার ভিতর দিয়ে প্রফেসার ওকে এক চোখে দেখে নিলেন। তারপর বললেন—চাই কাব্যের প্রেরণা। তার জন্য দরকার প্রিয়া নয়, চাঁদ নয়, কিছুই নয়। শুধু যদি থাকে খিদে ; শুধু যদি না থাকে বদহজম।

বক্তিয়ার বিনু যদি জবাব দিতে শুরু করে তাহলে রক্ষে নেই। ব্যাপার বেগতিক দেখে কবিকে সরিয়ে দিলাম। নিয়ে এলাম ভ্রমণ কাহিনী লেখককে।

পরিচয়ের পর উনি লেখককে তার প্রাণের কথা জিজ্ঞেস করলেন—দেশে ত সব পাঁচশালা পরিকল্পনা হচ্ছে। তুমিও নিশ্চয়ই প্ল্যান এঁটেছ?

লেখক বললেন,—একটা জবর রকম প্ল্যান করেছি। আফ্রিকার জঙ্গলে কোন বাঙ্গালী এখনো যায় নি। সে দেশ সম্বন্ধে লিখিনি। আমি একেবারে আনকোরা টাটকা ভ্রমণ কাহিনী লিখব। আমার দৃষ্টিভঙ্গিও বেড়ে যাবে।

—সাধু, সাধু। তারপর?

—তারপর ফিরে এসে লিখবার আগে লাইব্রেরীতে আফ্রিকা সম্বন্ধে বই পড়ব বছর দুই।

—সে কি? বইয়ের পাতা ঘষে ঘষে দেখা আর শেখাটা মুছে ফেলবে?

ভদ্রলোক প্রায় সারাজীবন নির্বাসনে কাটিয়ে সবে দেশে ফিরেছেন। যেমন চমৎকার তেমনই চটকদার তাঁর কথাবার্তা। পার্টিটা এমন জমে উঠল। হঠাৎ হঠাৎ উড়ো খৈয়ের মত শাদা হাল্কা ঠাট্টা বিদ্রূপ বেরিয়ে আসছে। হাসতে গিয়ে থমকে যাচ্ছি আমরা।

এমন সময় তিনজন তরুণী একসঙ্গে এলেন। প্রফেসারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলে উঠলেন—এতক্ষণ এই ত খুঁজছিলাম। মেয়েরা না হলে কি আর পার্টি জমে? আহা! শাড়ি পরা তরুণী। প্যারিসের স্বপ্ন।

বোকার মত বলে ফেললাম—সে কথা ঠিক। কিন্তু এখানেও আজকাল মেয়েরা শাড়ি ছেড়ে জিন আর স্ল্যাক্স্ পরছে। চেনাই যায় না কেবা ছেলে, কেবা মেয়ে।

উনি মাথা নাড়লেন—উহুঃ। এক মিনিটেই চেনা যায়। এক ধাঁচের চুল আর পোশাক হলে কি হবে? যারা তোড়ে মুখ চালিয়ে যাচ্ছে দেখে নিয়ো যে তারাই মেয়ে।

—তাহলে ময়দানের মিটিংয়ে যারা ঘুষি পাকিয়ে···

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে উনি বললেন—তারাও মেয়ে। অর্থাৎ আদ্যাশক্তি। আমাদের সেই অগ্নিযুগে ওই শক্তিতে বাঙ্গালীরা সেরা ছিল। অথচ এযুগে দেখছি···

কি দেখছেন, প্রফেসার?

দেখছি যে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্য এ যুগের উমারা তপস্যা করে না। করে উমেদারী। মহাবাবুর দরবারে। চাকরীর জন্য। অথচ মহাবাবুর তৃতীয় নয়ন ফাইলের মধ্যে লেপটে থাকে। ধ্যান ভঙ্গ হয় না। আর গলায় সাজানো টাইটি সাপের চেহারা নিয়ে নড়ে চড়ে ওঠে।

—তা উপায় কি বলুন। যে যুগে যা প্রয়োজন।

—সত্যি কথা। বাঙ্গালী বিয়ে ত বিয়ে নয়। যেন সার্কাসের তারের খেলা। রোপ ওয়াকিং করতে করতে বর আর কনে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে। পুরোনোকেলে ঘরে ইষ্টি কুটুম আছে। পাড়া সমাজ আছে। সবাই যেন দর্শক। ওদের দিকে ট্যারা নজর দিচ্ছে।

—তাহলে কোন্‌টা ভাল আপনার মতে? এদিকে বর কনের মাথায় যে সব নতুন আইডিয়া এসে গেছে গুরুজনরা বলে সেগুলো সব গোলমেলে। পশ্চিমের আমদানী।

তেড়ে ফুড়ে উঠলেন উনি—পশ্চিমের কাঁটা দিয়েই পুবের কাঁটাগুলোকে তুলে ফেলতে হবে। কিন্তু শুধুই কি কাঁটা? বলি, মধু কি কম পাচ্ছ? বেশ স্বাধীনভাবে দেশে মেয়েরা মিশছে দেখছি। আর স্বাধীনভাবে নিজের ভাগ্য ঠিক করে নিতে গেলেই অপরাধ? মধু আর কাঁটা দুই মিলিয়ে ত ফুল।

ততক্ষণে তনিমা সামনে এসে প্রফেসারকে নমস্কার করল। বলল—কি সৌভাগ্য আমাদের। আপনি সেই দেশে ছিলেন যেখানে নারী সকলের সঙ্গে সমান হয়ে গেছে সম্মানে।

—কিন্তু সে সম্মান যে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা নিজেরাই খুইয়ে ফেলতে তৈরী হও, বাছা। ভুলেই যাও যে এনগেজমেণ্টের আঙটির হীরেটা বোধহয় শুধু কাচ। হীরে নয়, কাচ।

• বিয়ের বিরুদ্ধে বার্নার্ড শ' অনেক কথা লিখেছেন। সামাজিক আচার লৌকিকতা হিসেবে বিয়েকে এত ব্যঙ্গ বোধ হয় আর কেউ করেন নি। এদিকে চিনু আর তনিমার বিয়ের কথাটা কেমন যেন গোলমেলে হয়ে এসেছে। অনেক দিনের মন জানাজানি সত্ত্বেও ওদের সম্বন্ধটা কেমন যেন একটু চিড় খেয়ে যাচ্ছে।

তাই ভেতরে ভেতরে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি আজকের পার্টিটার আসল মতলব ছিল ওদের মধ্যে মিটমাট করে নেবার একটা সুযোগ করে দেওয়া।

আর সেখানে এই বুড়ো খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দিলেন যে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের অসম্মান শুরু হয়। ভালো রে আপদ।

তনিমা অবশ্য একালিনী। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—এ যুগে আমরা ছেলেদের সমান সমান। আপনাদের বিলেতেও বরকনে হাত ধরাধরি করে এক সঙ্গে গির্জায় যায়। আগে পিছে নয়।

ঠাট্টাটা উনি গায়ে মাখলেন না। 'আপনাদের বিলেত' কথাটাই মজার। তাই দাড়িতে মমতা ভরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—ওটা ত একটা বাঁধা নিয়ম। আসলে জীবন ভোর ত বক্সিং লড়াই চলবে। তা শুরু হবার আগে শেকহ্যাণ্ড করে নেবার জন্য ওরা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে আসে।

হো হো করে হেসে উঠে হাওয়াটা হাল্কা করে নেবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু উনি ছাড়বার পাত্র নন। হাসতে হাসতেই বললেন—বিলেতেও এমনিভাবে বোকা বনে মেয়েরা বড্ড স্বপ্ন দেখে কিনা। ওরা মনে করে ছেলেরা ওদের ভালবাসে। কিন্তু জান দিদিমণি, ছেলেরা মেয়েদের ভালবাসে ঠিক যেমন বীণ-কার তার বীণাকে ব্যবহার করে। অথবা ধর, সিপাই তার বন্দুক চালায়।

একটু থেমে আবার বললেন—হ্যাঁ, তবে তোমার মত সুন্দর মেয়ের উপর টান হবে বৈকি। তোমার চোখে আকাশের তারা খুঁজবে, খুঁজবে জীবনের প্রেরণা। তবে বিয়ের হপ্তাখানেক পর থেকেই এক থালা মিষ্টির চেয়ে বেশী প্রেরণা আর তোমার মধ্যে পাবে না। প্রত্যাশাও করবে না।

পাশেই বসে ছিল বিনু। শশার স্যাণ্ডুইচ হাতে।

তনিমার দিকে সে আড়চোখে তাকাতে লাগল। মরিয়া হয়ে বাধা দিলাম—না, না, সাহেব। আপনি জানেন না তনিমাকে। এত লক্ষ্মী মেয়ে। এত ভাল। ওকে যে ভালবেসে বিয়ে করবে সে জীবনভোর সুখ পাবে।

উনি যেন বিড়বিড় করে কি বললেন। মনে হল বললেন—জীবন ভরা সুখ? কোন্ মানুষের তা সহ্য হবে? সেটা ত হবে এই পৃথিবীতেই নরকের সামিল।

গৃহকর্ত্রী দরদী আর বুদ্ধিমতী। বিনু আর তনিমাকে এইসব জ্ঞানের হাত থেকে রেহাই দিলেন। আর আমরা ভদ্রলোকের চারদিকে ব্যূহ তৈরী করলাম।

ওরা দুজনে কেমন করে এদিক সেদিক দিয়ে চা ঢালতে বা সিঙ্গারা পরিবেশন করতে গিয়ে পাশের ঘরে সরে পড়ল। আমরা টি য়্যাণ্ড সিম্প্যাথীর ভক্ত। চা আর দরদ মিশিয়ে এমনভাবে কথা বলতে লাগলাম যেন কিছুই নজর করিনি।

এদিকে অনেকগুলি বাঁকা চাহনী আমার দিকে এসে পড়ল। এমনিতেই তনিমার মাথায় স্ত্রী স্বাধীনতা বেয়াড়াভাবে চাড়া দিয়ে উঠেছে। তার উপর প্রফেসার ফোড়ন দিয়েছেন রসিয়ে। কেনরে বাবা এরকম অচেনা অজানা

বিশ্ববীকে বলা নেই কওয়া নেই হুট করে এইখানে এনে হাজির করা ? যেখানে চা পার্টিটা বিশেষ মতলব নিয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

আমি কি একাই অপরাধী ? তোমরা পার্টি সুদ্ধ সবাই ত ওঁকে নিয়ে মেতে উঠেছিল। তবু ব্যাপারটা ওঁকে জানিয়ে দেওয়া ভাল।

এক ফাঁকে ওঁকে এই ঘটনা আর দুর্ঘটনা দুটোই খুলে বললাম। বেচারা বন্ধু এত ভালবেসে এত সাধনা করে তনিমার মন পেয়েছিল। শংকরের মোহমুখারের বাণী খুব ভাল কথা হতে পারে। আপনি আয়ার্ল্যাণ্ডে ছিলেন তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার বুকনি তনিমার মনে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। এটা কি ভাল হল ?

কিন্তু উনি বললেন যে খুবই ভাল হয়েছে। যা কিছু মন কষাকষি তা বিয়ের আগে শুরু হওয়াই ভাল। ভুল বোঝাবুঝির পালার মহড়াও আগে হয়ে যাওয়া দরকার। তাহলে অনেক আশা করে অনেক নিরাশ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মানলাম না সে কথা। উনি যে বাণী ঝেড়েছেন তাতে মেয়েদের মন বিয়ের উপরেই খাপ্পা হয়ে যাবার কথা। উনি তর্ক বাড়ালেন না। শুধু স্যাণ্ডুইচ থেকে এক টুকরো টোমাটো খুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

নিরেমিষ কথাবার্তা আর কতক্ষণ চালানো যায়। অতএব আরম্ভ হল গান। একটুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন প্রফেসার রে। চোখ বোজা। কিন্তু মন খোলা। বুঝতে চাইছেন বহুদিন পরে শোনা বাংলা গানের কথা, সুর, মর্মবাণী। শেষ পর্যন্ত তিনি বারান্দায় উঠে গেলেন। দূরে থেকে খোলা হাওয়ায় একলা বাংলা গান উপভোগ করতে চান। কতো—কতো বছর পরে বাংলা গান শুনছেন। ঠিক আইরিশ মেলডির মত করুণ।

বারান্দার ওদিকের ঘরে তখন বিনু আর তনিমা। ভদ্রলোকের কানটা গানের দিকে না আড়িপাতার দিকে কে জানে।

তনিমা তখন বলছে—শুনলে ত, বুড়ো লোকটিও সেই কথাই বলছেন। শ'য়ের মত মনীষী হয় না বলে তোমরা খুব চেঁচাচ্ছ। তবে তাঁর বুদ্ধি অনুসারে ভাল মানুষের মত কেটে পড় না কেন ?

বিনু মৃদু প্রতিবাদ করল—শ'কে এর মধ্যে টেনে আনছ কেন ?

—বাঃ। তিনি পর্যন্ত বলেছেন যে বিয়ের পর মেয়েদের মূল্য থাকে না।

—তারা অমূল্য হয়ে ওঠে, তনু। তারা অমূল্য হয়ে ওঠে।

—নিজের কানেই ত শুনলে এখনি।

—তবে শোন, তনু। জীবনটা ছাপানো বই নয়। তা যদি হত তাহলেও তার কথাতেই তুমি জবাব পাবে। তিনি বলেছেন যে প্রেম, এমন কি তুমি বলতে পার কামনা—কামনা বিয়েকে দেয় মর্যাদা, দেয় চেতনা আর মানে। দেহের ক্ষুধার মধ্যে দিয়েই বহু নীতি বহু উদ্দেশ্য সৃষ্টি হয়। আত্মা সৃষ্টি হয় সেই কামনার মধ্য দিয়ে। এর পরেও কি তুমি আমাদের ভালবাসাকে ভুলে থাকতে চাও? অস্বীকার করতে চাও?

—ও সব ত হচ্ছে বড় বড় বাণী। অর্থাৎ যাকে বলে স্রেফ ভাঁওতা। আমরা শুরু করব সমস্ত পৃথিবীর মাথার উপর দিয়ে। কিন্তু ক্রমে নেমে আসব সংসারের অতলে। আমি নারী হয়ে আমার সবচেয়ে বড় সম্পদগুলি তোমায় দেব। তবু তুমি চাইবে ছোট ছোট জিনিষ। আমি দেব আমার আত্মা, আমার সত্তা। তুমি চাইবে শুধু অফার মত আমার দেহ, এই খেলার পুতুল। এরি মানে বিয়ে।

—না, না, তনু। তুমি মিছেমিছি বড় বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। তুমি যখন আমায় ভালবাস তখন আমি দিতে চাই আকাশের সমস্ত তারা আর চাঁদ তোমার খেলার জন্য। দেহ হয়ে যায় আত্মার মন্দির। যে মন্দিরে আমরা রোজ থাকি, রোজ দেখি তাকে যে তবু ভালবাসি, তবু চাই। মানুষের ভালবাসার সেই ত সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

তনিমা মানল না। বলল—তবু ভেবে দেখ, আমাদের চারদিকে যে সব স্বামী স্ত্রী তাদের ঘর সংসার দেখলে খালি জেলখানা মনে হয়। টিয়া ময়নার খাঁচার চেয়ে বেশী স্বাভাবিক নয় সেগুলি।

বিনু বাধা দিতে চাইল।

তনিমা বলল—সত্যি কথা বলতে কি, জেলখানা সংসারের চেয়ে বেশী ভয়াবহ নয়। জেলে তবু নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে। সংসারের হৈ হামলা হচ্ছে, বটু মাষ্টারের ইস্কুলের ইনকালাবের চেয়েও বেশী হ্যাঙ্গামের।

বিনু তবু হাল ছাড়ল না। শুধু মনে করিয়ে দিল যে জীবনটার এক টেরে ঘুমোচ্ছে বটু মাষ্টার। অন্য প্রান্তে সজাগ রয়েছে বার্নার্ড শ। তার মাঝখানে যে ফাঁকা মাঠ, যে শান্তি, যে স্বস্তি সেটুকুর মধ্যেই সে পাততে চায় সংসার। তনুর সঙ্গে। একান্তে।

সেখানে নেই কোন মিটিংয়ের ঠাঁই। নেই বক্তৃতা, কাব্যলেখা। নেই চা পার্টি আর কালচারের বুলি।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল তনিমার মুখ।

—তাহলে তুমি যে হপ্তার পর হপ্তা ছাত্রনেতা সেজে মিটিং করে বেড়াচ্ছ ? আমি একটা প্রাণী ইহলোকে আছি কি নেই তা-ও তোমার মনে নেই। স্রেফ ভুলে গেছ।

—ভুলি নি তনু, ভুলি নি। ভুল করেছি। তাই ত ছুটে এলাম তোমার কাছে। বড় বড় গালভারী পোষাকী কথা ছেড়ে শুধু তোমার সঙ্গে কইব কথা। নিরালায়। সুদূরে। যাবে কি এখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এই সন্ধ্যায় ? নিরুদ্দেশ যাত্রায় ?

তনু শুধু শুধোল—সত্যি ?

আড়ালে বারান্দায় প্রফেসার রে নিজেকে উত্তর দিলেন—সত্যি। এটুকুই সত্যি।

অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

নিদাঘ-কালের সায়াহ্ন। এক অত্যুচ্চ গিরি-শিখরের অন্তরালে সূর্য অস্ত যাইতেছে, রক্তবর্ণ সূর্য-রশ্মি শিখরস্থিত পাষাণ-দুর্গের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র দুর্গটিকে এক অপূর্ব রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। দূর হইতে হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে যেন দুর্গের পশ্চাতভাগে অগ্নিকাণ্ড হইতেছে, তাহারই আলোক প্রাচীরে প্রতিফলিত। পর্বত-গাত্র বন্ধুর, উপল-বিষম, দুরারোহ। নিম্নে, পর্বতের পাদদেশে, হরিদ্বর্ণ শষ্পতৃণ-মণ্ডিত সুরম্য উপত্যকা।

দুইজন অশ্বারোহী উপত্যকা অতিক্রম করিয়া পর্বতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন।

অশ্বারোহীদ্বয় উভয়েই বর্মাবৃত, অশ্বও বর্মাবৃত। লৌহবর্মের অন্তরালে সংগুপ্ত অশ্বারোহীর দেহসৌষ্ঠব লক্ষ্যগোচর হয় না, তথাপি অনুমানে উপলব্ধি হয়; উভয়ের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ, অপর অল্পবয়স্ক। যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, ভাবে-ভঙ্গিতে তাঁহাকে প্রৌঢ় বলিয়া মনে হয়; যেন যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইতেছেন, অথচ যৌবন-সুলভ তেজ ও বীর্য

এখনও তাঁহাকে সম্যক পরিত্যাগ করে নাই। দেহ দীর্ঘ, উন্নত, বলিষ্ঠ। অপরজন যুবা। অনুমানে বুঝা যায় যৌবনের মাত্র আরম্ভ; যুবজনোচিত শক্তি ও তেজের আবির্ভাব তাঁহাতে হইয়াছে, কিন্তু কৈশোরের চাঞ্চল্য ও চাপল্য মন ও দেহ হইতে এককালে অন্তর্হিত হয় নাই। উভয়েরই এক বেশ, বর্ম ও শিরস্ত্রাণে দেহ ও মুখমণ্ডল আবৃত, পৃষ্ঠে বর্শা আবদ্ধ; বাহুতে চর্ম, কটিতে তরবারি ও ছুরিকা, দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠাধরে ও চক্ষে দৃঢ় সংকল্প।

অশ্বের দেহ বর্মাবৃত। অশ্বগণ উচ্চবংশজাত, দৃঢ়কায়, কিন্তু তাহাদের পদবিক্ষেপ ক্লান্ত, দেখিয়া বুঝা যায় বহুদূর ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে।

চলিতে চলিতে যুবা অশ্বের রশ্মি ঈষৎ সংযত করিলেন। দুইজনে পাশাপাশি চলিতেছিলেন, এবার যুবা পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। প্রৌঢ় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যুবা পার্শ্বে নাই। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, যুবা অশ্ব সংযত করিয়া একদৃষ্টে গিরিশিখরের দিকে চাহিয়া আছেন, দুর্গের পশ্চাতে সূর্যাস্তের অপূর্ব শোভা, মুগ্ধ হইয়া তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন। প্রৌঢ় অশ্ব ফিরাইয়া যুবার নিকটে গেলেন। বলিলেন, চল চল।

যুবা মুখ ফিরাইলেন না, কহিলেন, দাঁড়ান, একটু দেখিয়া লই।

প্রৌঢ় কহিলেন, ও দেখিবার অবসর অনেক পাইবে। এখন আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, এমনিই বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

যুবা কহিলেন, কিসের বিলম্ব?

প্রৌঢ় কহিলেন, দুর্গে পৌঁছিবার। পৌঁছিতে রাত্রি দুই দণ্ড অতিক্রান্ত হইয়া যাইবে। সূর্যাস্তের পূর্বে পৌঁছিবার কথা ছিল।

যুবা কহিলেন, ছিল তো ছিল।

প্রৌঢ় কহিলেন, তাহা বলিলে চলিবে কেন। আমরা নির্দেশের দাস, যেমন নির্দেশ সেই অনুসারেই চলিতে বাধ্য।

যুবা ভ্রূকুটি করিলেন, নির্মল আকাশে সহসা মেঘের সঞ্চার হইল। কহিলেন, কেবলই শুনি, নির্দেশ, নির্দেশ। এমনই কি নির্দেশ, যে তাহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সহে না? কাহার নির্দেশ?

প্রৌঢ় কহিলেন, প্রভুর।

যুবা কহিলেন বুঝিলাম না। বিধাতা? কিন্তু তিনি তো নিজ মুখে নির্দেশ ব্যক্ত করেন না।

প্রৌঢ় কহিলেন, বিধাতা নহে, আমাদের পক্ষে তিনি বিধাতা অপেক্ষা বৃহৎ। তাঁহারই ইচ্ছায় আমাদের জন্মিতে মরিতে হয়। আমাদের গতিবিধি ইচ্ছা-

অনিচ্ছা পর্যন্ত তাঁহারই ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত।

যুবা কহিলেন, কিন্তু কে সে, কি তাহার পরিচয় ?

প্রৌঢ় কহিলেন, পরিচয় আমিও জানি না। কেবল তাঁহার ইচ্ছায় চলিতে হয় এইটুকুই জানি।

যুবা কহিলেন, পরিচয় না পাইলে আমি আর চলিব না। যাহাকে চিনি না, জানি না, তাহার আদেশেই আমাকে সর্বদা চলিতে হইবে, এ কেমন কথা ?

প্রৌঢ় কহিলেন, তবে আর একজনের আদেশ শোন। ঐ দেখ।

প্রৌঢ় অঙ্গুলি-সংকেতে দেখাইলেন, দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, যেখানে আকাশ দিগন্তে মিশিয়াছে, সেইখানে দিকচক্রের গায়ে একটি সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ রেখার আবির্ভাব হইয়াছে।

যুবা কহিলেন, কি ?

প্রৌঢ় কহিলেন, ঝড়। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি আসিবে। আসিবার পূর্বেই আমাদের দুর্গে পৌঁছিতে হইবে, নতুবা সমূহ বিপদ।

যুবা কহিলেন, সে কথা ভাল। বলিয়া রশ্মি শ্লথ করিলেন, অশ্বের উদরে ঈষৎ পদস্পর্শ করাইলেন, শিক্ষিত অশ্ব লম্ফ দিয়া সম্মুখে ধাবিত হইল।

এক মুহূর্ত নীরবে চলিয়া যুবা কহিলেন, আমি কিন্তু মেঘ দেখিয়াই চলিতে রাজি হইলাম, প্রভুর আদেশ বলিয়া নয়।

প্রৌঢ় কহিলেন, আরও দ্রুত চল। এই আলোটুকু থাকিতে থাকিতে পথ শেষ করা যায় কিনা দেখ।

সূর্য তখন অস্ত গিয়াছে। কেবল সন্ধ্যার ম্লান আলোকে তখনও পথ দেখা যাইতেছিল।

প্রৌঢ় কহিলেন, এখনই বৃষ্টি আসিবে।

যুবা কহিলেন, আসিলেই বা। বর্ম তো আছে।

প্রৌঢ় কহিলেন, দেহে বর্ম আছে, পথে বর্ম নাই, অশ্বের খুরে বর্ম নাই। পর্বত বাহিয়া দুর্গে উঠিতে হইবে। পথ পিচ্ছিল হইলে অশ্ব চলিতে পারিবে না।

বলিতে বলিতে সমতল উপত্যকাভূমি শেষ হইয়া গেল। পর্বতের গাত্র বাহিয়া সংকীর্ণ অমসৃণ গিরিপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া দুর্গের দ্বারে গিয়া পৌঁছিয়াছে ; দুইজনে সেই পথে সাবধানে অশ্ব চালনা করিলেন। অশ্ব শ্রান্ত, ক্লেশে সেই অসমতল পথ বাহিয়া উর্ধ্বে উঠিতে লাগিল, তাঁহাদের গতি মন্থর হইয়া গেল। প্রৌঢ় ও যুবা উভয়েই নিপুণ অশ্বারোহী। এই পথ, তাহাতে

প্রায় অন্ধকার, একবার যদি অশ্বের পদস্খলন হয় তবে বিপদ অনিবার্য। রশ্মি শ্লথ করিয়া তাঁহারা অশ্বকে যথেচ্ছ চলিতে দিলেন, দ্রুত চালাইবার চেষ্টা করিলেন না। অল্প কিছুদূর উঠিতে না উঠিতেই অন্ধকার ঘোর হইয়া আসিল। প্রৌঢ় একবার থামিলেন, শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া মনোযোগ দিয়া কি যেন শুনিতে চেষ্টা করিলেন। যুবা কহিলেন, কি হইল ?

প্রৌঢ় শিরস্ত্রাণ পুনরায় পরিধান করিলেন। কহিলেন, ঝড় আসিয়া পড়িয়াছে।

বলিতে বলিতেই উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ তাঁহাদের গায়ে আসিয়া লাগিল। তাহার পর প্রচণ্ড ঝড়। পর্বতগাত্র প্রস্তরময়, অনুর্বর, বৃক্ষলতা বড় নাই। থাকিলে, তাহার অন্তরালে কথঞ্চিৎ আশ্রয় পাওয়া যাইত। উন্মত্ত বায়ু এমনই প্রচণ্ড বেগে উভয়কে আঘাত করিতে লাগিল, মনে হইল পর্বত হইতে উড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দিবে। ঝড়ের শব্দে অন্য শব্দ শোনা যায় না। প্রৌঢ় অশ্বকে যুবার নিকটে লইয়া গেলেন, প্রাণপণে চীৎকার করিয়া কতক ভাষায় কতক ইঙ্গিতে কহিলেন, দ্রুত চলিবার চেষ্টা কর।

সে অবস্থায় দ্রুত চলিবার চেষ্টা করা বিপজ্জনক। যুবা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন ?

প্রৌঢ় কহিলেন, আর একটু সম্মুখে পথ বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানে একটি ক্ষুদ্র শিখর আছে। সেই পর্যন্ত যাইতে পারিলে আশ্রয় পাইব।

যুবা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, অশ্বের উদরে পদাঘাত করিলেন, অশ্ব সম্মুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া উভয়েই বুঝিলেন, এ-চেষ্টায় ফল নাই। ঝড়ের বেগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, এমতাবস্থায় দ্রুত গমন তো দূরের কথা, অশ্বপৃষ্ঠে থাকাও বিপজ্জনক। তথাপি দুইজনে আরও কিয়ৎক্ষণ চেষ্টা করিলেন। অন্ধকারে ঝড়ের পীড়নে অশ্বের বারংবার পদস্খলন হইতে লাগিল, বারংবার তাঁহারা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে বাঁচিয়া গেলেন।

অবশেষে প্রৌঢ় কহিলেন, আর না, এবার নাম।

দুইজনে নীরবে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন, অশ্বকে টানিয়া ভূমিতে বসাইলেন। শিক্ষিত অশ্ব পার্শ্বে ভর দিয়া প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়া শয়ন করিল। আরোহীরাও বসিলেন, অশ্বের দেহের অন্তরালে যথাসাধ্য আপনাকে গোপন করিয়া ভূমিলগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। ঝড় তাঁহাদের আর স্পর্শ করিল না ; ঊর্ধ্ব দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় অর্ধদণ্ডকাল অতিবাহিত হইল। তারপর ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় শব্দ করিয়া বৃষ্টি নামিল। প্রৌঢ় কহিলেন, আর বিলম্ব নয়, চল।

দুইজন উঠিলেন। অশ্বকে উঠাইলেন। যুবা এক লম্ফে অশ্বে আরোহণ করিতে যাইতেছেন। প্রৌঢ় বাধা দিলেন। কহিলেন, পারিবে না, হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

দুইজন পদব্রজে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, অশ্বকে বল্গা ধরিয়া পশ্চাতে টানিয়া লইয়া চলিলেন। ঘন-কৃষ্ণ মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, নক্ষত্রের আলোক পর্যন্ত নাই। নিশ্ছিদ্র ঘন অন্ধকার, যেন হাত দিয়া স্পর্শ করা যায়। সেই অন্ধকারে অনুমানে পথ স্থির করিয়া সাবধানে পদবিক্ষেপ করিয়া দুইজনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, শিক্ষিত অশ্বও ঠিক সেইরূপ পদক্ষেপ করিয়া পশ্চাতে আসিতে লাগিল। বৃষ্টি মুষলধারায় পড়িতেছে…। অচিরাৎ উভয়ের পদদ্বয় জলে নিমগ্ন হইল। পর্বত-গাত্র বাহিয়া শতসহস্র জলধারা আসিয়া পথে পড়িতেছে, পথটি জলপ্রণালীতে পরিণত হইয়াছে। পথ উপলবিষম, তাহাতে ধূলিবিহীন মসৃণ প্রস্তর জলস্পর্শে পিচ্ছিল হইয়া গেল। প্রতিপদে পদস্খলনের ভয়। কোথায় পদক্ষেপ হইতেছে কিছুই দেখা যায় না, পদে পদে আঘাত লাগিতে লাগিল। যুবাই প্রথম আছাড় খাইলেন, পদতলে শিলাখণ্ড সরিয়া যাইবার ফলে একেবারে জানু পাতিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। প্রৌঢ় ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে টানিয়া উঠাইলেন। কহিলেন, লাগে নাই তো?

যুবা কহিলেন, না, কিন্তু না লাগাই আশ্চর্য। প্রৌঢ় কহিলেন সাবধানে চলিও।

যুবা বিরক্তস্বরে কহিলেন, কোথায় কোন পথে যাইতেছি কিছুই দেখিতে পাই না, সাবধান হইব কি করিয়া?

প্রৌঢ় আপন মনে কহিলেন, আজ ললাটে অনেক দুর্গতি আছে। কে জানে প্রভুর মনে কি উদ্দেশ্য।

যুবা কহিলেন, আবার প্রভু! এখন যদি আমার কাছে তাহার নাম করেন, ভাল হইবে না বলিয়া দিতেছি।

প্রৌঢ় কহিলেন, নাম না করিলেই কি তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিব?

বলিতে বলিতে তাঁহার অশ্বের পদস্খলন হইল, অশ্ব সম্মুখে হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে কোনক্রমে সামলাইয়া গেল। অশ্বের মুখ পিছন হইতে প্রৌঢ়ের স্কন্ধে ঠেকিয়া তাঁহাকে অতর্কিতে ঠেলিয়া দিয়াছিল, তিনিও পড়িতে পড়িতে

অতি কষ্টে বাঁচিয়া গেলেন। তখন অশ্বের বল্‌গা আরও একটু ছাড়িয়া দিলেন, যেন অশ্ব ও তাঁহার মধ্যে ব্যবধান দীর্ঘতর হয়, আবার তাহার পদস্খলন যদি বা হয়, তাঁহার গায়ে না পড়িতে পারে। যুবাকেও সেইরূপ করিতে নির্দেশ দিলেন। যুবা নির্দেশ পালন করিলেন, মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, নানান্ জ্বালা।

আর কিছু অগ্রসর হইয়া প্রৌঢ় ভূপতিত হইলেন। একেবারে চিৎ হইয়া সর্বাঙ্গব্যাপী পতন, শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত ভূমি স্পর্শ করিল।

যুবা উচ্চহাস্য করিয়া তাঁহাকে টানিয়া উঠাইলেন। কহিলেন, এবারে কে কাহাকে সাবধান করে?

বলিতে বলিতে যুবার অশ্ব আবার হুঁচোট খাইল। যুবা কহিলেন, চলুক, চলুক।

তারপর আবার তিনি পড়িলেন, নিজেই আবার উঠিলেন। আবার প্রৌঢ় পড়িলেন, আবার যুবা, আবার প্রৌঢ়ের অশ্ব, তারপর আর পতনের বিরাম রহিল না। পথ ক্রমেই আরও খাড়া হইতেছে, ক্রমেই আরোও পিছল হইতেছে, যাত্রীদের পদক্ষেপ ক্রমেই আরো ক্লান্ত হইতেছে। এই যুবা পড়েন, তিনি উঠিতে না উঠিতেই প্রৌঢ় পড়েন, তার পরই একটা অশ্ব পড়ে, তাহাকে টানিয়া তুলিতে গিয়া আবার যুবার পা পিছলাইয়া যায়, সে এক বিচিত্র দৃশ্য। বর্ম-শিরস্ত্রাণ কর্দমে মাখামাখি হইয়া গেল, অশ্ব দুটিকে দেখিলে মনে হয় পঙ্কস্নান করিয়া উঠিল, অস্ত্রে-বস্ত্রে সর্বত্র কর্দম—বৃষ্টির ধারায় ও পথের স্রোতজলে সর্বাঙ্গ সিক্ত।

একবার যুবার জানুতে আঘাত লাগিল। তিনি অতি কষ্টে উঠিয়া পথের উপরে বসিলেন, অন্ধকারে হাতড়াইয়া জানুত্রাণের উপর দিয়াই আহত জানুতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

প্রৌঢ় কহিলেন, কি হইল?

যুবা কহিলেন, বিশেষ কিছুই নহে। বাটিটা হারাইয়া গেল নাকি দেখিতেছি।

প্রৌঢ় কহিলেন, খুব লাগিয়াছে?

যুবা কহিলেন, কাল বুঝিব—এত অন্ধকারে কি ব্যথা ঠাহর হয়?

প্রৌঢ় কহিলেন, তুমি এক কাজ কর, অশ্বেই চড়িয়া বইস, আমি অশ্বকে যেমন টানিয়া লইতেছি, লইয়া যাই—

যুবা কহিলেন, তবেই হইয়াছে। এ তবু হাঁটুর উপর দিয়া গেল,

অশ্বসমেত ডিগবাজি খাইলে সর্বাঙ্গই রসাতলে যাইতে পারিব। কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, হাঁটিয়াই যাইব, বাটিটা এখনও আছে মনে হইল।

দুইজনে অগ্রসর হইলেন। এবার আরও মন্দগতিতে, কারণ যুবা খোঁড়াইতেছেন, প্রৌঢ়ের স্কন্ধে ভর দিয়া চলিতেছেন।

চলিতে চলিতে যুবা কাতরোক্তি করিলেন। প্রৌঢ় কহিলেন, লাগিতেছে ?

যুবা কহিলেন, খুব।

প্রৌঢ় কহিলেন, আর বেশী দূর নাই, সম্মুখেই সেই বাঁক, সেখানে গেলে আশ্রয় পাইব। এইটুকু কষ্ট সহিতে পারিবে না ?

যুবা দন্তে দন্ত নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, পারিব।

দুইজনে সন্তর্পণে অগ্রসর হইলেন। অচিরাৎ বর্ণিত শৃঙ্গমূলে পৌঁছিলেন। পথিকদ্বয়ের কষ্ট দেখিয়া ঝড়-বৃষ্টির বোধ হয় লজ্জা হইয়াছিল, তাহার বেগও হঠাৎ কমিয়া গেল। পর্বতের একটি শৃঙ্গকে বেষ্টন করিয়া পথ ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে, শৃঙ্গের ঊর্ধ্বভাগ পথের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আবৃত পাদমূলে একটি সংকীর্ণ আশ্রয়স্থল রচিত হইয়াছে, সেখানে পাঁচ সাতজন মনুষ্য একসঙ্গে দাঁড়াইতে বা বসিতে পারে। আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া প্রৌঢ় কহিলেন ; আর নয়, এইখানে বসিব।

আবৃত স্থানে বৃষ্টিপাত হয় নাই। ভূমিতল শুষ্ক। প্রৌঢ় ও যুবা ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। অশ্ব দুইটি আশ্রয়ে কথঞ্চিৎ মস্তক প্রবিষ্ট করাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবা কহিলেন, জানুত্রাণটা খুলি। একটু বিদ্যুৎ পর্যন্ত নাই যে কিছু দেখিতে পাইব। উল্কা লইয়া আসা উচিত ছিল।

প্রৌঢ় কহিলেন, তখন ত জানিতাম সন্ধ্যার পূর্বে দুর্গে পৌঁছিব। আর, আনিলেই বা কি হইত, এই বৃষ্টিতে কি উল্কাই জ্বলিত ?

যুবা উত্তর না করিয়া জানুত্রাণ খুলিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রন্থি মোচন করিয়া বন্ধনীর পাক খুলিতে যাইবেন, এমন সময় অন্ধকারের মধ্য হইতে সহসা প্রশ্ন হইল, এত দেরি কেন ?

দুইজনেই চমকিত হইলেন। প্রথমে ভাবিলেন, প্রেতযোনি। তারপর লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। অন্ধকারের মধ্যেই অনুভব করিলেন, তৃতীয় এক ব্যক্তি অকস্মাৎ কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহাদের ঠিক সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে।

উত্তর না পাইয়া সে ব্যক্তি আবার প্রশ্ন করিল, উত্তর দাও। এত দেরি

করিলে কেন ? বিরক্তি-জড়িত স্বর ; তাহাতে আদেশের উদ্ধত ভঙ্গি। যুবা কহিলেন, কে তুমি ?

সে ব্যক্তি কহিল, আমার কথার উত্তর দাও। সন্ধ্যার বহুপূর্বে হইতে আমি তোমাদের অপেক্ষায় এইস্থানে দাঁড়াইয়া আছি। এত দেরি করিয়া আসিলে কেন ?

যুবা কহিলেন, তুমি কে ?

সে কহিল, আমি তোমাদের স্রষ্টা। আমি লেখক।

প্রৌঢ় নিঃশব্দে অভিবাদন করিলেন। কহিলেন, প্রভু !

লেখক প্রত্যভিবাদন করিল না, রুক্ষ স্বরে কহিল, এত বিলম্ব হইল কেন ?

প্রৌঢ় কহিলেন, দীর্ঘপথ। রৌদ্রে অশ্ব শ্রান্ত হইয়া পড়ে, চলিতে পারে না, তাহার উপর এই ঝড়বৃষ্টি।

লেখক কহিল, আমি সমস্তই জানি। কিন্তু অন্যের লিখিত পুস্তকের নায়ক হইতে গেলে সময় মত চলিতে হয়। গন্তব্যস্থান যখন বহুদূরে, তখনও অশ্ব থামাইয়া সূর্যাস্তের শোভা দেখিয়া সময় নষ্ট করা তাহার চলে না।

যুবার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিলেন। দীর্ঘ বিসর্পিত কেশকলাপ স্কন্ধদেশ আচ্ছন্ন করিল। তীক্ষ্মস্বরে কহিলেন, আর, আমি যে আছাড় খাইয়া হাঁটু ভাঙিলাম ?

লেখক কহিল, বড় করিয়াছ। দুইজনে মিলিয়া দশবিশ পঞ্চাশটা করিয়া আছাড় খাইয়াছ—আছাড় খাইতে জায়গা লাগে না, না ? কাগজের দর কত হইয়াছে, তাহার সংবাদ রাখ ?

যুবা কহিলেন, বাজে কথা বলিও না। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই প্রাণপণে চলিয়াছি, অশ্বকে সারাদিন এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিই নাই। আছাড় খাইয়া হাঁটু ভাঙিয়াছে, বৃষ্টিতে ভিজিয়া সর্বাঙ্গ ফুলিয়া ঢোল হইয়াছে।

লেখক কহিল, আর, আমি ভিজি নাই ? তোমরা ভিজিয়াছ বর্ম পরিয়া ; আমার গায়ে শুধু একটা মিলের পাঞ্জাবি, তাহাও তিন স্থানে ছেঁড়া। তোমরা দুর্গে পেঁছিয়া আশ্রয় পাইবে অভ্যর্থনা পাইবে, দুর্গ-স্বামীর রূপবতী ষোড়শী কন্যা স্বয়ং তোমাদের আপ্যায়নের ভার লইবে, হয়তো তাহার হাতের বরমাল্যও তোমার জন্যই সঞ্চিত রহিয়াছে। আর আমি ? তোমরা দুর্গে পেঁছিলে তবেই আমার একটি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ, সেইটি লইয়া সম্পাদকের নিকটে যাইব, তিনি দশটি টাকা দিবেন, সেই টাকায় আমার আজিকার চাউল কেনা হইবে।

যুবা কহিলেন, অত ইতিবৃত্ত শুনিতে চাই না, আমি শুনিয়া কি করিব—?

আমার কথা, আমরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, যুদ্ধ বুঝি, কর্তব্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু তারপর যদি সিদ্ধকাম না হই, চেষ্টা করার পরও যদি সে চেষ্টা দৈবাৎ সফল না হয়, তাহার জন্য কৈফিয়ৎ দিতেও আমরা প্রস্তুত নই।

লেখক চটিয়া গেল, গর্জন করিয়া কহিল, আলবৎ দিতে হইবে কৈফিয়ৎ, একশতবার দিতে হইবে। আমার ইচ্ছায় তোমাদের জন্ম, আবার আমার ইচ্ছায়ই বিনাশ। জান ইচ্ছা করিলে তোমাকে এই মুহূর্তে গিরিচূড়া হইতে নিম্নে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে পারি,—যেখানে তোমার চূর্ণ অস্থিরও সন্ধান কেহ কোনদিন পাইবে না ?

দিন হইলে দেখা যাইত, যুবার মুখ লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। জানুর ব্যথা ভুলিয়া এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আইস না, শক্তির পরীক্ষাই এক হাত হইয়া যাক।

লেখক দুই পদ পিছাইয়া গেল, কহিল, বাহুবল কেন, বাহুবলকে আমরা ঘৃণা করি, উহা পাশব বল মাত্র। আরও দুই পদ পিছাইয়া গিয়া কহিল, তোমাকে গিরি গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে আমার বাহুবলের প্রয়োজন হয় না, ভল্ল-বল্লমের আবশ্যক হয় না। সেজন্য আমার কলমই যথেষ্ট, শুধু দুইটি ছত্র লিখিবার অপেক্ষা। জান, এই যে সারাদিন অবিশ্রাম ঘোড়া ছুটাইয়া এতদূরে পথে লইয়া আসিয়াছি, ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া পর্বতে টানিয়া তুলিয়াছি, তাহা কেবল আমার কলমের জোরে ?

যুবার ওষ্ঠ সহসা হাস্যরঞ্জিত হইল। কহিলেন, আমি কিন্তু তোমাকে অতখানি গ্রাহ্য করি না। সূর্যাস্ত দেখা স্থগিত রাখিয়া আবার অশ্ব চালাইয়াছিলাম তোমার ভয়ে নহে, মেঘ দেখিয়া।

লেখক ব্যঙ্গভরে হাসিয়া কহিল, কিন্তু জান কি, সে মেঘও আমারই সৃষ্টি ? আমি মেঘের কথা না লিখিলে কি মেঘ হইত ?

যুবা কহিলেন, কিন্তু তাই যদি হয়, মেঘ আনিলে কেন ? আকাশ যদি পরিষ্কার থাকিত, আমরা যথাসময়ে দুর্গে পেঁ'ছিতে পারিতাম। বৃষ্টিতে ভিজিয়া কষ্ট পাইতাম না, হাঁটুটাও ভাঙিত না।

লেখক বিজ্ঞজনোচিত হাস্য করিয়া কহিল, কিন্তু তাহা না হইলে যে প্লট জমিত না। পরিষ্কার আকাশে দিনের আলোকে পথ অতিক্রম করিতে সকলেই পারে ; তাহাতে শৌর্যের প্রমাণ হয় না। পাঠকও খুশী হয় না, তাহারা অ্যাডভেঞ্চার চায়।

যুবা কহিলেন, তাহার অর্থ ? তুমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঝড়-বৃষ্টির

সৃষ্টি করিয়াছ, আমাদের বৃষ্টিতে ভিজাইয়াছ। আমার হাঁটু ভাঙিয়াছ!

লেখক ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ইহাতে তোমারও স্বার্থসিদ্ধি হইবে—ঝড়-বৃষ্টিতে তোমার দুর্গতি, ভগ্ন জানু; হয়তো দুর্গস্বামীর কন্যার হৃদয়ে তোমার প্রবেশ পথ সহজ করিয়া দিবে।

যুবা তরবারির মুঠায় হস্তক্ষেপ করিলেন, কহিলেন, উত্তর দাও। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তুমি আমাদের এত কষ্ট দিয়াছ?

লেখক কহিল, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমি তোমাদের সৃষ্টিই করিয়াছি।

যুবা গর্জন করিয়া কহিলেন, তুমি বুর্জোয়া।

লেখক কহিল, আমি তোমার সৃষ্টিকর্তা।

যুবা তরবারি কোষমুক্ত করিতে গেলেন, অর্ধেক মুক্ত করিয়া আবার কি ভাবিয়া তাহাকে কোষে প্রবিষ্ট করাইলেন। শান্তস্বরে কহিলেন, তোমাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিতাম। কাটিব না—তুমি অস্নাক্লিষ্ট, ক্রোধের অযোগ্য। তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম।

বলিয়া যুবা ফিরিলেন, কষ্টে হাঁটিয়া গিয়া অশ্বের বল্গা ধরিলেন। প্রৌঢ় কহিলেন, কোথায় যাও?

যুবা কহিলেন ফিরিয়া যাইতেছি।

লেখকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ রহিল, ভবিষ্যতে কোনদিন কোন আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে লইয়া গল্প লিখিতে যাইও না; বিপন্ন হইবে। আমি চলিলাম।

লেখক হতবাক্ হইয়া কহিল, কোথায় যাও?

যুবা কহিলেন, তোমার গল্পের নায়ক আমি হইব না, তোমার প্লটে আমি পদাঘাত করি।

লেখক কহিল, কিন্তু দুর্গস্বামীর ষোড়শী কন্যা—

যুবা কহিলেন, তাঁহার জন্য নূতন নায়ক বানাইয়া দিও।

যুবা এক লম্ফে অশ্বে উঠিলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে, পথে জল নামিয়া গিয়াছে। নিম্নাভিমুখে অশ্বচালনা করিয়া দ্রুত অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

প্রৌঢ় এতক্ষণ নির্বাক হইয়া ছিলেন, এখন তিনিও উঠিলেন, নিঃশব্দে নিজের অশ্বে আরোহণ করিলেন।

লেখক ব্যাকুল হইয়া কহিল, আপনিও? আপনি অন্তত দুর্গে চলুন।

প্রৌঢ় মৃদুস্বরে কহিলেন, নায়ক ঐ যুবা। আমি দেহরক্ষী মাত্র।

প্রৌঢ়ের অশ্বও অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে লেখক একাকী চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন ; কেবল ছিন্নমেঘের ফাঁক দিয়া এখানে ওখানে দুই একটি তারা এক চক্ষু মেলিয়া বক্র দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

লেখক বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া পিছন ফিরিল। ফিরিতেই দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ কিরকম শির্ শির্ করিয়া উঠিল। যেন কাহার লঘু স্পর্শ। লেখক চমকিয়া উঠিল, স্বরহীন কণ্ঠে কহিল, কে ?

মৃদু, ভীরুস্বরে উত্তর হইল, প্লট। আমি এখন কি করিব ?

লেখক সর্পের মত গর্জন করিয়া কহিল, চুলায় যাও।

অজিতকৃষ্ণ বসু

একটি কবিতার কাহিনী

কবিসম্রাট চতুরানন চম্পটী মারা গেলেন, বেঁচে রইলেন তাঁর বিধবা—চপলসুন্দরী চম্পটী। ভদ্রলোক মারা গেলেন একেবারে হঠাৎ, আমরা কেউ এজন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি নিজেও ছিলেন কিনা সন্দেহ। যে দিন (অর্থাৎ যে রাত্রে) তিনি মারা গেলেন, তার পরদিন খবরের কাগজের একেবারে শেষ পাতার তলার দিকে—যেখানে সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদ ছাপাবার জন্য খানিকটা জায়গা খালি রাখা হয়, সেখানে—তাঁর মৃত্যু সংবাদ সংক্ষেপে ছাপা হল ঃ

কবিসম্রাটের মহাপ্রয়াণ

গতকল্য রাত্রি দুই ঘটিকার সময় কবিসম্রাট চতুরানন চম্পটি মহাশয়ের মহাপ্রয়াণ ঘটিয়াছে। তিনি পৌনে দুই ঘটিকা পর্যন্ত স্বরচিত কবিতা পাঠে ব্যাপৃত ছিলেন। ঠিক তাহার পরেই তিনি হঠাৎ বুকে ও মগজে যন্ত্রণা বোধ করিতে থাকেন। তাঁহার আর্তনাদে বাড়ীর সকলের ঘুম ভাঙিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন লাভ হয় না, কারণ ডাক্তার ডাকিবার উদ্যোগ করিতে না করিতেই ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়।

পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে কখনো এত বড় মনীষীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ এত ছোট করে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এ না হয়ে উপায় ছিলো না। এমন বেয়াড়াভাবে কোন মনীষীই মারা যান নি—এ যেন খবরের কাগজগুলোকে জব্দ করবার জন্যে কবিসম্রাটের চালাকী। বয়স তাঁর এমন কিছু বেশী হয় নি, কোনোরকম অসুখেও তিনি ভুগছিলেন না, যাতে কাগজওয়ালারা আগে থেকে তৈরী হতে পারে। কোনো কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগই আগে থেকে শোকাচ্ছন্ন সম্পাদকীয়, জীবন কাহিনী ইত্যাদি তৈরী করে রাখেনি, যে প্রয়োজনমত চট করে ছেপে দেওয়া যাবে। রাত দশটার ভেতর মারা গেলেও না হয় হতো—সম্পাদকীয় বিভাগের লোক সে সময়ে হাজির থাকেন, তাঁরা তখন তখন শোকোচ্ছ্বাস লিখে দিতে পারতেন। খবর যখন পাওয়া গেল তখন পুরো কাগজটাই কম্পোজ হয়ে ছাপার মেশিনে উঠতে যাচ্ছে। সে অবস্থায় ঐ সংক্ষিপ্ত খবরটুকুও যে ছাপাতে পারা গেল ঐটুকুই যথেষ্ট। তাই নিয়েই কাগজ ভোরবেলা বেরিয়ে গেল। দুপুরবেলা অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হলো "কবিসম্রাট মহাপ্রয়াণ সংখ্যা" রূপে।

সহরের অনেকেই এ মহাপ্রয়াণে মর্মাহত হলেন। আমরা, মানে ত্রৈমাসিক "পঞ্চরঙ্গ" পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীও, মর্মাহত হলাম; সেটা প্রধানতঃ অন্য কারণে। আমরা বেশ ঢাক পিটিয়েই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলাম—পূজা সংখ্যায় কবিসম্রাটের সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একটি কবিতা প্রকাশিত হবে—ভাষায়, ভাবে ও আঙ্গিকে অনবদ্য। যে তারিখে কবিতাটি পাবার কথা ছিল, তার দুদিন আগেই কবি মহাপ্রয়াণ করলেন। কবিতাটি তিনি হয় তো লিখে রেখে গেছেন, কিন্তু কি করে সেটা পাওয়া যায়? আমাদের অজ্ঞাতসারে অন্য কোনো পত্রিকা আবার সেটা হস্তগত করে না ফেলে।

কবি পরিবারের সঙ্গে আমাদের গজানন মাইতির অন্তরঙ্গতা ছিল গভীর। শ্রাদ্ধাদি ব্যাপার চুকে যেতেই তাকে পাঠিয়ে দিলাম কবিপত্নী চপলাসুন্দরী দেবীর কাছে, কবিতাটি কৌশলে সংগ্রহ করে আনতে। আমাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির ওপর কবির বরাবরই একটু বিশেষ পক্ষপাত ছিল। পূজা সংখ্যার জন্যে একটা বিশেষ কিছু দেবার জন্যে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি বলেছিলেন, "দেবো হে, দেবো। আমার সেরা রচনা দেবো। এবারে এমন জিনিষ দেবো, যা কবিতা-রসিকদের মাথা ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবে। চট্ করে কবিতা বলে অনেকে বুঝবেই না। কয়েকবার পড়লে পর বুঝবে যে এটা কবিতা, কিন্তু ভাব বুঝতে পারবে না। আরো কয়েকবার বিশেষ মন দিয়ে

পড়লে ওর অন্তর্নিহিত ভাবের কিঞ্চিৎ আভাষ পাবে। তারপর যত পড়বে তত নতুন নতুন……"ইত্যাদি।

সুতরাং কবিতাটির জন্য আমাদের আগ্রহের ব্যাকুলতা কত গভীর ছিল তা বোঝাবার চেষ্টা না করাই ভাল।

গজানন মাইতি যখন গিয়ে উপস্থিত হলো (পরে একথা গজাননের নিজের মুখেই শুনেছি) সেদিন বিকেলেই কবি-পত্নী রওনা হবেন শ্রীবৃন্দাবনে। কবি-হীন কলকাতা তাঁর আর ভালো লাগছিল না, ভাবছিলেন হয় তো বৃন্দাবন-তীর্থে গেলে প্রাণে কিছুটা শান্তি পাবেন। জিনিষপত্র গোছগাছ চলছিলো। গজানন একটু ইতস্ততঃ করে কথাটা পাড়তেই হঠাৎ কবি-পত্নীর মনে পড়ে গেল কথাটা। শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠে তিনি বললেন, "কবিতাটি তিনি লিখে রেখে গেছেন বটে, তাঁর জীবনের শেষ খাতায়। সে খাতা তাঁর নিজের হাতে বানানো, ফুলিশক্যাপ কাগজ সেলাই করে'। বলেছিলেন কবিতাটি আরেকবার দেখে, একটু আধটু অদল বদল দরকার হলে তা করে', তারপর আপনাদের দেবেন। আপনাদের পঞ্চরঙ্গের ওপর ওঁর মনে একটা অন্তরঙ্গ স্নেহ প্রচ্ছন্ন ছিল।" বলে কবি-পত্নী আরো শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

অধীরতার ঝোঁকটা একটু কমে এলে গজানন মাইতি বললে, "খাতাটা দয়া করে আমাকে দিয়ে দিন।"

চপলাসুন্দরী দেবী বললেন, "খাতাটাকে আপনাকে দিতে পারবো না, কেন না তাতে ওঁর অন্য কবিতাও আছে। এবং কবিতা ছাড়া অন্যান্য লেখাও আছে। এটা শুধু কবিতার খাতা নয়। আমি আপনাকে বরং ঐ কবিতার পাতাটা ছিঁড়ে দিয়ে দিই। কি বলেন?"

গজাননের অত্যন্ত লোভ হচ্ছিল গোটা খাতাটাই নেবার। কিন্তু বেশী লোভের বশবর্তী হয়ে গোটা খাতাটা চাইতে গেলে শেষটায় কবি-পত্নী ক্ষেপে উঠে পাছে ঐ কবিতাটুকুও না দিয়ে বৃন্দাবন চলে যান, এই ভয়ে গজানন তাঁকে বেশী ঘাঁটাতে ভরসা পেল না। বলল, "তাই দিন।"

(এখানে বলে রাখা দরকার কবি-পত্নী অত্যন্ত রগ-চটা প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। বে-আদবি তিনি একদম সইতে পারতেন না, এবং তিনি যা বলতেন তার কোনো রকম প্রতিবাদ করলেই তৎক্ষণাৎ এমন চটে উঠতেন যে তাঁকে আর কিছুতেই ঠাণ্ডা করা যেতো না। সুতরাং, গজাননের মনে হলো, এই নিদারুণ শোকের অবস্থায় চটে উঠলে সেটা আরো বেশী মারাত্মক হবে।)

গজানন আরো বলল, "কবির স্বহস্তলিখিত এই পাণ্ডুলিপি থেকে ফোটো

তুলে আমরা হাফ্‌টোন ব্লক করে ছাপাবো, যেন পাঠক-পাঠিকারা কবির নিজের হাতের লেখার প্রতিলিপিতেই তাঁর কবিতা পড়তে পারেন।"

কবি-পত্নী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "ধন্য আপনারা, ধন্য আপনাদের প্রচেষ্টা। এই কবিতাটাই কবির সর্বশেষ রচিত কবিতা। ওঃ !!!" বলে তিনি উদ্‌গত অশ্রু চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে পাশের ঘরে চলে গেলেন এবং একটু পরেই খাতার ছিন্নপত্র (কবিতা-সম্বলিত) এনে গজানন মাইতির হাতে দিলেন। তারপর, "এই কবিতাখানাই এই পৃথিবীতে তাঁর সর্বশেষ অবদান। আশাকরি আপনারা এর যথাযোগ্য মর্যাদা দেবেন।" বলে গজানন-হস্তস্থিত খাতার ছিন্নপত্রটির দিকে এমন করুণ মমতা মাখানো দৃষ্টিতে তাকালেন, যে গজাননের ভয় হলো ভদ্রমহিলার মতির হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে, হয়তো শেষটায় পাতাটা হাতছাড়া করবার অনিচ্ছায় ফেরতও চেয়ে বসতে পারেন। তাহলেই বিপদ। সুতরাং তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে গজানন সেখান থেকে কেটে পড়ল। সেদিনই শ্রীবৃন্দাবন রওনা হয়ে গেলেন চপলাসুন্দরী দেবী। আমাদের পঞ্চরঙ্গ বৈঠকে সঙ্গোপনে কবিসম্রাটের সর্বশেষ কবিতাটি পড়া হলো। সত্যিই অদ্ভুত লাগলো। কানের কাছাকাছি গুঞ্জন করতে লাগলো ৺কবিসম্রাটের সার্থক কথাগুলো : "দেবো হে দেবো। এমন জিনিষ দেবো যা……" ইত্যাদি।

কবিতাটির পাণ্ডুলিপি থেকে ফোটো তুলে ব্লক তৈরি করা হলো। পূজা-সংখ্যা 'পঞ্চরঙ্গ'র প্রথম পৃষ্ঠায় সেই ব্লক থেকে ছাপা হলো ৺কবিসম্রাটের শেষ কবিতা।

আমাদের বৈঠকেও ফোটোগ্রাফার নরহরি হোড় কবিসম্রাটের শেষ চেহারার ফোটো তুলে এনেছিলো। তা থেকে ব্লক তৈরি করে আমরা ঐ ব্লক থেকে কবি-সম্রাটের শেষ চেহারার ছবিও ছেপে দিলাম একই পৃষ্ঠায়। পাশাপাশি তাঁর শেষ চেহারার এবং শেষ কবিতা—দুইই সমান অনবদ্য।

এই কবিতাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লিখে দিলাম আমাদের সম্পাদকীয় শোকোচ্ছ্বাসের ভেতর। তাতে গর্ব ও গৌরব প্রকাশ করলাম। কবিতাটি সম্বন্ধে কবির নিজের মতটাও জানিয়ে দিলাম সেই সঙ্গে।

চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল। সাতদিনের ভেতর পঞ্চরঙ্গ পূজাসংখ্যার গুদাম সাবাড় হয়ে গেল। জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে আরেকবার ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হলো এক পৃষ্ঠায় কবিসম্রাটের শেষ কবিতা :

"আমার শান্তিপুরী ধুতি এক জোড়া।
নীল ডোরা কাটা একটা সাদা তোয়ালে,
দুটো বিছানার চাদর, তিনটে রুমাল।
তোমার সাড়ী পনেরো, সেমিজ দশ, সায়া পাঁচ;
অগ্যাণ্ডির ব্লাউজ তিনখানা।
আমার গেঞ্জি হাতাহীন দুই, হাতাওলা তিন,
পাজামা (বা পাৎলুন ?) চারখানা,
ফতুয়া দুই, হাওয়াই কোট পাঁচ
তিনখানা আদ্দির পাঞ্জাবি, সাতখানা শার্ট,
গাউন দুখানা—একখানা ড্রেসিং, একখানা স্লীপিং;
তিনটি টেব্‌ল কভার—একটি গোল, দুটি চৌকো।
মাথা বালিশের খোল চারখানা,
দুখানা পাশ-বালিশের।
একখানা সতরঞ্চি।
জানালার পর্দা পাঁচখানা নীল,
আর পাঁচখানা সাদা;
দরজার পর্দা সাদা চারখানা,
তিনখানা কালো।"

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ধরনের আঙ্গিক। একেবারে কবিসম্রাটের নিজস্ব—কোন চলতি ছাঁচে ঢালাই নয়। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল—আগেই বলেছি। দু-চারজন মূর্খ ও বখাটে কবিতাটিকে একেবারে উড়িয়েই দিতে চেয়েছিলো। তারা মার খেতে খেতে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু সুধীসমাজে অপাংক্তেয় হয়ে রইল।

রসবোদ্ধা প্রবীণ সমালোচক ডক্‌টর অবলোকিতেশ্বর ভট্টাচার্য সমস্ত মতভেদ ও গবেষণাকে নিস্তব্ধ করে দিয়ে লিখলেন:

"অনেক দিক দিয়াই কবিতাটি অতুলনীয় ও অনবদ্য। ইহা নিজেই বিশেষ, ইহাকে কোনও শ্রেণীবিশেষের মধ্যে ফেলা যায় না। ইহা গদ্যও বটে, কবিতাও বটে, কিন্তু সাধারণ গদ্য-কবিতা হইতে ইহা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভারতীয় মিস্টিসিজ্‌ম্ কবিতাটির মধ্যে অপূর্ব, অব্যক্ত মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উহার অন্তর্নিহিত সুরটুকু ধরিতে হইলে সূক্ষ্ম দার্শনিক বোধ থাকা চাই। ইহা ঠিক 'পপুলার' জাতীয় কবিতা নহে। কবির জীবনের গভীরতম উপলব্ধি এই কবিতাটিকে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাই কবিতাটি

'সিম্‌বলিজ্‌ম্' (symbolism) প্রধান বা রূপকধর্মী'।

"পৃথিবীময় অশান্তির আবহাওয়া দেখিয়া কবির চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই শান্তিপুরী ধুতির রূপকের মাধ্যমে তিনি শান্তির আহ্বান জানাইয়াছেন। ধুতি, তোয়ালে, বিছানার চাদর, রুমাল—ইহারা জাতে আলাদা, অথচ মূলতঃ ইহারা সাদা। তেমন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মানুষ, কিন্তু মূলতঃ ইহারাও সবাই এক। এই মূলগত ঐক্য ভুলিয়া অনৈক্যকে বড় করিয়া দেখার ফলেই যত অশান্তি ও সংগ্রাম, কবি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন।

"সাড়ী, সেমিজ, সায়া ও ব্লাউজের উল্লেখে কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন নারীশক্তির গুরুত্ব। পৃথিবী জুড়িয়া যে ধ্বংসাত্মক লীলার বিভীষিকা চলিয়াছে তাহার অবসান ঘটাইতে হইলে নারীজাতিকেও পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাহা হইলে পুরুষ শান্তিকামীদের শক্তি ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে।

"এই কবিতাটি সারা পৃথিবীর শান্তিকামীদের—বিশেষ করিয়া যুব ও নারীশক্তির প্রতি কবির অন্তিম আহ্বান।......" ইত্যাদি।

শোনা যেতে লাগলো কবিতাটি এম্-এ বাংলা পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য কথা ইতিমধ্যেই উঠেছে।

বহু পাড়ায় কবিসম্রাটের শোকসভা হলো। অধিকাংশ জায়গাতেই কবিতাটি আবৃত্তি করা হলো এবং কোনো কোনো সভায় সুর ও হারমোনিয়াম সহযোগে কবিতাটি গাওয়া হলো। শ্রীবৃন্দাবনে পূজা-সংখ্যা 'পঞ্চরঙ্গ' কবিপত্নীর কাছে পাঠানো হয়েছিলো। চিঠিতে লিখেছিলাম "৺কবিসম্রাটের সর্বশেষ-কবিতা-ধন্য শারদীয়া সংখ্যা পঞ্চরঙ্গ একখণ্ড আপনাকে পাঠাইয়া ধন্য হইলাম। ৺কবি-সম্রাটের শেষ প্রতিকৃতি ও শেষ কবিতা আমাদের ক্ষুদ্র অথচ আন্তরিক সাধ্যে কিরূপ ছাপা হইয়াছে সে বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানাইলে বাধিত ও উৎসাহিত হইব।"

লিখনেকা ওয়াস্তে লিখিয়াছিলাম, উত্তর আশা করি নাই। কিন্তু পত্রপাঠ উত্তর আসিল:

"সবিনয় নিবেদন,

আপনারা সর্বনাশ করিয়াছেন, কেলেংকারীর চূড়ান্ত করিয়াছেন। আমি না হয় শোকের মাথায় ভুলে কি দেতে কি দিয়েছি; কিন্তু আপনারা কোন বুদ্ধিতে ধোপার হিসাবকে কবিতা বলিয়া চালাইলেন? ছি ছি ছি! আপনারা

কি কবিতাও চেনেন না ? কবি খাতার যে পৃষ্ঠায় আপনাদের জন্য কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার পরের পৃষ্ঠাতে নিজের হাতেই ধোপার হিসাব লিখিয়াছেন। আমি কবিতার পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া দিতে ভুলে ধোপার হিসাবের পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু খেয়াল করি নাই, আপনারাও করেন নাই। আমি ফিরিয়া কবির শেষ কবিতাটি প্রকাশার্থ দিব। আপনারা ইতিমধ্যে অবিলম্বে একটি ভুল-সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি দিবার ব্যবস্থা করুন। কবিকে লইয়া এ কি কেলেংকারী ? ছি ছি ছি।..."

চিঠি পড়ে আমরা মাথায় হাত দিলাম।

এখন উপায় ?

গজানন মাইতি বললে, "দেখ, যা হবার হয়ে গেছে ; তার আর চারা নেই। এখন কেঁচে গণ্ডূষ করতে গেলে কেলেংকারী বাড়বে বই কমবে না।"

বললাম, "কিন্তু আমরা নিজেই ভুলটাকে চেপে চুপ থাকলেই কবি-পত্নী চুপ থাকবেন কেন ? তিনি জানাজানি করে কেলেংকারীর একশেষ করবেন। তখন যে আরো নাকাল হতে হবে।"

একটু ভেবে গজানন বললে, "ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে লিখলেই উনি গোলমাল করবেন না, চুপ থেকে যাবেন।"

সবাই মিলে পরামর্শ করে লিখলাম :

"মাননীয়াসু,

আপনার পত্র পাইয়া আমাদের ভুল বুঝিয়া লজ্জিত হইলাম। কিন্তু যে ভুল হইয়া গিয়াছে, তাহা এতদূর গিয়াছে যে এখন তাহা শোধরাইতে গেলে মহা কেলেংকারী ঘটিবে।

আমাদের ভুল আপনি ব্যতীত আর কেহই ধরিতে পারে নাই। ধোপার হিসাবটিই কবির শেষ কবিতা এবং তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিস্টিক কবিতা বলিয়া নিঃসন্দেহে এবং বিনা বাধায় চালু হইয়া লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। কবিসম্রাট সংগীতের জনপ্রিয় গায়ক বসন্তদুলাল মুখপাত্র এই ধোপার হিসাবটিকে সুর করিয়া বেতারে গাহিবার জন্য মহড়া দিতেছেন এবং পরে গানটি রেকর্ডও করিবেন। রাষ্ট্রভাষা প্রচারিণী সমাজের তরফ হইতে শ্রীযুক্ত শিউশরণ সিং কর্তৃক ইহা রাষ্ট্রভাষায় অনূদিতও হইতেছে। কবিতাটি (অর্থাৎ ধোপার হিসাবটি) এম্-এতে পাঠ্য হইবে, ইহাও একরকম ঠিক। ডক্টর দিগন্তশেখর দস্তিদার, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট মহাশয় কবিতাটির ইংরাজী তর্জমা করিয়া প্রকাশার্থ ন্যাশন্যাল রিভিউ পত্রিকায় দিয়াছেন—এতক্ষণে

হয় তো তাহা কম্পোজ হইয়া প্রুফ দেখাও হইয়া গিয়াছে। ডক্টর মহাশয় ইহার উপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধও লিখিতেছেন।

এ অবস্থায় ভুল সংশোধন করিতে যাওয়া বিনা মেঘে বজ্রপাত বা বিনা এরোপ্লেনে অ্যাটমবোমাপাত অপেক্ষাও বেশী ভয়ংকর হইবে। এ নিয়ে এখন আর গোলমাল না করাই ভাল। এ অবস্থায় হাটে হাঁড়ি ভাঙিলে কবির অন্যান্য বিখ্যাত কবিতা সম্বন্ধেও সাধারণ ও সুধী সমাজের মনে অনুরূপ সন্দেহ জাগিতে পারে এবং ক্রমে কবিসম্রাটের কবিসম্রাটত্ব নিয়াও টানাটানি হইতে পারে। অতএব হে দেবী! কবির স্বহস্তলিখিত ধোপার হিসাব যখন তাঁহার জীবনের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মিষ্টিক কবিতারূপে অমরত্ব লাভ করিয়াছে, তখন ঐরূপেই তাহা অমর হইয়া থাকুক।"

কবি-পত্নীর কাছ থেকে যে জবাব এলো তার অর্থ এক কথায় :

"তথাস্তু।"

সাগরময় ঘোষ

লম্বোদরের তিন ছেলে

জীবনে ভোম্বলদার মত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ আরও দেখেছি এবং এ-ও দেখেছি, প্রত্যেক মানুষের জীবনই নাটকীয় উপাদানে ভরা। কমেডি আর ট্র্যাজেডির টানাপোড়েনে বোনা মানবজীবন যেন নক্সী-কাঁথার এক একটি বিচিত্র ডিজাইন, কোন এক অদৃশ্য শিল্পী সবার অলক্ষ্যে থেকে আপন মনে এঁকে চলেছেন।

আমার কৈশোর জীবনে দেখা যে চার-চরিত্রের কথা আমি এখন বলতে বসেছি, তারা হচ্ছে লম্বোদরের বংশধর।

পূব বাংলার চাঁদপুর মহকুমার মধ্যে বাজাপ্তি গ্রামে ছিল আমার পৈতৃক ভিটা। আমাদের পাশের গ্রামের লম্বোদর ভট্টাচার্য ছিলেন সে তল্লাটে নামকরা ভোজনবিলাসী ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তাঁর ভোজনপর্ব সম্পর্কে আমাদের গ্রামে মজার মজার কাহিনী প্রচলিত, তারই একটি আজ আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

লম্বোদর ভট্টাচার্য যখন বুঝতে পারলেন তাঁর শেষ সময় উপস্থিত তখন তিন ছেলেকে কাছে ডাকলেন।

বড়ছেলে স্ফীতোদর, মেজো বৃকোদর আর কনিষ্ঠ পুত্র কৃশোদর মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতার শয্যাপাশে এসে বসল।

মৃত্যুপথযাত্রী লম্বোদর দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে ছেলেদের বললেন—আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। যাবার আগে তোমাদের কাছে একটি মাত্র অনুরোধ, লোকে যেন বলে পিতার উপযুক্ত সন্তান তোমরা, বাপের নাম রেখেছো। তাহলেই পরলোকে আমার আত্মা শান্তি পাবে।

লম্বোদরের তিন পুত্রই পিতার এই উপদেশ নতমস্তকে শিরোধার্য করে নিল, নিশ্চিন্ত হয়ে লম্বোদর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

লম্বোদর ভটচাজকে আমি আমার বাল্যকালে একাধিকবার দেখেছি এবং আমাদের গ্রাম থেকে পুবে পাঁচ মাইল দূরে চালতাতলির বৈদিকবাড়ির এই স্বনামধন্য ব্রাহ্মণ ছিলেন আমাদের বিশেষ কৌতুক ও কৌতূহলের বস্তু।

শৈশবে আমরা যখন পুজোর ছুটি ও গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে যেতাম, তখন আমার বৃদ্ধা ঠাকুমার হাত ধরে পাঁচ মাইল হেঁটে একবার এই চালতাতলির বৈদিকবাড়িতে যেতে হতো, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ লম্বোদরের পাদোদক পান করে দীর্ঘায়ু হবার জন্যে। ঠাকুরমা একবাটি জল লম্বোদরের পায়ের কাছে ধরতেন, খড়ম থেকে আলগোছে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে সেই বাটির জল ছুঁয়ে দিতেন। সেই জল ভক্তিভরে আমাদের মাথায় ছিটিয়ে দিতেন ঠাকুরমা, পরে বাকি জলটুকু খেয়ে ফেলতে হতো।

সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কাছে দু'টাকা প্রণামী রেখে ঠাকুরমা আবার আমাদের সেই পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়ে গ্রামে ফিরে আসতেন।

লম্বোদর ভটচাজ সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠস্পর্শিত পাদোদক সেবনের জন্য নয়, এরকম সার্থকনামা উদরসর্বস্ব ব্রাহ্মণ আমার জীবনে দ্বিতীয় আর কাউকে দেখিনি।

আমাদের গ্রামে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদিতে ব্রাহ্মণভোজন করাতে হলেই লম্বোদর ভটচাজকে বলতেই হতো এবং তিনি যখন তাঁর শিশুপুত্রদের সঙ্গে নিয়ে ভোজনে বসতেন তখন তা দেখবার জন্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে ভিড় লেগে যেত।

আমার কৌতূহল ছিল ঠিক এই কারণেই। ছেলেবেলায় কলকাতার ফুটপাথে মাদারীদের জাদুবিদ্যা দেখে আমরা বিস্মিত হতাম। অনায়াসে একটার পর একটা লোহার গুলি খেয়ে ফেলে আবার তা বার করে যখন দেখাত তখন তাজ্জব বনে যেতাম, হাততালির ধুম পড়ে যেত দর্শকদের মধ্যে। লম্বোদরের খাওয়াটাও ছিল ঠিক এই ধরনের এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এক হাঁড়ি রসগোল্লা একটার পর একটা টপাটপ খেয়ে ফেলতেন, নিমেষে হাঁড়ি

শেষ। বলাই বাহুল্য, জাদুকরের লোহার বল-এর মতো রসগোল্লা তাঁকে আর বের করতে হতো না।

ছেলে তিনটিও তৈরী হয়েছিল চৌকশ। বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও হাত চালাত। বাপ একাই একটা হাঁড়ি শেষ করতেন, ওরা তিনজনে শেষ করত একটা। বড় ছেলে স্ফীতোদর ছিলো আরো এককাঠি সরেস। রসগোল্লা শেষ হয়ে গেলে দুই হাতে হাঁড়ির মুখের কাছে ধরে চোঁচোঁ করে রসগোল্লার সবটুকু রস খেয়ে ছোট্ট একটা ঢেকুর তুলত।

হাঁড়ির পর হাঁড়ি দই মিষ্টি সাবাড় করে ব্রাহ্মণীর জন্য ছাঁদা বাঁধতেন! তিন ছেলের মাথায় তিনটি ছাঁদা চাপিয়ে নির্বিকারচিত্তে হাঁটা দিতেন নিজের গ্রাম চালতাতলির পথে।

আমাদের গ্রামের জমিদার দত্তরা ছিল দুই শরিক। বড় আর ছোট বাড়ির মধ্যে সর্বদাই রেষারেষি চলত। দুর্গাপুজোর সময় কোন বাড়ির প্রতিমা ভালো হয়েছে, কোন বাড়ির যাত্রার দল এবার আসর মাৎ করেছে, কোন বাড়ির পুজোয় প্রজাদের ভিড় সবচেয়ে বেশী—এই নিয়ে দুই শরিকে প্রতি বছরই বচসা শুরু হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই বচসার নিষ্পত্তি হতো উভয় পক্ষের লাঠিয়ালদের মোকাবিলায়।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে গিয়েই শুনি বড় বাড়ির জমিদারের মাতৃবিয়োগ হয়েছে। দিন সাতেক পরেই পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন হবে। সে তল্লাটের বাইশটা গ্রামের ব্রাহ্মণরা আসছেন, আর আসছেন চালতাতলির বৈদিক বাড়ির লম্বোদর ভটচাজ, সঙ্গে তাঁর তিন ছেলে—স্ফীতোদর, বৃকোদর ও কৃশোদর।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, লম্বোদরের ছোট ছেলের নামকরণের একটি ছোট ইতিহাস আছে। জন্মাবার পর থেকেই লম্বোদরের কনিষ্ঠ পুত্র একটু পেট-রোগা ছিল। বেশী খেতে পারত না, খেলেও হজম হতো না; রাগ করে তাই বাপ নাম রাখলেন কৃশোদর। কনিষ্ঠ পুত্র সাবালক হয়ে উঠলেও তার নাম পরিবর্তনের কোনো কারণ ঘটেনি। তার দুই অগ্রজের মতো আহারে পারঙ্গম হতে না পারলেও বাপের সুনাম রাখার চেষ্টা সাধ্যমতো সে বরাবরই করে এসেছে।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে। লম্বোদর তাঁর তিন পুত্র নিয়ে বড় বাড়ির ব্রাহ্মণভোজনে আসছেন এবং খাবেন আজব খাওয়া—ভোজ কয় যাহারে।

বাইশ গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল সেদিন জমিদার বাড়ির আটচালায়। সন্ধ্যাবেলায় লোকে লোকারণ্য। ব্রাহ্মণভোজন তো নয়, যেন যাত্রার আসর। আটচালার মাঝখানে তিন-চারটে হ্যাজাক জ্বলছে। তারি তলায় পাত পড়ছে ব্রাহ্মণভোজনের। আসরের চারিদিক ঘিরে আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী ভিড় করে দাঁড়িয়ে। ব্রাহ্মণরা একে একে আসরে এসে বসতে লাগলেন, কিন্তু লম্বোদরের দেখা নেই। আমরা উৎসুক হয়ে লম্বোদরের অপেক্ষা করছি, ওদিকে পাতে বসে-পড়া ব্রাহ্মণরা অপেক্ষা করছেন লুচির ধামা হাতে নিয়ে কখন পরিবেশকের দল আসরে নামবে।

লম্বোদর কি তাহলে আসেননি? আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বললে—এসেছেন, তবে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনদিন উপোসে থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছেন, তাই ক্লান্তি।

এমন সময় লম্বোদর তাঁর তিন পুত্রকে নিয়ে আসরে প্রবেশ করলেন এবং নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় বসতে না বসতেই চালতাতলির লোকেরা হর্ষধ্বনি দিয়ে বললে—ভটচাজমশাই, গ্রামের নাম রাখা চাই।

লম্বোদর পাশে উপবিষ্ট তিন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—শুনলি তো! গ্রামের নাম আমি ঠিকই রাখব, বাপের নাম তোদের রাখা চাই!

শুরু হল খাওয়া। এ তো খাওয়া নয়, যেন ভাগাড়ে শকুন পড়েছে। নিমেষের মধ্যে ধামা ধামা লুচি, বেগুন ভাজা, মাছের মুড়োর ডাল, মাছের ঝোল, মাংস নিঃশেষ হতে লাগল। পাত চেটেপুটে পরিষ্কার করেই হাঁকডাক শুরু—কই, লুচি কই, মাছের তরকারী কই, বেগুন ভাজা কই—

পরিবেশনকারীরা গলদঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করছে, জমিদারবাবু স্বয়ং আসরে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন। চারিদিকে গোল হয়ে ভিড় করে দাঁড়ানো দর্শকের দল যে-যার গ্রামের ব্রাহ্মণদের চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে।

এবারে ভোজনপর্বের শেষের দিক। দইমিষ্টি পরিবেশন শুরু হয়েছে। লম্বোদরের কাছে আসতেই তিনি পরিবেশনকারীকে শুধু বললেন—কেন বার বার কষ্ট করবেন, তার চেয়ে তিন হাঁড়ি দই আর তিন হাঁড়ি মিষ্টি আমাদের সামনে বসিয়ে দিয়ে যান। তাতে আপনাদেরও পরিশ্রম বাঁচবে, আমাদেরও হাঁকডাক করে আপনাদের বিরক্ত করতে হবে না।

জমিদারবাবু তৎক্ষণাৎ সেই ব্যবস্থাই করলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণদের তখন পেট ফাটো ফাটো অবস্থা, উঠতে পারলে বাঁচে। আটচালার মণ্ডপে ফরাস পাতা আছে, যাতে ব্রাহ্মণরা আহারান্তে কোন রকমে গড়িয়ে এসেই শুয়ে পড়তে পারে।

লম্বোদর ততক্ষণে দইয়ের হাঁড়িটা শেষ করে একটা মিষ্টির হাঁড়ি পাতের উপর টেনে নিলেন। শুধু একবার বললেন—গোটাকতক লেবু আর কাঁচালঙ্কা দিন, মাঝে মাঝে মুখটা মেরে নিতে হবে।

বংশবদ তিন বংশধরও বাপের সঙ্গে সমান তাল রেখে খেয়ে চলেছে। কনিষ্ঠ পুত্র কৃশোদর হাত চালাচ্ছে বটে, তবে দাদাদের মতো অতটা পটুত্বের সঙ্গে নয়। লম্বোদর একবার কৃশোদরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চাপাস্বরে রেগে বললেন—কুলাঙ্গার।

আসরে অন্যান্য ব্রাহ্মণরা ভোজনান্তে অনুমতি নিয়ে কোনরকমে মণ্ডপের ফরাস বিছানো শয্যায় পেট ভাসিয়ে শুয়ে পড়েছে, লম্বোদর ও তাঁর তিন পুত্র তখনো হাঁড়ির মিষ্টি শেষ করতে ব্যস্ত।

হাঁড়ির শেষ রসগোল্লাটা মুখে পুরেই লম্বোদর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোদের হল? এইবার উঠে পড়।

জ্যেষ্ঠপুত্র স্ফীতোদর তখন রসগোল্লার হাঁড়িটা দুই হাতে মুখের কাছে ধরে রসটা খেতে ব্যস্ত। উপযুক্ত পুত্রের কাণ্ডটা দেখে লম্বোদরের মুখে একটা পরিতৃপ্তির ভাব। মনে মনে তিনি বুঝে গেলেন, এই ছেলেই তাঁর নাম রাখবে। রসিকতা করে বললেন—দেখিস, পাঁপরভাজা দেয়নি বলে রাগ করে হাঁড়িটা কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলিস না।

আহারান্তে বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করলেন না লম্বোদর ভটচাজ। তিন ছেলের মাথায় ব্রাহ্মণীর জন্য ছাঁদা চাপিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বড়বাবু জমিদার করজোড়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—ভটচাজমশাই, বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছেন তো?

লম্বোদর বললেন—ব্রাহ্মণদের আহারে কি কখনো তৃপ্তি আছে? কিছু অতৃপ্তি নিয়েই ফিরতে হয়। তবে আয়োজনের কোন ত্রুটিই আপনি রাখেননি। আপনার মায়ের আত্মার কল্যাণ হোক।

লম্বোদর তাঁর তিন পুত্রকে নিয়ে যাত্রা করলেন গ্রামের পথে। চালতাতলি গ্রামের দর্শকদল হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সঙ্গে সঙ্গে চলল। যেন কোন প্রতিযোগিতা-মূলক খেলায় শীল্ড জিতে নিয়েছেন লম্বোদর, উল্লাসধ্বনি সহকারে সঙ্গে চলেছে সমর্থকের দল।

সেই খাওয়াই লম্বোদরের শেষ খাওয়া। গ্রামে তিনি সুস্থভাবেই ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এসে যে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না। তিন পুত্রকে

কাছে ডেকে তাঁর সুনাম রক্ষার গুরুদায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে তিনি চক্ষু মুদলেন।

ইতিমধ্যে অনেক বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশ দ্বিখণ্ডিত হল, সেই থেকে আমাদেরও আর স্বগ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেনি। কৈশোর জীবনে গ্রামের বহু স্মৃতির সঙ্গে লম্বোদর ভটচাজের কথা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর তিন পুত্র পিতার সুনাম কীভাবে রক্ষা করছেন জানবার অসীম কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও গ্রামের সঙ্গে সব সম্পর্ক মুছে যাওয়ায় চালতাতলির এই ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনো খবর আর রাখতে পারিনি!

বছরখানেক আগে আমার এক পিসতুতো ভাই এসেছিল কলকাতায়। উদ্দেশ্য ছিল, শহরতলির কোথাও একটু জমি সংগ্রহ করে বাড়ি তুলবেন। দেশের গ্রামে আর থাকা নিরাপদ নয়, কোনো রকমে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করতে পারলেই সবাইকে নিয়ে আসবেন।

আমার সঙ্গে দেখা হতেই কথায় কথায় গ্রামের কথা উঠল. সেই প্রসঙ্গে চালতাতলির বৈদিকবাড়ির লম্বোদর ভটচাজের বংশধর তিন ভাইয়ের কথাও। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করার পরিণাম শুনে আমি স্তম্ভিত। সেই ঘটনাই এবার আপনাদের বলি।

লম্বোদরের তিরোধানের পর তাঁর তিন পুত্র স্ফীতোদর, বৃকোদর ও কৃশোদরের দিন খুবই কষ্টে চলছিল। দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে; সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। হিন্দু জমিদাররা প্রায় সবাই পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুস্থানে চলে এসেছে। যে দু-চারজন আছে, তাদের আর সেই বোলবোলাও নেই। যে কয় ঘর গৃহস্থ হিন্দু পরিবার নিতান্তই পৈতৃক ভিটার টানে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে, তারা নিজেদের প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত। ঘটা করে পুজো-পার্বণ পারলৌকিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান আর সম্পন্ন করা তাদের সামর্থ্যেও কুলোয় না, মানসিক অবস্থাও অনুকূল নয়। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনের রেওয়াজ প্রায় উঠেই গিয়েছে। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান তিলাঞ্জলি তর্পণ করেই সমাধা করতে হয়। বাপের নাম রাখবার জন্যে তিন ভাই ব্যাকুল, কিন্তু সে সুযোগ তাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে।

ইতিমধ্যে যুগটাও গিয়েছে পালটে। শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকর্মাদিতে একালের তরুণদের মতি নেই—তারা মনে করে ওটা বাজে খরচ।

স্ফীতোদর তার দুই ভাই বৃকোদর ও কৃশোদরকে বললে—দেখ, এখানে পড়ে থেকে আর কি হবে। যজমানরা তো প্রায় সবাই এদেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে

চলে গিয়েছে। ক্রিয়াকর্মাদিতে আমাদের তো আর কেউ ডাকে না, ডাকলেও রীতিরক্ষার্থে নমো নমো করে সেরে দেয়। তার চেয়ে চল আমরাও চলে যাই।

বৃকোদর দাদার প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—তা কেমন করে হয়। এখনও তো কয়েক ঘর হিন্দু গ্রামে আছে। আমরা চলে গেলে তাদের চলবে কি করে।

ছোট ভাই কৃশোদর বললে—তাছাড়া কলকাতায় আমাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই! এখানে তবু তো পৈতৃক ভিটেটা আছে। ওখানে শুনেছি, চাল, ডাল, তেল, ঘি সবকিছুতেই ভেজাল। ভেজালের দেশে গিয়ে অম্লরোগে প্রাণটা দেওয়ার চাইতে এখানে শাক ভাত অনেক ভালো। অবস্থার একটু উন্নতি হলে যজমানরা সবাই আবার নিজের নিজের গ্রামে ফিরে আসবে, ওরা ফিরলে আমাদেরও কপাল ফিরবে।

ছোটভাই কৃশোদরের কথাটা স্ফীতোদর ও বৃকোদর ফেলতে পারল না বটে, তবে ওদের কপাল আর ফিরবার লক্ষণ নেই।

অবশেষে সত্যিই কপাল ফিরল। ভৌমিকবাড়ির বড় কর্তা দেহরক্ষা করলেন। অবস্থাপন্ন কায়স্থ পরিবার, ছেলেরা বৃদ্ধ পিতাকে অনেকবার বলেছিল, এ-দেশ ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকতে, বৃদ্ধ কিছুতেই রাজী হননি। যে-ভিটেতে জন্মেছেন সেই ভিটেতেই দেহরক্ষা করলেন এবং এইটিই ছিল তাঁর একমাত্র সংকল্প। ছেলেরা তাই স্থির করল ঘটা করে পিতৃশ্রাদ্ধ করবে।

সে-তল্লাটে কতগুলি হিন্দু গ্রাম ছিল। সেইসব গ্রামের অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে ব্রাহ্মণভোজনের, সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ হয়েছে চালতাতলির ভটচাজ বাড়ির তিন বংশধরের।

স্ফীতোদর বৃকোদর ও কৃশোদর এমনিতে প্রায় অর্ধাশনেই দিন কাটাচ্ছিল, এবারে ব্রাহ্মণভোজনের সাত দিন আগে থেকে পুরো অনশনে থেকে গেল। বহুকাল পর পিতৃনাম রক্ষার সুযোগ পেয়েছে তিন ভাই। তাদের সংকল্প, দশ গাঁয়ের লোক যেন একবাক্যে বলতে পারে—হ্যাঁ, লম্বোদরের উপযুক্ত বংশধর বটে।

ভোজনের দিন প্রাতঃকালে স্নান সেরে পূজার্চনাদি সমাধানের পর কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে নতুন ধুতি ও চাদর পরে ছাঁদা বাঁধবার জন্য তিনজনে তিনটি নতুন গামছা মাথায় চাপিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল।

চালতাতলির থেকে মাইল আষ্টেক হাঁটা পথ। এবারে

গ্রামবাসীরা ব্রাহ্মণভোজন দেখবার জন্যে সঙ্গে কেউ আর গেল না। তারা জানে এটা নিতান্তই অভাবের দিনের ভোজন; এখানে রেষারেষি করে, প্রতিযোগিতা-মূলক মনোভাব নিয়ে কোনো ব্রাহ্মণই ভোজন করতে যাচ্ছেন না। সুতরাং খাওয়া দেখে উৎফুল্ল হওয়ার ব্যাপারই এটা নয়।

গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত এসে গ্রামবাসীরা তিন ভাইকে বিদায় দিয়ে বললে—তোমরা লম্বোদর ভট্টাচার্যের উপযুক্ত বংশধর, পিতার অন্তিম বাসনা তোমরা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবে। তাছাড়া চালতাতলি গ্রামের সুনামও তোমরা রেখে আসবে আশা করি।

স্থির হল, ব্রাহ্মণভোজন যখন দ্বিপ্রহরে তখন সূর্যাস্তের আগেই তিন ভাই ফিরে আসবে, গ্রামবাসীরা গ্রামের সীমান্তে ওদেরই প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় থাকবে।

দুপুর পেরিয়ে বিকেল হল। সূর্য তখন প্রায় পশ্চিম প্রান্তে হেলে পড়েছে। গ্রামের পুব প্রান্তের বড় বকুল গাছের তলায় গ্রামবাসীরা দল বেঁধে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে তিন ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনের। কারোর দেখা নেই।

সূর্য যখন প্রায় ডোবে-ডোবে তখন সহসা দেখা গেল দূরে থেকে একজন অতিকষ্টে হেঁটে আসছে। মুখটা আকাশের দিকে তোলা, পথের উপর দৃষ্টি ফেলবার উপায় নেই। একটা অর্ধচেতন দেহ কোন রকমে থপ্‌থপ্‌ করে হেঁটে এগিয়ে আসছে। গ্রামবাসীরা ছুটলো সেদিকে। এ নিশ্চয় তিন ভাইয়ের এক ভাই। কাছে গিয়ে দেখলে, ছোট ভাই কৃশোদর। আকণ্ঠ এমন খাওয়াই খেয়েছে যে মাথাটা নীচু করতে পারছে না, আকাশের দিকে মুখ রেখেই সে হাঁটছে।

কৃশোদরকে তার দুই দাদা স্ফীতোদর ও বৃকোদরের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে কোনোরকমে হাতের ইসারায় পিছনের পথটা দেখিয়ে দিলে, কথা বলবার মতো শক্তিও তখন তার নেই।

গ্রামবাসীরা বুঝে নিল যে, পিছনে আর দুই ভাই আসছে। ছোট ভাইয়ের অবস্থাই যখন এই, তখন অপর দুই ভাইকে কী অবস্থায় দেখবে সেই কৌতূহল নিয়েই গ্রামবাসীরা এগিয়ে চলল। মাইলখানেক পথ যাওয়ার পর দেখতে পেল সাত-আট জন লোক একটা খাটিয়া কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে।

কাছে আসতেই দেখা গেল সে আর কেউ নয়, মেজোভাই বৃকোদর প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় খাটিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে, ভৌমিকবাড়ির কয়েকজন ষণ্ডামার্কা

পাল্‌কি-বেহারা তাকে বহন করে নিয়ে আসছে।

চিৎকার করে গ্রামবাসীরা জিজ্ঞেস করল বড় ভাই স্ফীতোদরের কথা। সে কোথায় !

বৃকোদরের মুখেও কোনো কথা নেই। সে শুধু অতি কষ্টে ডান হাতটা আকাশের দিকে তুলে আঙুল দেখিয়ে পথের নির্দেশ দিল অর্থাৎ পরলোকে গেলেই দেখতে পাবে।

উৎকণ্ঠা নিয়ে আরো খানিকটা পথ এগিয়ে যাবার পর গ্রামবাসীরা দেখতে পেল, একটা বটগাছের তলায় ফাঁকা জমিতে একটা চিতা জ্বলছে। চিতার ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার। সূর্যও তখন অস্তাচলে।

কুমারেশ ঘোষ

এ যুগে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

প্রস্থান সময় উপস্থিত হইল। মিসেস গোতমী এবং মাস্টার শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত (এই দুই দাঁত-ভাঙা নামকে সরল করিয়া সরোজ ও শরৎ করা যাক্—বিশেষ করিয়া র্ঙ্গ ও দ্ব যুক্তাক্ষর বেশী নাই—কাজেই কম্পোজ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে) —নামে পাড়াতুতো দুই দাদা শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা (এই দুইটি নাম ও শকুন্তলা নাম পুনরায় বর্তমান বাজারে চালু হওয়ায় অবিকৃতই থাকিল। যথাসম্ভব, স্নো-পাউডার, লিপস্টিক মাখাইয়া বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। কর্তা মহর্ষি এ যুগে কই?) শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন ধড়াস-ধড়াস করিতেছে, নয়ন অবিরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইয়া চশমা যুগল ঝাপসা হইয়া যাইতেছে, গৃহিণী-রোষ ভীতপ্রায় কণ্ঠ রোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছে, কত ব্যাধিত মতই জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কী আশ্চর্য! আমি ক্লাব-আড্ডাধারী, অথচ সংসারে টান বশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে, ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া, আর অনর্থ কাল হরণ করিয়া লাভ কি? এই বলিয়া উপস্থিত পাড়াপড়শীদের সম্বোধন করিয়া

কহিলেন, শকু কাহারও অন্যায় (?) দেখিলে তাহার মুণ্ডুপাত না করিয়া কদাচ জলপান করিত না ; কাহারও নূতন ডিজাইনের গহনা বা শাড়ি দেখিলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া আমাকে ঐরূপ কিনিয়া দিবার জন্য দাবী জানাইতে ভুলিত না ; আপনাদের কাহারও প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে নার্সিংহোমে ছুটিতে আনন্দের সীমা থাকিত না অদ্য সেই শকু পতিগৃহে যাইতেছে— আপনারা সকলে কনগ্রাচুলেশন জানান।

অনন্তর সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা গুরুজনদিগকে ঈষৎ মিষ্ট হাসিতে বশ করিয়া প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, চক্ষু নাচাইয়া ইঙ্গিতে তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কহিতে লাগিলেন, দ্যাখ, পি-বি (প্রিয়ংবদার সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ), সুশান্তকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত আছাড়ি-পাছাড়ি খাইতেছে বটে, কিন্তু এতদিনের পাড়া পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, তা বটে। তুই যে কেবল পাড়া ছাড়িতে কাতর হইতেছিস্ এরূপ নহে, তোর বিরহে পল্লীপুত্রদের (সরল বাংলায় 'পাড়ার ছেলেদের') কী অবস্থা ঘটিতেছে চাহিয়া দেখ। সবাই নিরানন্দ ও শোকাকুল। মনুদা কবিতা লেখায় পরাঙমুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, হাতের কলম হাত হইতে পড়িয়া যাইতেছে। পার্শ্ববর্তী বাটির সোমনাথ জানালা পরিত্যাগ করিয়া অধোমুখ হইয়া আছে। সম্মুখস্থ বাটির মধুময় তোমার রূপসুধা পান হইতে বঞ্চিত হইয়াছে ও গুনগুন ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কর্তা কহিলেন, শকু আর কেন বিলম্ব কর। ট্যাক্সির মিটার বাড়িতেছে। শকুন্তলা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, দ্যাখ অনু আর পি-বি, আমি ঐ ভক্তদের তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, কিন্তু মাই ডীয়ার, আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বলো। এই বলিয়া উভয়ে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে কর্তা কহিলেন, অনু, প্রিয়ে, তোমরা কি পাগল হইলে, কোথায় তোমরা শকুকে ছাড়িয়া দিবে, না হইয়া তোমরাই গল্প মাতিয়া উঠিলে।

এক পূর্ণগর্ভা কুক্কুরী বারান্দায় শয়ন করিয়াছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে শকুন্তলা কর্তাকে কহিলেন, ড্যাডি, এই রোজি নির্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমায় একটি পাপ দিবে, ভুলিবে না বলো!

কর্তা কহিলেন, না শকু, আমি কখনোই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতি ভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, 'আমার ভ্যানিটি ব্যাগ ধরিয়া কে টানিতেছে' এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কর্তা

কহিলেন, শকু, তোমার ছোকরা 'বোয়'টি যে সর্বদা তোমাকে মিনিবাবা মিনিবাবা বলিত, সেই তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার রুক্ষ চুলে আঙুল ঢুকাইয়া নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, বোয়, আমি চলিলাম, অনু বা পি-বি'র নিকটে ইচ্ছা হইলে থাকিতে পার। আরে ভোয়া!...এই বলিয়া শকুন্তলা পা বাড়াইতে গিয়া পতনোন্মুখা হইলেন। কর্তা তাঁহাকে সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, পথ দেখিয়া চলো। উচ্চ-নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করিলে বাটার দামী জুতারও স্ট্র্যাপ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

অতঃপর কর্তা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শরৎ ও সরোজকে কহিলেন, দ্যাখো তোমরা শকুন্তলাকে সাহেবের বাংলোতে পৌঁছাইয়া দিয়া জানাইবে, আমরা সাধারণ গৃহস্থ, আপনি বিলাত ফেরত সাহেব; আর শকু 'লভ' করিয়া আপনাকে বিবাহ করিয়াছে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অন্যান্য লেডিফ্রেণ্ডের ন্যায় শকুন্তলার সহিতও যেন ট্রা-লা-লা-লা করিয়া বেলেল্লাপনা না করেন। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কর্তা এই সন্দেশ নির্দেশ করিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শকু! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব। আমি ক্লাব আড্ডাধারী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে (তোমার মামীর মত না হইলেও) নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি।

তুমি পতিগৃহে গিয়া সুশান্তর দিকে বড়া নজর রাখিবে। তাহার লেডি-ফ্রেণ্ডদের ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবে। বোয় ও আয়াদের শাসনে রাখিবে। স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শ করিলে তুমিও রোষবশা হইবে। মহিলারা, এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই প্রকৃত গৃহিণীতে প্রতিষ্ঠাতা হয়। ইহা কহিয়া বলিলেন, দ্যাখো, তোমার মামি-ই বা কি বলেন? মিসেস গোতমী কহিলেন, এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবে। পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, মা শকু, উনি যেগুলি বলিলেন, তাহা আমারই শেখানো বুলি মাত্র।

অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা একান্তে শকুন্তলাকে ডাকিয়া কহিলেন, যদি মিঃ মুখার্জি তোকে প্রথমে আমল দিতে না চান, তবে তাঁহাকে স্বিতীয় স্বলিখিত লভ-লেটারগুলি দেখাইবি। সঙ্গে লইয়াছিস তো? শকুন্তলা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, পি-বি তোমরা এত ভয় পাইতেছ কেন? ইয়ার্কি নাকি? পি-বি তাড়াতাড়ি কহিলেন, না ভাই, মানে, এই আর কি, শুনিলাম কিনা, ভদ্রলোক নাকি বড়ই বখিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের কাছে বিদায় লইয়া, শকুন্তলা পরোপকারী

পাড়াতুতো দাদাদের সমভিব্যাহারে প্রবাসী স্বামী মিঃ সুশান্ত মুখার্জির কর্মস্থল দিল্লীর উদ্দেশ্যে ট্যাক্সিতে হাওড়া স্টেশন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। (এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, কর্তা বড় হুঁশিয়ার লোক ; সে কারণে একজন 'দাদা'র সহিত শকুন্তলাকে পতিগৃহে না পাঠাইয়া দুইজন 'দাদা'র সহিত পাঠাইলেন, যাহাতে তাঁহার কন্যার সহিত একজনের কোনরূপ বদ আচরণ দেখিলে অপরজন হিংসা পরবশ হইয়া পাঁচখানা করিয়া তাঁহাকে জানাইতে পারেন। হয়তো সে যুগে মহর্ষি কণ্বেরও মনোগতভাব তাহাই ছিল, তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা লজ্জায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই—কিংবা সৎব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিধায় ঐরূপ কোন কুভাব তাঁহার মনে আসে নাই।)

অতঃপর ক্রমে ক্রমে শকুন্তলাদের ট্যাক্সি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে কর্তা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যাহার জিনিস তাহার ঘাড়ে তো গছাইয়া দেওয়া গেল ; এখন আমি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম।

সন্তোষকুমার দে

ন্যাটা নাগ

সেদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগের সংবাদ। খবরটা পড়ে অবধি মনটা বিচলিত হয়ে আছে। বিকালে দেখা হতেই আমাদের সবজান্তা ন্যাটা নাগ বললে, কুছ সমঝেছিস্?

আমি হতভম্বের ভাব করতে সে বললে—আংরেজি হটাচ্ছি আমরা, তার আগাড়ি যো যো আদ্মি আংরেজি-ওয়ালা, তারাও হটবেন, এ তারই শুভ সূচনা!

রাষ্ট্রভাষাটা ন্যাটা বেশ রপ্ত করেছে মনে হয়। বিশুদ্ধভাবে বলতে না পারুক এবং লিখতে আদৌ না পারুক, তাতে ক্ষতি নেই। বাংলা বলবার সময় অক্লেশে সাড়ে সাতাশ পারসেণ্ট রাষ্ট্রভাষা পাঞ্চ করে সে ভাষার যে কক্টেল্ তৈরী করে তার খেল দেখবার মত।

ন্যাটা বললে—দ্যাখ্, লেড়কীরা সব ফুটানিকা ডিবিয়া লিয়ে চলতে ফিরতে পারে তবু হাল ফ্যাসানের বাৎচিত্ রপ্ত করতে পারে না—এতো বড়ি তাজ্জব কী বাৎ। আর তোরা সব নওযোয়ান, কণ্ঠকে-লেঙ্গুট পিন্‌কের সাহাব্ বন্ যাচ্ছিস। তবু রাষ্ট্রভাষা মালুম করতে পারিস না কেন?

'দূরভাষ'-মে কৈ রোজ বাৎচিত্ হুই, তরুভি কুছু না সমঝাস্। বেওকুফ, ইয়া বুড়বক্ আদমি আছিস তু।

তাজ্জব বনবার আর বাকি ছিল না আমার। বললাম—আচ্ছা ভাই, তোর কথাই শিরোধার্য। এতকাল যারা আংরেজি বুলি ঝাড়ত তারা তোর দেখাদেখি রাষ্ট্রভাষায় বোল ফোটাবে। ন্যাটা অর্থাৎ আমার ছোটবেলার বন্ধু নটবর নাগ—চোঙা প্যাণ্ট, টেরিলিনের সার্ট আর ছুঁচোলো কালো জুতোর মধ্যে একখানি স্লিম ফিগার, অনেকটা পারপেণ্ডিকুলার-ধর্মী। তবে ইদানীং আবার একটু কোলকুঁজো হয়েছে বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেও পৃথিবীর সঙ্গে পারপেণ্ডিকুলার ঠিক হয় না। ন্যাটা বললে—এবার পুজোয় যা একখানা ঝাড়ছি না, দেখে সব আদমির আঁখ্ ট্যারা হয়ে যাবে।

বললাম—ছবি-টবি তুলছিস না কি? তোর তো অসাধ্য কোন কাজ নেই।

ন্যাটা বললে—কুছ্ নাফা ওঠে এমন একটা ফিকরমে আছি। তুই বেওকুফ আদমি, তবু ন্যাংটোবেলার দোস্ত্, তোকে বলি, তুই আবার আইডিয়াটা ব্লাকে ঝেড়ে দিবি না তো?

সাগ্রহে শুনতে চাইলাম—ন্যাটা নাগের প্রজেক্ট্, তার ভাষ্যে—উদ্‌যোগ বা যোজ্না।

ন্যাটা বললে—পুজার কিতাব নিকলাবো একঠো। সব ঠিক, এখন একটা পিরেস রাজি করাতে পারলেই হয়। তোর পিসে না মেসো—কার না একঠো পিরেস থা?

শুধু থা কেন, আভি আছে পিরেস আমার পিসেমশাই-এর। বন্ধুর জন্যে বন্ধু কি না করে, আমি ন্যাটাকে নিয়ে গিয়ে ধরলাম আমার সেই পিসেমশাইকে, বললাম—ন্যাটার কাগজ ছাপতেই হবে আপনার প্রেসে। নেহাৎ আমার হাত এড়াতে না পেরে পিসেমশাই রাজিও হলেন।

ক্রমে ন্যাটা আমাকে তার সেক্রেটারি বনাম অফিস-পিওন সব মিলিয়ে একজন করে নিয়েছে। ফলে এই বেকার মানুষটি যেমন সাকার রূপ ধারণ করেছে, তেমনি আবার আমার একটি তৃতীয় নয়ন উন্মুক্ত হয়েছে। আমি এখন অনেক-কিছু দেখছি—যা আগে দেখতে পাইনি কিম্বা দেখেও বুঝতে পারিনি। ন্যাটাই আমায় সব দেখিয়ে চিনিয়ে বেওপারের ভাও সমঝিয়ে দিয়েছে।

আমার ধারণা ছিল, পত্রিকা চালাতে হলে নামকরা লেখকদের স্বারস্থ হতে হয়, লেখার পারিশ্রমিক দিতে হয়। ন্যাটা সেদিক দিয়েই গেল না, বললে—উসমে বহোৎ লট্‌ঘটি আছে। হামার বাবা সিধা হিসাব, সোজা কাম।

বলে সে আমায় তার লেখকের লিস্টি দেখালে—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়……এক একটা

নাম দেখি আর আমারই চোখ ট্যারা হবার অবস্থা।

ন্যাটা বললে—কি, লেখকের নাম পছন্ আয়ে? হুঁ, বাবা সাহিত্য-পরিষদের ধুলোপড়া আলমারি ঘেঁটে বহোৎ মেহনৎ করে, বহোৎ কোসিস করে তবে এই সব রত্ন হাতিয়েছি, সব লাইন ক্লিয়ার মাল্—

তার মানে?—না জিজ্ঞাসা করে পারিনে।

ন্যাটা বললে—কপি রাইট কুচ ভি নেহি। যেতনা খুশী নাও, কারো কুছু বোলবার এক্তিয়ার নেহি।

এবার ব্যাপারটা সমঝালাম। ন্যাটা তবে একেবারে আলিবাবা বনে গেছে; সোনার পাহাড় মজুত, যেতনা খুশী নাও!

ন্যাটা বললে—তবে ঠক্করকে বাদ দিয়েছি।

ঠক্কর? সে আবার কার নাম?—জিজ্ঞাসা করে ফেলি। ন্যাটা বললে—সে যুগে যাকে ইংরাজিতে ট্যাগোর বলত, মানে রবীন্দর নাথ ঠক্কর। ওর লেখা অংখন বাদ থাক্, বীচ্ মে দেখা যায়ে গা।

কিন্তু আমার মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। হতে পারে এইসব লেখা বাংলা সাহিত্যের মণিমুক্তা, কিন্তু ঐ সব প্রাচীন লেখকদের নাম শুনলেই পাঠকেরা সটকে পড়বে, ও বই কেউ ছোঁবে না। ন্যাটাকে বললাম সে কথা।

ন্যাটা বললে—ঠ্যারো তো ভেইয়া, আরো লিস্ট আছে।

হামি বলি তু লিখলে—তারাশংকর, প্রেমেন মিত্তির, বিমল মিত্তর—

জিজ্ঞাসা করলাম—এদেরও পুরোনো লেখা চালাবি নাকি?

রামোচন্দর! ন্যাটা শাণিত হাসি হাসলে, তারপর দেরাজ খুলে লেখাগুলি আমার হাতে দিলে।

আমি তো অবাক। আমি শুধু ওইসব খ্যাতনামা ব্যক্তিদের চোখেই দেখিনি, হাতের লেখাও চিনিনা। কিন্তু পাণ্ডুলিপি খুলে দেখি—সব কাঁচা হাতের লেখা। দু'চার লাইন পড়েই দেখি—বানান ভুলে ভরতি! গল্প কি হয়েছে ভগবানই জানেন।

ন্যাটা বললে—এ সব টিরেড সিকরেট আছে। শুনু, দুনিয়ামে আজ কৈ চীজ খাঁটি না মিলি। সব চীজ্কা ভেজাল আছে আর লেখকের কি ভেজাল হোবে না। জরুর হোবে। এক নম্বর তারাশংকর জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন, দুস্রা তারাশংকরও মজুত আছেন। আভি তিসরা তারাশংকর হোবে। বিমল মিত্তরকা নক্ল, ঔর ভী হোবে, তাহলে প্রেমেন মিত্তর দো নম্বর কেন না হোবে? আমি সব ভালা ভালা নামী আদমীর দুসরা নম্বর খাঁতা করে

দিইচি। লাও, কয়ঠো জরুরৎ হ্যায়, লাও। নারাণ গাংলি আছে, বোম্ধা বোস আছে, অচিন সেনগুপ্ত্ আছে। সব মজুত হ্যায়—

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। ন্যাটা যে বলেছিল, চোখ ট্যারা করে দেবে, তা আর অবিশ্বাস করবার উপায় রইল না।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের আরও কিছু বাকী ছিল!

প্রেসে কপি চলে গিয়েছিল, ন্যাটাই পাঠিয়েছিল। প্রুফ দেখতে গিয়ে হতভম্ব হলাম। ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র কারো লেখাই আর চিনতে পারিনে।

ন্যাটাকে দেখালাম, বললাম—একি জগাখিচুড়ি ভাষারে বাবা। তুই কি এদের লেখার উপরেও কলম চালিয়েছিস নাকি?

ন্যাটা বললে—একটু আধটু দেখেশুনে না দিলে সম্পাদনা আর কাকে বলেরে বোকা।

বোকা হয়েই রইলাম। ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা একটু আধটু দেখে দিয়েছে কে? না—ন্যাটা নাগ। যার বিদ্যে আমাদের যুগের ইণ্টারমিডিয়েট অব আর্টস পর্যন্ত, তাও ফেল নয়, পরীক্ষাই দেয়নি।

ভাষার নমুনাটা তুলে দেব ভাবছিলাম কিন্তু পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি হবে ভয়ে দিলাম না। বাংলাকে যতটা হিন্দি করা যায় তাই করে বাংলা ক্রিয়াপদগুলি রেখে লেখা মর্ডানাইজ করা হয়েছে। দেশ ধীরে ধীরে উন্নত হলে তখন ঐ ভাষা সবার রপ্ত হয়ে যাবে, ন্যাটা তারই অগ্রদূতের কাজ করছে।

ন্যাটা বললে—এতে দুঃখ করছিস কেন রে বুড়বক্, শুনিস নি নতুন রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে—

"আপ্ ক্যায়সন্ বারকে গানা গাতা হ্যায়, গুণহি;
হাম বুন্ধু বনকে শুন্‌হি, হরবকৎ শুনাহি!"

মনে না পড়বার কারণ নেই, কান ঝাঁ ঝাঁ করলেও শুনতে বাধ্য হয়েছি—"মেরি শির লপট দেও তেরি টেংরিকা ধুল পর!"

অর্থাৎ

তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী

আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি-র তর্জমা তবু শোনা যায়, কিন্তু 'আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণধুলার তলে'র একি হতশ্রী চেহারা! আমার মাথাও নত হয়ে আসে, তা আর তুলতে পারিনে। ন্যাটা শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে যায়।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সাদা বাঘ

চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সংবাদপত্রে, বেতারে, দূরদর্শনে জোর খবর। সুন্দরবনে সাদা বাঘ।

খবরটা আর কেউ দিলে লোকে সন্দেহ করত। নেহাৎ গল্প, কিংবা রাতের বেলা রং ভুল করেছে।

কিন্তু নিজের চোখে দেখেছেন ফ্লেচার স্বয়ং। খাঁটি সায়েববাচ্ছা। বিলেত থেকে এদেশে এসেছেন মাসখানেকও হয়নি। হিপি নন যে লোকে বলবে গাঁজায় দম দিয়ে কি দেখতে কি দেখেছেন।

ফ্লেচার পাদরীর ছেলে। নিজে অবশ্য পাদরী নন। চামড়ার ব্যাপারী। এদেশে এসেছিলেন কাঁচা মালের সন্ধানে। তাঁর ধারণা ছিল এদেশের ঝোপেঝাড়ে অফুরন্ত কেঁদো বাঘ লুকোচুরি খেলছে। কাছেপিঠে পুকুরে, বিলে কুমীরে ঠাস বোঝাই। একবার বন্দুক নিয়ে পাড়ে দাঁড়ালেই কুমীরদের মধ্যে ভেসে ওঠবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান, তারই লাগি কাড়াকাড়ি।

কলকাতায় নেমে ফ্লেচার সায়েব হতাশ হলেন। ঝোপেঝাড়ে বাঘ তো দূরের কথা, বেড়ালও নেই। পুকুরে বিলে কিছু মাছ হয়তো আছে, কিন্তু

কুমীরের ল্যাজের দেখাও মিলল না। তখন ফ্লেচার সায়েব চামড়ার জন্য ট্যাংরায় ধর্না দিলেন। বাঘ কিংবা কুমীরের চামড়া চাই। যে দামই হোক।

ট্যানারির মালিক ফুললাই ঝকঝকে সোনার দাঁত বের করে হেসে বলেছিল, কুমীরের চামড়া পারব না সায়েব। সরকার থেকে কুমীর প্রকল্প হচ্ছে শুনে সব কুমীর সেখানে ভর্তি হয়েছে। তাদের ছোঁবার উপায় নেই। বাঘের চামড়া একটা হাতে আছে দিতে পারি। দেড় হাজার টাকা পড়বে। ঠিক আছে, টাকা নিয়ে কাল এই সময়ে আসব। চামড়া তৈরি রেখো।

ফুললাই একগাল হাসল। হাসলে চোখ দুটো আর দেখা যায় না। সেই ভাবেই বলল, সে কি কথা সায়েব, আপনি কষ্ট করে আসবেন কেন? আপনার হোটেলের ঠিকানা দিন, আমি কাল সন্ধ্যাবেলা চামড়া দিয়ে টাকা নিয়ে আসব।

ফুললাই কথা রেখেছিল। ঠিক সন্ধ্যায় চামড়া দিয়ে টাকা নিয়ে গিয়েছিল।

চামড়া দেখে ফ্লেচার সায়েব খুব খুশি। হলদে চামড়ার ওপর মোটা গাঢ় কালো রঙের ডোরা। একটু আপসোস বাঘটা ছোট সাইজের, আর একটু বড় সাইজের হলে বেশ হত। যাক, এরকম সাইজের গোটা দশেক পেলেই চলবে।

পরের দিন সকালে কেলেংকারি কাণ্ড। চামড়াটা দেয়ালে টাঙিয়ে ফ্লেচার সায়েব ব্রাশ দিয়ে ঘষে ঘষে চকচকে করে তোলার চেষ্টা করছিলেন, বারকয়েক ব্রাশ টানতেই কালো ডোরাগুলো সারা চামড়ার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ফ্লেচার সায়েব চমকে উঠলেন। কি ব্যাপার, বাঘেরাও কি আজকাল মেকআপ ব্যবহার করছে নাকি!

খানসামা সেই সময় প্রাতঃরাশ নিয়ে রুমে ঢুকছিল, সে সব দেখে হেসে উঠল। ভাঙা ইংরাজিতে বলল, আপনাকে ঠকিয়েছে সায়েব। রামছাগলের চামড়ার ওপর কালো রং দিয়ে ডোরা কেটে দিয়েছে।

অ্যাঁ! ফ্লেচার সায়েব রেগে টং। তখনই চামড়া বগলে করে ট্যাংরায় গিয়ে হাজির।

ইংরাজিতে চেঁচামেচি শুরু করতেই ভিতর থেকে এক চীনা মহিলা বের হয়ে এসেছিল। তার হাতে অর্ধেক ছাল ছাড়ানো একটি শুয়োর।

ফ্লেচার সায়েবের ইংরাজির উত্তরে বিশুদ্ধ চীনা ভাষায় চিৎকার করেছিল।

একদল চীনা ফ্লেচার সায়েবকে ঘিরে সব শুনে বুঝিয়েছিল, ফুললাই আজ ভোরের প্লেনে দেশে ফিরে গেছে। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। এই মহিলা ফুললাইয়ের পিসি। বাড়ি আগলাতে কাল রাত্রে এসেছে।

অগত্যা ফেনচার সায়েব ফিরে এসেছিলেন। চামড়া ট্যাংরায় ফেলে দিয়ে। এসেই খানসামাকে তলব।

আমাকে একজন পাকা লোক দাও, যে সুন্দরবন এলাকা বেশ ভালভাবে চেনে। কিছু কিছু শিকারও বোঝে। আমি বন্দুক নিয়ে যাব, সে পাশে পাশে থাকবে।

সেদিনই বিকালে খানসামা লোক এনে হাজির।

লম্বায় সাড়ে চার ফুট। প্রস্থে সেটা পুষিয়ে নিয়েছে। কদমছাঁট চুল। হলুদ রঙের গোল গোল দুটি চোখ, চামর গোঁফ। এই গরমেও পরনে কালো কোটপ্যান্ট পায়ে বুট।

এসেই সেলাম করে টান হয়ে দাঁড়াল।

তুমি বাঘের খোঁজ রাখ?

লোকটা তো হেসেই অস্থির। হাসি থামতে বলল, জিম করবেটের নাম শুনেছ সায়েব? সে ছোকরাকে বাঘের সন্ধান কুমায়ুনে আমিই দিই। কত রাত গাছের উপর মাচায় পাশাপাশি বসে কাটিয়েছি। বাঘের অপেক্ষায় তাস খেলেছি। ছোকরা অদ্ভুত তৈরি হয়েছিল। বাতাসে বোঁটকা গন্ধ শুঁকে বলতে পারত বাঘ না বাঘিনী। আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত! মরবার আগে পর্যন্ত সপ্তাহে একখানা করে চিঠি লিখত। এই যে বুটজোড়া, এ তো তারই দান।

সুন্দরবন চেনো?

চিনি মানে? ওখানেই তো আমার জন্ম। সন্দেশখালিতে। ওখানকার প্রত্যেকটি সুঁদুরি গাছ আমার চেনা। প্রত্যেকটি বাঘের ল্যাজে কটা ডোরা আছে, তাও আমার নখদর্পণে!

ডোরার কথায় ফেনচার সায়েবের ভেজাল চামড়ার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সবিস্তারে ফুললাইয়ের কীর্তির কথা বললেন।

শুনে লোকটা বলল, এ আর আশ্চর্যের কথা কি সায়েব, লোকটার নামেই তো তার প্রকৃতি বোঝা যাচ্ছে। লাই মানেই তো মিথ্যা।

ফেনচার সায়েব লোকটাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। লোকটার নাম নিধিরাম সামন্ত। ফেনচার সায়েব ছোট করে ডাকতেন, নিডি।

নৌকা বিদ্যাপতি, মাতলা ঘুরে রায়মঙ্গলে পড়ল। বাঘের দেখা নেই। জল খেতেও কি কেউ আসে না?

তখন ফেনচার সায়েব ঠিক করলেন, ফিরে যাবেন। সব ঝুট। সুন্দরবনে বাঘ আর নেই, তখনই ঘটল ব্যাপারটা।

চাঁদনী রাত। চারদিক দিনের আলোর মতন পরিষ্কার। গাছের প্রত্যেকটি পাতা আলাদা করে চেনা যায়। নৌকার পাটাতনে ফেন্সচার সায়েব। চোখে দূরবীন, কাঁধে বন্দুক। পাশে নিধিরাম।

হঠাৎ ফেন্সচার সাহেব চিৎকার করে উঠলেন, নিডি, নিডি!

দূরবীন চোখে দিয়ে নিধিরাম অবাক।

সায়েব, সাদা বাঘ, সাদা বাঘ।

ধবধবে সাদা একটা বাঘ থপথপ করে জলের ধার দিয়ে চলছে। ফেন্সচার সায়েব বন্দুক তাগ করতেই, নিধিরাম বাধা দিল।

সাদা বাঘ মারা সরকারের নিষেধ সায়েব! জেল হয়ে যাবে।

ফেন্সচার সায়েব ফিরে এসেই ইংরাজি সংবাদপত্রের অফিসে দেখা করতেন। পরের দিনই কাগজে ফলাও করে বিবৃতি বের হল। সাদা বাঘের ফটো তোলা হয়নি, সুতরাং বন্দুক হাতে ফেন্সচার সায়েবের ফটো তোলা হল।

তারপর অফিসে, কলেজে, স্কুলে, রেস্তরাঁয়, বাড়ির রোয়াকে কেবল এই নিয়ে আলোচনা।

সুন্দরবনে সাদা বাঘ এল কি করে? রেওয়া আর সুন্দরবন পাশাপাশি নয়, যে কিতকিত খেলতে খেলতে সাদা বাঘ ছিটকে সুন্দরবনে ঢুকে পড়বে।

পরে ফেন্সচার সায়েব চিড়িয়াখানায় দেখে এসেছেন। দেখে মন্তব্য করেছেন, যে বাঘ তিনি সুন্দরবনে দেখেছেন, সে এর চেয়েও অনেক সাদা। একেবারে দুধের মতন রং।

সরকার পক্ষ থেকে একঝাঁক শিকারী পাঠানো হল। তারা সুন্দরবন তন্ন তন্ন করে খুঁজল। সাদা বাঘের ছায়াও দেখতে পেল না।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের জানা আছে।

কিছুদিন হল সুন্দরবনে একটা বাঘের উপদ্রব হয়েছে। বুড়ো মানুষখেকো বাঘ। অবশ্য যখন বাঘের হরিণ ধরার ক্ষমতা থাকে না, তার বয়স হয়, তখনই সে মানুষ ধরে। আর একবার মানুষের স্বাদ পেলে, তার অন্য মাংসে রুচি হয় না।

গোটা তিনেক মানুষ বাঘের পেটে যাবার পর, গাঁয়ের লোকেরা মফঃস্বল শহরে বিরজা মণ্ডলের বাড়ি হানা দিল। বিরজা মণ্ডল বেঁচে নেই, কিন্তু তার ছেলে ভরত মণ্ডল রয়েছে। এখানকার লোকেরা ভোট দিয়ে তাকে এম. এল. এ. করেছে। ভোটের সময় কথা দিয়েছিল, আপদে-বিপদে এখানকার লোককে বুক দিয়ে পড়ে বাঁচাবে, এবার বাঁচাক। ভরতবাবুর তো বন্দুক রয়েছে।

বাইরে বের হয়ে ভরতের চক্ষুস্থির। প্রায় শ' আড়াই লোক তার বাড়ী ঘেরাও করেছে।

সব শুনে ভরত রীতিমত বিচলিত। বন্দুক একটা আছে বটে। বাপের আমলের। তাতে বারকয়েক ভরত পাখি শিকার করেছে। কোন জন্তু নয়।

লোকেরা কোন কথায় কান দিল না। জনকয়েক ভরতকে কাঁধে করে নিয়ে গেল। আর কয়েকজন তার বন্দুক আর কার্তুজের বাক্স নিল।

নিরুপায় ভরত বলল, আরে বাবা, এভাবে কি বাঘ শিকার হয়? গাছে মাচা বাঁধতে হবে। গাছের নিচে ছাগল রাখা চাই।

দলের পাণ্ডা রামহরি বলল, সব ঠিক আছে বাবু। খালের ধারে সুঁদুরী গাছে মাচা বাঁধা আছে। নিচে ছাগলছানা। আজ বিকালে আপনাকে গাছে চড়িয়ে দেব।

এদের যে কথা, সেই কাজ।

গাছের ডালে বসে ভরত একবার শেষ চেষ্টা করল।

রামহরি, একটা যে ভুল হয়ে গেছে।

রামহরি বলল, কি?

দই দরকার। শুভ কাজে দই চাই। তোমরা যেভাবে আমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এলে, কিছুই তো করবার সুযোগ পেলাম না।

ভরত নিশ্চিন্ত ছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে কিছুতেই দইয়ের যোগাড় হবে না। অতএব সে গাছ থেকে নেমে বাড়ি চলে যেতে পারবে।

কিন্তু তাকে বিস্মিত করে রামহরি উত্তর করল, ঠিক আছে, নিয়ে আসছি।

মিনিট কুড়ির মধ্যে রামহরি ফিরে এল। মাথায় বিরাট সাইজের এক হাঁড়ি।

হাঁড়ি মাথায় সে তরতর করে গাছে উঠে মাচার ওপর হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে বলল, এই নিন আপনার দই।

এত দই? এত কি হবে? এর মধ্যে এত দই যোগাড় করলে কি করে?

গামছা দিয়ে শরীর মুছতে মুছতে রামহরি বলল, কাল যে পঞ্চানন সাঁপুইয়ের মেয়ের বিয়ে। সেই শহর থেকে এনে রেখেছিল। আপনার যতটা লাগে নিন। পরে বাকিটা নিয়ে যাব।

ভরতকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে রামহরি নেমে পড়ল। যেতে যেতে বলল আমরা ধারে কাছেই রইলাম। বন্দুকের আওয়াজ পেলেই এসে বাঘটাকে তুলে নিয়ে যাব।

একটু একটু করে অন্ধকার নামল। আশেপাশে ঝিঁঝির শব্দ। ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকির মালা। কাছে-দূরে বিদঘুটে সব আওয়াজ।

বড় জানোয়ারের মধ্যে গাছের নিচে ছাগল, ওপরে ভরত।

ভরত থরথর করে কাঁপছে আর ইষ্টদেবতার নাম করছে। সে ভাবতে লাগল এম এল. এ. হবার সময়ে যে শপথ-বাক্য তাকে পাঠ করানো হয়েছিল তাতে কি বাঘ মারার প্রতিশ্রুতি ছিল ?

হঠাৎ ঝিঁঝির ডাক থেমে গেল। কাছের দূরের আওয়াজও স্তব্ধ। ছাগলটাও ডাক বন্ধ করে দড়ি ছেঁড়বার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

কাছেই কার পায়ের শব্দ। কে যে শুকনো পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

জ্যোৎস্না রাত। কোথাও একটু অন্ধকার নেই।

একটু পরেই দেখা গেল। প্রমাণ সাইজের এক কেঁদো বাঘ। আগুনের ভাটার মত চোখ। গাছের হাতদশেক দূরে বসে কাছির মত ল্যাজটা আছড়াচ্ছে।

দৃষ্টি ছাগলের দিকে নয়, ভরতের দিকে।

ভরতের প্রথমে মনে হয়েছিল, ভূমিকম্প। পরে বুঝতে পেরেছিল, না, ভূমিকম্প নয়, ভরত কাঁপছে, মাচা কাঁপছে, পাশে রাখা দইয়ের হাঁড়িও কাঁপছে।

খুব আস্তে আস্তে বাঘটা এগোল। পিঠটা ধনুকের মতন বেঁকিয়ে। দৃষ্টি কিন্তু ভরতের দিকে।

ভরত জানে লাফাবার আগে বাঘ ঠিক এমনই করে। অবিকল বেড়ালের মতন।

হঠাৎ কি যে হল, বন্দুকটা হাত থেকে নিচে পড়ে গেল। অত কাঁপলে কখনও হাতে থাকে। বন্দুকটা পড়ল একেবারে ছাগলের পিঠের ওপর। যন্ত্রণায় ছাগলটা ব্যা ব্যা করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘও লাফ দিল। ভরতের নাগাল পেল না, তবে মাচার কাছাকাছি পেঁছিল।

তারপর কি হল ভরতেরও খেয়াল নেই। বাঘ নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দইয়ের হাঁড়িটা তার দেহের ওপর পড়ল, কিংবা এমনও হতে পারে, দইয়ের হাঁড়ির ধাক্কাতেই বাঘটা মাটিতে পড়ল।

হাঁড়ি ভেঙে বাঘের সারা গা দইয়ে মাখামাখি। তার আসল রং ঢাকা পড়ে গেল। দু'চোখে দইয়ের ছিটে। সামনের পথ দেখার উপায় নেই ; বাঘটা কোন রকমে থপ থপ করে ছুটতে লাগল।

ঠিক এই অবস্থাতে বাঘটাকে ফ্লেচার সায়েব দেখেছিল। একেবারে সাদা ধবধবে বাঘ। ওটা যে দই-বাঘ সেটা বুঝবেন কেমন করে!

ভরত এসব কিছুই দেখেনি। সে আর ছাগল তখন জাপটা-জাপটি করে গাছের তলায় পড়ে আছে। দুজনেই অজ্ঞান।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নাম

স্ত্রী আর দুই বোনের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম। উঠতে বসতে তাগিদ, 'কই ঝি'র কি করলে? বলে বলে যে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম—'

খুঁজে খুঁজে আমিও কি কম হয়রান হয়েছি। কিন্তু কলকাতায় চার টাকার জায়গায় আট-দশ টাকা মাসিক মাইনের যদি বা ঠিকে ঝি বার কয়েক ঠিক করা গেছে, গাঁয়ে এসে দেখতে পেলাম টাকা বিলিয়ে আর যাই মিলুক না কেন ঝি মিলবে না।

আশে পাশে যে কয়েক ঘর কামার আর নমশূদ্র প্রতিবেশী আছে আগে তাদের বিধবা বোন আর মেয়েদের ভিতর থেকেই এসব প্রয়োজন মিটত। কিন্তু আজকাল দিনকাল বদলেছে। পুরুষদের মজুরির রেট হয়েছে এখন দু-তিন টাকা। ফলে মেয়েদের মান-সম্মানের দিকে চোখ পড়েছে। কি মেয়ে, কি পুরুষ, ঝি-চাকর খাটতে আর কেউ রাজী নয়।

ঘুরে ঘুরে দু-তিন বাড়িতে গিয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে কথাটা পেড়েও ফেললাম, কিন্তু কেউ বলল, 'দেহ ভালো নয়, নিজের সংসারেই নানান ঝামেলা,' আবার

কেউ-বা পরিষ্কার মাথা নেড়ে জানাল, 'না কর্তা, সমাজে তাহলে কথা উঠবে।'

তা তো উঠবে, কিন্তু এদিকে বাইরের কাজকর্ম করার জন্য একজন মেয়ে-ছেলে না হলে নিতান্তই যে আমাদের নয়।

সবচেয়ে অসুবিধা জলের। আধ মাইলখানেক দূরে নদী। ফাল্গুনেই জল হাঁটুর নীচে নামতে চায়। তাও রাত থাকতে থাকতে, খুব ভোর ভোর সময় গিয়ে পেঁছুলে সেটুকু দেখা যায়। একটু বেলা হয়ে গেলেই ঘোলা হতে হতে তরল কাদায় সেই জল রূপান্তরিত হয়। তিন ননদ-বৌদিতে প্রথম দিন দুয়েক কলসী কাঁখে বেশ সোৎসাহে স্নান-যাত্রা শুরু করেছিল কিন্তু তৃতীয় দিনেই দেখা গেল তাদের মধ্যে দুইজনের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। বলবার কিছু নেই, দীর্ঘকালের নাগরিক অভ্যাস বদলানো শক্ত। মনের জোর জিহ্বায় যত সহজে সঞ্চারিত হয় অন্য সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তত সহজে হয়ে ওঠে না।

জলের পর আগুন। রান্না করতে গেলে সুলতার প্রায় চোখ ছলছল করে ওঠে আর কি। শহরের মতো কয়লা এখানে মেলে না। শক্ত কোনো রকম জ্বালানি কাঠের ব্যবস্থা করা যায় নি। উমা আর রমা দুজনে মিলে বাগান থেকে কিছু শুকনো পাতা আর ছিটকে ডাল সংগ্রহ করে এনেছে। আহার্য তৈরির তাই একমাত্র ভরসা। আমি অবশ্য আশ্বাস পেয়েছি এবং আশ্বাস দিয়েছি যে শিগগিরই এর একটা সুব্যবস্থা হবে। নিষ্পত্র শুকনো শুকনো ডাল নিয়ে যেসব গাছ এখনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারাই জ্বালানিরূপে সুলতার উনানের পাশে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে। কেবল জন দুয়েক কামলা মিললেই হয়।

পৈত্রিক বাড়িতে মাসখানেকের জন্য সপরিবারে বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু ঝি-চাকরের আর কামলা কৃষাণের অভাব প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বকে দুঃসহ করে তুলল।

পাশের গাঁ থেকে পিসেমশাই অবশেষে এনে হাজির করলেন ঝি। তাঁর প্রজা বুড়ো ভুবন মণ্ডলের বিধবা মেয়ে। আকালের পর ভুবন মারা যাওয়ায় তাঁর বাড়িতেই এতদিন ছিল। এবার তিনি তাকে নতুন চাকরিতে ভর্তি করে দিতে চান।

বললুম, 'আপনার চলবে কি করে?'

পিসেমশাই বললেন, 'সেজন্যে ভেবো না। তোমার পিসীমা একাই একশ, কাজকর্ম দেখে যদি পছন্দ হয় তুমি ওকে কলকাতায়ও নিয়ে যেতে পারো। শুনেছি সেখানেও ঝি'রা নাকি সব রাজার ঝি হয়েছে।

তামাক খেয়ে পিসেমশাই বিদায় নিলেন। আমি অন্দরে গেলাম ঝি সম্বন্ধে ওদের মতামত শুনতে। কিন্তু চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো মুখের ভাব কারোরই দেখলাম না। সুলতা আর উমা দুজনে গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছে। রমা হাসছে মুচকে মুচকে।

তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি, ঝি পছন্দ হয়েছে তো?'

সুলতা বলল, 'আচ্ছা, পিসেমশাই না হয় বুড়ো মানুষ, তাঁর রুচির কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তোমার কি সঙ্গে চোখ ছিল না?'

উমা বলল, 'রাগ কোরো না দাদা, চোখ মানে এখানে চশমা।'

বললুম, 'দুই-ই ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের এ ধরনের সন্দেহের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

উমা বলল, 'দেখা যাক, আর একবার দেখে যদি পারো।' বলে উমা একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, 'ওগো, একবার এদিকে এসো তো, বাড়ির কর্তা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন।'

ঘরের পিছনে বসে জ্বালানির জন্য দা দিয়ে শুকনো কঞ্চিগুলিকে ঝি ছোট ছোট করে কেটে রাখছিল। উমার ডাক শুনে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আট হাতি ধুতির আঁচলটুকু মাথায় টেনে দিতে বার-দুয়েক চেষ্টা করল, কিন্তু কোনোবারেই মাথায় আর তা রইল না।

সুলতা ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'চেহারাখানা দেখো একবার।'

এতক্ষণ চেহারার কথা আমার মনেই হয়নি। ঝি'র আবার কেউ চেহারা দেখে নাকি। বিশেষতঃ সারা গ্রাম খুঁজলে যা একটি মেলে না, তার চেহারা কিরকম কে দেখতে যায়।

সুলতার অনুরোধে ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। বোঝা গেল এতক্ষণ কেন সুলতা আর উমার মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিল, কেনই-বা ওরা হাসি চাপতে পারছিল না। বছর তিরিশেক হবে বয়স। লম্বা ছিপছিপে একটি গাবের চারার মতো চেহারা, কোনো অঙ্গে যে বিশেষ রকমের খুঁত আছে তা নয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনোরকম সামঞ্জস্যই যেন নেই। অত বড়ো মুখে নাক এবং চোখ দুটিকে ভারী ছোট মনে হয়। দেহের তুলনায় হাত দুখানিও খুব খাটো এবং নিচের অংশ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকমের লম্বা। চেহারার পুরুষালি ধরনটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আসলে ও যেন মেয়ে নয়, মেয়ে সেজে এসেছে এবং সাজটা সম্পূর্ণ করার কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। ঝি'র আংগিক গঠনের এই

বৈসাদৃশ্যেই রমাকে হাসিয়েছে এবং সুলতাকে বিরক্ত ও গম্ভীর করে তুলেছে বুঝতে পারলাম। সুলতার ইচ্ছা বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব যেন সুন্দর হয় এবং গৃহকর্ত্রীর সুরুচি এবং সৌন্দর্য-নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?' কর্কশ পুরুষের কণ্ঠে জবাব এল, 'রসো।'

ওর পৌরুষের আধিক্যে স্ত্রীসুলভ লজ্জা অনুভব করে একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললাম, 'কাজকর্ম সব দেখে নিয়েছ? সব পারবে তো করতে?'

রসো বলল, 'কেন পারব না? এ দেশের মানুষ আমি, না বিলেত থেকে এসেছি?'

সুলতা বললো, 'তাতো আসোনি। কিন্তু মাথাটাকে অমন কদমছাঁটা করেছ কেন। চুলগুলি কি দোষ করল।'

রসো এবার লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল। বলল, 'আর বলবেন না বউঠাকরুণ। দিনরাত উকুনের জ্বালায় অস্থির হয়ে বেড়াতাম। মাথা ভরে কেবল চুলবুল চুলবুল করত। যত সব অশান্তির বাসা। শেষে রাগ করে দিলাম একদিন ছেঁটে।'

সুলতা রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'বেশ করেছ।'

ব্যক্তিগতভাবে চুলের ভারি যত্ন করে সুলতা। তেল মাখিয়ে শুকানোয়, বেণী কি কবরী রচনায় অনেক সময় তার ব্যয় হয়। কিন্তু তার প্রতি মুহূর্ত সে যেন আলাদা আলাদা করে উপভোগ করে। সুলতার জন্য সত্যিই কষ্ট বোধ করলাম।

সুলতা পিছিয়ে এল তো উমা গেল এগিয়ে। দ্বিতীয় দিনে আবার বিনা অনুমতিতেই সুটকেশ থেকে পুরনো সরু নকসী-পেড়ে ধুতিখানা বের করে আনল। আনলা থেকে নামিয়ে নিল নিজের আধ পুরনো সাদা সেমিজটা। তারপর রসোর কাছে গিয়ে বলল, 'ওখানা ছেড়ে এগুলো পরো দেখি, ওভাবে তুমি তো দিব্যি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করো, এদিকে আমরা যে চোখ তুলে তাকাতে পারি না। ছিঃ ছিঃ।'

রসো অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল। তারপর উমার দেওয়া সেই ধুতি আর সেমিজটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আড়ালে চলে গেল।

কিন্তু দু-দিন যেতে না যেতেই দেখি সেই আট হাতি জীর্ণ ময়লা চীর পরে সে বেশ আরামে স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম করছে।

উমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওমা, সেই ধুতি আর সেমিজ কি করলি?'

রসো অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'ছেড়ে রেখেছি। ভারী বাধো বাধো ঠেকে! আর পরতে না পরতেই যা ঘামাচি উঠেছে, দেখবেন?'

উমা বিকৃত মুখে বলল, 'থাক তোমার ঘামাচি দেখে আমার আর দরকার নেই।'

আরো দিন কয়েক কাটল। দেখা গেল অবস্থার মোটামুটি উন্নতি হয়েছে।

রসোর কদমছাঁটা মাথা, আঙ্গিক শ্রীহীন বৈসাদৃশ্য এবং পরিধেয়ের হ্রস্বতা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। কাজ কর্মে সবাইকে সে তুষ্ট করেছে। রান্না এবং খাওয়া ছাড়া প্রায় কোনো কাজেই সুলতাদের হাত দিতে হয় না। কলসীতে কলসীতে নদী থেকে জল নিয়ে আসে রসো। এত জল যে তাতে সুলতাদের স্নান পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়।

জ্বালানি কাঠের কোনো অভাব নেই আজকাল। শুকনো পাতা আর কঞ্চির খণ্ড নয়, অবসর মতো বিকেলে ছোট কুড়ুলখানা নিয়ে আম আর গাব গাছের শুকনো গুঁড়িগুলি রসো চেলা করে দেয়। তার সে রূপ নাকি চোখ পেতে দেখা যায় না।

মাথায় কোনো কালেই রসোর কাপড় থাকে না। বুকের আঁচল মাথায় জড়িয়ে নেয়। তারপর লোহার মতো শক্ত আমের গুঁড়ির ওপর মুহুর্মুহু তার কুড়ুল পড়তে থাকে; দর দর করে ঘাম ঝরে পড়ে পিঠ বেয়ে।

সুলতা মাঝে মাঝে মিনতি করে বলে, 'থাক না রসো, এসব পুরুষের কাজ তোমাকে করতে হবে না।'

কুড়ুল থামিয়ে রসো তার বিপুল মুখখানাকে বিকৃত করে জবাব দিল, 'আহাহা কি সোহাগের কথাখানা গো! আমাকে করতে হবে না তো কে করবে শুনি? চাকর বাকর কামাল কৃষাণ আছে দু-চার গণ্ডা, না দাদাবাবু নিজে এসে করতে পারবে। কোপ দেওয়া দূরে, কুড়ুলখানা যদি ভালো করে ধরতে জানতো তবু না হয় বুঝতাম। গুণের ওইতো একখানা সোয়ামী। এরপর আবার পুরুষের কাজ আর মেয়েমানুষের কাজ বলে বকাবকি করছ বউ ঠাকরুণ!'

নায়ক নায়িকার সংলাপ রচনা করতে করতে হঠাৎ কথাগুলি আমার কানে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে কলমটি স্তব্ধ হয়ে থাকে কিন্তু রসোর কুড়ুলের খট্‌খট শব্দ চলতে থাকে অবিরাম। খানিক বাদে এসে রসো আবার আপোস করে সুলতার সঙ্গে।

'সোয়ামীর নিন্দা করলাম বলে রাগ করেছ নাকি বউঠাকরুণ?'

সুলতা হাসি গোপন করে বলে, 'করেছিই তো। নিন্দা শুনলে রাগ হয় না? তোর হত না।'

জানালা দিয়ে চোখে পড়লো রসো তার বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ধরেছে, 'হু, এইটে হত।'

উমা হঠাৎ ধমকের সুরে বলে, 'ছিঃ, ওসব কি?'

রসো পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যায়, 'কাজের কথা বলছিলে বউঠাকরুণ। কাজের কি আবার মেয়ে পুরুষ আছে। যে যা জানে তার সেই কাজ। তাই তাকে মানায়।' রমা হেসে ওঠে, 'বাব্বাঃ, আমাদের রসরাজ যে আবার বক্তৃতা দিতে জানে দেখছি, বৌদি।'

রসোর পৌরুষকে স্বীকার করে নিয়ে ওরা তার নাম রেখেছে রসরাজ। চালচলনে রুচিতে প্রসাধনে নিজেদের সঙ্গে রসোর মিল নেই। এ নিয়ে মনে আর কোনো ক্ষোভ নেই সুলতার, চোখ আর পীড়িত হয়ে ওঠে না। ওর বেশবাসে, আচার-ব্যবহারে লজ্জা পাওয়ার কি আছে। ও যে কেবল আমাদের শ্রেণীর মেয়ে নয় তাই নয়, ওর মধ্যে কোনো শ্রেণীর কোনো নারীত্বই নেই।

আরো একটি ঘটনায় এ কথার ভালো রকম প্রমাণ হয়ে গেল। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকেন কুঞ্জ কবিরাজ। ছেলেপুলে নেই, বছর কয়েক আগে স্ত্রী মারা গেছে। আর একবার বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মাথার চুল সব পেকে যাওয়ায় কোনো মেয়ের বাপ রাজী হয়নি, পাড়ার ছেলেরাও শাসিয়েছে। অগত্যা বড়ি আর দাবার বড়ে নিয়েই কবিরাজের দিন কাটে।

আমি বাড়ি এসেছি শুনে দাবার পুঁটলি হাতে রোজ আমাদের বাড়িতে আসা তিনি শুরু করলেন। বললাম, 'কিন্তু দাবা খেলা তো আমি জানিনে কবিরাজ মশাই।'

কবিরাজ মশাই নাছোড়বান্দা। বললেন, 'জানো না, জানতে কতক্ষণ?'

প্রথম দিনকয়েক খুব বিরক্ত বোধ করতাম। কিন্তু ক্রমশ একটু একটু করে রস পেতে লাগলাম। নেশা জমে উঠল।

তবু কবিরাজের মতো জিততে পারি না, চালও দিতে পারি না তাড়াতাড়ি ভাবতে হয়। অনেক সময় লাগে।

কবিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তারপর অধীরভাবে বললেন, 'না হে তুমি তো রাত ভোর করে দিতে চললে দেখছি। বসে বসে আমি কি করি বলো তো। অন্ততঃ একটু ধোঁয়া টোয়ার ব্যবস্থা করলেও না হয় বুঝতুম।'

লজ্জিত হয়ে পরদিন থেকে কবিরাজ মশাইয়ের জন্য তামাকের ব্যবস্থা

করে দিলাম। হুঁকো-কলকে এল, মাটির ভাঁড়ে রইল মাথা তামাকের গুলি, আগুনে মালসায় দগ দগ করতে লাগল চেলা কাঠের আগুন। নবাবী শিষ্টাচারে আরও একধাপ অগ্রসর হলাম। রসোকে ডেকে বললাম, 'রাত্রে তো কোনো কাজ নেই। এখানে কাছাকাছি থাকবি। কবিরাজ মশাই যখন তামাক চাইবেন, ভরে তামাক দিবি।'

রসো হাত মুখ নেড়ে বললে, 'আহাহা কী সোহাগের কথা গো, ওঁরা রাত ভরে দাবা খেলবেন আর আমি বসে বসে কেবল তামাক ভরে দেব! আমার বুঝি আর মানুষের গতর নয়।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই রসো অত্যন্ত অপ্রতিভ এবং সংকুচিত হয়ে বলল, 'বকো না দাদাবাবু, মুখে বললুম বলে, তোমার কথার কি সত্যই অমান্য করতে পারি। তুমি হচ্ছ মনিব।'

সুবন্দোবস্তের ফলে কবিরাজ মশাই-এর তামাক তৃষ্ণা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। এক ছিলিম শেষ না হতে না হতে আর এক ছিলিম রসোকে ভরতে বলেন। দুটো দিন যেতে না যেতে বড়ো বড়ো এক একটা গুলি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ নিয়ে বলি বলি করেও কবিরাজ মশাইকে কিছু বলতে ভারি সংকোচ হয়। ভাবি, আর কটা দিনই বা।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এবং আকস্মিকভাবে যে দাবা আর তামাকের ওপর যবনিকা পড়বে ভাবতেই পারি নি। সুলতারা এ নিয়ে অনেকবার অনেক রকম মন্তব্য করেছে, কানে তুলিনি। কিন্তু সে রাত্রে ব্যাপার ঘটল একেবারে ভিন্ন রকমের।

একটু বেশী রাত হয়ে যাওয়ায় এবং ওরা বার বার আপত্তি করতে থাকায় খেলা ত অসমাপ্ত রেখেই কবিরাজ মশাইকে বিদায় দিলাম। কবিরাজ মশাই নিতান্ত অনিচ্ছায় পুঁটলিটি বেঁধে উঠে পড়লেন। বললেন, 'বড়ো বেরসিক লোক হে, একেবারে স্ত্রীর আঁচল ধরা হয়ে পড়েছ।'

হেসে বললাম, 'সেটা তো রসিকেরই লক্ষণ। সে আঁচল যে রসে একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে থাকে, তাকি এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?'

রসো যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল তা লক্ষ্য করিনি। তার হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। চমকালেন কবিরাজও। এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'রসো আলোটা একটু ধরো তো, ভারী অন্ধকার রাস্তা।' বললাম, 'আমি দিচ্ছি এগিয়ে।'

রসো তাড়াতাড়ি হারিকেনটা তুলে নিয়ে বলল, 'না দাদাবাবু, আপনি

থাকুন। পথঘাট ভালো নয়, আমিই যাচ্ছি।'

ঘরে গিয়ে সুলতার অভিযোগের জবাব দিতে চেষ্টা করছি হঠাৎ বাগানের ভিতর থেকে কবিরাজ মশাইয়ের তীব্র আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলাম। ব্যাপার কি! সাপটাপ পড়ল নাকি রাস্তায়! তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। পিছন থেকে রমা আর উমা ভীত কণ্ঠে বলল, 'একটা আলো নিয়ে যাও দাদা। এমন অন্ধকারে যেও না।'

খানিকটা যেতে না যেতেই বিস্মিত হয়ে দেখলাম, কবিরাজ মশাইয়ের একখানা হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে রসো তাঁকে হিড় হিড় করে আমাদের বাড়ির দিকে টেনে আনছে।

বললাম, 'ব্যাপার কি রসো?'

রসো একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে উঠল, 'হতচ্ছাড়া, মুখপোড়া বুড়ো আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল বাগানের মধ্যে।'

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'ছেড়ে দাও ওঁকে।'

'এসব কি কাণ্ড কবিরাজ মশাই?'

কবিরাজ মশাইয়ের চেহারাটা অত্যন্ত করুণ দেখালো। গরম চিমনির ছাপ লেগে গালের খানিকটা পুড়ে গেছে। হাত ছেড়ে দিতে মনে হল কব্জিটা তাঁর মচকে গেছে। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম রসো সম্বন্ধে এমন ভুল, এমন মোহ তাঁর হল কি করে? রসোর অন্তরে বাহিরে সত্যিই কি নারীত্ব বলে কিছু আছে?

মহকুমা শহর থেকে টীকাদার এসেছে বসন্তের টীকা দেওয়ার জন্য। রোগটা প্রত্যেকবার এই সময়টায় এ অঞ্চলে বেশ একটু ছড়িয়ে পড়ে। আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।

অন্য সব বাড়ি সেরে প্রায় দুপুরের সময় টীকাদার আমাদের বাড়িতে এল। মেয়েরা প্রথমটায় কিছুতেই টীকা নেবে না। টীকাদার বার বার অনুরোধ করে বলতে লাগল, "সব তো আমার মা লক্ষ্মী। আমার কাছে আবার লজ্জা কি আপনাদের।"

সুলতাদের বললাম, 'দোষ কি! নাও না টীকা।'

বারান্দায় চেয়ার পেতে টীকাদারকে বসতে দেওয়া হল। পাড়ার কৌতূহলী ছেলে-মেয়েরা টীকাদারের পিছনে পিছনে এসেছিল। ধমক খেয়ে আর তারা এগুলো না।

শত হলেও বাইরের একজন লোকের সামনে বেরুতে হবে। আবাল্যের

অভ্যাস মতো তিনজনেই শাড়িটা বদলে নিল, আয়নার সামনে গিয়ে দেখে নিল মুখখানা। তারপর টীকা নেওয়ার জন্য বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রসোও এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে দেখছে সব চেয়ে চেয়ে।

টীকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টীকাদারের সঙ্গের লোকটি একটি খাতায় নাম লিখে নিচ্ছে।

রমার টীকা দেওয়া হয়ে গেলে লোকটি বলল, 'ওর নামটা?'

বললাম, 'ডাকি তো রমা করে। ভালো নামটাই লিখুন, কাবেরী রায়।'

উমার পোশাকী নাম উজ্জয়িনী। সুলতার শুচিস্মিতা।

এবার রসোর পালা। টীকাদারদের কাছে ঠিক মধুরেণ সমাপয়েৎ হল না। রসোর শক্ত শাবলের মতো হাতখানায় নিতান্ত নিস্পৃহভাবে সরু ছুরি দিয়ে গোটা তিনেক আঁচড়ে কেটে টীকাদার পরম অবহেলায় জিজ্ঞাসা করল, 'নাম?'

বললাম, 'রসো', রসো একবার আমার দিকে তাকাল। চোখ বুলিয়ে নিল সুলতাদের দিকে, তারপর টীকাদারের দিকে চেয়ে মোলায়েম গলায় বলল, 'না টীকাদার মশাই, আমার নাম রসমঞ্জরী।'

অবাক হয়ে রসোর দিকে তাকালাম। তার বেশবাসের সংস্কারের দিকে আজ আর কেউ লক্ষ্য করে নি। এতদিনে লক্ষ্য না করাটাই সকলের অভ্যেস হয়ে গেছে। রসোর পরনে সেই আট-হাতি ময়লা ধুতি। কয়েক জায়গায় ছেঁড়া।

টীকাদাররা চলে গেলে বললাম, 'আমরা তো জানতাম না। এ নাম তুই কোথায় পেলি রে?'

রসো ভারী লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'পাবো আবার কোথায়? পোড়ার মুখো কবরেজ সেদিন ওই নামেই ডেকেছিল।'

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুকে না রাখিলে
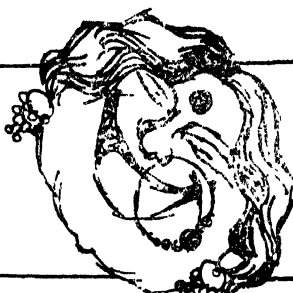
সন্ধ্যেবেলা বাড়ির সামনে গিয়ে যেই ডাক দিয়েছি, অমনি একেবারে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল তপন।

—এই যে এসে গেছ তা হলে! যাক।

আমার কেমন ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল।

এসে তো গেছিই। কিন্তু সেজন্যে অমনভাবে নাচবার কারণটা তো বুঝতে পারছি না। তুমি তো আমায় নেমতন্ন করোনি।

তা ছাড়া—

তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার আমার সন্দেহ হলো : আর মুখে হলদে হলদে ও-সব তুমি মেখেছই বা কী? তোমার গায়ে-হলুদ নাকি হে?

—অ্যাঁ—লেগে গেছে বুঝি? —তপন দু'হাতে মুছতে চেষ্টা করল এবং তার ফলে সেই হলুদ রঙের ব্যাপারটা ঠিক চলে গেল কিনা বুঝতে পারলুম না, কিন্তু যাবার আগে ওকে বেশ করে রাঙিয়ে দিয়ে গেল। মানে বেশ নতুন রকমের একটা চেহারা হল তপনের।

—ওগুলো কি হে? মুখে মাখছই বা কেন?

—মাখছি কে বললে তোমায় ? —তপন বিরক্ত হলো : ধনে বাটা জিরে বাটা—হলুদ বাটা—এগুলো কেউ মুখে মাখে ?

আমি চমকে গেলুম : মাখছিলে না ? তবে খাচ্ছিলে বুঝি ? কিন্তু ধনে-জিরে বাটা কি কখনো কেউ খায় ? এর পরে তুমি তো দেখছি শিল-নোড়া অবধি খেতে শুরু করে দেবে। তপন চটে গেল : মিছেমিছি বকে মরছ কেন শুনি ? ভেতরে আসবে না রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে ?

তপনের সচিত্র মুখচ্ছবি দেখে মনে হলো, একটা জটিল রহস্য—একটা গভীর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। সুতরাং ভেতরেই পদার্পণ করা গেল।

গরমের ছুটিতে তপনের মা বাবা ভাইবোন সবাই পুরীতে বেড়াতে চলে গেছেন। ব্যাঙ্কের চাকরিতে তপন আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা—তার বেরুবার জো নেই। এই ফাঁকে মাঝে মাঝে ওদের বৈঠকখানায় আমি আড্ডা দিই আর তপনের বাবার ইজিচেয়ারে শুয়ে সেই ভদ্রলোকের শখের গড়গড়ায় ভালো বিষ্ণুপুরী তামাক খেয়ে থাকি। আজকেও জুত করে চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছি এবং তামাকের জন্যে তপনের চাকর ঝড়ুকে একটা ডাক দেব ভাবছি, ঠিক তখনই মোটা গলায় তপন বললে, উঁহু, ওখানে নয় !

—তবে কোথায় ?

—রান্নাঘরে।

আমার সন্দেহ আরো গভীর হলো।

—তার মানে ? আমাকেও ধনে-বাটা খাওয়াতে চাও নাকি ? না ভাই—আমার ওসব অভ্যেস নেই।

—আঃ, এ তো ভারী জ্বালা হলো। কে তোমায় ধনে বাটা খাওয়াতে চায় শুনি ? তপনের মসলামাখা লেবুর আচারের মতো মুখে খানিকটা মোহিনী হাসি মিট মিট করে উঠল : রান্না চাখাব—রান্না। নিজেই রাঁধছি কিনা !

প্রথমটায় প্রাণ উৎসাহে নেচে উঠেছিল, শেষ কথাটায় একটু দমেই গেলুম।

—তুমি রাঁধছ ? জানো নাকি রাঁধতে ?

—ও আর জানাজানি কি, রাঁধলেই হলো। এসো না—চাখবে একটু। মাংস আর পায়েসটা করে ফেলেছি, এখন মাছের কালিয়া আর ভাতটা হলেই হয়ে যায়। শর্ট বাট্ শার্প কোর্স। এসো—এসো—

রান্না ঘরে এসে দেখি চারদিক একাকার। মেঝেটা নানা রঙের জলে জলময়। তার মধ্যে রাশি রাশি পেঁয়াজের খোসা, মাছের আঁশ—আধবাটা মসলার কদাকার ধ্বংসাবশেষ। একধারে একটা স্টোভের ওপর এলুমিনিয়মের

হাঁড়িতে সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে।

এসব কী ব্যাপার হে? এত সমারোহ করে রাঁধছ কেন? তোমার ঝড়ুটাই বা গেল কোথায়?

—ঝড়ুর কথা আর বোলো না—তপনের মুখে বেদনার ছায়া পড়ল: প্রত্যেক ছমাস পরে ওদের চাচা মারা যায়। কোথা থেকে যে এত চাচা পায় ভগবানই জানেন। 'তাই আজ সকালে দেশে পালিয়েছে। আর আমি—

রান্নাঘরের সেই জলের ওপর তপন একটা মোড়া পেতে বসল—আমাকেও একটা দিলে। আমি সেই মোড়ার স্বীপে উবু হয়ে বসলুম, তারপরে আবার কৌতূহলী জিজ্ঞাসা নিক্ষেপ করলুম।

চাকর দেশে গেছে বলেই কি এত ঘটা করে মাংস পায়েস রাঁধতে শুরু করেছ? আবার সেইরকম একটা বনমোরগ শিকার করেছ নাকি? মানে সেই যে বন্দুক দিয়ে কার পোষা মোরগ মেরে কুড়ি টাকা গচ্চা দিয়েছিলে?

—ধুত্তোর তোমার বনমোরগ। —তপন চটে বললে, আমায় কিছু বলতে দেবে সুকুমার? নাকি নিজেই সমানে বকর-বকর করে যাবে?

—আচ্ছা—আচ্ছা—বলো শুনছি।

তপন একমনে কয়েকটা মাছের টুকরোতে হলুদ-টলুদ কী সব মাখাতে মাখাতে বলে চলল, মানে কলকাতা থেকে আমাদের এক বড়কর্তা গজাননবাবু ইনস্‌পেক্‌সনে এসেছেন। ওঁর একটা ভালো রিপোর্ট পেলে আমার প্রমোশন হয়ে যায়। খুব খাইয়ে লোক—মাংস আর পায়েসটা দারুণ ভালোবাসেন। ভাবলুম এই মওকায় নেমতন্ন করে খাইয়ে নিই। তাই হাত-টাত কচ্‌লে বললুম, স্যার, কাল সন্ধ্যেয় আমার ওখানে যদি একবার—। শুনে বললেন, 'তা বেশ, তা বেশ। তবে আমি বেশি জিনিস পছন্দ করিনে, মানে—শর্ট আর শার্প কোর্স হলেই চলে। একটু মাংস-পায়েস—আর মাছের ঝোল-ভাত, ব্যস!' আমি তো নেমন্তন্ন করে এলুম—ইদিকে ঝড়ু হতচ্ছাড়া দিন বুঝে হাওয়া হয়ে গেল। আর নেমন্তন্নও তো ফিরিয়ে নিতে পারি না—তাই—

আমি মেঝেতে একটু শুকনো জায়গা দেখে পা নামাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু খানিকটা মাছ-ধোয়া-জল সেদিকে তেড়ে আসছে দেখে চট করে আবার মোড়াতেই উবু হয়ে বসলুম। বেশ ব্যালান্‌স্‌ করে বসতে হচ্ছিল, কারণ উলটে পড়লে আমাকেই মৎস্যাবতার হয়ে মেঝের সেই নানা রঙের ঝোলে সাঁতার দিতে হবে!

বললুম, পায়েস আর মাংসটা তো হয়েই গেছে বলছ—কিন্তু—আমার নাকটা হঠাৎ চোখা হয়ে উঠল; কিন্তু হাঁড়িতে একটা কিছু পোড়াচ্ছ বলে বোধ হচ্ছে।

ওটাও কি কোনো খাদ্যদ্রব্য নাকি ?

—অ্যাঁ—পোড়াচ্ছি মানে ? ভাত হচ্ছে যে—তপন পা পিছলে সড়াক্ করে পড়তে পড়তে হাঁড়ির দিকে এগোল, তারপর দুম্ করে টেনে নামালো।

—ইস্—ইস্ আঙুলে ফোস্কা পড়ে গেল যে! ওফ! ওয়াঃ! আমি বললুম, বার্নল-ফার্নল থাকে তো—

—চুলোয় যাক বার্নল—তপন একটা খুন্তি দিয়ে ঠনাৎ করে হাঁড়ির ঢাকনাটা নীচে ফেলে দিলে। আর তার ভেতর থেকে ঘন ধোঁয়ার সঙ্গে পাকিয়ে উঠতে লাগল পোড়া ভাতের গন্ধ।

—এঃ, ভাতটা একেবারে লাল হয়ে গেছে—তপন হাহাকার করে উঠল ঃ ভালো গোবিন্দভোগ চাল এনেছিলুম—তার বারোটা বেজে গেল। ইঃ ইঃ—এখন খেতে দিই কি গজাননবাবুকে ?

আমি জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে একবার ভাতটা পর্যবেক্ষণ করলুম। মাথায় বুদ্ধি এসে গেল একটা।

—দিব্যি লালটুকটুকে দেখাচ্ছে। ওটাকে পোলাও বানালে হয় না ?

—পোলাও! —তপন বিচলিত হল ঃ তা কী করে হয় ? পোড়া ভাত কি কখনো পোলাও হতে পারে ?

—কেন পারে না ? —আমি ওকে উৎসাহ দিতে লাগলুম ঃ রঙটা তো হয়েই রয়েছে—এখন বেশ করে খানিকটা ঘি ঢেলে দাও। লাল ভাতে ঘি মাখানো থাকলে তাকেই তো পোলাও বলে!

তপন ফোসকাপড়া দুটো আঙুল একবার মাথার চুলে ঘষে নিলে। তারপর চিন্তিত হয়ে বললে, ঠিক তাকেই বলে কি ? মানে—পেস্তা-বাদাম-কিস্মিস্—

—তাও দিয়ে দাও না গোটাকয়েক।

—পাব কোথায় শুনি ? —তপন ব্যাজার হয়ে উঠল ঃ আজ রোববার—বাজার বন্ধ না ? তবে তপন একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল ঃ আচ্ছা, আঙুর শুকিয়েই তো কিসমিস্ হয়—না হে ?

আমি ও ব্যাপারে খুব নিশ্চিন্ত নই। তবু বললুম, সেইরকমই তো শুনেছি।

—আজ বিকেলে সস্তায় এক পো আঙুর কিনেছিলুম। একটু টক আছে—তা—ওরই গোটাকয়েক দিয়ে দিই কী বলো ?

—দাও—দাও। ঘিয়ে ভাজা হলেই আঙুর কিস্মিস্ হয়ে যাবে। টক হলে বোধ হয় বিশেষ ক্ষতি হবে না—কোনো কোনো কিস্মিস্ তো একটু টক হয়েই থাকে।

—তা তো হয়ই। —তপন আমার সঙ্গে একমত হল, তারপর বেশ খুশি হয়ে বললে, বুদ্ধিটা কিন্তু ভালোই দিয়েছ সুকুমার। এই জন্যেই তো সময়-অসময়ে বন্ধুর দরকার হয়।

তপন উঠে গিয়ে কোথা থেকে এক থাবা আঙুর নিয়ে এল। তারপর সেরখানেক ঘি আর সেই আঙুরগুলো ভাতের মধ্যে ঢেলে একটা খুন্তি দিয়ে ঘটর ঘটর নাড়াতে লাগল। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর সেই কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করতে লাগলুম। খানিকটা নাড়ানাড়ি করে তপন নাকটা কুঁচকে বললে, গন্ধটা কী বলে ইয়ে—তেমন ভালো বোধ হচ্ছে না কিন্তু! আমি বললুম, গন্ধে কী আসে যায় হে! স্বাদেই মেরে দেবে।

—তা মেরে দেবে বটে। কিন্তু খানিকটা ভাত—মানে পোলাও—হাঁড়ির তলায় শক্ত হয়ে আটকে আছে যে! উঠছে না!

বললুম, উঠিয়ো না—থাকুক। হাঁড়িখানেক তো হয়েছে দেখছি। ওপরে যা আছে তাই তো চারজনে খেয়েও শেষ করতে পারবে না।

—হুঁ, চালটা একটু বেশি পড়ে গেছে বোধ হচ্ছে—বোধ হচ্ছে—তপন মাথা নাড়ল : তাইতেই পুড়ে গেল খুব সম্ভব। যাক, তবু এই সুযোগে পোলাও রান্নাটাও শিখে ফেলা গেল—কী বলো?

—নির্ঘাত। জীবনে সুযোগ তো এইভাবেই আসে—এমনি অ্যাক্সিডেন্ট থেকেই বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়। কিন্তু—একটা অত্যন্ত জরুরী কথা আমার মনে পড়ে গেল : আমাকে যে মাংস, আর পায়েস চাখাবে বলেছিলে —তার কী হলো?

পোলাও রান্নাটা শিখে ফেলায় তপনকে বেশ পুলকিত দেখা গেল। এক গাল লেবুর আচার বিনিন্দিত হাসি হেসে বললে, হচ্ছে হচ্ছে। চাখাবো বই কি। আর পোলাওটার পরিমাণ যা দেখছি তাতে খাইয়েও দিতে পারব বোধ হয়। কিন্তু একটু দাঁড়াও—মাছের ঝোলটাকে চাপিয়ে দিই আগে। তা হলেই আমার খেলা খতম—একদম ছুটি! দেখছ না, তখন থেকে খামোকা স্টোভটা পুড়ে যাচ্ছে?

তখন একটা কড়াই এনে স্টোভে বসিয়ে দিলে। প্রাণ খুলে তেল ঢালল তাতে। ঠিক কতটা ঢালল বলতে পারব না—আধ সেরের কাছাকাছি বলে মনে হলো। তারপর মাছ দিতে গিয়েই থেমে গেল—এই যাঃ, ঠিক মনে পড়েছে। ওঃ, একটু হলেই ভুলে গিয়েছিলুম।—বলেই টপ করে পাশের কুলুঙ্গি থেকে কী একটা টেনে এনে মুখে পরে নিলে। আর আমি আঁতকে উঠে, মোড়া

থেকে উল্টে পড়তে পড়তে সামলে গেলুম।

—একি কাণ্ড—অ্যাঁ।

কাগজের লম্বা নাক, বড় বড় দাঁত আর মোটা গোঁফওলা এক ভয়াবহ মুখোশ। তার ভেতর থেকে হ্যা-হ্যা-হ্যা করে একটা বিকট হাসি ছাড়ল তপন।

—হঠাৎ ও-রকম মুখোশ পরে লোককে চমকে দেবার মানে কী—শুনি ? —আমার রাগ হয়ে গেল।

—হ্যা-হ্যা-হ্যা—এবার তপনের মুখোশখোলা আচার মার্কা হাসি : আমার ব্রেনওয়েভ। মাছ কিনে আনছি, দেখি রাস্তার ধারে বিক্রি করছে এগুলো। মনে পড়ল, মা কড়াইতে মাছ দিলেই দেখেছি তেলফেন ছিটকে মুখে আসে। তাই এটাকে মাস্ক করে—মানে তেল-মাস্ক করে মাছ ভাজবে। দেখে নাও—

বলে আবার সেই বিকট মুখোশটা পরে নিলে, আর সমস্ত মাছগুলো ঢেলে দিলে তেলের ভেতরে। তারপর তক্ষুনি সেই খুন্তিটা নিয়ে ঘটর ঘটর করে মাছ নাড়াতে লাগল।

আমি বললুম, আহা-হা-আস্তে নাড়ো, মাছ ভেঙে যাবে যে—

তপন মুখোস-পরা ভয়ঙ্কর পাকানো চোখে আমার দিকে তাকালো। গোঁ গোঁ করে বললে, গেছেই। মানে তেলে পড়তেই কেমন লাড্ডুর মতো পাকিয়ে গেল।

—তা হলে ?

মুখোশ খুলে তপন বললে ঝোল হবে না বোধ হচ্ছে। এগুলো দিয়ে কী করা যায় বলো তো ? চুপ করে দেখব ?

—সেও তো ভাবতে হবে। —আমি বললুম আর ভাজাটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। ওটা টক করা যায় না ? মানে—মাছের চাটনি ? ধরো খানিকটা তেঁতুল গুলে দিলে—ভালোই হবে বোধ হয় ?

—না, মাছের চাটনির দরকার নেই। —তপন এবার একটু গম্ভীর : তেঁতুল আমি একেবারে পছন্দ করি না। ওটাকে ফ্রাই বলে যদি চালাই —কেমন হয় ?

—কিন্তু ফ্রাই কি ঠিক ওইরকম হয়ে থাকে ? মানে সেটা কি খানিকটা কাটলেটের মতো নয় ? —আমার একটু সন্দেহ হলো।

তপন বললে, তা বটে। কিন্তু যদি বলি এটা মেক্সিকো ফ্রাই ? মানে গজাননবাবু নিশ্চয়ই কখনো মেক্সিকোতে যাননি।

আমি বললুম, স্পুটনিক ফ্রাই বললে আরো চমকে দেওয়া যায়।

তপন আপত্তি করল : না—চমকে দিতে চাই না, চাকরিতে প্রমোশন পেতে

চাই। ওটাকে বরং মেক্সিকো ফ্রাই-ই বলি।

—বলো। 'গোলাপ যে নামে ডাকো, সুগন্ধ বিতরে।' গজাননকে কায়দা করতে পারলেই হলো। কিন্তু—আবার সেই জরুরী প্রশ্নটা আমার মনে পড়ে গেল : কিন্তু তোমার সেই দুটো অ্যাচিভমেণ্ট—সেই পায়েস আর মাংস যে আমাকে চাখাবে বলেছিলে, তার কী হলো ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—হচ্ছে। —মেক্সিকো ফ্রাইকে আরো খানিকটা ঘট ঘট শব্দে নাড়ানাড়ি করে তপন স্টোভ নেবালো। বলতে লাগল, মাছের ঝোল করা গেল না বটে, কিন্তু পোলাওটা তো বাড়তি হলো। আর কী বলে—তা ফ্রাইটাও বেশ নতুন ধরনের দাঁড়িয়েছে। ভালো কথা, পোলাওতে তো কোনো মসলা দেওয়া হলো না। একটুখানি ধনেবাটা আছে, দিয়ে দিই ?

—দাও দাও—আমি তক্ষুনি সমর্থন করলুম : পোলাওকে ধনী—মানে রিচ করাই তো দস্তুর।

বেশি বলতে হলো না। তৎক্ষণাৎ তপন ওটাকে রিচ করে ফেলল।

—এইবার চাখো—একটা রাইস প্লেট নিয়ে তপন আমার জন্যে সব সাজাতে আরম্ভ করলে।

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলুম : বলছিলুম কি ফ্রাই থাক। ওটা বরং না-ই চাখলুম। আর পোলাওটাও—

—বাঃ, সে কি হয় ?—তপন ব্যথিত হলো : তোমার আইডিয়াতেই পোলাও করলুম—একটু না চাখলে চলে ? নাও, ধরো ধরো। এই যে—চামচে দিচ্ছি—

কী আর করা—নিতেই হলো আমাকে। যেই একটু পোলাও জিভে ঠেকিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে তার উৎকট স্বাদে গন্ধে নাকমুখ যেন বুজে উঠতে চাইল। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে গাঢ় লাল রঙের ঝোল থেকে একটা মাংসের টুকরোকে তুলতে গেছি—সেটা চামচের চাপে সোজা বুলেটের মতো প্লেট থেকে ছিটকে বেরুল। হাজার খণ্ডে বিভক্ত এবং ঝোলায়িত হয়েও সে আদিম ও অদমিত—একেবারে পাঁঠার গোঁ নিয়ে ছুটে গেল—ব্যা করে ডেকেও গেল কিনা কে জানে। এই সহস্র-মণ্ডিত অথচ বহুরূপে জীবন্ত পাঁঠাকে কিছুতেই কায়দা করা যাবে না জেনে আমি একটুখানি ঝোল মুখে তুলে নিলুম।

আর তক্ষুনি চীৎকার ছাড়তে হলো। তারস্বরে নয়—একেবারে কাছিস্বরে।

—আগুন—আগুন। মুখ জ্বলে গেল—আগুন—

ধাবন্ত পাঁঠা দেখেও তপন বিচলিত হয়নি, এবার ঘাবড়েই গেল একটুখানি।

—ঝাল হয়ে গেছে ব্ঝি? আমি ভাবল্ম গজাননবাব্ চিটাগাঙের লোক—তাই একট্ বেশি করে লংকাবাটা—

—রেখে দাও চিটাগাঙ। এই ঝোল খেলে গজানন একেবারে গাঙসই হয়ে যাবে। উঃ—আগ্ন—দাবানল—বাড়ব বহ্নি—ফায়ার ব্রিগেড—নানা—পায়েস—পায়েস—

—হাঁ-হাঁ-হাঁ—দিচ্ছি—

বিদ্যুৎবেগে একটা বাটিতে করে প্রায় তরল সাদা রঙের কী খানিকটা দিলে আমায়। এবং তাতে একটি মাত্র একটি চুম্ক দেবার পরেই—তড়াক করে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়ল্ম—একেবারে নালাটার ধারে। পেটের বত্রিশ নাড়ী একসঙ্গে 'চণ্ডালিকা'র কোরাস গাইতে লাগল : "পাক দে—পাক দে—পাক দে-এ-এ"! এবং গলা দিয়ে অন্নপ্রাশনের নয়, তারও আগের—মানে প্র্বজন্মের এক আধ দানাও কিছ্ যদি থাকে, সব 'হারে-রে-রে' করে বেরিয়ে আসতে লাগল।

আর তপন চাঁদি চুলকোতে চুলকোতে বলে চলল : ই-হি-হি, আমারই ভুল হয়ে গেছে। মাছটাছ কুটে সাবান দিয়ে হাতটা কখন পায়েসের গামলাতেই ধ্য়ে ফেলেছি, টেরও পাইনি!

আমি যখন খানিকটা সামলে নিয়েছি, তখন তপন বসে পড়েছে মাথায় হাত দিয়ে। ওর লেব্র আচারমার্কা ম্খটা লংকার আচারের মতো শীর্ণ এবং কর্ণ। একবার বিড়বিড় করে বললে, পোলাওটাও অন্তত খাওয়ানো যাবে না একট্খানি?

আমি জবাব দিল্ম : ক্ষেপে গিয়ে তোমায় কামড়ে দিতে পারেন গজানন।

—আর মাংসটা?

—শিং তুলে ওঁকে গ্ঁতিয়ে দেবে।

—তা হলে পায়েস?

না-না—ওতে আবার মাছ কেটে সাবান দিয়ে হাত ধ্য়েছি—ও চলবে না।

কিন্তু একট্খানি ফ্রাই? ট্রাই করলেই মারা যাবেন। এবং তাতে খ্ব সম্ভব তোমার ফাঁসি হবে।

তপন এবার ড্করে উঠল।

—কী হবে ভাই? প্রমোশন তো গেলই, কিন্তু লোকটা যে স্টেশনের কাছের ডাকবাংলো থেকে প্রো এক মাইল হেঁটে খেতে আসবে—তার কী করি? আর ন'টা প্রায় বাজে—আসতেও দেরি নেই।

অগত্যা নিজেকে বললুম, উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ। যেমন পায়েসই খাওয়াক—বন্ধু তো! এবং দুঃসময়ে বন্ধুকে বন্ধু না রাখিলে কে রাখিবে!

বললুম, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না—চুপচাপ বসে থাকো। নিজের রান্নাও খেতে পারো এক আধটুখানি। আমি তোমার গজাননকে দেখছি। কেবল তোমার রান্নাঘর থেকে একটা দরকারী জিনিস আমায় নিতে হবে।

তপনের বাড়ির সামনের ছোট কম্পাউন্ড, গেটের দু'ধারে গোটাচারেক বড় বড় আমগাছ। রাস্তার ইলেকট্রিক একটু দূরে—বেশ আলো-আঁধারি তৈরী হয়েছে খানিকটা। আমাকে মিনিট সাতেকের বেশি দেরি করতে হলোনা। বেশ হৃষ্ট গলায় গান শোনা যাচ্ছে : 'বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে'। অর্থাৎ গজাননবাবু আসছেন। নিদ তাঁর থাকবার কথা নয়—অচিরে একটি শর্ট আর শার্প কোর্সের সম্ভাবনা রয়েছে যখন! আমিও তৈরী হয়ে নিলুম।

প্রথমে আমগাছের আড়াল থেকে বললুম : গাঁ-গাঁ-গাঁ—গজানন চমকে থেমে বললেন, কে—কে ওখানে? এবারে সামনে বেরুতে হলো। সেই মুখোশটাকে—মানে তপনের সেই অয়েলমাস্ককে—ইলেকট্রিকের আলো-আঁধারিতে বিকশিত করে হাসলুম তপনের মতো : হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যা:—এবং ভারতীয় নাচের ছন্দে খানিকটা অগ্রসর হলুম গজাননের দিকে।

গজানন আকাশের দিকে একটা লাফ মারলেন, কেবল বললেন, ওরেঃ—! তারপরে যে গতিতে—যে রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি ছুটলেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল : এক মাইল দূরের ডাকবাংলো কেন, তিনশো মাইল দূরে কলকাতা পর্যন্ত না পৌঁছে তিনি আর থামছেন না! 'বন্ধুকে বন্ধু না রাখিলে রাখিবে কে?' আপনারাই বলুন।

বিমল কর

হৃদয় বিনিময়

আজ পাঁচ সাত বছর হয়ে গেল বটকৃষ্ণ পুজোর মুখে দেওঘর চলে আসছেন। জায়গাটা তাঁর খুবই পছন্দ হয়ে গিয়েছে, স্ত্রী নলিনীরও। এখানকার জল-বাতাসে নলিনীর শ্বাসের কষ্ট কম হয়, রাতের ব্যথাটাও সহ্যের মধ্যে থাকে। বটকৃষ্ণর নিজেরও খুচরো আধিব্যাধি বেশ চাপা পড়ে এখানে। দেওঘরে পাকাপাকিভাবে থাকার একটা ইচ্ছে বটকৃষ্ণর মনে মনে রয়েছে। ছেলেমেয়েদের জন্য হয়ে উঠছে না। তারা দেওঘরের নাম শুনলেই নাক মুখ কোঁচকায়। প্রথম প্রথম এক আধবার ছেলেমেয়েরা বটকৃষ্ণর সঙ্গে এসেছিল, এখন আর আসতে চায় না, বড় ছেলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে নৈনিতাল মুসৌরি রানীক্ষেত যায়, ছোট পালায় পাহাড়ে চড়া শিখতে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চিঠি লেখে: 'মা, তোমার জামাই একেবারে ছুটি পাচ্ছে না, পুজোয় আমরা কোথাও যাচ্ছি না।'

বটকৃষ্ণ অবশ্য কারও তোয়াক্কা করেন না। বাষট্টি পেরিয়ে গিয়েছেন, তবু নুয়ে পড়েননি; শরীর স্বাস্থ্য এ-বয়সে যতটা মজবুত থাকা দরকার তার চেয়ে এক চুল কম নেই। খান-দান, বেড়ান, নলিনীর সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করেন, শীতের মুখে ফিরে যান।

এবারে বটকৃষ্ণ তাঁর ভায়রা সত্যপ্রসন্নকে আসতে লিখেছিলেন। একটা উদ্দেশ্য অবশ্য বটকৃষ্ণর ছিল। ইদানীং দু-তিন বছর তিনি যে বাড়িটায় উঠছেন—সেটা বিক্রি হয়ে যাবার কথা। বটকৃষ্ণর মনে মনে ইচ্ছে বাড়িটা কিনে ফেলেন। বাংলো ধরনের ছোট বাড়ি, কিছু গাছপালা রয়েছে; পাশের দু-চারখানা বাড়ীও ভদ্রগোছের পরিবেশটা ভাল।

সত্যপ্রসন্ন বটকৃষ্ণর নিজের ভায়রা নন, নলিনীর মাসতুতো বোন মমতার স্বামী। বয়সে বছর ছয়েকের ছোট। পেশায় ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। বটকৃষ্ণর ইচ্ছে সত্যপ্রসন্নকে দিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে তার মতামত নেন, ভবিষ্যতে সামান্য কিছু অদলবদল করতে হবে—তারই বা কি করা যায়—সে পরামর্শও সেরে রাখেন। সত্যপ্রসন্ন মত দিলে—বটকৃষ্ণ বায়নাটাও করে রাখবেন।

সত্যপ্রসন্ন স্ত্রী মমতাকে নিয়ে দেওঘর এসেছেন গতকাল। তারপর পাক্কা ছত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেছে।

সন্ধ্যেবেলায় বাইরের দিকের ঢাকা বারান্দায় চারজন বসেছিলেন: বটকৃষ্ণ নলিনী, সত্যপ্রসন্ন আর মমতা।

ভায়রার হাতে চুরুট গুঁজে দিয়ে বটকৃষ্ণ বললেন, "সত্য, তোমার ওপিনিয়ানটা কী?"

সত্যপ্রসন্ন চুরুট জিনিষটা পছন্দ করেন না। তবু ধীরে-সুস্থে চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, "বাড়ি খারাপ নয়, একটা একস্ট্রা বাথরুম তৈরি করা, কিচেনটাকে বাড়ানো—এসব কোনো সমস্যাই নয়। কুয়োয় পাম্প বসিয়ে ছাদের ওপর ট্যাংকে জল তোলাও যাবে—কলটল, কমোড কোনোটাতেই আটকাবেনা। কিন্তু এত পয়সা খরচ করে এ-বাড়ি নিয়ে আপনি করবেন কী?"

বটকৃষ্ণ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "বাড়ি নিয়ে লোকে কী করে হে! আমরা থাকব।"

"পারবেন থাকতে বুড়োবুড়ীতে?"

"না পাবার কোনো কারণ দেখেছ? ছেলেমেয়েরা এখন সাবালক; বেকার নয়, খোঁড়া অন্ধ মাথা মোটা নয়, তাদের সংসার তারা করুক, আমরা বুড়োবুড়ীতে এখানে থাকব।"

মমতা বললেন, "এখন মুখে বলছেন জামাইবাবু, সত্যি কি আর তাই পারবেন? নন্তুর বিয়ে দেননি এখনও। বাড়িতে বউ এলে দিদিই কি এখানে থাকতে পারবে।"

বটকৃষ্ণ বললেন, "ছেলের বউ বড়, না আমি বড়—সেটা তোমার দিদিকেই জিগ্যেস করো।"

সাদা মাথা, সাদা খোলের লাল চওড়া পেড়ে শাড়ি, গোলগাল—ফরসা, বেঁটেখাটো মানুষটি একপাশে বসেছিলেন। মাথার কাপড় ঠিক করে নলিনী বললেন, "ছেলের সঙ্গে রেষারেষি করছ নাকি ?"

বটকৃষ্ণ চটপট জবাব দিলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে করলাম—তা তোমার ছেলে !"

মমতা হেসে উঠলেন।

সত্যপ্রসন্ন চুপচাপ থেকে খুঁতখুঁতে গলায় বললেন, "আপনার ওই পাশের বাড়ীর ভাবগতিক আমার ভালো লাগছে না, দাদা। সারাদিন দেখছি দুটো ছোঁড়াছুঁড়িতে যা করছে—একবার দোলনায় দুলছে, একবার রবারের চাকা নিয়ে খেলছে, এ ছুটছে তো ও পেছনে পেছনে দৌড়চ্ছে। দুপুরবেলায় দেখলুম ছুঁড়িটা আমতলায় জালের দোলনা বেঁধে শুয়ে শুয়ে নভেল পড়ছে—আর ছোঁড়াটা মাঝে মাঝে দোলনার নিচে বসে মেয়েটাকে ঢু মারছে। নাচ, গান, হল্লা তো আছেই। এ যদি আপনার নেবার হয় জ্বলেপুড়ে মরবেন।"

বটকৃষ্ণ বললেন, "তুমি আইভির কথা বলছ। জি. সেনের মেয়ে। আরে, ও তো আমার খুব পেট ? ওই ছেলেটি হল, পঙ্কজ। ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। ভেরি ব্রাইট। আইভির সঙ্গে লভে পড়েছে। দুটোই মাঝে মাঝে আমাদের কাছে আসে, নলিনীকে নাচায়।"

সত্যপ্রসন্ন কেমন থতমত খেয়ে গেলেন। ঢোক গিলে বললেন, "আপনি কি বলছেন, দাদা ? একে লাভ বলে ? ছাগলের মতন দুটোতে গুঁতোগুঁতি করছে ?"

বটকৃষ্ণ নিভন্ত চুরুটে অভ্যেসবশে টান দিয়ে বললেন, "গুঁতোগুঁতি তো অনেক ভাল। সত্য, তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং বোঝ, কিন্তু ভগবানের এই কলকব্জার কেরামতি কিছু বোঝ না। লভ্ হল আরথকোয়েক, বাসুকী কখন যে ফণা নাড়িয়ে দেয়, কিস্যু বোঝা যায় না।" ব'লে বটকৃষ্ণ চশমার ফাঁক দিয়ে নলিনীকে দেখলেন। রঙ্গরসের গলায় বললেন, "ও নলিনী, তোমার ভগিনীপোত ওই ছেলেমেয়ে দুটোর গুঁতোগুঁতি দেখছে। ওকে একবার তোমার লভ্ করার গল্পটা শুনিয়ে দাওনা। ব্যাপারটা বুঝুক।"

নলিনী অপ্রস্তুত। লজ্জা পেয়ে বললেন, "মুখে কিছু বাধে না। ভীমরতি। বুড়ো বয়সে আর রঙ্গ করতে হবে না।"

বটকৃষ্ণ বললেন, "রঙ্গ করব না তো করব কি! তোমার সঙ্গে রঙ্গ করলাম বলেই না বত্রিশটা বছর সঙ্গ পেলাম।"

মমতা হেসে বললেন, "জামাইবাবুর কি বত্রিশ হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ ভাই বত্রিশ হয়ে গেল। ইচ্ছে ছিল গোল্ডেন জুবিলি করে যাব। ততটা দূরদর্শী হতে ভরসা পাচ্ছি না। গোল্ডেনের এখনও আঠারো বছর।"

মমতা বললেন, "ভগবান করেন আপনাদের গোল্ডেনও হোক। আমরা সবাই এসে লুচি-মণ্ডা খেয়ে যাব। কিন্তু এখন আপনার বিয়ের গল্পটা বলুন, শুনি।"

সত্যপ্রসন্নর ধাত একটু গম্ভীর। চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন।

বটকৃষ্ণ নলিনীকে বললেন, "তোমার নিতাইপ্রভুকে ডাকো, একটু চা দিতে বলো।" বলে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। একটু পরে বললেন, "আহা কি খাসাই লাগছে! সত্য কেমন একটু শীতশীত পড়েছে দেখেছ! এই হল হেমন্তকাল। দেবদারু গাছের গন্ধ পাচ্ছ তো! বাড়ির সামনে দুটো দেবদারু গাছ। তার মাথার ওপর দিকে তাকাও, ওই তারাটা জ্বলজ্বল করছে, সন্ধ্যেতারা। এমন একটা বাড়ি কি ছেড়ে দেওয়া ভাল হবে সত্য? কিনেই ফেলি—কি বলো? কিনে তোমার দিদিকে প্রেজেণ্ট করে দি, বত্রিশ বছরের হৃদয়অর্ঘ্য।"

নলিনী তার সোনার জল ধরানো গোল গোল চশমার ফাঁক দিয়ে স্বামীকে দেখতে দেখতে বললেন, আমায় দিতে হবে না, তোমার জিনিষ তোমারই থাক।"

বটকৃষ্ণ বললেন, "আমার তো তুমিই আছ। তুমি থাকতে আমার কিসের পরোয়া। তোমার অমন জাঁদরেল বাবা, আমার শ্বশুরমশাইকে পর্যন্ত আমি তোমার জোরে কব্জা করে ফেললাম, আমার ভয়টা কিসের?"

মমতা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন, "আমি চায়ের কথা বলে আসছি। জামাইবাবু আপনার বিয়ের গল্পটা কিন্তু আজ শুনব। শুনেছি, আপনি নাকি বিয়ের আগে অনেক কীর্তি করেছেন!"

নলিনী বললেন, "তুই আর ধুনোর গন্ধ দিস না বাপু, এমনিতেই মরছি—।"

বটকৃষ্ণ বললেন, "আমায় গন্ধ দিতে হয় না। আমি গন্ধমাদন।"

সত্যপ্রসন্নও হেসে ফেললেন।

চা খেতে খেতে বটকৃষ্ণ মমতাকে বললেন, "আমার বিয়ের গল্পটা

হ্যালফিলের নয় ভাই। তোমার কত বয়স হল, পঞ্চাশ-টঞ্চাশ বড়জোর। তুমি খানিকটা বুঝবে। আমার যখন পঁচিশ বছর বয়েস—তখন অষ্টম এডওয়ার্ড প্রেমের জন্য রাজত্বই ছেড়ে দিলেন। ব্যাপারটা বোঝ, এতবড় বৃটিশ রাজত্ব—যেখানে কথায় বলে সূর্যাস্ত হয় না—সেই রাজত্ব প্রেমের জন্য ছেড়ে দেওয়া। তখন প্রেম-ট্রেম ছিল এই রকমই পাকাপোক্ত ব্যাপার। তা আমি তখন একরকম ভ্যাগাব্যান্ড। লেখাপড়া শিখে একবার রেল একবার ফরেস্ট অফিসে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছি, কোথাও ঠিক ঢু মেরে ঢুকতে পারছি না। আমার বাবা বলছেন, ল' পড়। আমি বলছি—কভ্‌ভি নেহি। মাঝে মাঝে ছেলে পড়াই। এই করতে করতে এসে পড়লাম আসানসোলে। একটা চাকরি জুটল, মাইনে চল্লিশ। সেখানে তোমার দিদিকে দেখলাম। বছর ষোলো সতেরো বয়েস, রায়সাহেব করুণাময় গুহর বাড়ির বাগানে কুমারী নলিনী গুহ একটা সাইকেল নিয়ে হাফ প্যাডেল মারছে, পড়ছে, উঠছে, আবার পড়ছে। এখন হংস ডিম্বের মতন তোমার যে দিদিটিকে দেখছ—তখন তিনি এই রকম ছিলেন না—কচি শসার মতন, লিকলিকে ফিনফিনে ছিলেন………।"

নলিনী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন, "তবু রক্ষে শসা বলেছ, ঢেঁড়স বলোনি।"

মমতা হেসে উঠলেন। সত্যপ্রসন্ন চুরুটে আরাম পাচ্ছিলেন না। চুরুট ফেলে দিয়ে সিগারেট ধরালেন।

বটকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, "ঢেঁড়স লম্বার দিকে বাড়ে, তুমি ওদিকটায় পা মাড়াও নি। তাবলে কি তুমি দেখতে খারাপ ছিলে। মাথায় একটু ইয়ে হলেও লিকলিকে লাউ ডগার মতন খুব তেজী ছিলে। নয়ত আমি যেদিন ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার সাইকেল থেকে পতন দেখলাম—সেদিন শাড়ি সামলে উঠে দাঁড়িয়ে আমায় জিবও ভেঙাতে না, হাত তুলে চড়ও দেখাতে না।"

মমতা হেলে দুলে খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বয়েসে গলা মোটা হয়ে গিয়েছে—খিল খিল হাসিটা মোটা মোটা শোনাল।

"দিদি তুমি চড় দেখিয়েছিলে?"

নলিনী বললেন, "দেখাব না! লোকের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অসভ্যতা করা। আবার দাঁত বের করে হাসা হচ্ছিল!"

"তা কি করব—" বটকৃষ্ণ চায়ের পেয়ালায় বড় করে চুমুক দিলেন। "তুমিই বলো মমতা, দাঁতটা যত সহজে বার করা যায়, হৃদয়টা তো তত সহজে

বার করা যায় না। যদি দেখানো যেত, আমি একেবারে সেই মুহূর্তে দেখিয়ে দিতাম—তোমার দিদি আমার হৃদয় ফাটিয়ে দিয়েছে।"

সত্যপ্রসন্নর মতন গম্ভীর মেজাজের লোকও এবারে হেসে ফেললেন। হয়ত মুখে চা থাকলে বিষম লেগে যেত। মমতাও হাসছিলেন। বটকৃষ্ণ ধীরে সুস্থে তাঁর নিভন্ত চুরুট আবার ধরিয়ে নিলেন। বললেন, "প্রথম দর্শনে প্রেম—লভ্ অ্যাট ফার্স্ট সাইট যাকে বলে—আমার তাই হল। পা আর নড়তে চায়না। চক্ষু আর পলক ফেলেনা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এমন সময় রায়সাহেব করুণাময় গুহর বাড়ির এক নেড়ি কুত্তা ফটকের কাছে এসে চেল্লাতে লাগল। তার চেল্লানির চোটে বাড়ির লোক জমে যাবার অবস্থা। আমি আর দাঁড়ালাম না ভয়ে।"

নলিনী বললেন, "আমার বাবা নেড়ি কুকুর পোষার লোক নয়। ওটা খাস অ্যালসেসিয়ান। নাম ছিল কাইজার।"

বটকৃষ্ণ মিটমিটে চোখ করে বললেন, "খাস নেড়িও নয়, তাদের তেজও কম নয়। সে যাক গে, তখনকার মতন তো পালালাম। কিন্তু চোখের সামনে সেই কাঁচ শশা দুলতে লাগল; কুকুরের মুখের ডগায় মাংস ঝুলিয়ে তাকে দৌড় করালে যেমন হয়—আমাকেও সেই রকম আড়াই মাইল দৌড় করিয়ে শশাটা বিছানায় ধপাস করে ফেলে দিল।"

সত্যপ্রসন্ন বললেন, "আড়াই মাইল কেন ?"

বটকৃষ্ণ বললেন, "আড়াই মাইল দূরে একটা মেসে আমি থাকতাম। মেসে গিয়ে সেই যে শুলাম—আর উঠলাম না। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল সত্য। তোমার বড় শালী চোখের সামনে সাইকেল চড়তে লাগল। আর বার বার দেখতে লাগলাম সেই জিব ভেংচানো, চড় মারার ভঙ্গি। কালিদাস খুব বড় কবি, কিন্তু তিনি যদি একবারও রাজা দুষ্মন্তকে দিয়ে চড় দেখাতেন কিংবা জিব দেখাতেন, কাব্যটা তবে আরও জমত। ···আমার হল ভীষণ অবস্থা, সারাক্ষণ ওই একই ছবিটা দেখি। ঘুম গেল, খাওয়া গেল, অফিসের কাজকর্মও গেল। পাঁচের ঘরের নামতাটা ভুলে গিয়ে পাঁচ পাঁচে পঁয়ত্রিশ লিখে ফেললুম হিসেবে। মুখুজ্যেবাবু বললেন, তোমাকে দিয়ে হবে না।······তা অত কথার দরকার কি ভাই, রোজনামচা লিখতে বসিনি। সোজা কথা, প্রেমে পড়ে গেলুম তোমার বড় শালীর। কিন্তু থাকি আড়াই মাইল দূরে, সাইকেল ঠেঙিয়ে প্রেমিকাকে দেখতে আসা বড় কথা নয়, বড় কথা হল—এলেই তো আর দেখতে পাবনা। রায়সাহেব সশরীরে রয়েছেন, রয়েছে কাইজার, লোহার ফটক, বাড়ির লোকজন।

তবু রোজ একটা করে গুড়ের বাতাসা মা কালীকে মানত করে রায়সাহেবের বাড়ির দিকে ছুটে আসতুম। এক আধদিন দেখা হয়ে যেত, মানে দেখতুম—বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রেমিকা আমার ধোপার সঙ্গে কথা বলছে, কিংবা বাড়ির বাগানে ঘুরে ঘুরে পাড়ার কোনো মেয়ের সঙ্গে হি হি করছে। আমায় ও নজরই করত না। ···আমার নাম বটকৃষ্ণ দত্ত। বটবৃক্ষের মতন আমার ধৈর্য, আর কৃষ্ণের মতন আমি প্রেমিক। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন করে লেগে থাকলুম আমি। শেষে একদিন, 'কণ্ঠহার' বলে একটা বায়োস্কোপ দেখতে গিয়ে চারি চক্ষুর মিলন এবং দুপক্ষেরই হাসি-হাসি মুখ হল। হাফ টাইমে বেরিয়ে স্যাট করে দুঠোঙা চিনেবাদাম কিনে ফেললুম। অন্ধকারে ফিরে আসার সময় একটা ঠোঙা কোলে ফেলে দিয়ে এলুম শ্রীমতীর। লভের ফার্স্ট চ্যাপ্টার শুরু হল।"

মমতা পায়ের তলায় চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন। হেসে হেসে মরে যাচ্ছেন বটকৃষ্ণর কথা শুনতে শুনতে। নলিনী আর কি বলবেন, ডিবের পান জর্দা মুখে পুরে বসে আছেন।

বটকৃষ্ণ কয়েক মুহূর্ত সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বোধ হয় ফটকের সামনে দেবদারু গাছের মাথা ডিঙিয়ে তারাটা লক্ষ্য করলেন, তারপর গলা পরিষ্কার করে স্ত্রী এবং শালীর দিকে তাকিয়ে রঙ্গের স্বরে বললেন, "থিয়েটার দেখেছ তো ফার্স্ট অ্যাক্টের পর সেকেণ্ড অ্যাক্ট তাড়াতাড়ি জমে যায়। আমাদেরও হল তাই। নলিনী বিকেল পাঁচটায় চুল বাঁধতে বাঁধতে বারান্দায় এসে দাঁড়াত, কোনোদিন বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে থাকত, ফটকের সামনে এসে কুলপি মালাই ডাকত। আমি দুদ্দাড় দৌড়ে সময়মতন হাজির থাকতাম রাস্তার উল্টো দিকে। চোখে চোখে কথা হত, হাসি ছোঁড়াছুঁড়ি করে হৃদয় বিনিময়। রায়সাহেবের বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢোকার সাহস আমার ছিল না। নলিনীরও সাধ্য ছিল না আমায় ভেতরে ডাকে। আজকাল ছেলেমেয়েরা কত সহজ—ফ্রি, লভারের হাত ধরে বাপের কাছে নিয়ে যায়—বলে, আমার বন্ধু। বাবারাও আর রায়সাহেবের মতন হয় না। রায়সাহেব—মানে আমার ভূতপূর্ব শ্বশুরমশাই—ভূতপূর্ব বলছি এইজন্য যে তিনি এখন বর্তমান নেই—যে কী জাঁদরেল মানুষ ছিলেন তোমরা জান না। সেকেলে রেলের অফিসার। ফার্স্ট ওয়ারে নাকি লড়াইয়ে গিয়েছিলেন, বেঁটে চেহারা, রুদ্দামারা ঘাড়, মাথার চুল কদম ছাঁট করা, তামাটে গায়ের রঙ, চোখ দুটো বাঘের মতন জ্বলত। গলার স্বর ছিল যেন বজ্রনিনাদ।

নলিনী আবার ঝাপটা মেরে বললেন, "আমার বাবার নিন্দে করো না বলছি। যে মানুষ স্বর্গে গিয়েছেন তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা!"

হাত মাথা নেড়ে বটকৃষ্ণ বললেন, "নিন্দে কোথায় করছি, গুণগান গাইছি। আচ্ছা ভাই মমতা, তুমি ছেলেবেলায় এক-আধবার তোমার মেসোমশাইকে দেখেছ তো? আমি যা বলছি তা কি মিথ্যা! রায়সাহেব করুণাময়কে দেখলে কি মনে হত না গাদা বন্দুক তোমার দিকে তাক করে আছেন। বাবারে বাবা সে কি কড়া লোক, সাহেবী ডিসিপ্লিনে মানুষ—ফাজলামি করবে তাঁর সঙ্গে! চাকরি থেকে রিটায়ার করার পরও বড় বড় রেলের অফিসাররা খানাপিনায় তাঁকে ডাকত। আমি যখনকার কথা বলছি—তখন তিনি রিটায়ার করে গিয়েছেন, করে একটা ভাড়া করা বাড়ি নিয়ে থাকেন। প্রচণ্ড খাতির, লোকে ভয় পায় বাঘের মতন, বলত কেঁদো বাঘ। সেই বাঘের বাড়িতে কোন সাহসে আমি ঢুকব বলো! এদিকে আমার যে হৃদয় যায় যায় করছে। রোজ অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর; ঘুম হয়না, খাওয়ায় রুচি নেই, দুঃস্বপ্ন দেখছি রোজ। শেষে তোমাদের ওই দিদি নলিনী একদিন ইশারা করে আমায় বাড়ির পেছন দিকে যেতে বলল।"

বাধা দিয়ে নলিনী বললেন, "মিথ্যা কথা বলো না। আমি তোমায় কিছু বলিনি; তুমিই একদিন এক টুকরো কাগজে কী লিখে ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়েছিলে!"

বটকৃষ্ণ বাধ্য ছেলের মতন অভিযোগটা মেনে নিয়ে বললেন, "তা হতে পারে। একে বলে স্মৃতিভ্রংশ। বুড়ো হয়ে গিয়েছি তো!"

"সুবিধে বুঝে একবার বুড়ো হচ্ছে, আবার জোয়ান হচ্ছে।" নলিনী বললেন।

মমতা বললেন, "তারপর কী হল বলুন? বাড়ির পেছনে কী ছিল?"

বটকৃষ্ণ বললেন, "রায়সাহেবের বাড়ির পেছনদিকে ছিল ভাঙা পাঁচিল, কিছু গাছপালা—বাতাবিলেবু, কুল, কলকে ফুল এই সবের খানিকটা ঝোপঝাড় ছিল। আর বাড়িঅলা সত্য সাঁইয়ের সে আমলের একটা ভাঙা লরি। লরির চাকা-টাকা ছিল না, পাথর আর ইঁটের ওপর ভাঙা লরিটা বসান ছিল। আমরা সেই ভাঙা লরির ড্রাইভারের সিটে আমাদের কুঞ্জবন বানিয়ে ফেললাম। তোমায় কি বলব মমতা, যত রাজ্যের টিকটিকি গিরগিটি পোকা-মাকড় জায়গাটায় রাজত্ব বানিয়ে ফেলেছিল। দু-চারটে সাপখোপও যে আশে-পাশে ছিলনা তা নয়। কিন্তু প্রেম যখন গনগন করছে তখন কে

ও-সবের তোয়াক্কা রাখে। ভয়তো সব দিকেই ছিল—রায়সাহেবের করুণাময় একবার যদি ধরতে পারেন হান্টার চালিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেবেন, বিন্দুমাত্র করুণা করবেন না। তা ছাড়া রয়েছে নলিনীর বোন যামিনী। আর এক যন্ত্রণা। ওদিকে ছিল কালু—বাচ্চা হলে হবে কি রাম বিচ্ছু। তার ওপর সেই নেড়ি কাইজার। রোজ চার ছ' আনার ওগ্ বিস্কুট নিয়ে যেতাম পকেটে করে। তাতেও ভয় যেত না। বিস্কুট খেলেই কুকুর মানুষ হয় না। বিপদে পড়তে পারি ভেবে বোন রুটির মধ্যে আফিঙের ডেলা মিশিয়ে পকেটে রাখতাম।

সত্যপ্রসন্ন আবার একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, "কুকুরকে আফিঙের নেশা করালেন? এরকম আগে কই শুনি নি।"

"শুনবে কোথা থেকে হে," বটকৃষ্ণ বললেন, "আমার মতন গাদা বন্দুকের নলের মুখে বসে কোন ব্যাটা প্রেম করেছে? আমি করেছি। লরির মধ্যে বসে, কাইজারকে ডগ্ বিস্কুট খাইয়ে—রাজ্যের পোকামাকড়ের কামড় খেতে খেতে পাক্কা একবছর। গরম গেল, বর্ষা গেল, বসন্ত গেল—প্রেমের রেলগাড়ি চলতেই লাগল, যখন তখন উল্টে যাবার ভয়। তোমার নলিনী দিদির আজ এরকম দেখছ; কিন্তু তখন যদি দেখতে কী সাহস, কত বুদ্ধি। কত রকম ফন্দি ফিকির করে—ছোট বোনকে হরদম কৃমি-বিনাশক জোলাপ খাইয়ে, ছোট ভাইকে দু-এক আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে অভিসার করতে আসত। মেয়েছেলে হয়ে টিকটিকিকে ভয় পায়না এমন দেখেছ কখনও? তোমার দিদি সে ভয়ও পেত না। আমরা দুজনে লরির মধ্যে বসে ফিসফাস করে কথা বলতাম, হাতে হাত ধরে বসে থাকতাম, মান করতাম, মান ভাঙাতাম। বার কয়েক ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। একবার তো রায়সাহেব হাতে-নাতে ধরে ফেলতেন—শুধু তাঁর চশমাটা চোখে ছিল না বলে বেঁচে গিয়েছি।"

নলিনী মাথার কাপড়টা ঠিক করে নিলেন আবার, টিপ্পনী কেটে বললেন, "যা সিঁধেল চোর, সারা গায়ে তেল মেখে আসতে। তোমায় কে ধরবে!"

মমতা একটু গুছিয়ে বসলেন। তাঁর শরীর বেদম ভারী নয়। তবু বেতের চেয়ারটা শব্দ করে উঠল।

বটকৃষ্ণ চুরটটা আবার জ্বালিয়ে নিলেন। পাশের বাংলোয় আইভিরা গ্রামোফোন বাজাতে শুরু করেছে।

বললেন, "নাটকের সেকেন্ড অ্যাক্ট এই ভাবে শেষ হয়ে গেল; ভাঙা লরিতে বসে—কাইজারকে ডগ্ বিস্কুট আর মাঝে আফিং রুটি খাইয়ে। এমন

সময় মাথার ওপর বজ্রাঘাত হল। নলিনী বলল, রায়সাহেব কারমাটারে যে বাড়ি তৈরী করেছেন নতুন, সেখানে হাওয়া বদলাতে যাবেন। পুরো শীতটা থাকবেন। আর সেখানেই নাকি কে আসবে নলিনীকে দেখতে। ভেবে দেখো ব্যাপারটা। একে নলিনী থাকবে না, তায় আবার কে আসবে মেয়ে দেখতে। নলিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আমি বুক চাপড়াই। আজকালকার দিন হলে অন্য কথা ছিল—ইলোপ করে নিয়ে যেতাম নলিনীকে। সেটা তো সম্ভব নয়। আর রায়সাহেবের করুণাময় গুহর বাড়ি থেকে মেয়ে বার করে নিয়ে যাবার হিম্মৎ কার আছে।···আমরা দুটি যুবক যুবতী তখন অকূল পাথারে ভাসছি। এক একবার মনে হত—অ্যারারুটের সাথে ধুতরা ফলের বিচি মিশিয়ে খেয়ে ফেলি। তাতে কি হত সেটা অবশ্য জানতাম না। নলিনী কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে গেল, নলিনী মুদিল আঁখি। আর আমার তো সবদিকেই শ্মশান—খাঁ খাঁ করছে।··· এমন অবস্থায় নলিনী হঠাৎ একদিন এক বুদ্ধি দিল—মেয়েরা ছাড়া কোনো বুদ্ধি কেউ দিতে পারেনা। পুরাণে আছে—লক্ষ্মী বুদ্ধি দিয়েছিল বলে দৈত্যরা স্বর্গ জয় করতে পারেনি। যতরকম কূট, ফিচেল, ভীষণ ভীষণ বুদ্ধি জগৎ সংসারে মেয়েরাই দেয়।"

নলিনী আর মমতা দুজনেই প্রবল আপত্তি তুললেন, "সব দোষ মেয়েদের তোমরা আর ভাজা মাছ উল্টে খেতে জাননা ?"

বটকৃষ্ণ হেসে বললেন, "মাছ ভাজা হলে আমরা খেতে জানি। কিন্তু মাছটা ভাজে কে ? মেয়েরা। ও কথা থাক, তবে এটা তো সত্যি কথা—নলিনী যদি বুদ্ধিটা না দিত—আমার চোদ্দপুরুষের সাধ্য ছিল না অমন একটা মতলব মাথায় আসে।"

মমতা বললেন, "বুদ্ধিটা কী ?"

"বলছি। রায়সাহেব করুণাময়ের হৃদয়ে অন্য কোন করুণা না থাকলেও মানুষটির কয়েকটি বিগ্ বিগ্ গুণ ছিল। ভেরী অনেষ্ট, কথার নড়চড় করতেন না—হ্যাঁ তো হ্যাঁ—না তো না। তোষামোদ খোসামোদ বরদাস্ত করতেন না একেবারে। আর ভদ্রলোকের সবচেয়ে বেশী দুর্বলতা ছিল সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর। গেরুয়া দেখলেই কাত, হাত তুলে দুবার হরিনাম করলেই করুণাময়ের হৃদয়ে করুণার নির্ঝর নেমে আসত। নলিনী আমার হাত ধরে বলল একদিন, "সোনা—তুমি সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাও।"

মমতা হেসে বললেন, "ও, মা সেকি কথা, দিদি আপনাকে সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যেতে বলল ?"

নলিনী বললেন, "তুই ওসব বানানো কথা শুনিস কেন? সবই দিদি বলছে, আর উনি গোবর গণেশ হয়ে বসে আছেন, ঘটে বুদ্ধি খেলছে না।"

বটকৃষ্ণ বনেদী বাড়ির আওয়াজের মতন বার দুই কাশলেন, তারপর বললেন, "আমার ঘটে বুদ্ধি খেলেনি—তা তো আমি বলিনি। তুমি আমায় সোনা লক্ষ্মী দুষ্টু এইসব করে গলিয়ে শেষে বেকায়দা বুঝে গেরুয়ার লাইনে ঠেলে দিয়ে পালাতে চেয়েছিলে। তা আর আমি বুঝি নি—"

নলিনী বোনকে বললেন, "কথার ছিরি দেখছিস?"

"তোমার দিদি আমায় পথে ভাসাচ্ছে দেখে—বুঝলে ভাই মমতা, আমার বুদ্ধির ঘট নড়ে উঠল। লোকে দত্তদের কি যেন একটা গালাগালি দেয়—আমি হলাম সেই দত্ত। ভেবে দেখলাম—রায়সাহেব করুণাময়কে বাগাতে হলে গেরুয়ার লাইন ছাড়া লাইন নেই। ওই রন্ধ্র পথেই ঢুকতে হবে। নলিনীকে বললাম, "ঠিক আছে, তোমরা কারমাটারে যাও—আমি আসছি।" নলিনী আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি এসো লক্ষ্মীটি, আমি তোমার জন্য হাঁ করে চেয়ে থাকব।"

সত্যপ্রসন্ন এবার বেশ জোরে হেসে উঠলেন। "দাদা কি সত্যি সত্যিই সাধু সন্ন্যাসী হলেন?"

বটকৃষ্ণ চুরুটের ছাই ঝেড়ে আবার সেটা ধরিয়ে নিলেন। বললেন, "নাটকের সেটাই তো ভাই থার্ড অ্যাক্ট। তোমার দিদিরা কারমাটারের নতুন বাড়িতে চলে গেল। রায়সাহেবের সেই নেড়ি কুকুরটা পর্যন্ত। আমার চোখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু পুরুষ মানুষ আমি—যোগী হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন? শাস্ত্রে বলেছে—কর্ম আর উদ্যোগের দ্বারাই পৌরুষের বিচার। আমিও হাত পা ঝেড়ে উঠে বসলাম।"

মমতা, "কী করলেন?"

বটকৃষ্ণ বললেন, "লোকে মা বাপ মরলে মাথা নেড়া করে। আমি তোমার দিদিকে পাবার আশায়, আর করুণাময়ের করুণা উদ্রেকের জন্য মাথা নেড়া করলাম, টকটকে গেরুয়া বসন পরলাম—আর একটা পকেট সংস্করণ গীতা আলখাল্লার পকেটে ঢুকিয়ে একদিন পৌষমাসের সকালে কারমাটার স্টেশনে নামলুম। চোখে একটা চশমাও দিয়েছি, গোলগোল কাচ, চশমার ফ্রেমটা নিকেলের। চেহারাটা আমার ভগবানের কৃপায় মন্দ ছিল না, তাছাড়া তখন কাঁচ বয়স, ড্রেসটা আমায় যা মানিয়েছিল—না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না।...তা কারমাটার স্টেশনে নেমে একটু খোঁজ খবর করে খানিকটা এগুতেই দেখি—আমার নলিনী মর্নিং

ওয়াক করতে বেরিয়েছে। দেখে চক্ষু সার্থক হল। কে বলবে এই নলিনী সেই নলিনী। পনেরো বিশ দিনেই দেখি ওর মুখ চোখের রঙ ফিরে গিয়েছে। সেকালের মেয়েরা আজকালকার মতন করে শাড়ি জামা জুতো পরত না। এই ফ্যাশানটাও ছিল না। নলিনী পার্শি ঢঙে শাড়ি পরেছে; গায়ে গরম লং কোট; মাথায় স্কার্ফ, পায়ে মোজা আর নাগরা জুতো। নলিনীর সঙ্গে বাড়ির ঝি নিত্যবালা। কাছাকাছি আসতেই নলিনী দাঁড়িয়ে পড়ল, একেবারে থ। তার চোখের পলক আর পড়তে চায় না। এদিকে পৌষ মাসের ওই ভোরের শীতে আমার অবস্থা কাহিল। একটা করকরে র‍্যাপার ছাড়া আর কোনো শীতবস্ত্র নেই। গায়ে অবশ্য তুলো ধরানো গেঞ্জি রয়েছে। কিন্তু তাতে শীতকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। দিদিমণিকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে নিত্যবালা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নলিনী কথা বলতে পারছে না। আমিও চুপচাপ। একটা কথা বলি—নলিনীদের বাড়ির কেউ আমাকে চিনত না। চোখে দেখে থাকবে—কিন্তু তেমন করে নজর করে নি। তার ওপর আমায় নেড়া মাথা সন্ন্যাসীর বেশে চেনা মুশকিল। নলিনী চোখের ইশারায় আমায় মাঠ ভেঙে সোজা চলে যেতে বলল। বলে সে নিত্যকে নিয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল।"

মমতা ঠাট্টা করে বললেন, "দিদি আপনাকে দেখে কেঁদে ফেলেনি তো?"

সত্যপ্রসন্ন আবার সিগারেট ধরালেন, "তারপর কী হল?"

বটকৃষ্ণ বললেন, "তারপর আমি সোজা করুণাময়ের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। নতুন বাড়ী করেছেন রায়সাহেব, শৌখিন ছোট্ট বাড়ী, তখনও সব কাজ শেষ হয় নি, জানালা দরজায় সদ্য রঙ হয়েছে; বাড়ির বাইরে রঙ পড়ছে। চুনের গন্ধ, রঙের গন্ধ। তবে সত্য, জায়গাটি সত্যিই চমৎকার। রায় সাহেব বাড়ীর মধ্যে কাইজারকে নিয়ে পদচারণা করছিলেন। কাঠের নতুন ফটকের সামনে আসতেই কাইজার বেটা হাউ হাউ করে তেড়ে এলো। কিন্তু আমার পকেটে তো তখন ডগ্ বিস্কুট নেই, আফিং দেওয়া বান্ রুটিও নয়। কাইজারের তাড়ায় গেটের সামনে থেকে পিছিয়ে এলুম। রায় সাহেবের চোখ পড়ল। তিনি একটা ঢোললা পাজামা, গায়ে জব্বর ওভারকোট পরে, গলায় মাফলার জড়িয়ে পায়চারি করছিলেন। আমায় দেখে এগিয়ে এলেন। কাইজারকে ধমক দিয়ে বললেন: ডোণ্ট সাউন্ড। তাঁর এক ধমকে কাইজার লেজ নাড়তে লাগল। রায় সাহেব আমায় কয়েক মুহূর্ত দেখলেন, মানে নিরীক্ষণ করলেন। আপাদমস্তক, সেই সার্চ লাইটের মতন চোখের দৃষ্টিতে আমি ভেতরে ভেতরে কাঁপতে লাগলাম। অবশ্য শীতটাও ছিল প্রচণ্ড। শেষে রায় সাহেব বললেন, কি চাই?...আমি

বললুম, কিছু না। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, নতুন বাড়ীটা দেখে চোখ জুড়লো, তাই দেখতে এসেছিলাম। বাড়ীটি বড় চমৎকার। রায় সাহেব তোষামোদে খুশী হবার লোক নয়, কিন্তু বউ বাড়ী আর গাড়ীর গুণগান গাইলে পুরুষ মানুষে খুশী হয়। রায় সাহেব বললেন, আচ্ছা ভেতরে আসুন। আমি হাত জোড় করে বললাম, আমায় আপনি বলবেন না, বয়স্ক প্রবীণ লোক আপনি—আমি লজ্জা পাবো।

ভেতরে এসো। তোমার তো শীত ধরে গেছে—এসো এক কাপ গরম চা খেয়ে যাও। রায় সাহেব কাঠের ফটক খুলে ধরলেন।

মমতা হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, "আপনার তো পোয়া বার হল।"

বটকৃষ্ণ বললেন, "তা আর বলতে। রায় সাহেব তো জানতেন না কোন রন্ধ্র পথে আমি ঢুকতে চাইছি। একেই বলে ভাগ্য। ভাগ্য যদি দেয় তুমি রাজা ; না দিলে ফকির। অমন জাঁদরেল রায় সাহেব আমায় বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চা এল, চা খেতে খেতে বললেন : তোমার বয়স কত হে ? বললাম, ছাব্বিশ শেষ হয়েছে। উনি বললেন, "তা এই বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছ কেন ?"

বললাম, "বয়স কি বৈরাগ্যকে আটকায়। গৌতম বুদ্ধ কোন বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন ? তীর্থংকর কখন করেছিলেন ? মহাপ্রভু কোন বয়সে সংসার ত্যাগ করেছিলেন তা তো আপনি জানেন !"

রায় সাহেব আমার মুখের দিকে দুদণ্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, "বুঝেছি। তা এখন কদিন এখানেই থাক। পরে আমি দেখছি।"

সত্যপ্রসন্ন বললেন, "বলেন কি দাদা, সোজাসুজি আপনাকে থাকতে বললেন।"

"বললেন" মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন বটকৃষ্ণ। "বলেছি না—গেরুয়াতে রায় সাহেবের হৃদয় গলত। তাছাড়া উনি সন্দেহ করেছিলেন—আমি কোন কারণে বাড়ী থেকে পালিয়ে সাধু-সন্ন্যাসী সেজেছি।"

নলিনী বোনকে বললেন, "জানিস মনো, আমাদের কারমাটারে বাড়ীর দশ আনা হয়েছে মাত্র—ছ' আনা তখনও বাকি। দোতলার মাত্র দুটো ঘর হয়েছে, একটায় থাকত বাবা, আর অন্যটায় মা, যামিনী, কালু। নিচের তলায় একটা মাঝারি ঘরে থাকতুম আমি। নিচেই ছিল রান্না, ভাঁড়ার, বসার ঘর।—তবু কোথাও কোথাও কাজ বাকি থেকে গেছে। বাবা ওকে নিচের তলায় বসার ঘরটা থাকতে দিল।" বটকৃষ্ণ বললেন, "তোমার বাবার মতন সদাশয় মানুষ আর হয় না। থাকতে দিলেন বটে কিন্তু চারদিক থেকে গার্ড করে দিলেন। সকালে রায়

সাহেব নিজে এসে আমার ধর্মে কতটা মতি তা বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করতেন। ভীষণ ভীষণ প্রশ্ন করতেন ; রামায়ণ মহাভারত থেকে গীতা পর্যন্ত। খ‍ুঁচিয়ে খ‍ুঁচিয়ে জানবার চেষ্টা করতেন আমি কে—কোথা থেকে এসেছি—কেন সংসার ত্যাগ করেছি ? সকালে আমাকে ধরাশায়ী করে তিনি বেরিয়ে যেতেন। তিনি বেরিয়ে গেলে আসত ভবিষ্যৎ শ্যালিকা যামিনী আর শ্যালক কালু। ওরা এসে বলত, লুডো খেল, কিংবা বলত, মাথা নিচু পা উঁচু করে তপস্যা করে… দেখাও ; না হয়…দুটো বেয়াড়া অংক এনে বলত, করে দাও। দুপুরবেলা আমার শাশুড়ী পেঁপে সেদ্ধ, কাঁচকলা সেদ্ধ ডাল সেদ্ধ দিয়ে ভাত খাওয়াতেন। রায় সাহেব কারমাটারের সস্তা মুরগীর ঝোল টানতেন। পক্ষিক চাকর, নিত্যঝি এরাও আমাকে চোখে চোখে রাখত। সন্ধ্যেবেলা রায় সাহেব আবার একদফা গোয়েন্দাগিরি করতে বসতেন। রাত্রে কাইজারকে ছেড়ে রাখা হত নিচের তলায়।

ভেবে দেখো অবস্থাটা কী দাঁড়াল। একেবারে প্রিজনার হয়ে গেলাম। ভাবতাম হায় হায়—একি হল, আমি তো নজরবন্দী হয়ে গেলাম। এরপর রায় সাহেব আমার মতলবটা জানতে পারলেই তো সোজা পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।

মমতা রঙ্গ করে বললেন, "দিদির সঙ্গে দেখা হত না ?"

"দিদির এদিকে ঘেঁষার হুকুম ছিল না। দৈবাৎ দেখা হয়ে যেত।"

নলিনী এবার গালে হাত তুলে বললেন, "কত মিথ্যেই যে বলবে।"

আমি তোমার দুবেলা চা জল-খাবার দিতে আসতুম ; ঘর পরিষ্কার করতে যেতাম।"

"ও তো নিমেষের ব্যাপার। আসতে আর যেতে। বড় জোর একটা চিরকুটে দুলাইন লিখে ফেলে দিয়ে যেতে। তোমার ন্যাকামি দেখলে তখন রাগে গা জ্বলে যেত। নিজেরা চারবেলা চর্বচোষ্য খাচ্ছ, ডিম উড়ছে, মুরগী উড়ছে, মাছ চলছে—রাত্রে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা হচ্ছে—আর আমি বেটা বটকৃষ্ণ—ভেজানো ছোলা, আদার কুচি, কাঁচকলা সেদ্ধ, কপি সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে আছি। রাত্রে মশার ঝাঁক গায়ের চামড়া ফুলিয়ে দিচ্ছে তার ওপর ওই নেড়ি কুকুরটার সারারাত দাপাদাপি।"

নলিনী বললেন, "দেখো দত্তবাবুঃ এত পাপ ভগবানে সইবে না। তোমার জন্যে আমি লুকিয়ে ডিমের ওমলেট, মাছ ভাজা, এমনকি কাচের বাটি করে জানলা গলিয়ে মাংস পর্যন্ত রেখে গিয়েছি। মশার জন্যে রোজ ধুনো দিয়ে যেতাম ঘরে।"

বটকৃষ্ণ বললেন, "ধুনো যে কোথায় দিতে লক্ষ্মী তা তো জানি না। তবে হ্যাঁ, তোমার বাবা কাইজারকে রোজ হাড় মাংস খাইয়ে খাইয়ে একটা বাঘ করে ফেলেছিলেন। আফিং খাইয়ে খাইয়ে আমি নেড়িটার শরীর চিমসে করে দিয়েছিলাম। তোমার বাবা তাকে আবার তাজা করে ফেলেছিলেন। রাত্রে একটু বেরুবো, রোমিও জুলিয়েট করবো—তার কি উপায় রেখেছিলেন রায় সাহেব—চার পাঁচ দিনেই বুঝলুম, আমার আশা নেই। বৃথাই মাথা ন্যাড়া করে গেরুয়া পরে ছুটতে ছুটতে এসেছি। নলিনী-মিলন হবে না। মানে মানে ফিরে যেতে পারলেই বাঁচি। তবে হ্যাঁ—সংসারে আর ফিরব না। গেরুয়াই যখন ধরেছি—তখন সোজা হরিদ্বার কিংবা কনখলে চলে যাবো। এটা স্থির করে নিয়ে রায় সাহেবকে বললাম, 'এবার আমায় যেতে দিন'। উনি বললেন, "সেকি আরো কটা দিন থাকো না। অসুবিধা হচ্ছে।" বললাম, 'আজ্ঞে না, এত সুখ আরাম আমাদের জন্যে নয়। আমরা গৃহত্যাগী। দুঃখ কষ্ট সহ্য করাই আমাদের ধর্ম।' রায় সাহেব ধূর্ত চোখ করে বললেন, 'ছেলে মানুষ তো, ফাজলামি বেশ শিখেছ। শোন হে, এই রবিবার মধুপুর থেকে আমার এক বন্ধু আসবে। রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। আমারও ঘর দোর কম। তা তুমি কালকের দিনটা থেকে পরশু—শনিবার চলে যেও।'

মমতা বললেন, "ওমা! সেকি! আপনাকে চলে যেতে বললেন?"

"বললেন বই কি। সাফসুফ বললেন"—বটকৃষ্ণ মাথা নাড়লেন। আমিও ভেবেছিলুম—চলেই যাবো। জেল খানায় বসে তো কিছু করার উপায় নেই। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমার দিদি যখন কাঠ কয়লা জ্বালিয়ে ধুনো দিতে এলো, বললাম—তোমার বাবা আমায় পরশুদিন চলে যেতে বলেছেন। আমি চলে যাচ্ছি। তোমাদের ঘরদোর কম মধুপুর থেকে তোমার বাবার কোন বন্ধু আসবেন। তোমার দিদি ধুনোয় ঘর অন্ধকার করে দিয়ে চলে গেলো। আমি বসে নাকের জলে চোখের জলে হলাম। রাত্রের দিকে তোমার দিদি এক চিরকুট ধরিয়ে চলে গেলো। চিরকুট পড়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। মধুপুরের সেই ভদ্রলোক—রায় সাহেবের বন্ধু—তাঁর ভাইপোর জন্য নলিনীকে দেখতে আসছেন। তোমার দিদি লিখেছিল, "তুমি আমায় বাঁচাও। না বাঁচালে বিষ খাবো। তুমি ছাড়া আমার কে আছে লক্ষ্মীটি?"

সত্যপ্রসন্ন নলিনীর দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কি তাই লিখেছিলেন দিদি?"

নলিনী বললেন, "বয়ে গেছে।"

বটকৃষ্ণ বললেন, "বয়েই তো যাচ্ছিল। অন্য হাতে পড়লে বুঝতে। সোনার অঙ্গ কালি করে দিত।...যা বলছিলাম সত্য, তোমার দিদির চিঠি পড়ে আমার মনে হল—বিষটা আমিই আগে খেয়ে নিই। কিন্তু কোথায় পাবো বিষ? কারমাটারে একটা সিন্ধির দোকান পর্যন্ত নেই। ভাবলাম গলায় দড়ি দিই, ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখি—একটা হুক পর্যন্ত নেই, দড়ি বাঁধব কোথায়। যেদিকে তাকাই ফাঁকা। মরার মতন কিছু হাতের কাছে পেলাম না। ভাবি আর ভাবি; কোন উপায় পাই না। হঠাৎ একটা জেদ চাপল। ভাবলাম জীবনটা তো নষ্ট হয়ে গেলো, প্রেমের পুজোর এই তো লভিন্দু ফল। তা নষ্টই যখন হল বেচারী নলিনীর জন্যে কিছু না করেই কি মরব? ও আমার কাছে বাঁচতে চেয়েছে। কেমন করে বাঁচাই? কেমন করে? সারা রাত ঘুম হল না। ছটফট করে কাটল। হাজার ভেবেও কোন বুদ্ধি এল না। পরের দিন সকাল থেকে মৌনী হয়ে থাকলাম। রায় সাহেবকেও পাত্তা দিলাম না। দুপুর বেলায় খেলাম না। বিকেল বেলায় কেমন ঘোরের মতন বাইরে পাইচারি করতে করতে খেয়ালই করি নি রায় সাহেব আমায় ডাকছেন। যখন খেয়াল হল—রায় সাহেব তখন আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উনি বললেন, কি হে, তুমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁট নাকি? বলতে যাচ্ছিলাম—আজ্ঞে না। কিন্তু হঠাৎ আমার এক মামার কথা মনে পড়ল। মামা সোমনামবুলিজমে ভোগে, মানে স্লিপ ওয়াকার, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটে, তবলা বাজায়, ক্যালকুলাসের অঙ্ক করে। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ওই রোগটা আছে। বংশানুক্রমিক।' রায় সাহেব আঁতকে উঠে বললেন, 'সেকি আগে তো বলোনি। ওরে সর্বনেশে রোগ। আমার এক বন্ধু এই রোগে সেলুন থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেল। এতো ভাল কথা নয়। তুমি রাত্রে বাথরুমে টাথরুমে বেরিও না। কাইজার ছাড়া থাকে। তোমার গলার টুঁটি কামড়ে ধরবে, না না খুব খারাপ, ভেরী ডেন্‌জারাস, তোমার আগে বাপু বলা উচিত ছিল। স্লিপ ওয়াকার্সদের আমি বড় ভয় পাই।' রায় সাহেব কি যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন। আমিও হঠাৎ ব্রেন ওয়েভ পেয়ে ভাবতে ভাবতে চলে গেলাম।"

মমতা শুধোলেন, "মাথায় বুঝি কোন বুদ্ধি এলো?" বটকৃষ্ণ চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন আবার। বললেন, হ্যাঁ মাথায় বুদ্ধি এল। ওই একটি মাত্র পথ ছাড়া আর কোনো পথও ছিল না। রাত্রে এক ফাঁকে তোমার দিদিকে অনেক কষ্টে ধরলাম। বললাম সোনা আমার, তোমার শোবার ঘরের দরজাটা একটু খুলে রেখো। শুনে তোমার দিদি আমায় মারতে ওঠে আর কি! অনেক করে

বোঝালাম—"তোমার বাবা কত বড় বাঘা ওল আমি দেখব, আমিও সেই রকম তেঁতুল।"

অধৈর্য হয়ে মমতা বললেন, "তারপর কি করলেন বলুন।"

বটকৃষ্ণ বললেন, "সেদিন রাত্রে রায় সাহেব কাইজারকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখলেন। তোমার দিদি শুতো নিচে, তার ঘরে থাকত নিত্য ঝি। নিত্য বড় ঘুম কাতুরে। ভূতটুতের বড় ভয়। সেদিন নিত্য ঘুমিয়ে পড়ার পর নলিনী ঘরের ভেতর থেকে ছিটকিনিটা খুলে রাখল। ভোর রাতের দিকে আমি স্লিপ ওয়াকিং করতে করতে তোমার দিদির ঘরে গিয়ে হাজির। নিত্যঝি ভোর-বেলায় উঠত। ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে বিছানার দিকে তাকাতেই দেখল আমি সটান বিছানায় শুয়ে আছি, নলিনী জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। নিত্য হাউমাউ করে চেঁচাতে লাগল। তার চেঁচানির চোটে কাইজার চেন ছিঁড়ে বাঘের মতন নিচে নেমে এল। পাজামার দড়ি আঁটতে আঁটতে রায় সাহেব নিচে নেমে এলেন, আমার হবু শাশুড়ী ঠাকুরণও। পশ্চিমে চাকরও হাজির। আমি সমস্তই বুঝতে পারছি—কিন্তু নড়ছি না—মরার মতন শুয়ে আছি। কানে এল, রায় সাহেব ঘরের মধ্যে বোমা ফাটানোর গলায় বললেন, 'ঘরের দরজা কে খুলেছিল? কে?' নলিনী কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "নিত্যদি। কলঘরে গিয়ে ফিরে এসে নিশ্চয় দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল।" নিত্য বলল, 'না, বাবাঠাকুর আমি নই।' শাশুড়ী ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর তুই, তোর ঘুম আমি জানি না। সব কটাকে বাড়ী থেকে তাড়াব।' রায় সাহেব বললেন, 'ওই রাস্কেল, ইতর, ছুঁচোটাকে তুলে দাও, দিয়ে আমার ঘরে নিয়ে এস। হারামজাদাকে হান্টার পেটা করব।'

সত্যপ্রসন্ন প্যাকেট খুলে দেখলেন আর সিগারেট নেই। মমতা হাসির দমকা তুলে দিদির হাত টিপে ধরলেন।

বটকৃষ্ণ বললেন, "খানিকটা পরে আমি রায় সাহেবের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঘরে আমার হবু শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ ছিল না। রায় সাহেব সার্কাসের রিং মাস্টারের মতন বসে ছিলেন হান্টার হাতে, একপাশে গিন্নী, অন্য পাশে কাইজার। রায় সাহেব আমায় দেখেই তোপ দাগলেন, 'বদমাশ, স্কাউণ্ড্রেল, পাজি, ইতর কোথাকার।...তুমি কোন মতলবে বাড়ীর মেয়েদের ঘরে ঢুকেছিলে? সত্যি কথা বলো? নয়তো চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেবো।' ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল, কিন্তু এই শেষ সময়ে ভয় করলে তো চলবে না। মা কালীকে মনে মনে ডেকে ন্যাকার মতন বললুম, 'আপনি কি বলছেন—আমি বুঝতে

পারছি না। আমি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী মানুষ। আমি কেন বাড়ীর মেয়েদের ঘরে ঢুকতে যাবো ছি ছি।' বলে কানে আঙুল দিলাম।'

রায় সাহেব হান্টারটা সোঁ করে ঘুরিয়ে মেঝের ওপর আছড়ে মারলেন। 'তুমি সাত্ত্বিক—তুমি সন্ন্যাসী। তুমি জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ, লম্পট—। আমি তোমায় পুলিশে দেবো।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন।'

'তোমায় আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে।'

'আমি কিন্তু নির্দোষ। আমার কোনো অপরাধ নেই।'

'তুমি নলিনীর ঘরে কেমন করে গেলে ?'

'আজ্ঞে আমি জানি না।'

'জানো না ? বদমাশ ?'

'সত্যিই জানি না। বোধ হয় ঘুমের ঘোরে চলে গিয়েছি। আপনি তো জানেন আমার স্লিপ ওয়াকিং রোগ আছে। ঘুমের ঘোরে কি করি জানি না।'

রায় সাহেব হান্টার তুলে আছড়াতে গিয়েও থেমে গেলেন—রায়-গিন্নী বললেন, ঝি-চাকর সবাই তো দেখল জানল। তোমার কি রোগ আছে বাছা আমি জানি না। কিন্তু একথা যদি বাইরে রটে তবে যে কেলেঙ্কারী হবে। লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কাল মধুপুর থেকে কর্তার বন্ধু আসার কথা।

রায় সাহেব কী ভেবে আমায় আদেশ দিলেন, 'এখন নীচে যাও। পরে আমি যা করার করব।'

আমি নিচে নেমে আসার সময় দেখি নলিনী পাশের ঘরে কাঁদছে।

ঘণ্টা খানেক পরে রায় সাহেবের কাছ থেকে স্লিপ এল। পাঙ্কি নিয়ে এসে দিল আমাকে। রায় সাহেব নিজে আর রাগে, লজ্জায় নিচে আসেননি। স্লিপে লেখা ছিল, 'তুমি আমার মান মর্যাদা সম্মান ডুবিয়েছ। নলিনীকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।'

বটকৃষ্ণ তার গল্প শেষ করে হা হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন, "শ্বশুর মশাই পরে অবশ্য বুঝেছিলেন—তিনি একটি রত্ন পেয়েছেন। আমিও অবশ্য বড় রত্ন পেয়েছি, ভাই" বলে বটকৃষ্ণ চোখের ইশারায় নলিনীকে দেখালেন।

প্রবুদ্ধ

ঢেঁকিদা, নলকূপ ও মাধ্যাকর্ষণ

মাত্র একমাসের জন্য ঢেঁকিদা তেরো নম্বর পটুয়াটোলা লেন ছেড়ে দেশের বাড়ীতে গেছলেন, এলেন সেখানকার প্রতিটি গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা কুড়িয়ে, আর ফালতু পাওয়া রোজ্‌কার রোজগার একটি করে মুরগীর শ্রাদ্ধ করে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন দিব্যি পুরুষ্ট মুরগীর গোটা দশেক স্যাম্পেল, এক হাঁড়ি গুড়, বড় বড় তিন বোতল ঘি। এসব ছাড়া আলু, কুমড়ো, পেঁয়াজ, তেঁতুল, আমচুর তো রয়েছেই। সবই খাঁটি। গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ঢেঁকিদা-গিন্নী অম্বালিকা অর্থাৎ গগন, হারাধন, সুখেনদের বৌদি ভারী খুশী স্বামীর ওপর। ঢেঁকিদার আসার পরদিন সকালে ভেতর থেকে হারাধনের ডাক এলো। কি ব্যাপার? না, আজ সকালে ওরা যেন এখানে খেয়ে যায়।

গগন, সুখেন, হারাধন বৈঠকখানায় বসে গবেষণা শুরু করে—হঠাৎ রাতারাতি ঢেঁকিদা কি কৌশলে গ্রামবাসীদের হৃদয় জয় করলেন? বরং হিমালয় জয় করা সহজ, কিন্তু হাজার গণ্ডা গ্রাম দলাদলি, মামলামোকদ্দমা এই সবের মাঝখানে আমাদের ঢেঁকিদা কি করে এতগুলি গ্রামবাসীর সেন্ট-পারসেন্ট ভোটে ভালো লোক বলে বিবেচিত হলেন সেটা গবেষণার বিষয় ছাড়া আর কি?

অবশেষে সুখেন বললে—ঢেঁকিদা নিশ্চয়ই গ্রামের ক্লাবগুলোতে মোটা চাঁদা দিয়ে গ্রামবাসীদের হাত করেছিলেন।

গগন বলে, ধ্যুৎ? ঢেঁকিদা ওদিক দিয়েই যাননি। তিনি দেশের বাড়ীতে গিয়ে কিছু টাকা দাদন দিয়ে গ্রামের লোকগুলোকে হাত করেছেন।

হারাধনও চুপ করে থাকে না। সে বললে, আমি বাজি রাখতে পারি, ঢেঁকিদা ওসব কিছুই করেন নি। হুঁ, যত্তো সব। ঢেঁকিদা কি জানেন না, ও-টাকা জীবনে আদায় হবে না, তাছাড়া মামলামোকদ্দমার হ্যাঙ্গাম রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি বেশ কয়েক আসর যাত্রা শুনিয়ে দিয়েছেন গ্রামের লোকদের। গ্রামের লোকেরা যাত্রা শুনতে পেলে আর কিছুই চায় না। গৃহস্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

ঠিক এমনি সময়ে ওদের পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল—তোমাদের মুণ্ডু!

আরে ঢেঁকিদা কখন এলেন?—এতক্ষণ তাহলে তাদের কথাবার্তা সবই শুনে ফেলেছেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

ঢেঁকিদা বললেন, তোরা এক একটি আস্ত গবেট। গাঁটের কাঁড়ি খরচ করে নাম কেনে কারা? যারা বোকা, তারাই। কেননা, যে মুহূর্তে টাকা খরচ করতে অক্ষম হবে, সেই মুহূর্তে উল্টে উপকৃতরাই বদনাম করতে থাকবে। নাম কিনতে হলে টাকা এবং বুদ্ধি দুই-ই খরচ করতে হয়। আর আমার কথা যদি বলিস তো, বলি—আমি টাকা খরচ না করে বুদ্ধিটাই খরচ করে এসেছি। যা না একবার আমার গ্রামে,—ঢেঁকিদার নামে এখনো গ্রামের লোকগুলো অজ্ঞান হয়ে যায়।

অজ্ঞান!—মানে সেন্সলেস্? হারাধন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে,—তবে বুঝি ভূত সেজে রাত্তির বেলা সবাইকে ভয় দেখিয়ে এসেছেন?

তুই একটা হাঁদাকান্ত, ঢেঁকিদা বলেন—সে অজ্ঞান নয় রে, সে অজ্ঞান নয়। এক কথায় যাকে বলে গুণমুগ্ধ।

কিন্তু কি করে, কোন্ মন্ত্রবলে?—তিন জনেই সমস্বরে জিগ্যেস করে।

বেশ গুছিয়ে আসর জমিয়ে বসে ঢেঁকিদা বললেন, শোন্ তাহলে। ঢেঁকিদা শুরু করলেন তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী: আমার সাফল্যের মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের একটি জিনিস, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি?—হাঁ হয়ে যায় গগনের মুখ।

হ্যাঁ হে ছোকরা, ইংরেজীতে যাকে বলে 'ল অফ গ্র্যাভিটেশন।' মাধ্যাকর্ষণ কাকে বলে রে সুখেন, জানিস, না ভুলে গেছিস?

জানি ঢেঁকিদা, সুখেন বলে, 'পৃথিবীর যে আকর্ষণ বশতঃ বায়ুতে উৎক্ষিপ্ত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয়'—এখনো হুবহু মুখস্ত রয়েছে।

বাঃ বেশ মনে রেখেছিস। আমারও মনে ছিল বলেই ঐ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা কাজে লাগিয়ে গ্রামবাসীদের জন্য একটা নলকূপ করিয়ে দিয়ে এলাম। তাতেই তারা কৃতজ্ঞ।

সে কি ঢেঁকিদা, হারাধন প্রশ্ন করে—নলকূপের জলে তো উপর থেকে চাপ দিয়ে নীচ থেকে তোলা হয়,—এতো মাধ্যকর্ষণ শক্তির উল্টো। আপনি কি তাহলে নতুন কোনো ধরনের নলকূপ আবিষ্কার করে এলেন ?

না হে নলকূপ ইজ নলকূপ। পাম্প করলেই প্রেসারে জল উঠে আসছে। আমি আবার আবিষ্কার করবো কি ? আসলে ঐ নলকূপটা বাগানোর মূলেই ছিল আমার বুদ্ধি—আর ঐ যে বলে, 'ল অফ্ গ্রাভিটেশন।' খুলেই বলি ব্যাপারটা।

ঢেঁকিদার কথামৃত ওরা আকুল আগ্রহে পান করতে থাকে।

ঢেঁকিদা বলে চললেন : অনেকদিন পর গ্রামে গিয়ে দেখলাম, গ্রামে একটাও নলকূপ নেই, ঘরে ঘরে আমাশা। সবাইকে ডাকিয়ে একদিন আমার বাড়ীতে জড় করে বললুম,—ওহে, তোমরা কি গ্রামে নলকূপ চাও না ? যদি চাও তাহলে এক জোটে এই কাগজখানায় সই কর দেখি। আমার প্রস্তাবে দু-তিন মাতব্বর গোছের লোক আপত্তি জানালো, তারা বললে, টাকা দিতে পারবে না। তবে ঢেঁকিদা যদি নিজের খরচে নলকূপ বসায়, তার জল খেতে কারুরই আপত্তি নেই। ওদের কথা শুনে বললুম—কাউকেই টাকা খরচ করতে হবে না, এমন-কি আমাকেও না। তোমরা শুধু সই করেই খালাস। আমার কথা শুনে মোড়ল গুণধর দাস বললে—সই করলেই যদি নলকূপ হত, তাহলে আমরা আজ অব্দি তিনবার সই করলাম, কই নলকূপ তো হলো না ?

সেই তো মজা, বললাম আমি, তোমরা ঠিক জায়গায় দরখাস্তটি দিতে পার নি। নাও, সবাই মিলে এই কাগজখানায় সই করো।

খানিকটা সন্দেহ ; খানিকটা দ্বিধায় একে একে গ্রামের সবাই কাগজখানায় সই করলো। বেশ কিছু লোকের টিপও থাকলো।

তারপর আমি করলাম কি—একখানা দরখাস্ত লিখে ফেললাম আমাদের গ্রামের জন্য একটি নলকূপ বসানোর আবেদন জানিয়ে। এবং পরদিন পোস্ট করলুম ডাকে খোদ্ ভারতের রাষ্ট্রপতির নামে, দিল্লীতে।

এ্যাঁ—যেন আঁতকে উঠলো গগণ, সুখেন, হারাধন। রা-ষ্ট্র-পতি ? মানে

ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেণ্ট ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তা আবেদন-পত্রটি পাঠাবার কুড়ি দিনের দিন হাতে-নাতে ফল হল। স্থানীয় বি-ডি-ও সাহেব জিপে চড়ে এসে কী খাতিরটাই না করলেন আমাকে। একটু অভিযোগও করলেন, কেন, তাঁকে জানালেই কি তিনি নলকূপটা বসিয়ে দিতে পারতেন না তাড়াতাড়ি ? খোদ প্রেসিডেণ্টকে সরাসরি লিখে তাঁকে অপ্রস্তুত করার দরকার কি ছিল···ইত্যাদি-ইত্যাদি। শুধু এই নয়, পরদিন ব্লক থেকে নলকূপ বসানোর কাজ শুরু হয়ে গেল। গ্রামের লোক আমাকে তুলে নাচতেই বাকী রাখলে কেবল।

হারাধন বললে—অবাক কথা ঢেঁকিদা। কাগজে তো পড়েছিলাম ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট যখন কলকাতায় আসতেন তখন ছাত্রাবস্থায় বহু জানাশোনা সহপাঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

ধুৎ! জানাশোনা আবার কিসের ? একদিনও আমি আমাদের প্রেসিডেণ্টকে চাক্ষুষ দেখিনি ; জানাশোনা তো দূরের কথা। আসলে গ্রামবাসীরা ইতঃপূর্বে কি করেছিল ? তারা প্রপার চ্যানেল ভেবে যে দরখাস্ত প্রথমে বি-ডি-ও মানে ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসের মাধ্যমে ওপরওয়ালার কাছে পাঠিয়েছে তাতেই গোড়ায় গলদ থেকে গেছে। বি-ডি-ও পাঠাবেন এস-ডি-ওকে, এস-ডি-ও ফরোয়ার্ড করবেন ডি-এম মানে ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটকে, এইভাবে ধাপে ধাপে ঐ আবেদনপত্রটি উঠবে—আর দেরী হবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এতো জানা কথা—নীচ থেকে উপরে উঠতে কত কষ্ট হয়, দেরী হয়, কোমরে ব্যথা ধরে। কিন্তু আমার আবেদনপত্রটির বেলা কি হয়েছিল ? সোজা ভারতের প্রেসিডেণ্টের কাছে নলকূপের আবেদন গেছে, তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর নীচে থাকা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে, তাঁরা পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, মুখ্যমন্ত্রী সেচমন্ত্রীর কাছে, সেচমন্ত্রী জেলাশাসকের কাছে, জেলাশাসক মহকুমা-শাসকের কাছে, এস-ডি-ও পাঠিয়েছেন থানার ব্লক অফিসে। উপর থেকে হুড়হুড় করে নীচে নেমে আসতে মাত্তর কুড়িটি দিন লেগেছে ; নীচ থেকে ওপরওয়ালার কাছে যেতে—যেখানে মাসের পর মাস, বছর ঘুরে আসে—সেখানে কত তাড়াতাড়ি কাজ করছে—ঐ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জোরে। নে এখন বল দেখি তোরা, এতে যদি গ্রামবাসীরা আমাকে মাথায় করে নাচে, অবাক হবার কিছু আছে কি ? তাড়াতাড়ি স্নান করে আয়—রান্না শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে।

ঢেঁকিদা গাত্রোত্থান করেন। হারাধন, সুখেন, গগণও উঠে পড়ে। আরে ঢেঁকিদার বাড়ীতে গ্র্যান্ড ফিস্ট আছে যে।

গৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী)

ব্রজদার গল্প

জ্যুজুৎসু জানা না থাকলে, খবরদার, গণ্ডার ধরতে যাসনি। রিকস আছে। কথাটা বলেই ব্রজদা সুনীতের দিকে চাইলেন।

সুনীল বলল, ভাল লোককেই কথাটা বললেন বটে ব্রজদা। সুনীতবাবু নিজে হাতে কখনও একটা ছারপোকা ধরেছেন কিনা জিজ্ঞেস করুন তো!

ছারপোকা!

সুনীত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বাঃ, কি যে বলেন, ছারপোকা ধরা কী এমন শক্ত!

শক্ত বৈকি? জ্যুজুৎসু জানলে গণ্ডার কাবু করা যায়, কিন্তু জ্যুজুৎসুতে ছারপোকা ঘায়েল করা যায় না। এ আমার নিজের চোখে দেখা কিনা। আমার যিনি ওস্তাদ—জাপানের চ্যাম্পিয়ন জ্যুজুৎসু বীর—

(ব্রজদা থামলেন। চোখ বুঁজে আলতোভাবে নিজের নাক কান মলে গুরুকে স্মরণ করে নিলেন।)

মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা একবার কলকাতায় এসেছিলেন জ্যুজুৎসুর খেলা দেখাতে। বড়লাটের আমন্ত্রণে। আমি তখন পটলডাঙ্গার মেস্-ডি-শান্তিনিকেতনে

একখানা সিঙ্গিল সীটেড্রুমে থাকি। ওস্তাদের ইচ্ছে আমার কাছেই কদিন থাকেন। কি আর করি গেস্ট রুম থেকে একখানা ভালো দেখে তক্তপোশ এনে আমার পাশেই পেতে দিলুম। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেখি অন্ধকারে প্রচণ্ড একটা হুটোপাটি চলছে। ব্যাপারটা কি? তাড়াতাড়ি লাইট জেবলে দিলাম। ততক্ষণে মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা গোটাকয়েক জুজুৎসুর গুঁতো ঝেড়ে তক্তপোশটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন।

একটু অবাক হয়েই বললাম, ব্যাপার কি?

মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা বললেন, শতো শতো সূচিখোঁচা দাগা।

ওস্তাদ জাপানী হলেও একটু বাঙ্গাল কছমের জাপানী। কিয়োটোর কুট্টি কিনা! তাই মানেটা বুঝতে একটু দেরি হল। সমঝে নিয়ে একটু হেসে বললাম, ওস্তাদ, ভয় পেয়ো না, ওগুলো সুঁচের খোঁচা নয়। এদেশে একরকম খুদে খুদে ডোমেস্টিক জানোয়ার আছে। আমরা বলি, ছারপোকা। হার্মলেস্। শুয়ে পড়ো।

ওস্তাদ আমার কথায় বিশেষ ভয় পেলেন না। আলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে সারা গা দেখতে লাগলেন।

আর বলতে লাগলেন, গাটাগোটা ফুটো।

তা মিছে বলেননি বুঝলি। আমিও দেখলাম ছারপোকার কামড়ে ওস্তাদের গোটা গাটাই প্রায় ফুটো হয়ে গেছে।

ব্রজদা দম নেবার জন্য একটু থামতেই সুনীত বলে উঠল, বাঃ জাপানী ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার তো বেশ একটা মিল আছে!

ব্রজদা বললেন, হবে না কেন, ওরিয়েণ্টাল কাণ্ট্রি যে। আমরাও প্রাচ্য, জাপানীরাও প্রাচ্য। অরিজিন তো সেই বেদ! ইংরেজ এসেই না ভেদটা সৃণ্টি করে দিলে। নইলে আদিতে শ্যাম, কম্বোজ, বোরোবুদুর, যবদ্বীপ, বালি, সিংহল, জাপান ইস্তক আমেরিকা, এ-সবই তো বৃহত্তর বঙ্গের অংশ ছিল! আমাদের ছিল। বাংলার সমৃদ্ধি, বাংলার সংস্কৃতি এককালে কোন তুঙ্গে উঠেছিল একবার চেয়ে দ্যাখ। আর সেই বাংলার আজ কি দুরবস্থা। এখন যে চান্স পাচ্ছে, সেই একখানা লাথি ঝেড়ে চলে যাচ্ছে।

ব্রজদা ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, ডিফেক্টটা কি হয়েছে জানিস, পেঁচক আর তেমন করে ডাকছে না।

পেঁচক! মানে?

পেঁচা। বাংলা কি ভুলে গেলি ? আউল।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, পেঁচা ডাকছে না, তা হয়েছে কি ?

যা হবার তাই হচ্ছে। আবার কি হবে !

ব্রজদা চটে উঠলেন।

বললেন, প্রহরে প্রহরে পেঁচক "বাঙ্গালী জাগো" বলে আর ডেকে উঠছে না। কাজেই বাঙ্গালী ঘুমুচ্ছে। একেই বাঙ্গালীর ছেলের একটু লেটে ওঠা অভ্যেস, তার উপর জাগানেওলা নেই। আসলে গুবলেট তো সেইখানেই। বুঝিলিনে। নইলে জাগ্রত বাঙ্গালীর গায়ে হাত তুলবে এমন সাহস ভূ-ভারতের কোন ব্রাদারের আছে।

যাকগে থাক, যা বলছিলাম তাই বলি।

ব্রজদা প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।

সারারাত ধরে মিঃ গুরুমারা ছারপোকা মারার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, দেখলাম বটে, জাপানী অধ্যবসায় কাকে বলে ! এক একখানা করে কাঠ তক্তপোশ থেকে তিনি খুলে ফেললেন। কিন্তু কোথায় ছারপোকা ! একটারও টিকি দেখা গেল না ! আবার একটু একটু করে তক্তপোশটি জুড়ে আলো নিভিয়ে যাঁহাতক শোয়া অমনি "শতো শতো সুঁচিখোঁচা" ওস্তাদকে আবার দাগা দিল। সারারাত এই ভাবে লড়াই চলল। তোষক বালিশ ছিঁড়ে, তক্তপোশের কাঠগুলো ভেঙ্গে ঘরটাকে লণ্ডভণ্ড করে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওস্তাদ আমার হাওয়া দিলেন। এদেশ ত্যাগ করেই চলে গেলেন।

তাই বলছিলাম, বাঘ, ভালুক, হাতি, হিপো মারার চাইতে ছারপোকা মারা শক্ত। অন্তত আমার কাছে।

সুনীত বলল, আর গণ্ডার ? গণ্ডার মারেননি ব্রজদা ?

সুনীল দাবড়ে উঠল, কাকে কি কোশ্চেন করতে হয় মশাই এখনও পর্যন্ত তাই শিখলেন না। ব্রজদা কি এক-আধটা গণ্ডার মেরেছেন ? গণ্ডার হিসেব জিজ্ঞেস করুন।

ব্রজদা সস্নেহে বললেন, চিরটা কাল তোর একই রকম কাটল সুনীল। আজও তোতে পাক ধরল না। সেই ডাঁসাই থেকে গেলি। গণ্ডার কি বাঙ্গালী যে গণ্ডায় গণ্ডায় মারা পড়বে ? আর তাছাড়া এখানে কোথায় তুই গণ্ডায় গণ্ডায় গণ্ডার পাবি যে মারবি ? মারা তো দূরস্থান, যে কটা বাঙ্গালী গণ্ডার আছে রিজার্ভ ফরেস্টে, সে ক'টা বাঁচিয়ে রাখাই এখন দারুণ সমস্যা।

ব্রজদা নড়েচড়ে বসলেন।

বললেন, মাঝখানে তো আমাদের বনমন্ত্রীর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কি, না গণ্ডারদের ছেলেপুলে হচ্ছে না। কত ডাক্তার কবিরাজ এল। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, বাইয়োকেমিক, আয়ুর্বেদী, য়ুনানি, ভেটিরিনারি, কত কি করা হল। কোন ফল হল না। বনমন্ত্রী সাহেব-ডাক্তার আনালেন। বড় বড় সব গাইনোকলজিস্ট। যাদের হাতে পড়লে বাঁজা বউও কার্তিকের মা হয়। কিন্তু ওনারাও এখানে ফেল মেরে গেলেন। গণ্ডারনীরা লজ্জায় তাদের সামনে বেরুলই না যে। সরকারের এক কাঁড়ি টাকা খরচ হয়ে গেল।

তাই নিয়ে এজিটেশন হল। মিটিং প্রশেসন হল। কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা রেট-পেয়ারদের স্বার্থে চারদিন ধরে স্পেশাল মিটিং ডেকে গলাবাজি করে, অবশেষে বিধান সভায় "অবিলম্বে গণ্ডারের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাব" পাঠিয়ে দিলেন। বিধান-সভায় লেফটিস্ট গ্রুপ সরকারকে তুলো ধুনে দিলে। লোক সভায় প্রশ্ন উঠল। কম্যুনিস্ট দল বললে, কংগ্রেসী কুশাসনের প্রতিবাদে গণ্ডারদের এই ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ, ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামী আত্মত্যাগ, গণ্ডার-সমাজকে আজ শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে এনে ফেলেছে। বিশ্বের প্রগতিশীল সমাজ আজ দাবী করছে, সরকার হয় এই বিপ্লবী গণ্ডারদের বংশ বৃদ্ধি ঘটান, নইলে গদি ছেড়ে দিন। পি-এস-পি বললে, ভারত আক্রমণে উদ্যত চীনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার আজ পর্যন্ত কোন সক্রিয় ব্যবস্থ অবলম্বন না করায় গণ্ডারদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তারা ভাবছে, যে-দেশে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কেই অনাস্থা রয়েছে, সে-দেশে আর বাচ্চা পেড়ে কি হবে? গণ্ডারদের এই মনোভাবে সামগ্রিকভাবে নেহরু সরকারের চীন-নীতি এবং বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে। জনসংঘ এবং হিন্দুমহাসভার মতে এটা অশাস্ত্রীয় জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অনুকূলে সরকারী প্রচার কার্যের ব্যাড্ এফেক্ট।

লোকসভার মেঝেয় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বিতর্কের প্রথম দিন সবাইকে প্রচণ্ড গালাগাল দিলেন। পি-এস-পি-কে বললেন, মোটলি ক্রাউড্। কমিউনিস্টদের বললেন, এদেশে ওদের শিকড় নেই, অন্যান্যদের বললেন, কমিউন্যাল। দ্বিতীয় দিন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং মডার্ণ জেনেটিক্সের উপর দেড় ঘণ্টা লেকচার দিলেন। গান্ধিজীর কথা স্মরণ রাখতে বলে সবাইকার কাছে দেশের ইউনিটি বজায় রাখতে আবেদন জানালেন। তৃতীয় দিনে গণ্ডার প্রসঙ্গ তুলে

বললেন, এবিষয়ে আমাদের নীতি পরিষ্কার। পাকিস্তান, পর্তুগাল, এমন কি চীন সম্পর্কে আমাদের যা পলিসি, গণ্ডারদের সম্পর্কেও তাই। কোয়ার্সন নয়, পার্সিকিউশন, থ্রুড়ি পারসুয়েশন। বুদ্ধ, অশোক, গান্ধিজীর পন্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। গণ্ডারদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আর সে দায়িত্ব কেন্দ্রের নয়, রাজ্য সরকারের। অতঃপর সরকারপক্ষ প্রস্তাব আনলেন, এটা রাজ্য সরকারের জুরিসডিক্‌শন। স্পীকারের হস্তক্ষেপে বিরোধী দলের প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি নাকচ হয়ে গেল। রাজ্যের বনমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন, আমি হলপ করে বলতে পারি, গণ্ডারদের ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য কোন নির্দেশ আমার দপ্তর থেকে দেওয়া হয়নি। গণ্ডারদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কোন ব্যবস্থাও করা হয়নি। এখন গণ্ডাররা যদি তা সত্ত্বেও বংশ-বৃদ্ধি না করে, তার আমি কি করব? সরকারের যেটুকু করার তা করেছেন। এই খাতে অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে। আর গণ্ডারের বাচ্চা না হওয়ার জন্য কে দায়ী, গণ্ডার না গণ্ডারনী, সেটা তদন্তের জন্য একটা এক্স্‌পার্ট কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। বিখ্যাত শিকারী শ্রী ব্রজরাজ কারফর্মা হচ্ছেন সেই কমিটির চেয়ারম্যান।

ব্রজদা থামলেন, একটু দম নিলেন।

বললেন, অ্যাইসা রিপোর্ট দিয়েছিলাম না একখানা, কি বলব, একটু ব্যাকিং পেলে ঐতেই নোবেল প্রাইজটা পেয়ে যেতুম। ইতিহাস, ভূগোল, সায়েন্স, হাইজিন, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইস্তক দেহতত্ত্ব, কি না ছিল সেই রিপোর্টে। বিশ্বের জন্ম থেকে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম আর মানব জাতির ধ্বংসে দি এণ্ড্‌। সেই রিপোর্টটার সামারি করেই তো এইচ. জি. ওয়েলস্‌ "আউটলাইন অব্‌ দি হিস্ট্রি অব্‌ দি ওয়ার্ল্ড" বইখানা বের করে দিলে।

সুনীত ফস্‌ করে বলে ফেলল, সে কী ওটা তো অনেক আগের বই! তখন তো আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেন্টই হয় নি।

ব্রজদা বললেন, ঐটেই তো বৃটিশদের বাহাদুরি। ব্যাটারা যেটা করে, আগে আগে করে। তা সে টুকলিফাইং-ই হোক, কি সাম্রাজ্যবিস্তারই হোক। জাতটা বড় হয়েছে কি অমনি অমনি!

সুনীল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তারপর গণ্ডারদের কি হল?

ঝড়াঝড় বাচ্চা হল। হবে না! ব্রজদা বললেন, কেমন মোক্ষম জিনিস সুপারিশ করেছিলাম।

সুনীতের ইদানিং এসব বিষয়ে একটু বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে।

মুখটি একটু নীচু করে জিজ্ঞেস করলে, জিনিসটা কি দাদা ?

ব্রজদা বললেন, একটা স্বপ্নাদ্য তাবিজ। প্রসূতির গলায় কালো কার দিয়ে শনি-মঙ্গলবারে ঝুলিয়ে দিলে একেবারে অব্যর্থ ফল। এক পয়সা খরচা নেই, শুধু ঐ তাবিজটার যা কস্ট্। ওনলি পাঁচ সিকে।

তা সেই তাবিজ গণ্ডারনীর গলায় কে ঝোলালে ?

ব্রজদা সুনীতের দিকে চেয়ে "ঈশ্বর ওকে ক্ষমা কর" হাসি হাসলেন! বললেন, আমি ছাড়া এ ভারতে রিয়েল জুজুৎসু আর কে জানে ? হলে হবে কি, ব্রজদা হতাশ গলায় বললেন, দেশে তো দিশি গুণীর কদর নেই। এই কাজটা যদি কোন সাহেব এসে করত তো দেখতিস। দেশে তার স্ট্যাচু তোয়ের হোয়ে যেত। এই যে, জিমকরবেটের নামে তোরা ন্যাশনাল পার্ক করে দিলি, আর তার যে গুরু, যে তাকে হাতে ধরে শিকার শিখালে, সে গেল ভেসে! কেন ? না সে যে বাঙ্গালী। আজ বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যদি হোল ওয়ার্ল্ডে এই কন্সপিরেসি না হত তো দেখতিস, পজিশন কাকে বলে তা তোদের ব্রজদা জগৎবাসীকে দেখিয়ে ছাড়ত। পজিশন পাচ্ছে না বলেই তো বাঙ্গালী আজ স্থায়ীভাবে অপজিশনে চলে যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, জিম করবেটকে পাকড়ালেন কি করে ?

ব্রজদা আমার মুখের পানে অগ্নি দৃষ্টি হানলেন।

বললেন, সেটা করবেটকেই জিজ্ঞেস করো।

সুনীল বললে, তিনি তো গত হয়েছেন। তাঁকে এখন পাই কোথায় ?

ব্রজদা বললেন, তবে কিছুকাল অপেক্ষা কর। এত অধৈর্যই বা হচ্ছ কেন ? এটুকু জেনে রাখতে পার, যে-ছোকরা এয়ার গান ছাড়া কিছু চালাতে পারত না, তাকে আমি হাতে ধরে ৩৪৫ বোরের ম্যাঞ্চেস্টার রিপিটার ছোঁড়া শিখিয়েছি।

সেবার জিমু বললে, ওস্তাদ, বাঘ মারা তো শেখালে, মারলামও অনেক, এখন ওতে অরুচি ধরে গেছে। এবার হাতি মারার কৌশলটা শিখিয়ে দাও।

হেসে বললাম, জিমু, এখনও তেমন বাঘের পাল্লায় পড়নি। মেরেছ তো পাহাড়ি বাঘ। পড়তে বাংলার বাঘের পাল্লায়, বুঝতে। একবার এক বাংলার বাঘকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলার করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর ঠ্যালায় অস্থির। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে ব্রিটিশরা বাঘেদের আর কখনও ভাইস চ্যান্সেলার হবার চান্স দিয়েছে বলে শুনিনি। তাই বলছি বাঘকে অত তুচ্ছ ভেব না। অবিশ্যি হাতি মারা শিখতে চাও শিখিয়ে দেব।

ক'দিন পরে খবর পাওয়া গেল আসামের জঙ্গলে একটা বুনো হাতি খুব অত্যাচার শুরু করেছে। খেত-খামার নষ্ট করে দিচ্ছে। বাড়িঘর তচনচ করছে। মানুষ মারছে। জিমিকে নিয়ে চললাম। ওকে বললাম, হাতি মারতে হয় এক গুলিতে। মিস্ করেছ কি গেছ। তোমাকে কিসমিস বানিয়ে ছেড়ে দেবে। আর হাতির ভালনারেবল্ জায়গাটা আছে মাথায়। শুঁড়টা যেখানে শেষ হয়ে কপালটা শুরু হয়েছে, জাস্ট্ অন্ দ্যাট্ স্পট্। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, হাতি যেন কক্ষনো তোমার গায়ের গন্ধ টের না পায়। খুব সাবধান। বাতাসের বিপরীতে কক্ষনো থাকবে না। অর্ডারটা যেমন বলে দিচ্ছি তেমনি বজায় রেখে চলবে। আগে বাতাস, মধ্যিখানে হাতি, তারপর তুমি। আমি হাতির কপালে চট করে একটা মার্কা করে দেব আর তুমি ঠিক সেইখানে চাঁদমারি করবে।

দিন তিনেক হেঁটে মিকির পাহাড়ের এক জায়গায় গিয়ে বুঝলাম, এসে গেছি। কিন্তু বিপদ হল এই যে, হাওয়ার গতির মাথামুণ্ডু টের পাওয়া যাচ্ছিল না। কখনও এদিক দিয়ে বইছে, একটু পরে সেদিক দিয়ে। আচ্ছা ঝামেলা। বুদ্ধিটা উস্কে নেবার জন্য পকেট থেকে নস্যির কৌটা বের করে একটিপ নস্যি নিয়েছি কি, সামনের সবরি কলার ঝাড়ের আড়াল থেকে প্রচণ্ড শব্দে এক হ্যাঁচ্ছো শোনা গেল। যেন বড় বড় গোটা চারেক হাউট্জার কামান এক সঙ্গে কেউ দ্যাগর করে দিলে। এক ফুৎকারে গোটা আণ্টেক কলার ঝাড় সবেগে উপড়ে গিয়ে জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। আর অমনি দেখলুম, দুহাত দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যমদূত-সদৃশ বিরাট এক টাস্কার। চুপিসাড়ে কলাগাছ খেয়ে যাচ্ছিল। আমার এক্সট্রা র-নস্যির কিছুটা হয়ত বাতাসে উড়ে ওর শুঁড়ের ফুটোয় ঢুকে গেছে। আর তাইতেই এই বিপর্যয়। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সেই অপ্রস্তুত দাঁতালের শুঁড়টা বাঁহাতে চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে মাথাটা নুইয়ে আনলাম, তারপর ডানহাত দিয়ে পকেট থেকে লাল টুকটুকে একটা টিপ বের করে থুথু দিয়ে ঝটিতি তার কপালে সেঁটে দিলাম। বললাম, জিমু, ফায়ার। কিন্তু কোথায় জিমু? দেখলাম, বেচারা তখনও পজিশন নিতে পারেনি। ইতস্তত করছে। আমি তৎক্ষণাৎ শুঁড় ধরে টেনে হাতির মুখটা জিমুর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। সত্যি, ছোকরার টিপটা প্রশংসা করার মতই। ঐ এক গুলিতেই মিকির পাহাড়ের সাক্ষাৎ শমনটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর উঠল না।

ব্রজদা চুপ করে গেলেন।

—আপনাকে কোন জানোয়ার কখনও বিপদে ফেলে নি ব্রজদা ?

—ফেলে নি আবার ! ব্রজদা নড়েচড়ে বসলেন। একবার একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারেই আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। এ তোদের ব্রজদার উপর দিয়েই যায়। ব্রজদারও ব্রজদা বলতে পারিস তাকে।

সুনীত সাহস করে বলে ফেলল, এ-তো তাহলে জবর টাইগার।

ব্রজদা বললেন, হ্যাঁ, বড় অদ্ভুত বাঘ। শুধু ধোপানী ধরে খেত। তাও সবটুকু খেত না। শুধু হাত দুখানা খেয়ে ফেলত।

সে কী, কেন ?

ব্রজদা বললেন, অম্বলের ব্যামো ছিল বোধ হয়। ধোপানীরা তো সোডা দিয়ে কাপড় কাচে। হাতে নিরন্তর সোডা বা ক্ষার লেগে থাকে। তাই খেয়ে হয়ত টেম্পরারি একটা রিলিফ্ পেত। ওরা অকারণে তো কারোর ক্ষতি করে না ! ভালো ভালো শিকারীর বই পড়ে দেখিস, জানতে পারবি।

এই বাঘটা আমাকে খুব ধোঁকা দিয়েছে। খুব ভুগিয়েছে। ওটাকে মারবার জন্য আমি গোটা ইন্ডিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি। পায়ের দাগ ধরে ফলো করতে করতে বার্মা সিলোন পর্যন্তও চলে গেছি। ধোপাদের এমন একটা আড্ডা ভারতে নেই, যেখানে আমি যাইনি। কিন্তু বৃথা। যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি হাহাকার। শয়তানটা স্বাভাবিক বুদ্ধিবশে এটা বুঝেছিল, ধোপাদের চাইতে ধোপানীদের কাবু করা সহজ। জানিনে চন্ডীদাস পড়েছিল কিনা। সাত বছরে সে দুহাজার পাঁচশ পঞ্চান্নটা ধোপানীকে ঘায়েল করেছিল।

ওর ধোপানী মারার রহস্যটা আমার কাছে যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন আমি একদিন ঢাকুরের এক ডোবায় ধোপানীর ছদ্মবেশে কাপড় কাচতে শুরু করলাম। লোডেড রাইফেলটা বাঁ হাতের কাছে একটা কাপড়ের পুটুলির নিচে লুকিয়ে রাখলাম। আমি জানি, বাঘ আজ এখানে আসবে। পায়ের তাজা ছাপ ডোবার পাড়ে দেখে বুঝলাম, রাত্তিরে এসে ও জায়গাটা সার্ভে করে গেছে।

ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে কাপড় কেচে চলেছি। কান দুটো খাড়া। দুপুর বেলা রোদ্দুর চড়চড় করছে। অনেকক্ষণ সেই পচা জলে দাঁড়িয়ে থাকায় পা চুলকুচ্ছে। সব সহ্য করছি। আজ এস্পার কি ওস্পার। হঠাৎ পিছনে জলে সামান্য একটা শব্দ হল। চট্ করে চেয়ে দেখলাম, কিছুই নেই। যেই আবার সামনে ফিরেছি, অমনি দেখি বাঘ। একেবারে পাড়ের উপর থাবা গেড়ে বসে জিব দিয়ে ঠোঁট চাট্ছে। চট্ করে রাইফেলটার দিকে হাত বাড়ালাম। কিন্তু কোথায় রাইফেল ? ঠাহর করে চেয়ে দেখি বাঘ সেটাকে কোন্ ফাঁকে সরিয়ে

নিয়েছিল, এখন সেটা ল্যাজে খেলাচ্ছে। কোন উপায় না দেখে উটপাখীর মত আমিও তৎক্ষণাৎ চোখ বুজে ফেললাম।

ব্রজদা গম্ভীর ভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম, তারপর ?

ব্রজদা ম্লান হেসে বললেন, এর পরেও কি আর তারপর থাকে রে বোকা ? তারপর বাঘটা আমাকে খেয়ে ফেলল।

যাঃ ! সুনীত প্রতিবাদ করল। কি যে বলেন ? এই তো দিব্যি বেঁচে রয়েছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রজদা ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, দ্যাখ তোদের ব্রজদা যে চোখে একদিন বাঙ্গালীর ছেলে বিজয় সিংহকে লঙ্কা জয় করতে দেখেছে, আজ সেই চোখেই তাকে দেখতে হচ্ছে, বাঙ্গালীর ছেলে চারদিক থেকে মার খেয়ে পালিয়ে বাড়ীর দরজায় এসে নেড়িকুত্তার মত কেঁউ কেঁউ করছে। একে কি তোরা বাঁচা বলিস।

চণ্ডী লাহিড়ী

কুকুর নিয়ে মহাভারত

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আবিষ্কার করলাম, আমার ঘরের সামনের রাস্তায় একটি কুকুরের মৃতদেহ। বোধহয় বয়োবৃদ্ধ শরীরে রাত্রের প্রচণ্ড বর্ষণ তার সহ্য হয়নি। ভোর রাত্রে বর্ষার জল নেমে গেছে। পড়ে আছে অবাঞ্ছিত কুকুরের শব। বেচারীর পেটটি ফুলে উঠেছে। পচনও সুরু হয়েছে। আশংকিত হলাম। কাল শনিবার হাফ-ডে, রবিবার বন্ধ, সোমবার ছুটির হাওয়া, মঙ্গলবার স্বাধীনতা দিবসের ছুটি, অর্থাৎ সর্বকর্মনাস্তি। এখনই সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আজই।

দেখে মনে হল জীবদ্দশায় ওকে কেউ কোনদিন পোষেনি। পেডিগ্রী নেই। দুমুঠো পেট ভরে কোনদিন খায়নি। মানুষের সঙ্গে ডাস্টবিনে লড়াই করতে করতে রণে ভঙ্গ দিয়েছে চিরদিনের মত। মরে অবশ্যই শান্তি পেয়েছে। এখনই লাসটার গতি করা দরকার। এখনই। লাস কখনো লাসটিং করেনা।

বাড়িতে যে মেথর কাজ করে তাকে ডাকলাম। মড়াটা দেখেই সে চমকে

।।

—না বাবু, কুকুরের মড়া ফেলা ডোমের কাজ।

আমি মেথর।

জ্ঞানলাভ হল। রাস্তায় এলাম। লুঙ্গিপরা কালো চেহারার একজনকে ঝাড়ু হাতে দেখে সোজা তার সামনে গিয়ে মুখখানা বিনয়ে উদ্ভাসিত করে প্রশ্ন করলাম,—

—তুমি কি মরা কুকুর ফেল?

—না, আমি ঝাড়ুদার।

লোকটার কণ্ঠস্বরে অগ্নিবর্ষণ হল। ভয় হল, ঝাড়ু দিয়ে আমার পিঠেই চারুকর্ম সুরু করে বুঝি? কলকাতার এই এক সমস্যা। যাকে মেথর মনে করি, সে হয় ঝাড়ুদার। যাকে ঝাড়ুদার মনে করি, সে বলে আমি জমাদার। জাততো কারো পিঠে লেখা থাকে না।

এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন, ডোম পাওয়া যায় মেডিকেল কলেজে। শ্মশানঘাটেও দেখা মেলে। রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্বস্ব হারিয়ে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে ডোম হয়েছিলেন। হাসপাতালে ডাক্তারের হাত থেকে হয়তো রেহাই পাওয়া যায় কিন্তু ডোমের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। পরনের শেষ লেংটিও তারা খুলে নেয়।

হাসপাতালেই ফোন করলাম। সেখানে ডোম আছে, তারা মরা মানুষ নিয়ে কারবার করে। মানবেতর কোন প্রাণীর গায়ে হাত দেয় না। সাফ জবাব।

লাসটা ইতিমধ্যে আরও ফুলে উঠেছে। সম্ভবত অহংকারেই। সর্বাঙ্গ ফুলিয়ে সে সম্ভবত ঘোষণা করতে চায়।

—আমার গায়ে হাত তোলে সাধ্য কার!

নাকের দায় এখন প্রাণের দায়ের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। ফোন করলাম কর্পোরেশনে। যিনি অপর প্রান্তে ধরলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল মৌতাতে ছিলেন। আমার কথা কানে যেতেই চমকে উঠলেন।

—মরা কুকুর! কুকুর আবার মরে নাকি। কুকুর তো জ্যান্ত অবস্থায় চারপায়ে হেঁটে সোজা স্বর্গে চলে যায়। পড়েন নি মহাভারত?

সেই পৌরসভাতেই আর একজনকে এবার ডাকলাম।

—একটা লাস পড়ে আছে। গন্ধ ছড়াচ্ছে।

—পুলিসে খবর দিন।

—কিন্তু মরে গেছে কুকুরটা। তারই লাস······

—তাহলে সি-এস-পি-সি-একে রিং করুন।

—কিন্তু কুকুরটা মরে গেছে। লাসটা ফেলবার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে……

—এক নম্বর ডিস্‌ট্রিক্‌ট্‌কে জানান। তাদের কারকাস্‌ ভ্যান আছে।

অগত্যা এক নম্বরেই ফোন করলাম।

—দেখুন একটা মরা কুকুর পড়ে আছে আমার বাড়ির সামনে। দয়া করে লাসটা যদি……

—মরা কুকুর! ভদ্রলোক কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভঙ্গী করলেন যেন সেটা তাঁর টেবিলে প্লেটে সাজিয়ে কাঁটা চামচসহ পরিবেশন করা হয়েছে।

—মরা কুকুর নিয়ে আমাদের কোন কারবার নেই। আমাদের ডগ স্কোয়াড আছে। র‍্যাবিড ডগ, রাস্তার কুকুর যারা খেপেছে বা যারা খেপতে পারে বা পাড়ার লোকদের খেপিয়ে তুলেছে তেমন কুকুর ধরে আমরা গাড়িতে তুলি। পরে গ্যাস চেম্বারে পুরে……

—সেই গাড়িটাই দয়া করে পাঠিয়ে দিন দাদা। সেটার জন্যই এই প্রার্থনা। কুকুরটা মারতে হবে না। বড়ই বিবেচক কুকুর। আপনাদের ঝামেলা কমাবার জন্য নিজেই মারা গেছে।

—মরা কুকুরের জন্য চার নম্বর ডিস্‌ট্রিক্‌টে ফোন করুন। তাদের ডোম আছে।

তাই করলাম। চার নম্বর উপদেশে সোচ্চার হয়ে উঠলেন—হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেন্টকে ফোন করুন সর্বাগ্রে। আবহাওয়া শোধনের জন্য ব্লিচিং পাউডার, অগুরু সেন্ট, অডিকোলন এসব কিনে রাখুন। একটু গঙ্গাজলও সেই সঙ্গে। একটা নামাবলী, কিছু খই, তামার পয়সা, একটা পেরেক।

—মশাই ঠাট্টা ইয়ারকির সময় নয় এখন। পেরেকটা আপনার মাথায় পুঁতলে ভাল হয় জানি।

পেরেকের ভয়েই কিনা জানিনা, ভদ্রলোকের সুর পাল্টালো।

—মশাই, হেলথের কাছ থেকে ডেথ সার্টিফিকেট না পেলে আমরা মড়া ছোঁবনা। নচেৎ খরচা করুন।

এবার হেলথের সঙ্গে লড়াইয়ের পালা।

—না মশাই, ডেথ-সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। মানুষ মরলে না হয় কথা ছিল। কুকুরের জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করলে কাউন্সিলাররা হৈ চৈ করবে। তার চেয়ে বরং সোজা লালবাজারে ফোন করুন। পুলিশকে জানান।

দুর্গন্ধটা এখন রাস্তা থেকে একেবারে শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছে। ভাত,

ডাল পেটে যাওয়া দূরের কথা, আশৈশব যা গলাধঃকরণ করেছি তাও সুদসহ বের হয়ে আসতে চাচ্ছে।

এবার লালবাজার। আর্ত চিৎকার শুনলে পুলিশ নাকি ছুটে আসে। গলায় সেজন্য ভয়ার্তনাদ ধ্বনিত করে বললাম—গাড়ি পাঠান দাদা। শিগ্‌গির। একটা কুকুর মরে পচে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। আহার নিদ্রা বন্ধ। দোহাই দাদা, তাড়াতাড়ি।

—মরা কুকুর! রঙ?

—ব্রাউন রঙ, ঘাড়ের কাছে সাদা।

—ঠিক ব্রাউন তো? ভাল করে দেখুন, লেজের কাছে কালো রঙ?

—থাকেই যদি, তাতে কি গন্ধ কিছু কমবে?

—এটা লালবাজার। যা বলছি, কথার জবাব দিন। গলায় বক্‌লেস আছে?

—পথের কুকুর। পথে মরেছে। বক্‌লেস থাকবে কেন?

লালবাজার থেকে সত্যিই গাড়ি এল। সঙ্গে দারোগা, পুলিস, ফোরেনসিক এক্‌স্‌পার্ট ইত্যাদির বিশাল বাহিনী। তাঁরা এসেই কুকুরটা দেখতে চাইলেন।

আমি চেঁচিয়ে বললাম—সরান মশাই, গন্ধটা একদম সহ্য হচ্ছে না।

—সেই সঙ্গে আপনাকেও সরাবো। যাঁর কুকুর তাঁর বাড়িতে ডাকাতি হয়। ডাকাতরা সরে পড়ার পর দেখা গেল কুকুরটাও সরে পড়েছে। আমাদের ধারণা, ডাকাতরা যাবার সময় কুকুরটা সরিয়ে ফেলেছিল। তারপর সেই নিখোঁজ কুকুরের সন্ধান পাওয়া গেল আপনার বাড়ির দরজায়। ডাকাতির শেষ প্রমাণ লোপের জন্য আপনি কুকুরটার লাসটা সরিয়ে ফেলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। চলুন থানায়।

আশা দেবী

কবরী কাব্য

বিষ্ণুচরণ চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। বাসর ঘর এখন খালি। ধীরে ধীরে সে উঠলো। দরজার কাছে এগিয়ে গেলো এবং নিপুণ হাতে দরজাটি বন্ধ করে দিলো। তারপর আবার তেমনি ধীরপদে বিছানার ওপর এসে বসলো। একপাশে বিজলীলতা বসেছিল। তার গায়ের রং কিঞ্চিৎ কালোই; নাকটা একটু চাপা—"খেঁদী" বলে একটা নেপথ্য নামে কেউ কেউ তাকে পেছন থেকে ডেকেও থাকে; চোখ দুটো তার পটলচেরা না পটলতোলা—এ নিয়েও কিছু কিছু মতভেদ আছে।

কিন্তু রং-নাক-চোখ আপাতত বিষ্ণুচরণের কাছে গুরুতর নয়। সে কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে স্ত্রীর পর্বতচূড়া সদৃশ কেশদামের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর আবেগভরা গলায় রাষ্ট্রভাষায় বলে ফেললে: কই বাত নেই—এমন মেঘের মত চুল, তাতে মাথা ভরা খোঁপা। এমন কজনের ভাগ্যে ঘটে? এমন কালো চুলে তুমি খোঁপা বেঁধো না—এলিয়ে দাও, নেমে আসুক আমার হৃদয়ের ওপরে নিবিড় রজনীর মতো—বলে হাত বাড়িয়ে চুল খুলতে যেতেই বেড়ালের মতো থাবা তুলে বিজলীলতা বিষ্ণুচরণের হাতের ওপর এক চড় মারলো।

চট করে ব্যাপারটা বোধগম্য হলো না বিষ্ণুচরণের। থাবড়াটা আরো রহস্যময় বোধ হলো। থাক তা হলে—আজ রাত্রে ওই কেশচূড়া নিবিড়তাতেই নিমগ্ন হয়ে থাকুক। আগামীকাল ওর গভীর গহনে মগ্ন হওয়া যাবে। বিষ্ণুচরণের মনে কিঞ্চিৎ কবিত্বের উদয় হলো। মশারির নেটের ভেতর দিয়ে ছাতের কড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে মনে মনে পদ্য বানাতে লাগলো : "তোমার কালো কেশের মাঝে কী যে আছে, কী যে আছে, তাইতো আমার পরাণ নাচে।" কিন্তু চতুর্থ লাইনটা কিছুতেই আসছে না। হঠাৎ কোত্থেকে একটা বেয়াড়া লাইন এসে গেল : "চড়ব আমি আমড়া গাছে—"—দুত্তোর—এর মধ্যে আবার—আমড়া গাছে চড়া কেন? নাকি বউয়ের মাথাটা আমড়া গাছের মতো দেখাচ্ছে, আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ বিষ্ণুচরণ যখন কবিতা মেলাচ্ছিল, সেই ফাঁকে বিজলীলতা ঘুমিয়ে পড়েছে। অল্প অল্প নাকও ডাকছে তার ফুরফুর করে। কিন্তু স্ত্রীর নাকের ডাক স্বামীর কানে যেন গানের মত গুণগুণ করতে লাগলো। অনেক দিনের দুঃখ তার দূর হয়েছে। সাক্ষাৎ কেশবতী কন্যা এসে ঘর আলো করেছে তার।

চুলের ব্যাপারে তার নিজের দুঃখের সীমা নেই। বারো বছর না পেরুতেই চুল ওঠা শুরু, বাইশে একেবারে সাফ চাঁদিটি যেন কালো-মার্বেল দিয়ে বাঁধানো, বসতে গেলেই মাছির পা পিছলে যায়। তারপর মাথায় যত তেল মেখেছে, সেগুলো ধরে রাখলে কলেজ স্কোয়ারের পুকুর ভরে যেতো। কিছুতেই কিছু হলো না। এর মধ্যে কে যেন বললে, মাথায় কাঁচা গোবর মাখিয়ে রাখলে চুল গজাবে—দেখিস না মাঠে গোবর পড়ে থাকলে সেখানে কি রকম ঘাস হয়? গোবরের গন্ধে বাড়ীর লোক জেরবার হয়ে গেল, কিন্তু কোথায় চুল? তারপর গাঁদাল পাতা ঘষে ঘষে গন্ধমাদন হয়ে গেল—টাক তেমনি রইলো উজ্জ্বল হয়ে। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে হাল ছাড়লো সে। সেই দুঃখ এতো দিনে মিটিয়েছে তার বউ। কী খোঁপা! চুল খুলে দিলে বোধহয় পায়ের গোড়ালিতে পৌঁছে যাবে। বিষ্ণুচরণের গলায় গান এসে গেলো—'এমন বিরাট খোঁপা কাহার, কোথায় এমন চুলের পাহাড়'।

: উ—উ—উঃ!

ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ককিয়ে উঠলো বিজলীলতা।

: কী হলো?—বিষ্ণুচরণ চমকালো

: না—কিছু না—আঃ—ইঁ!—আবার কাতরোক্তি বিজলীলতার।

: মাথা ধরেছে? টিপে দেবো?

ঃ না—ঠিক আছে। আমার কিছু হয়নি। উ—উফ্।

ঃ কিছু হয়নি, তবে কাতরাচ্ছ কেন? বিষ্ণুচরণ দারুণ বিস্মিত হলোঃ মার জন্যে মন খারাপ করছে বুঝি?

ঃ না—না, তুমি থামো না!—বলেই একটা ঝামটা মারলো বিজলীলতা, পরক্ষণেই আবার ঃ ই—ই ইস। নারীর হৃদয়-রহস্য বোঝা শক্ত। তা নিয়ে অবশ্য কবিতা লেখা যায় কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই যদি সে রহস্য জটিল হয়ে ওঠে তাহলে ভারী মুশকিল! তারপর আবার দারুণ একটা মুখঝামটা খেয়ে বিষ্ণুচরণ আরো ঘাবড়ে গেল। সুতরাং বিজলীলতাকে আর না ঘাঁটিয়ে নিদ্রা দেবারই চেষ্টা করলো সে। কিন্তু ঘুমোয় সাধ্য কার? এক একবার 'উ—উফ্' পরক্ষণেই 'ই—ই—ঈস'।

রাতটা তো কাটলো, কিন্তু দারুণ দমে গেল বিষ্ণুচরণের মনটা। কেশশোভা বউ-এর তো ভালই কিন্তু ওরকম দাপাদাপি করে কেন? মাথার গোলমাল আছে নাকি কোনরকম? কিন্তু জিজ্ঞেস করতেই গেলেই যে খ্যাঁক করে ওঠে। লক্ষণ তো ভালো নয়।

নাকি আরো কিছু আছে?

সন্দেহের নিবিড় মেঘজাল তার মনে বিকীর্ণ হতে থাকলো। তবে কি এর আগেই বিজলীলতার জীবনে আর কোনো পুরুষের ছায়া পড়েছিল? তাকে না পাওয়ার ব্যথাই কি এমন জর্জরিত করেছে তাকে? তার স্মৃতির কাঁটাই কি ওর হৃদয়ে চট সেলাইয়ের ছুঁচের মতো প্যাট-প্যাট করে খোঁচা মারছে? সর্বনাশ! ভাবতেই মাথার চুল খাড়া হতে চাইলো, কিন্তু চুল নেই বলে গোটা টাকটা শিরশির করতে লাগলো তার। ভেবে ভেবে থই না পেয়ে—অত্যন্ত বিভ্রান্ত হৃদয়ে, বিষ্ণুচরণ অগত্যা ষষ্ঠীদার চায়ের দোকানে কাপ তিনেক চা খেতে চলে গেল। সকালবেলায় বউ উঠল। কেশবতী পুত্রবধূর গর্বে গর্বিতা শাশুড়ী বললেন ঃ দ্যাখো ঠাকুরঝি কেমন বউ এনেছি ধরে। তোমরা বলতে ছেলের মাথায় টাক। বউ-এর মাথার চুল আমার সে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে।

ঃ সত্যি ভাই কেমন মাথাজোড়া খোঁপা, দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। বউ—এসো। আমি তোমার চুল বেঁধে দেব। আহা, বাঁধবার মতোই চুল।

কিন্তু বিপত্তি দেখা দিলো। বউ জানালো যে সে চুল খুলবে না। আর সে কারো কাছে বাঁধতেও চায় না।

ঃ হ্যাঁ গো কত করে ঠাকুরঝি ডাকছে, যাও না বউমা! ওদের কতদিনের সাধ, ওরা বিষ্ণুর বউ-এর চুল বাঁধবে।

ঃ আজ থাক মা। বলেই বিজলীলতা উঠে পড়লো এবং—

ঃ ও মা গো—গেলুম বলেই অকস্মাৎ একটি লাফ।

ঃ লাফাচ্ছ কেন বউমা? শাশুড়ী এবং পিসশাশুড়ী একসঙ্গে হতবাক ঃ কী হয়েছে?

কী আবার হবে, কিস্সুই হয়নি। —বলে বিজলীলতা খোঁপা আঁকড়ে ধরে আবার প্রাণপণে নাচতে লাগলো ঃ গেছিরে—খেয়ে ফেললোরে—ই"—ই"—ই"স।

ঃ কিসে খেলে? কোথায় খেয়ে ফেলল?—দুই স্তম্ভিত মহিলা ছুটে এলেন বউয়ের দিকে।

ঃ খবরদার—কাছে আসবেন না বলে দিচ্ছি—বউয়ের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুল ঃ আমার মাথায় হাত দিলে যা—তা কাণ্ড হয়ে যাবে।

তারপরেই দড়াম করে ঘরের দোর বন্ধ। ননদ-ভাজ কিছুক্ষণ স্তব্ধ। যেন দু-জনের শোক-সভা।

কথা বলবার আগে—না চিবিয়েই একগাল পান গিলে ফেলতে গিয়ে ননদ দারুণ একটি বিষম খেলেন, খক খক করে কাসলেন খানিকটা, তারপর বললেন, বউদি?

ঃ অ্যাঁ?

ঃ কোবরেজ।

ঃ কিসের কোবরেজ?

ঃ বউয়ের মাথা দেখাও। অসুখ আছে। বউদি সভয়ে বললেন ঃ কিসের অসুখ?

ঃ ওই যে—মগজে কী যেন হয় মাথার ভেতর থেকে থেকে যেন কুর-কুর করে কামড়ায়। আমার আঁদুলের মাস-শ্বশুরেরও হতো। এই বসে রয়েছেন ভালোমানুষ—তামাক খাচ্ছেন, হঠাৎ হুঁকো-টুকো ফেলে শিবের গাজন নাচতে লাগলেন ঃ গেলুম—গেলুম মাথা গেল। হুবহু সেই লক্ষণ। বলতে না বলতেই বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে চাপা আর্তনাদ ঃ ই"—ইস গেছি—গেছি!

ননদ বললেন, শুনলে?

বউদির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল?

ঃ কী হবে ঠাকুরঝি? এই রকম মাথার ব্যারামওলা বউ নিয়ে বিষ্ণুকে ঘর করতে হবে নাকি? চোখের অবস্থা দেখলে না তখন বউয়ের?—যেন মারে আর কি! মাথার জ্বালায় রেগে মেগে আমার ছেলেটাকে যদি আঁচড়ে কামড়ে

দেখ তা হলে বাছার তো নির্ঘাত জলাতঙ্ক। ধনুষ্টংকারও হতে পারে। বলতে বলতে বউদির কান্না এসে গেল ঃ—কেউ তো তখন বললো না যে মেয়ের মাথায় অসুখ। এখন কী হবে ?

ঃ তা কেউ বলে আগে ? পার করতে পারলেই নিশ্চিন্ত ! তা এতো ভেবো না বউদি ! উলুবেড়ের মাখন কোবরেজকে জানো ? সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ছিলেন। তিনি আমার মামাশ্বশুরের চাঁদি খানিকটা কামিয়ে দিয়ে পুরোনো ঘি মালিশ করাতেন। তাতেই সেরে গেল। পুরোনো ঘি আছে তোমার ঘরে ?

ঃ তা আছে। বছর ত্রিশেক আগের।

আবার ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার উঠল ঃ ইঁ—ইঁ—উফ্—গেলুম রে।

ননদ বললে ঃ ওই শোনো বউদি ! না, আর দেরি কোরো না—পরামানিক ডাকাও।

বিষ্ণুচরণ ষষ্ঠীদার দোকান থেকে চার কাপ চা, দুটো ওমলেট, ছ'খানা টোস্ট আর বারোটা বিড়ি খেয়ে অত্যন্ত উদাসভাবে বাড়ী ফিরছিলো। তার চিত্তে সংশয়ের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। কেন বিজলীলতার সারারাত এই মনোবেদনা ? কিসের জন্যে ? কার জন্যে ? তার হৃদয়ের দিগন্তে কেউ কি ছিল ? কবে ছিল ? কেন ছিল ? কোথায় ছিল ? এই সব কে-কি-কেন-কবে-কোথায় এমন ঘোরতর ভাবে তাকে যাতনা দিতে লাগলো যে, তেরো নম্বর বিড়িটা ধরিয়েই সে মাটিতে ফেলে দিলো। তারপর বাড়ীতে পা দেবার আগের মুহূর্তে স্থির সংকল্প করলো—না, বোঝাপড়া করতে হবে। বিজলীলতাকে কথাগুলো পরিষ্কার জিজ্ঞেস করা দরকার। আমি তোমার বিবাহিত স্বামী আর আমার ঘরে থেকে তুমি আর একজনের জন্যে আঃ—উঃ—ইস—উফ করবে।—এ চলবে না, চলতেই পারে না। ইম্পসিবল।

ঃ মা, বউ কই ?

মেঘের মতন গলায় মা বললেন ঃ ঘরের ভেতর। থেকে থেকে ওখানে দাপিয়ে দাপিয়ে উঠছে।

বিষ্ণুচরণ কঠিন গলায় বললো ঃ ওকে বেরুতে বলো।

মা বললেন ঃ তুমিই বলো। পরামানিক ডেকেছি এখনি এসে পড়বে।

ঃ পরামানিক কেন ? বিষ্ণুচরণ নিবিড়ভাবে বিস্মিত হলো।

ঃ মাথার অসুখ—ঠাকুরঝি বলে গেল চাঁদি একটু চেঁছে খানিক পুরোনো ঘি মালিশ করে দিলেই সেরে যাবে। একটা প্রাণান্তকর দুর্গন্ধ উঠেছিল ;

এতক্ষণে তার রহস্য বোঝা গেল। মা-র হাতে মুখ খোলা একটা বোয়ামে কিছু তরল কালো রঙের পদার্থ! চারিদিক মাত হয়ে যাচ্ছিল তার সৌরভে। বিষ্ণুচরণ ঘাবড়ে গেল। ওই বস্তু মাখাতে হবে বউ-এর মাথায়। এবং ওই ঘন নিবিড় চুল চেঁছে ফেলে!

ঃ মা—ঘি-টায় বেজায় দুর্গন্ধ।

ঃ পুরোনো ঘি থেকে কার আর গোলাপ ফুলের সুবাস বেরোয় বাছা! মার মুখ ব্যাজার হলো।

কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বিষ্ণুচরণ। কিন্তু তবু কোথা থেকে যেন শান্তি এবং সান্ত্বনার একটা শীতল বাতাসও বয়ে গেল তার প্রাণের ভেতরে। যদি সত্যিই মাথার ব্যারাম হয় এবং পুরোনো ঘিয়ে যদি তা সারে তবে আর দুঃখ কিসের? বউয়ের দিন কয়েক কষ্ট হবে, বিষ্ণুচরণেরও সুখে কাটবে না—নাকে রুমাল বেঁধে ঘুমোতে হবে—কিন্তু তারপরেই তো ঠিক হয়ে যাবে সমস্ত। আর মনের মধ্যে ওই কুটিল সন্দেহের জ্বালা। নাঃ, চাঁদিই চাঁছা হোক। চুলের জন্যে ভাবনা কি—অমন যার নিবিড় কেশদাম চাঁছা জায়গায় সাতদিনেই তার বেনাবন গজিয়ে যাবে।

পাড়ার নেপাল পরামানিক এসে হাঁক দিলো ঃ মা ঠাকরুণ ডেকেছেন?

ঃ হ্যাঁ বাবা, এসো! বিষ্ণু—বউমাকে বেরুতে বল—

তারপরেই নাটক জমে উঠলো।

ক্ষুর হাতে নাপিত, ঘিয়ের ভাঁড় হাতে মা নৃত্যরতা এবং বিমূঢ় বিষ্ণুচরণ। অপরূপ দৃশ্য।

ঃ খোঁপা খুলব না—না—না—ই—ই ইঁ—ঈস—এবার বিষ্ণুচরণের চকিতে 'কপালকুণ্ডলার' কথা মনে পড়ে গেল। 'অহং ব্রাহ্মণবেশী'—এই চিঠিটা লুকোনো ছিল না কপালকুণ্ডলার চুলে? তার বিজলীলতার এতো বড় খোঁপা। একখানা কেন—একশো প্রেমপত্রও লুকোনো থাকতে পারে ওতে। কে জানে—বিজলীলতা তার মাথার গোটা একটা—পোষ্টাপিসই বয়ে বেড়াচ্ছে কিনা।

কঠিন স্বরে বিষ্ণুচরণ বললে ঃ আমার আদেশ খোঁপা খোলো—এই মুহূর্তেই খোলো।

ঃ না—না—না। উঃ গেলুম—বলেই বিজলীলতা আবার একপাক নেচে এলো উঠোনে। তারপর—

তারপর যে সমস্যার সমাধান করলো সে বাড়ীর বনেদী হুলো বেড়ালটা। অনেকক্ষণ ধরেই সে নীরবে এবং গম্ভীর ভাবে কী যেন লক্ষ্য করছিল

বিজলীলতার মাথায়। হঠাৎ উর্ধ্বদিকে সে একটি লাফ মারলো পড়লো বিজলীলতার মাথার ওপর—।

বিজলীলতা আঁই-আঁই করবার আগেই বিশাল খোঁপা এবং হুলোর ভূতলে পতন, খোঁপা থেকে একটি অর্ধমৃত নেংটি ইঁদুর নিষ্ক্রমণ এবং সেটি মুখে নিয়ে হুলোর অন্তর্ধান ;

আবার মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা।

বউয়ের মাথায় চকচকে একটি টাক রোদে ঝিলমিল করছে ঝিলের জলের মত। নকল খোঁপায় কখন ঢুকে পড়েছিল একটি নেংটি ইঁদুর—বয়েসে তরুণ এবং তাই দাঁতে যথেষ্ট ধার নেই বলে নিবিড় নাইলনের জাল কেটে বেরুতে পারেনি, বিরক্ত হয়ে মধ্যে মধ্যে বিজলীলতার চাঁদি কামড়ে পথ খুঁজতে চেয়েছে। এবং তার ফল—

সব স্তব্ধ। ক্ষুর হাতে নরসুন্দর, ঘিয়ের ভাঁড় হাতে মা, নীরব নিথর নববধূ এবং হাঁ করা মুখে বিষ্ণুচরণ।

অতঃপর যবনিকা পতন।

কিন্তু শেষের পরও শেষ থাকে 'যেমন সলতে পাকাবার পর প্রদীপ জ্বালানো।'

রাত্রে বউয়ের ইঁদুর-দংশিত টাকে হাত বুলিয়ে সস্নেহে ক্ষমাশীল স্বামী বিষ্ণুচরণ বললে, দুঃখ কি খেঁদু। তোমারও টাক, আমারও টাক। যাকে বলে রাজযোটক। বিজলীলতা তখনও ফোঁপাচ্ছিল। স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে বললে : হুঁ—আ—চ্ছা।

হিমানীশ গোস্বামী

স্ক্রিপ্ট বহির্ভূত

ভপ্‌···ভপ্‌···ঘট্‌···ঘটাং·· সাই···সিনেমার ছবি তোলা হচ্ছিল, নায়ক বলছিল নায়িকাকে, এই সুন্দর বাড়ির, এই সুন্দর সময়, আর আমরা দুজনে এখানে, কি সুন্দর···হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, পেছনের পুকুরে একটা ফুটবল এসে পড়ল। ছলাৎ করে আওয়াজ হল। নায়ক সেদিকে স্ক্রিপ্ট বহির্ভূত ভাবে তাকালেন। ভ্রু দুবার কোঁচকালো, ফলে কপালে সব সমেত এগারোটা রেখা গোনা গেল। সাধারণত তাঁর কপালের রেখার সংখ্যা থাকে গড়ে সাড়ে চার করে। যিনি ক্যামেরা ধরেছিলেন তিনি ক্যামেরাটিকে ঠিক সময়ে থামাতে ভুলে গেলেন, ফলে বেশ কয়েক গজ ফিল্মে নায়কের ঐ কপাল কুঁচকে যাওয়ার ক্লোজ-আপ উঠে গেল। এই সময় পরিচালক মশাই, বেশ একটা তরুণ বয়স্ক, চঞ্চল-মতি একটি রক্তপায়ী মশাকে নিবিষ্টভাবে মারতে চেষ্টা করছিলেন বলে তিনি, 'কাট' বলতেও পারলেন না ঠিক সময়ে। অবশ্য সেই কারণে, এবং আরো অনেক কারণে প্রত্যেকেই বুঝতে পারল এই দৃশ্যটা আবার তুলতে হবে। নায়ক মুখ ব্যাজার করে একটা সিগারেট ধরালেন, নায়িকা মুখে যতখানি সম্ভব আবার পাউডার মাখালেন। ক্যামেরাম্যান ছতু পকেট থেকে একটা গুণ্ডি পান

বার করে ফস্‌ করে মুখে পুরলেন আর পরিচালক মশাই তাঁর কপালে জমায়েত হওয়া শিশির বিন্দুর মত আধ আউন্সটাক ঘাম রুমালে শুষে নিয়ে পকেটে পুরলেন।

নাঃ এই নিরিবিলি, শহর থেকে একুশ মাইল দূরের বাগান বাড়িতেও শান্তিতে কিছু করার উপায় নেই। এই কথাটা পরিচালক মশাই ভাবলেন, আর হুকুম দিলেন, 'আবার সব প্রস্তুত করুন। ঠিক একই ভাবে। দিনের আলোর গতিক ভাল নয়। রোদ্দুর চলে গেলে রাত্রের দৃশ্য তুলবার বারোটা বেজে যাবে।' এই কথাটা বলার পরই পুকুরের ওপারের দেয়ালের উপর চারটি তরুণের মাথা দেখা দিল। কি করে যে দশ ফুট দেয়ালের উপর ছোকরারা উঠতে পারে, তা তিনি ভেবেই পেলেন না। ঐ চারটি মাথা কিন্তু কেবল দেয়ালের উপর উদয় হয়েই ক্ষান্ত রইল না, তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ও দাদারা— আমাদের একটা ফুটবল এদিকে পড়েছে দেখেছেন?' সহকারী ক্যামেরাম্যান একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ঘুম ঘুম চোখে একবার তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলেন। সহকারী পরিচালক চেঁচিয়ে বললেন, 'একটা ফুটবল পুকুরে পড়েছে!' সেই তরুণেরা চিৎকার করে হুকুম করলো, 'তা পড়েছে আর আপনারা মজা করে দেখছেন? এক্ষুণি ফেরত দিন, নইলে মেরে লাস করে কুত্তা লেলিয়ে দেবো।' বাপ্‌রে বাপ্‌ বলে কি ওরা? পরিচালক মশাই শঙ্কিত হলেন। মেরে লাস করবে আবার তার উপর কুত্তা লেলিয়ে দেবার কথা বলছে! পরিচালক মশাই এবারে নায়কের চাইতেও দ্বিগুণ ভাবে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তোমরা দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি।' কিন্তু ব্যবস্থা করছি বললেই তো হবে না, কে পুকুর থেকে বল তুলবে? তিনি ক্যামেরাম্যানকে বললেন, ছতুবাবু আপনি যদি…' ছতুবাবু বললেন, 'আমি টার্জান নাকি মশাই, ওসব পুকুরে নামাটামা আমার দ্বারা হবে না।' বলে ভুল করে তিনি দুটো পান মুখে পুরে দিলেন। এখন নায়ককেও কথাটা বলা যায় না। নায়ক যদি বল তুলতে গিয়ে ডুবে যায় তাহলে সকলকেই ডোবাবে। নায়িকাকে তো বলা যায়ই না, অবশ্য নায়িকাকে জলে নামাতে পারলে আর সেই ছবি তুলতে পারলে দর্শক ফুর্তি করবে খুব। কিন্তু পরিচালক মশাই নায়িকাকেও বলতে পারলেন না। এই সময়ে হঠাৎ অনুরোধ করলে নায়িকা বেঁকে বসতে পারে।

'ও দাদা, তাড়াতাড়ি করুন!' সেই তরুণ মাথার দল আবার চাড়া দিয়ে উঠল। কি আর করা যায়, কোথাও কেউ তেমন রাজি না থাকায় পরিচালক মশাই নিজেই জলে নামলেন। পুরো নয়—হাঁটু জল। সেখান থেকে কয়েকটা

ঢিল ছুড়ে বলটাকে পরপারে পে'ৗছে দিলেন। এই সময় নায়ক একটু ঘুরে ওপারে গিয়ে বলটাকে ধরে দেয়ালের বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। এই সময় সেই তরুণেরা নায়ককে চিনতে পেরে বলে উঠল, 'এ শালা অপলককুমার যে রে! এখানে নিশ্চয় বায়েস্কোপ উঠেছে!' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেয়ালের উপরেই প্রচুর মাথা দেখা গেল। পরিচালক আকাশের দিকে তাকালেন, ঘড়ির দিকে তাকালেন, জমায়েত হওয়া মাথাগুলির দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, আয় এক মিনিটের মধ্যে সব কাটুন এখান থেকে!' আর কি, পরিচালকের হুকুম। ভ্যানের মধ্যে ক্যামেরা উঠে গেল। জিনিসপত্র সাজসরঞ্জাম সব। অন্য গাড়িগুলির মধ্যে বিধিমত সবাই দৌড়ে গিয়ে উঠে বসলেন। তিন মিনিটের মধ্যে একদিনের জন্য ভাড়াকরা বাগানবাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ছবিতে ঐ ফুটবল দেখা গেল, জল ছলাৎ করে উঠল, আর নায়ক ভুরু কুঁচকে তাকালেন—এইটুকু সিনেমায় রাখতেই হল। পরিচালকের বন্ধু ছবির প্রথম প্রক্ষেপণ দেখে বললেন, "চমৎকার ছবি হয়েছে। শালা ফটাই ল্যাং খেয়ে যাবে এমন ছবি দেখলে।" পরিচালকের আর এক বন্ধু বললেন, "দারুণ কারবার করেছেন মশাই। ফটাই এবারে ফট্ করে ফেটে যাবে।" ফটাই হলেন অন্য এক পরিচালক।

পরিচালক তবু খুশী হলেন না। নায়ক নায়িকার কথার মাঝখানে দুম্ করে একটা ফুটবল এসে পড়ল, এ নিয়ে তাঁর দুজন বিশেষ বন্ধু কোনো মন্তব্যই করলেন না, এটা তাঁর কেমন যেন লাগল। তিনি ব্যাপারটাকে উসকে দেবার জন্য বললেন, "কোন জায়গাটা সবচাইতে ভাল লেগেছিল বলুন তো?" প্রথম বন্ধুর, সত্যি কথা বলতে কি, সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যেখানে নৌকোর উপর নায়িকা দাঁড়িয়ে আর হাওয়ায় শাড়ির আঁচলটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আর প্রথম বন্ধু ভাবছিলেন, আর একটু, আর একটু…কিন্তু তিনি গম্ভীর মুখে ভেবে বললেন, "ঐ যে ঘরে নিরিবিলি যেখানে কাঠের কোকিল হঠাৎ খড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, কু কু… কু কু…আঃ গ্র্যান্ড। কি দৃশ্য, কি ক্লোজাপ, কি এফেক্ট।" দ্বিতীয় বন্ধুর সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যেখানে নায়িকা পেটিকোট পরে কোন্ শাড়ি পরবে তাই ভাবছিল আর নেচে নেচে গান গাইছিল সেই দৃশ্যটি। কিন্তু তিনিও ভেবে বার করলেন ঃ "ঐ যে যেখানে আকাশে চিল উড়ছিল, নীচে মড়া নিয়ে যাচ্ছে, আর মোটা ব্যবসাদার লোভী লোভী চোখে ওষুধে ভেজাল মেশাচ্ছে। কি দারুণ সমাজ সচেতনতা!" পরিচালক মশাই তবু ঐ দৃশ্যের ব্যাপারে অন্ধকারে রইলেন। অতএব তিনি নিজেই একটু

আলোকপাত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "আচ্ছা, সেই রাত্রের দৃশ্যটা কেমন মনে দাগ কাটল বলুন তো, যেখানে নায়ক বলছে : এই সুন্দর রাত্তির, এই সুন্দর সময়, আর আমরা দুজনে এখানে কি সুন্দর...।'

"দারুণ!" দুবন্ধু উচ্ছ্বসিত হলেন।

"তারপর একটা ফুটবল এসে পড়ল জলে...।" পরিচালক মশাই বললেন।

"অসাধারণ।" প্রথম বন্ধু বললেন।

"ক্ল্যাসিক!" দ্বিতীয় বন্ধু বললেন।

"ডালিরও কনসেপ্শনের বাইরে।" প্রথম বন্ধু বললেন।

"আমার মনে হয়" দ্বিতীয় বন্ধু বললেন, "এমন সুন্দরভাবে আপনি দেখিয়েছেন আমাদের প্রেমের অনিশ্চয়তা...যা কিনা একটু খানি পুকুরের ঢেউ-এর মত, ছলাৎ করে ওঠে বটে, কিন্তু মিলিয়েও যায়। রেখে যায় সেই ঢেউ-এর চিহ্ন কপালের কুঞ্চিত রেখায়। মশাই, বলব কি ঐ দৃশ্যে আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। একটা ফুটবল যে মানুষের ইমোশানকে এমন নাড়া দিতে পারে তা আমার কল্পনায় ছিল না।"

"ফুটবল" প্রথম বন্ধু বললেন, "আমাদের দেশের একটা প্রাণবন্ত ব্যাপার। সেই ফুটবল এমনিতে গতিহীন। কিন্তু তাকে উপলক্ষ করে কত গতি, কত গুঁতোগুঁতি, কত যুদ্ধ।"

দ্বিতীয় বন্ধু বললেন, "ফুটবল জীবনকেই বোঝায়। যে জীবনে আছে খালি লাথি, আছে কষ্ট, আছে সব!

পরিচালক মশাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর প্রোডিউসারকে ফোন করে বললেন, "ছবি তৈরি। এবারে ডিস্ট্রিবিউটারকে বলতে পারেন।"

পরিচালক মশাই খুশী খুশী মুখে বসে ছিলেন। ছবি দারুণ উৎরেছে। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে। চল্লিশজন ফিল্ম সাংবাদিক তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। প্রশ্ন করেছেন একের পর এক। যথাসাধ্য তিনিও জবাব দিচ্ছেন। বোম্বাই-এর একটি সাপ্তাহিক কাগজের সাংবাদিক পরানজাপে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছবি তুলতে আপনার ক-মাস লেগেছে?"

"সাড়ে তিন মাস।" তিনি সবিনয়ে জানালেন।

"ফটাই একটা ছবি তুলতে সাত মাস লাগায়।" পরিচালকের বন্ধু জানালেন।

দিল্লীর একটি কাগজের প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার জীবনের সবচেয়ে ভাল ছবি কোনটি?"

পরিচালক মশাই বললেন, "বলা শক্ত।"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "প্রত্যেকটিই সবচেয়ে ভালছবি। ফটাই-এর মাত্র একটি।"

মাদ্রাজের সাংবাদিক কুপুস্বামী জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছবির কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গভীর বলে আপনার মনে হয়?"

পরিচালক মশাই বললেন, "বলা শক্ত।"

পরিচালক মশাই-এর বন্ধু বললেন, "যেখানে ফুটবল এসে পড়ল গভীর জলে। নায়ক চমকে উঠল।"

"বাই দি ওয়ে।" একজন বিদেশী সাংবাদিক বললেন, "দৃশ্যটা অদ্ভুত লাগল। ফুটবল। ফুটবলের এমন সুন্দর ব্যবহার এর আগে আমাদের চোখে পড়েনি।"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "ফটাই এ পর্যন্ত তার কোনো ছবিতেই ফুটবল দেখায়নি।"

"আচ্ছা, পরিচালক মশাই!" একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার প্রত্যেকটি ছবি দেখার পরই মনে হয় আপনি আসলে একজন সমাজদ্রোহী। সমাজের উপর আপনার এত রাগ, এত অনাস্থা কেন?"

পরিচালক মশাই বললেন, "বলা শক্ত।"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "ফটাই-এর সম্পর্কে কোন রকম ধারণাই নেই।"

"আচ্ছা পরিচালক মশাই।" একজন মহিলা সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ছবি তোলার ব্যাপারে আপনার স্ত্রী কি উৎসাহ দেখান?"

"বলা শক্ত।" পরিচালক মশাই জানালেন।

"শুনেছি আপনি নাকি এরপর দুটো ছবিতে একসঙ্গে হাত দিচ্ছেন? কথাটা কি ঠিক?" মহিলা সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন।

"বলা শক্ত।" পরিচালক মশাই বললেন।

"এ পর্যন্ত আপনি তো অনেক পড়াশুনা করেছেন—এ দেশের তরুণ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা আপনি কার মধ্যে দেখতে পান?" একজন সাহিত্য পত্রিকা থেকে প্রশ্ন করলেন।

"বলা শক্ত।" পরিচালক জানালেন।

"আচ্ছা", একজন বিদেশী প্রশ্ন করলেন। তিনি একটু দেরিতে এসে পৌঁছেছেন, ট্রাফিক জ্যামে আটকে গিয়েছিলেন। "আপনার ঐ ফুটবলের

ব্যাপারটা আমাকে একটু বলবেন, মানে সেই অসাধারণ জায়গাটি, যেখানে নায়ক…।”

পরিচালক মশাই বললেন, “সেই ফুটবলের জায়গাটি তো ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“সত্যি কথা বলতে কি,” পরিচালক মশাই একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, “ঐ জায়গাটি আমি হঠাৎই তুলে ফেলেছিলাম। কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, কিছু না।

নায়ক নায়িকা বসে ছিল, কথা বলছিল। এমন সময়ে হঠাৎ ওই ফুটবলটি এসে পড়ে—পাশের মাঠে বা কোথাও ছেলেরা ঐ বল নিয়ে খেলছিল। জলে এসে পড়ে, অতএব ঢেউও ওঠে। নায়কও চমকে সেদিকে তাকায়। তার কপালে ভাঁজ পড়ে। এ একটা আকস্মিক ঘটনা বলতে পারেন। পরে আর রি-টেক করার মত সময় আর অবস্থা থাকে না।”

পরিচালক মশাই থামলেন।

পরিচালক মশাইয়ের বন্ধু বললেন, “দেখুন দেখি কি বিনয়। নিশ্চয় এই দৃশ্যটির জন্য তিনি অন্তত দু'বছর ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। কেন না তিনি কোনো দৃশ্যই অন্তত দু'বছর ধরে না ভেবে তোলেন না।”

সকলে বললে, “বিনয় বটে।”

পরিচালকের বন্ধু বললেন, “ফটাই-এর বাবার সাধ্য নেই এমন বিনয়…!”

পরিচালক মশাই বললেন, “কাট!”

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

ক্যালকেশিয়ানের কুলপি-চিন্তা

"উঃ কী শীত" শুনলে বলতে ইচ্ছা করে "কষে গাও গীত"। কিন্তু "উঃ কী গরম" তার বেলায় "এস দুঃখীরাম" "কী আরাম" বলতে এতটুকু মর্জি হয় না। এই দুঃসহ গরমে সবাই সত্যি সত্যি দুঃখীরাম। গরমে ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়ার সময় সবার মনে-প্রাণে একটি চিন্তাই মরীচিকার মত চিকচিক করে, সেটি হল স্নিগ্ধ শীতল স্বস্তি পাওয়ার বাসনা সেটিকে কুলপি-চিন্তা নাম দেওয়াই ভাল। এটি উত্তাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে থাকার চেষ্টা—এক রকম বাসনা। সম্বল হল : পাখার হাওয়া ও সরবত এবং রেস্ত থাকলে শেষ পর্যন্ত কোন পর্বত। দস্যুকুলে প্রহ্লাদের মত এই অগ্নিকুলে একমাত্র ভরসা একখণ্ড আইসক্রীম। যার নাম মুড়ি তার নাম চাল ভাজা। ছিল সাবেকী আমলের কুলপি—হাল আমলে হল আইসক্রীম। কিন্তু ক্যালকেশিয়ানদের দুর্দশার চরম। কারণ এখানে যারা বাস করে তাদের চোখের মাহাত্ম্য এমনি : অভাগা যেদিকে চায় দৃষ্টির অগ্নিবাণে কলের মুখে টালার সাগর সেদিকে শুকায়। থার্মোমিটারের কপালে ঘাম, বাবুবিবিরও সর্বাঙ্গে। শীত বসন্তের মত এই মরসুমটির নাম দেওয়া উচিত 'ঘামাঘামি'।

টাইফয়েড রোগীর জ্বরের ঘোরে যেমন মাংসর ঝোল লুচির স্বপ্ন দেখা অন্যায় নয় ; তেমনি নিদারুণ গরমে ভুক্তভোগীর পক্ষে কুলপি চিন্তাও অবান্তর নয়। এও এক রকম যোগ করা। এ যোগ করলে তাপ-বিয়োগ হয়। এই ঘোর গরমে যাঁরা ঘরের মধ্যে শীতকালকে তুতু করে ডেকে আনতে পারেন তাঁরা মন্তর জানেন। তাঁরা ভাগ্যবান, সুইচ টিপলেই এয়ারকণ্ডিশনার গ্রীষ্মের তাপকে লজ্জা দেয়। গরমে শীত এবং শীতে গরম যাঁরা পেতে অভ্যস্ত তাঁরা প্রাকৃতিক নিয়মকে দিনরাত্রি ডিগবাজি খাওয়ান লক্ষ্মীর জোরে বিজ্ঞানের সহায়ে।

কুলপি চিন্তার কথা বললেই মনে আসে সেবারের নিউইয়র্কের নিদারুণ তুষারপাতের শুভ্র সমুজ্জ্বল রূপটি। পিচ গলগল রাস্তায় ঘাম সপসপ দেহে বরফের কথা ভাবলে হৃদয়মন জুড়িয়ে যায়। কলকাতার কোন কোন রাস্তায় এক পশলা জোর বৃষ্টি হলে এককোমর জল দাঁড়িয়ে যায়—বর্ষায় তাই কখনও সখনও অপ্রত্যাশিতভাবে রেনি-ডে পাওয়ার আনন্দ আসে। কিন্তু কস্মিনকালে ভাবিনি শীতকালে নিউইয়র্কে একদিন অতর্কিতে নিদারুণ তুষারপাতের জন্যে হবে "স্নোয়ি-ডে"। জলের বদলে বরফে শহরের সব কর্মচাঞ্চল্য, সব দৌরাত্ম্য ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

শহর নিউইয়র্ক একটি চটুল মহিলার মত। ক্ষণে ক্ষণে তার মনমর্জির রঙ বদলায়। একটু সংস্পর্শে এলেই বুঝতে পারবেন দিদির রকম কত। সকালবেলা কাজে বার হবার সময় কিছু ঠাণ্ডা নেই—রীতিমত মাইল্ড বলে মনে হল। অনেক ভেবে চিন্তে নেব কী নেব না করে শেষ পর্যন্ত টপকোট সঙ্গে নিলেন না। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার সময় টেরটি পেলেন যখন দেখলেন তাপমাত্রা হিমাঙ্কে পা ছোঁয় ছোঁয়। গরমকালে আবার এখানে কলকাতার মত রিয়েল ইণ্ডিয়ান সামার আসে। গেলুম গেলুম তখন কেবল অঢেল ঠাণ্ডা খেলুম। তখন সবার ঘরে ঘরে ডেসার্টকুলারটি প্রিয়-বান্ধবীর কাজ করে। শীতেও তেমনি বেধড়ক ঠাণ্ডা, তুষারঝঞ্ঝা লেগে থাকে। তখন ঘরের মধ্যে ডেসার্টকুলারের পরিবর্তে হিটার জ্বালিয়ে গেঞ্জি গায়ে বাইরে ফ্রিজিং টেম্পারেচারের কাণ্ডটা দেখার মধ্যে থাকে দার্শনিকের দূরত্ব।

শীতকালে মাঝে মাঝে টুকটাক বরফ পড়বে তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে। ইতিমধ্যে কবার বরফও এলো গেল। যাদের গ্রীষ্মে কড়া রোদ্দুর দেখা অভ্যাস তাদের চোখে ছিটেফোঁটা তুষারপাত দেখে পুলকিত হওয়া বিচিত্র নয়। যেমন প্রবল বৃষ্টি দেখাটা বাঙালীর সংস্কার তেমনি প্রচণ্ড তুষারপাত

দেখাটাও নিউইয়র্ক-এর ধর্ম। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তেমন মনে রাখবার মত তুষারপাত হৃদয়ঙ্গম করা হয়নি। একদিন সত্যি সত্যি পালে বাঘ পড়ল। সেদিন সকালবেলা ঝিরঝির ঝিরঝির করে বরফ পড়তে শুরু করল। সকালে কাজে বার হবার মুখে কেউ সেদিকে চেয়েও দেখেনি, কিছু ধর্তব্যের মধ্যেও আনেনি। ইলসে গুঁড়ি বৃষ্টির মত গুঁড়িগুঁড়ি বরফ পড়ে রাস্তার উপর একটা সাদা পাতলা আস্তরণ লেপে দিয়েছে। তার উপর দিয়ে জুতো মশমশ করে সবাই আপিসমুখো হয়ে ছুটছে—কেউ তখন থমকে দাঁড়িয়ে বরফের দিকে দৃকপাতও করেনি। লাঞ্চ নাগাদ কাজ থেকে মুখ তুলে সবাই দেখল তখনও সজোরে বরফ ঝরছে। রাস্তাঘাট বাড়ির ছাদ সর্বত্র সাদা বরফের একটা পুরু পলস্তারা জমে উঠেছে। সবাই উসখুস করছে শহরের ভাবগতিক দেখে। যারা শহরের উপকণ্ঠে থাকে তাদের মন বেশী উতলা—রাস্তাঘাটের যেমন অবস্থা তা দেখে দুর্ভাবনার কারণ হওয়া স্বাভাবিক। এদিকে রেডিও ও টি ভি মারফত খবর আসছে কী নিদারুণ তুষারপাত শহরের উপকণ্ঠে চলেছে। বরফের এই দৃশ্যে কৌতুকপ্রিয় কোন বাঙালীর চোখে মনে হবে—দেবরাজ ইন্দ্রের এই ঠাণ্ডায় ইনফ্লুয়েঞ্জার মত কিছু হয়েছে, তাই উপরে আকাশের উঠানে স্বর্গীয় ধুনুরীরা তাঁর অর্ডার মাফিক লেপ তৈরী করতে বসে গগনজুড়ে ক্রমাগত তুলো পেঁজছে। তারই আঁশ উড়ে উড়ে নীচে নেমে আসছে।

কিন্তু ক্রমে বরফ পড়ার দৌরাত্ম্য আরও বাড়ে—ঝড়ের মত ক্রমান্বয় তুষারপাত পথ-ঘাটের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। রাস্তার উপর দিয়ে যানচলাচল প্রায় বন্ধ হয়। বরফের এই রকম ভাবগতিক দেখে বেলা তিনটে বাজতে না বাজতে আপিস বন্ধ, সেদিনকার মত কাজকর্ম সব চুকল। সন্ধ্যার আগেই যেন সবাই বাড়ির গর্তের মধ্যে সেঁদতে পারে। কিন্তু তা হবার নয়। সারা নিউইয়র্ক শহর ততক্ষণে তুষারকবলিত হয়েছে—শহরের সর্বত্র তুষারের বেড়াজাল পড়েছে। ট্রেন চলাচল বন্ধ। নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে যাদের বাস তারা বাড়ি ফিরতে অপারগ। ট্রেন লাইনের উপর প্রচুর বরফ জমে রয়েছে। ঝঞ্ঝা মাথায় বরফ মাড়িয়ে আপন ডেরার উদ্দেশ্যে নাগরিকরা ছোটে। হোটেলে একান্ত স্থান অকুলান। আত্মীয় বন্ধুর বাড়িও ভর্তি। বহু ডেলী প্যাসেঞ্জার গ্রাণ্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে রাত্রিবাসের উদ্দেশ্যে যায়। যাদের বয়স কম, ডেয়ার-ডেভিল তাদের কেউবা সিনেমায় বসে সারারাত কাটিয়ে দিতে প্রস্তুত। বরফের মধ্যে গাড়ি চালাতে ব্যর্থকাম হয়ে মাঝপথে গাড়ি ফেলে কেউবা কোন রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ে। যেখানে যে নিরাপদ মনে করে সেখানে মাথা গলিয়ে রাত্রিবাসের

ব্যবস্থা করে নেয়।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে এলো তখনও তুষারপাত কমবার নাম নেই—অঝোরে ঝরছে। আকাশের পেটে পেটে এও ছিল! সারা নিউ ইয়র্ক হয়ে উঠেছে একফালি সাইবেরিয়া। রাতের আকাশে চাঁদের মুখে চুমকি দেওয়া অন্ধকার ওড়নায় আবৃত—ল্যাম্পপোস্টগুলো চাঁদের দোসর হয়ে অন্ধকারে হিমে জড়সড়। রাস্তায় বাড়ির পা বরফে আকীর্ণ হয়ে হয়ে ঠকঠক করে কাঁদছে আর বাড়ির বুকের মধ্যে সেণ্ট্রালহিটিং সৌজন্যে আমরা পরম মৌতাতে তুষারপাতে জীবন্ত ছবি দেখছি।

একদিনের ভীষণ তুষারপাতে নিউইয়র্ক-এর দশা হয়েছে ম্যারী আঁতিনয়েতের মত। একরাত্রে চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। রাস্তা জমে আইসক্রীম। সকালবেলা সূর্যদেব হেসে মাভৈ ঘোষণা করলেও রাস্তার হাল দেখে স্বস্তি পাওয়া যায় না। আকাশে আর বরফের স্টক নেই, কিন্তু জমিতে বরফের যত স্টক জমা রয়েছে তাকে সাফ করা এক দারুণ ব্যাপার। এরপর বরফ গলতে শুরু করলে তখনই দই মাথামাখি হবে। শহর নিউ ইয়র্ক অন্য জায়গার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। নিউ ইয়র্কের চাঞ্চল্য নিষ্ফল। কোন ট্রেন ছাড়েনি, কোন ট্রেন আসেনি। বিমানবন্দর বরফে চাপা পড়েছে। কোন আন্তর্জাতিক বিমান আসেনি, কোন বিমান ছাড়েনি। রাস্তায় কোন গাড়ি নেই, জনমানব নেই, শুধু রাশি রাশি বরফ পড়ে আছে। হাওয়ার তাড়নায় জায়গায় জায়গায় বরফের উচ্চতা কোমর ছাপিয়ে উঠেছে। সকাল হতেই টেলিফোনের ধুম পড়ে যায়—যারা আত্মীয়-পরিজন থেকে গত রাত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তারা নিজেদের কুশল দেয় ও নেয়। অবিবাহিত চাকুরে মেয়ে শহরের উপকণ্ঠে মাকে জানায় নির্ভাবনায় সিনেমায় বসে রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছে। কোন অসুবিধা হয়নি। তখনকার মত মাকে গোপন রাখে এই ঝড়ের রাতে সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটি সারারাত্রি পাশাপাশি বসে সকালে কত আপনার হয়ে গেছেন।

১৮৮৪ সালে নাকি একবার বিশ ফুট বরফ পড়েছিল। এবার ১৪ ইঞ্চি পড়েছে তাতে রাস্তায় যেমন স্তূপীকৃত হয়ে বরফ জমে আছে তা সাফ করা শুধু সময়সাপেক্ষ নয়, নিদারুণ পরিশ্রমের। নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র ওয়াগনার ঘোষণা করেন—একমাত্র একান্ত প্রয়োজনীয় যানবাহন ছাড়া অন্য কোন যানবাহন রাস্তায় নামবে না। অবশ্য তখনও কোন যানবাহন চলবার প্রশ্ন ওঠে না—কর্পোরেশন শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা থেকে বরফ সাফ করবার কাজে লোক লাগায়। শহরে যা তরীতরকারি দুধ ও মাংস মজুত আছে তা দুতিনদিনের

বেশী চলবে না। তাই প্রথমে হাইওয়ের মুখগুলি তুষারমুক্ত করতে হবে রসদ সরবরাহ ঠিক রাখতে। শহরের যে হাল হয়েছে তাতে আজও কোন আপিস-দপ্তর স্কুল কলেজ খুলতে পারবে না। লোক চলাচল সব বন্ধ। শ্যাবল শভেল নিয়ে জোয়ানমর্দারা বরফ উঠনোর কাজে লেগেছে। রাস্তা থেকে বরফ খুঁজে খুঁজে একপাশে জড় করে রাখা হয়। যে যার বাড়ির সামনে, দোকানের সামনে, সিনেমার সামনে বরফ তোলবার কাজে সাহায্য করে। রাস্তায় রাস্তায় এই একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন রাস্তায় কর্পোরেশনের কর্মীরা স্নো-প্লাউ দিয়ে বরফ ঠেলে অতিদ্রুত সরিয়ে নেয়। স্তূপীকৃত বরফের জঞ্জাল রাস্তায় রাস্তায় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে পড়ে থাকে। পরে লরীতে সেইসব বরফ উঠিয়ে ইস্ট-রিভারের জলে নিক্ষেপ করা হবে। হাসপাতাল চালু রাখতে, রাস্তায় এমবুলেন্স চলতে ও ডাক্তার যাতায়াত করতে শহরের গুটি কয়েক প্রধান রাস্তা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কঘণ্টার মধ্যেই খুলে ফেলা হল। এই বিরাট শহর নিউইয়র্ককে বরফ খুঁড়ে উদ্ধার করা সোজা নয়—তাতে তিনচার দিন কেটে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র নিউ ইয়র্ক তুষারে বেশীদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা অসম্ভব। তাই নিদারুণ পরিশ্রম ও সেই সঙ্গে প্রচুর অর্থব্যয় করেও নিউ ইয়র্কের মুক্তি চাই। এত করেও শহরের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ ফিরে আসতে চারদিন লেগে যায়।

এ দৃশ্য দেখার পর অকৃপণ তুষারপাত না দেখার আর কোন আপসোস থাকে না। প্রথম তুষারপাতে একটা স্বর্গীয় মহিমা আছে যার শুভ্র সমুজ্জ্বল ভাবটি শিশুর কমনীয়তার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এই সাদা বরফ যখন গলতে শুরু হয় তখন নরক গুলজার। তখন কাদা প্যাচপ্যাচ, নোংরা বীভৎস ব্যাপার। তখন বেছে বেছে পুরোনো জামাকাপড় ব্যবহার করা এদের রেওয়াজ। একটি ঝেড়ে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত শহরের এই আবিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি নেই। অতি কষ্টে শহরের রাস্তাগুলো সাফ হলেও সেন্ট্রাল পার্কে তখনও বরফ সমানে পড়ে থাকে। দুদিন পর তুষার-দরদীরা তখন দলে দলে পার্কে গিয়ে বরফের সঙ্গে মোলাকাত করতে ছোটেন। তখনও সেখানে সর্বত্র তুষার বিস্তৃত গাছে ঘাসে মাঠে। সে দৃশ্য কোন জাপানী শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি যেন। সারাদিন বরফের উপর দাপাদাপি চলে। মুখে জলন্ত সিগারেট, হাতে বন্ধুর উষ্ণ সখ্য। পার্কের কাছাকাছি কোন রেস্তরাঁয় গিয়ে উষ্ণ সুপে গলা ভিজিয়ে উত্তাপ সঞ্চয় করে তুষারপ্রীতি সমানে চালিয়ে যাওয়া হয়। বিনাকারণে সেন্ট্রাল

পার্কে তখন চললে হয়তো দেখতে পাবেন দস্তানা ঢাকা কোন নরম হাতের সাদর আহ্বানে পার্কের আদি অকৃত্রিম বাসিন্দে কোন কাঠবিড়ালীকে ডাক দিয়েছেন—মহিলার হাতের ছলনায় ভুলে কাঠবিড়ালী কিছু পাবে আশা করে গর্ত ছেড়ে বরফের মধ্যে বার হয়েছে। পার্কের উঁচুনীচু ঢেউ খেলান জায়গা বেছে একদল বরফে স্কেট করছে কিম্বা স্লেজ চড়ছে। বরফের স্টেজের উপর তাদের চলমান রঙিন দেহ অদ্ভুত একটা সাবলীল ছন্দ তুলেছে। রাশিয়ান দূতাবাসে এই নিদারুণ তুষারপাত বোধ করি সবচেয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছে—ভদকা সহযোগে রিয়াল হোম ওয়েদার পাওয়ার আনন্দ উদ্‌যাপিত হয়েছে। ব্রঙ্কস-এর চিড়িয়াখানায় পোলার বীয়ারের আনন্দেরও আতিশয্য আর ধরে না এমন তুষারপাতের ঘনঘটা দেখে। কিন্তু ভারতবর্ষের হাতীর অবস্থা শোচনীয়—তাকে জবরদস্ত রাখতে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষরা নির্জলা হুইস্কি পান করিয়েছেন। তার বাপঠাকুরদা যা জন্মে স্পর্শ করেনি।

এই বরফের দুর্দিনে একটি বৃদ্ধ লাঠি ঠুকঠুক করে সিক্সটিফোর স্ট্রীট ও ফার্স্ট এভ্যুনিউ রাস্তা পার হতে যাচ্ছিলেন। ভাবলুম চোখে দেখেন না, সাহায্য চাইছেন। রাস্তা পার করে দেব কি না জিজ্ঞাসা করায় বিরক্ত হয়ে বললেন—না, না তার প্রয়োজন নেই, আমি আমার ভক্সওয়াগান গাড়িটি খুঁজছি—কোথায় বরফ চাপা পড়ে আছে।

এই ভয়ংকর তুষারপাত হয় মার্চ মাসে। তার দিন দশেক যেতে না যেতেই খবরের কাগজে একজন অপরূপ মহিলার আসন্ন আগমনের প্রশস্তি নিয়ে নিউ ইয়র্কের সাংবাদিকরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নিউ ইয়র্কে এত মহিলা থাকতে কে এই মহিলাটি, যাঁর জন্য সাংবাদিকদের এত কোলাহল। সত্যিই যখন তিনি এলেন সবুজ ওড়না গায়ে, ওষ্ঠে ফুলের হাসি হেসে, চোখে যৌবনের দীপ্তি নিয়ে, মরাল গ্রীবায় মনোহর ভঙ্গি হেনে, তখন সবাই চোখ তুলে দেখল তাঁকে। কে এই মহিলা? বসন্তকুমারী। তার আগে পক্ককেশে জীর্ণবেশে শীতবুড়ি পালিয়েছে। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। শীত না যেতে যেতে নিউ-ইয়র্কের সাংবাদিকরা বসন্তের চরণধ্বনি শোনেন, কোকিল যে খবর রাখে না, তাঁরা তা রাখেন। একালে ঋতু পরিবর্তনের সত্যি বাহন সাংবাদিকরা। কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে আর্জি এই যে তাঁরা যেন ঊর্ধ্ব-লোকের সঙ্গে একটু বন্দোবস্ত করেন যাতে এখানকার ষাট লক্ষ ক্যালকেশিয়ানরা এই নিদারুণ গরমে ইন্দ্রদেবের যৎসামান্য কৃপাবর্ষণ লাভ করলে তারা সব সময়ে ধন্যি ধন্যি করবে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

উলট পুরাণ

বনানী ব্যস্ত ভাবে ঘরে ঢুকে বলল, 'এই ছোড়দা জানিস কী হয়েছে ?'

'কী রে ?' বলে তাকালাম ওর দিকে। বনানী হাঁফাচ্ছে। মনে হল খুব দৌড়েই এসেছে কোত্থেকে। খুন খারাপি হতেও পারে। এবং যদি তাও হয়, সে নিশ্চয় একশো কিমি দূরে। কারণ হলফ করে বলতে পারি, বনানীর নার্ভ তত কড়া নয়। চোর বা পকেটমার ধরা পড়তে দেখলে কাঁদোকাঁদো মুখে বলে, তাহলে কী হবে রে ?

বনানী চাপা গলায় বলল, 'বেদানার বর গোমুখ্যু ! নিজের নাম সই করতেও পারে না !'

'কে বল্ তো ?'

আমার প্রশ্ন শুনে বনানী তেতোমুখে বলল, 'ফের ন্যাকামি করছিস ? বেদানাকে চিনিস নে ? হরিদার মেয়ে !'

একটু হেসে বললাম, 'তাই বল। তো ওর বর মানে সেই নাদুস-নুদুস চেহারার ভদ্রলোক তো ? সেই যে সেদিন...'

বাধা দিয়ে বনানী বলল, 'ব্যাপারটা কীভাবে ধরা পড়ল জানিস ? ওদের

বাড়ি গিছলাম একটু আগে। আমি আর শর্বরী। শর্বরীর হাতে একটা বই ছিল। বেদানার সঙ্গে কথা বলছি আমরা, হঠাৎ ওর বর ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এল। তারপর জানিস?' বনানী খিলখিল করে হেসে উঠল।

'যা বাবা! হেসেই মারা পড়বি যে!'

বনানী হাসির মধ্যে বলল, 'তারপর দেখি দেখি, কী বই ওটা বলে শর্বরীর বইটা নিয়ে পাতা ওল্টাল। হঠাৎ দেখি বইটা উল্টো করে ধরে আছে। গম্ভীর হয়ে পড়ার ভান করে বলল কী জানিস? খুব ভাল বই তো! দেবেন একবার পড়তে?'

'যাঃ! বানিয়ে বলছিস!'

'তোর দিব্যি। শর্বরীকে জিগ্যেস করিস।'

'তারপর?'

'আমরা তো হতভম্ব। আড়চোখে দেখি, বেদানার মুখটা একেবারে লাল। আসছি বলে কেটে পড়ল কোথায়।'

'হুঁ। তারপর?'

শর্বরী গম্ভীর হয়ে বলল, 'ঠিক আছে। পরে দেবখণ। বলে বইটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বেরুল। আসলে হাসিতে ওর গা গুলোচ্ছিল। বাইরে গিয়ে দুজনে হাসতে হাসতে মারা পড়ি আর কী!'

'মারা পড়িস নি দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। এবার বেরো। ডিসটার্ব করিস নে।'

বনানী রাগ করে বেরিয়ে গেল। যতটা শক্ আর আশা করেছিল, খাইনি দেখে। আসলে ওদের এই আবিষ্কারের অনেক আগেই ব্যাপারটা আমি আবিষ্কার করে বসে আছি। বলিনি এই যা। হরিপদ মুখুয্যের জামাই নিছক জামাই নয়, ঘরজামাই। কারণ মেয়ে মোটে একটাই এবং সারাজীবন মহকুমা আদালতে পেশকারী চাকরি করে পয়সা-কড়ি ভালই কামিয়েছেন। শহরের এদিকটায় সম্প্রতি ঘরবাড়ী হয়েছে অনেকগুলো। কতোকটা কলোনী টাইপ। ছড়ানো ছিটোনো একটা করে একতালা বাড়ি। চারপাশে অঢেল জায়গা। হরিদাই সবার আগে এখানে বাড়ী করেছিলেন। তারপর বাড়ীর শোভা বাড়ানোর মত চমৎকার সুদর্শন একটি ঘরজামাইও ইদানিং যোগাড় করে ফেলেছেন। যেখানে যান, খালি জামাইয়ের গল্প। হরিদার ভাষায় 'তিনটে পেপার এম. এ.।'

লোকের চোখ দেখেই নাকি বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধরা পড়ে,

কোথায় পড়েছিলাম বলতে পারবো না। কিন্তু আমার ধারণা এ এক ব্রহ্মজ্ঞান। কিছুদিন আগে হরিদার ঘরজামাই-ই আমার এই ব্রহ্মজ্ঞানের পাল্লায় পড়েছিলেন, নেহাৎ হরিদার মুখ চেয়ে এবং চক্ষুলজ্জায় পড়ে বলিনি কাকেও।

আসছিলাম ট্রেনে, কামরায় তত কিছু ভিড় ছিল না। পথে একটা জংসন পড়ল। আমার উল্টোদিকে নাদুস-নাদুস ফর্সা গ্রাম্য চেহারার এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি যে কোনও সংখ্যা হতে পারে। এমন মাকুন্দে এবং বেবিফেস দেখে বয়সের ভুল হয়েই থাকে। তো হঠাৎ দেখি, ভদ্রলোক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হকারের কাছে একটা ইংরেজী কাগজ কিনলেন।

ইংরেজি কাগজ কেনাটা কিছু নয়। কিন্তু কাগজটা উল্টো করে ধরে পড়ার ভান করাটাই গণ্ডগোল বাধাল। আমি তো অবাক। আশে পাশে আরও ক'জনও দেখি মুখ এবং চোখ টিপে আড়ালে হাসাহাসি করছেন। একজন তো বলেই ফেললেন, কী দাদা! আজকের বড় খবর কী দেখছেন?

ভদ্রলোক কিন্তু নির্বিকার। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেছে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। হুঁ, ভদ্রলোকের চোখ দুটোই বলে দিচ্ছে বিদ্যেবুদ্ধির খবর। গাঁয়ের চাষাভুষোর চোখ একেবারে। চাউনিতে ভোঁতা ভাব। কেমন ধোঁয়াটে আর নির্বাক। মানুষের চোখও তো কথা বলে। স্বীকার করতেই হবে, এমন অবোধ অপোগণ্ডচোখ আমি চাক্ষুস করিনি কদাচ।

ভাগ্যিস, কামরায় তত ডেঁপো কেউ ছিল না। তেমন ছেলেছোকরাও না। থাকলে লোকটার প্রচুর খোয়ার হত। তবে যিনি খবর জিগ্যেস করছিলেন তিনিই কিছুটা খোঁচাতে ছাড়লেন না। আসলে আমরা ততক্ষণে মনে মনে ধরেই নিয়েছি এ-ব্যাটা এক মুখ্যু। ঠকের রাজা। তাই ঠিকাঠিকানা শেষে গন্তব্য এবং নামধাম নিয়ে পড়লেন প্রশ্নকারী। লোকটা আশ্চর্য বেহায়া বলতে হয়। হাসি মুখেই জানিয়ে দিল সে বনবিহারী চক্কোত্তি। যাচ্ছে বহরমপুর। না সেখানে বাড়ী নয়, শ্বশুর বাড়ী। শ্বশুরের নাম হরিপদ মুখুয্যে।

তখন আমি হইচই করে বলেছিলাম, 'কী মুশকিল। আপনি হরিদার জামাই। তাই বলুন! গিছলেন কোথা? কলকাতা? একা কেন?'

হরিপদ মুখুয্যে এপাড়ার সবার দাদা। বাবাকেও শুনেছি হরিদা বলতে। রোগা ঢ্যাঙাগড়নের মানুষ। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। তাঁর মেয়ে আমার বোন বনানীর সঙ্গে কলেজে পড়ত। ওকে দেখেছি, পাড়ার মেয়ে বলে নিশ্চয় অসংখ্যবার দেখেছি, কথাও বলে থাকব—কিন্তু কেন কে জানে, এই দেখা বা

জানাশোনাটা তেমন স্পষ্ট নয়। বনানীর অনেক বন্ধুই তো আছে। তাদের প্রত্যেককে আমার যেমন চেনা নেই, জানা নেই—এও তেমনি। নিশ্চয় বেদানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

কিন্তু হরিদা যে বলে বেড়িয়েছেন, তাঁর জামাই তিনটে সাবজেক্টে এম. এ. ? নিশ্চয় একটা গুরুতর ঠকবাজী হয়েছে। শুধু অবাক লাগে হরিদার মত ঘোড়েল মানুষ কার পাল্লায় পড়ে এই গণ্ডগোলটি করে ফেললেন ? উল্টো করে ইংরেজি কাগজপড়া লোকটিকে দেখলে যেন নিজের মধ্যে কী এক অহংকার হু হু করে আঁচ দিতে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্য এই দু মাসেও হরিদা ব্যাপারটা টের পেলেন না ? নিশ্চয় পেয়েছেন এবং মনে মনে পস্তে শেষটা টিকা গেছেন। ভাগ্যের মার বলে মেনে নিয়েছেন নিশ্চয়। কিন্তু কষ্ট হয় বেদানা বেচারীর কথা ভাবলে। পরে বনানীকে জিগ্যেস করেছিলাম বেদানার প্রতিক্রিয়াটা কি ? বনানী জিভ কেটে বলেছিল, 'ভ্যাট। কী যে বলিস ? ওকে এসব জিগ্যেস করা যায় নাকি ? বোঝাই তো যায় রে বাবা বেচারী চুপচাপ মেনে নিয়েছে।'

বলেছিলাম, দেখবি একদিন বোমা ফাটবে। এ যুগটা যে অন্য রকম। মেয়েরা আজকাল কত কনসাস্‌।

বনানী চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'তুই মেয়েদের বুঝিস ? মেলা বকিসনে তো !'

'দ্যাখ বনি, আগের যুগে মেয়েরা যে কোন একটা পুরুষ মানুষ পেলেই...'

'শাটআপ। আমি তোর ছাত্রী নই।' বলে বনানী কেটে পড়েছিল। কিন্তু আমার মাথায় খালি বেদানার চিন্তা। শুধু গোমুখ্য হলেও কথা ছিল, লোকটা যে ঠগ। উল্টোদিকে ইংরেজী কাগজ পড়ে। সুতরাং বোঝাই যায়, নিতান্ত নির্বোধ ঠগ।...

আমাদের পাড়ার নীচেই গঙ্গা। এখন বারোমাস জলে ভরা। ফরাক্কা থেকে জল আসছে। বিকেলবেলা একবার গঙ্গার ধারে ঘুরে আসা ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস। সেদিন একটু দূরে থেকেই দেখি, হরিদার জামাই বনবিহারী। লাটুবাবুদের বাড়ীর পিছনে লক্ষ্য করলাম। একটু পরে দেখি, সে নীচু পাঁচিলের কাছে এগিয়ে গেল। তারপরই কী একটা ঘটল। সে সাঁৎ করে পিছিয়ে এসে হন হন করে চলতে শুরু করল। কুকুরের ভয়ে পিঠটান দিয়েছে বনবিহারী।

কিন্তু এসে দেখছি, শুধু ঠগ নয়। চোরও বটে। চুরির মতলব না

থাকলে এই সন্ধ্যাবেলা অমন করে কেউ পাঁচিল ডিঙোতে যায় ? খুব খারাপই লাগল ব্যাপারটা।

কদিন পরে সত্যি একটা কেলেঙ্কারী ঘটে গেল। রাত তখন প্রায় দশটা-সওয়া দশটা হবে। আমাদের বাড়ীর সামনে এক টুকরো সব্জি ক্ষেত আর ফুল বাগিচা আছে। সবুজ লনে পায়চারি করছি। সবে চাঁদটাও উঠেছে। হাল্কা জ্যোৎস্নায় নিঃঝুম পাড়াটা পাড়াগাঁয়ের মতোই দেখাচ্ছে। এখনও রাস্তায় আলো আসেনি। জ্যোৎস্নায় কারা দুজন রাস্তায় জাপটাজাপটি করছে চোখে পড়তেই শিউরে উঠলাম। খুনোখুনি হচ্ছে নাকি ? গেটের মাথায় বুগান ভিলিয়ার ঝাঁপি। ঘন ছায়া পড়েছে। জীবনে কখনো স্বচক্ষে খুনোখুনি দেখিনি এবং সেই সাংঘাতিক ব্যাপারটা ঘটছে ধরে নিয়েই কাঁপা কাঁপা শরীরে ওত পাতলাম।

তারপর অবাক হয়ে দেখি লড়াই বেঁধেছে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে। স্ত্রীলোকটি পুরুষটিকে জাপটে ধরে আছে। আর পুরুষটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। কিমিদং ? এতকাল এ পাড়ায় এসেছি এমন নাটক তো দেখিনি। চাপা গলায় দুজনই ফিসফাস করে সংলাপ আওড়াচ্ছে।

'আঃ ! কী হচ্ছে। ছাড়ো না। এক্ষুণি আসছি বলছি। আঃ দেখ দেখ...'

'না। তুমি চলে যাচ্ছ। কেন ? কী করেছি আমি ?'

'কী মুশকিল ! এক্ষুণি কে দেখে ফেলবে যে ! আহা, ছি ছি...'

'দেখুক। কেন তুমি এমন করে চলে যাবে ? কেন ? কেন ?'

'মাইরি তোমার দিব্যি। চলে যাইনি, চলে যাইনি। একটু ঘুরে টুরে আসি...'

'বেশ। তাহলে আমি যাব।'

'পাগল ? না-না। ছাড়ো ! এক্ষুণি আসছি। মাইরি, তোমার দিব্যি। বিশ্বাস করো।'

তারপর দেখলুম পুরুষটি ছিটকে বেরিয়ে গুলতির মতো বাঁই করে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্ত্রীলোকটি চুপচাপ একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে উল্টোদিকে চলে গেলো। কিন্তু ব্যাপারটা কী ? রাস্তায় গিয়ে দেখলাম স্ত্রীলোকটি হন হন করে এগিয়ে যে বাড়ীর গেট খুলো ঢুকল, সেটি হরিপদ মুখুজ্যের 'মাধুরী ভিলা'। আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। বেদানা ও বনবিহারী।

উল্টো করে ইংরেজি কাগজ-পড়া নির্বোধ বদমাশটার মধ্যে হরিদার গ্র্যাজুয়েট মেয়ে কী এমন বস্তু পেল রে বাবা যে রাত দুপুরে এমন করে রাস্তায় ঝাপটা-ঝাপটি করে গেল! এই উইমেনস লিবের যুগেও!

মিনিট পাঁচেক কেটেছে বড় জোর; হঠাৎ কোথায় একটা চেঁচামেচি হই হল্লা শোনা গেল। চমকে উঠলাম! তারপর দেখলাম কে ঘোড়ার মতো দৌড়ে এসে আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠল, 'এই! এই। প্লীজ, ওদের বলবেন না ভাই! আমি এখানে লুকোচ্ছি!' বলেই সে আমার জবাবের পরোয়া না করে গেটের ভেতর ঢুকে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল। লোকেরা হই-হই করে দৌড়ে আসছে। আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে যাবার পর মনে পড়ল, লোকটা হরিদার জামাই বনবিহারী। রাগ হল যত তত করুণাও। গোমুখ্য নির্বোধ আর কাকে বলে? এখন ধরিয়ে দিলে তো মেরে তক্তা বানাবে! খালি বেদানা আর হরিদার কথা ভেবে সামলে নিলাম! ডাকলাম 'ও মশাই! ঝোপে পোকামাকড় থাকতে পারে, বেরিয়ে আসুন!'

বনবিহারী ফিসফিস করে বলল, 'লাইন ক্লিয়ার?'

'হ্যাঁ। বেরিয়ে পড়ুন।'

'আপনার ঘরে কিছুক্ষণ থাকব। কেমন?'

'আচ্ছা।'

আমার ঘরে ঢুকে বনবিহারী আগে নিজের পাজামা পাঞ্জাবি খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর চমকানো গলায় বলল, 'দরজা বন্ধ করুন!'

দরজা বন্ধ করে হাসি ও ভর্ৎসনা মিশিয়ে বললাম, 'ব্যাপারটা কী। লাটু-বাবুদের বাড়ী ঢুকেছিলেন বুঝি?'

বনবিহারী আরামে বসে পকেটে হাত ভরল। মুখে নির্বোধ হাসি। সেই ঘোলাটে অবোধ চাউনি চোখে। পকেট থেকে প্রকাণ্ড দুটো পাকা পেয়ারা বের করে বলল, 'খাবেন নাকি?' তারপর নিজে একাটায় কামড় বসালো।

বললাম, 'পেয়ারা কোথায় পেলেন?'

বনবিহারী চতুর হাসি হেসে চোখ নাচিয়ে বলল, 'ওই যে ওদের বাগানে। আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেতুম!'

'আপনি পেয়ারা চুরি করতে গিয়েছিলেন!'

'অ্যাঁ!'

বনবিহারী খিকখিক করে হাসতে লাগল। তাহলে লোকটা শুধু ঠগ নয়, নির্বোধ তো বটেই এবং সাক্ষাৎ পাগল। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ফর্সা সুন্দর চেহারা, নাদুসনুদুস গড়ন, দেখতে রীতিমতো জেন্টেলম্যান—অথচ…

হঠাৎ বনবিহারী আমার বইয়ের র‍্যাক থেকে বাঁহাতে একটা বই টেনে নিল। তারপর তাচ্ছিল্য করে পাতা উল্টে পড়ার ভান করল। সেই উল্টো করে ধরা বই। আর চুপ করে থাকা গেল না। হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনার বুঝি উল্টো করে পড়া অভ্যেস? সেদিনও ট্রেনে দেখছিলাম উল্টো করে ইংরেজি কাগজ পড়ছেন!'

বনবিহারী নির্বিকার মুখে মাথা নেড়ে বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন!'

'কিন্তু এতে কী লাভ?'

'একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি অনেকদিন থেকে। আমার ধারণা, উল্টো করে পড়লে প্রত্যেকটি হরফের এ যাবৎ অজানা চরিত্র বেরিয়ে আসে। বনবিহারী আমাকে আরও অবাক করে বলতে থাকল, 'জানেন তো সঙ্গীতে যেমন অশ্রুত ধ্বনি থাকে, এও তাই?' বলে সে মার্লোপর্শি নামে মনোবিজ্ঞানীর বিখ্যাত বইটা থেকে উল্টোভাবে গড়গড় করে পড়ে চলল। আমি তখন আকাশ থেকে পড়ে হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে গেছি। হুঁ, হরিপদ মুখুয্যের জামায়ের চোখ দেখে ঠকেছি। যাক্ গে। বললাম, 'কিন্তু পেয়ারা চুরিও কি কোনও এক্সপেরিমেন্ট?' বনবিহারী লাজুক হেসে বলল, "হাউ"। ব্যাপারটা হল রোজ গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাই; আর পেয়ারাগুলো দেখে ভাবি পেয়ারা তো বাজারে কেনা যায়। কিন্তু সে হল সিধে দিক। বরং উল্টো করে বই পড়ার মতো উল্টো দিকে অর্থাৎ…'

বাধা দিয়ে বললাম, 'বুঝেছি। এবং কেন ঘরজামাই হয়েছেন, তাও বুঝে গেছি। পেয়ারাটাও উল্টো দিকে খাচ্ছেন!'

বনবিহারী বোঁটার দিকে পেয়ারাকে কামড়ে উল্টো করে ধরা বইটা গম্ভীরভাবে পড়তে পড়তে আনমনে বলল, 'এটাই বেদানাকে মশাই বোঝানো যায় না।'

বুদ্ধদেব গুহ

অজ-মাহাত্ম্য

এইখানেই নোঙর করো হে, বললেন বাগচীবাবু। মানে গোপেন্দ্রকিশোর বাগচী, ক্যানিং অঞ্চলে সকলেই যাঁকে চেনে। কিছুক্ষণ ধক্ধক্ আওয়াজ করে বিস্তর ডিজেলের গন্ধ ছড়িয়ে শান্ত হল মোটর বোটের এঞ্জিনটা। ঝপাং করে নোঙর ফেলার আওয়াজ হল। এঞ্জিন একবার রিভার্স করে দেখে নিলে সারেঙ, নোঙরটা ঠিক মতো লাগল কি লাগল না। নইলে মাঝ রাতে যখন জোয়ার আসবে হয়ত নোঙর হেঁটে যাবে।

বোটের ছাদে বসে বাগচীবাবু হাত দিয়ে দূরে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ও পাশে পাকিস্তান'। বড় বালির পাশে বোটটা দাঁড়িয়ে আছে। খালের পাশে পাশে কিছুটা জায়গাতে ধবধবে সাদা বালি। এখানে ওখানে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত জলে-ভাসা কাটাকুটো পড়ে আছে। সেই বালি পেরিয়ে তাকালে চোখে পড়ে বড় বড় কেওড়া গাছের বন, নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শীতের সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়াতে শেষবারের মতো রোদের আগুনে আঙুল ছুঁইয়ে নিচ্ছে গাছগুলো। বনের মাঝ থেকে মাঝে মাঝেই চিতল হরিণের ডাক শোনা যাচ্ছে, টাউ টাউ। একটা বড় জাতের ঘন বেগুনী আর কমলা-রঙা মাছরাঙা পাখি

জলের পাশে বসে বসে একটা খালের মুখে, নিবিষ্ট মনে পার্শে মাছের আনাগোনা লক্ষ্য করছে আর মাঝে মাঝে ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমেষে উড়ে যাচ্ছে। মাছ, জল, রোদ, মাছরাঙা—সমস্ত এক লহমায় একাকার হয়ে যাচ্ছে।

গ্রেগরী সাহেব অ্যালুমিনিয়ামের মগে গরম কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বোটের মাথায় উঠে এল; বলল—'হোয়াটস্ দি ডিলে্যা ফর্?' বাগচীবাবু বললেন, 'এমনিতেই খুব দেরী হয়ে গেছে এবার রওয়ানা দাও।'

সকালে আমরা যে ঝাঁকড়া কেওড়া গাছটাতে মাচা বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম, সেটা বোট থেকে বেশী হলে দু'শ গজ হবে। সে মাচার নীচে দিয়েই বাঘেদের রোজকার যাতায়াতের সড়ক। তার এ-পাশে ও-পাশে এ-গাছে ও-গাছে বাঘেদের নখ পরিষ্কারের দাগ সুস্পষ্ট। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে লোকে যেমন দাড়ি কামানো ক্ষুর ধার করে তেমনি করে তাদের সামনের পায়ের থাবা আঁচড়ে আঁচড়ে ধার করেছে। গ্রেগরী সাহেব একজন এক্সপেরিণ্টর। বাগচীবাবু বার বার বারণ করেছিলেন যে, পাঁঠা কিনে দরকার নেই, সুন্দর বনের বাঘ হয়ত তার চোদ্দপুরুষে পাঁঠা চোখে দেখেনি। তাছাড়া যে জায়গায় পাঁঠা বাঁধা হবে, সেখানে পাঁঠা না বেঁধে যে-কোনো বুদ্ধিমানকে বাঁধলেও বাঘ অবধারিত আসবে। আমিও প্রতিবাদ করে গ্রেগরীকে বলেছিলাম যে, 'বাঘ কখনো পাঁঠার লোভে আসে? হত একটা হাট্টা-কাট্টা-নর পাঠ্‌ঠা গাধা, দেখতে বাঘের জিভের লাল কাকে বলে।' গ্রেগরী বললে, 'এটা মামুলি শিকার নয়—সুন্দরবনের বাঘের উপর বঙ্গজ অজের প্রভাব সম্বন্ধেও গবেষণা করছি।' বাগচীবাবু শুনে বললেন, 'তাতে আপত্তির কারণ দেখি না, তবে থিসিসে সাহায্যকারী হিসাবে আমাদের নামটাও যেন যায়।' গ্রেগরী বললে, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ'।

কৃষ্ণাঙ্গ, আত্মতুষ্ট এবং কিঞ্চিৎ শ্মশ্রুবিশিষ্ট একটি অভিজাত পাঁঠাকে আমাদের খানসামা যখন বোট থেকে বালিতে নামাল, তখন সেই পাঁঠাকে দেখে তাকে আমার প্রশংসা করতে ইচ্ছে হল।

—গ্রেগরীর মুখ চোখ দেখে মনে হল বলতে চাইছে—"তুমি যে তুমিই, ওগো, সেই তব ঋণ, আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন।"

মনে মনে নিরুচ্চারে বললাম, বাহ্ বাহ্।

বাগচীবাবু বাঘ প্রচুর মেরেছেন। বাউলে আর মৌলেদের সঙ্গে সুন্দরবনের ট্যাঁকে ট্যাঁকে অনেক ঘুরেছেন। মাচায় বসে বাঘ মেরেছেন, পায়ে হেঁটে বাঘ মেরেছেন, মায় বোটে বসে পাঁচ নম্বরি ফুটবলের মতো বাঘের ভাসমান মাথাও

রাইফেলের গুলিতে চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন। তাই আমাদের মতো তাঁর পাগলামি ছিল না। উনি বোটের মাথায় দাঁড়িয়ে আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন, আর বললেন, যাবার সময় এবং ফেরবার সময় যেন যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করি।

গ্রেগরী মাথার টুপি খুলে পাঁঠাটার প্রতি সম্মান জানাল। বলল, আমাদের ধর্মে মরণোন্মুখ যে, তাকে প্রায় মৃত বললেই চলে, তখন এ সম্মান তাকে অগ্রিম দেওয়া চলে। অমনি আমি টুপি খুলে গ্রেগরীকে সম্মান জানালাম। গ্রেগরী ফট্ করে আঙুল দিয়ে ক্রস করে বলল, 'আমেন—আমেন।'

খুব সাবধানে আমরা দুজনে অজবরকে নিয়ে এগোতে লাগলাম। বেশ শীত। কিন্তু শীতের প্রকোপের চেয়েও মশার প্রকোপ বেশী। দাঁড়িয়ে পড়লেই সর্বাঙ্গে কামড়ায়। কতগুলো ছোট ছোট ফুলের ঝোপ সন্ধ্যামালতীর মতো দেখতে। হঠাৎ পাঁঠাটা একলাফে ছিটকে উঠে গ্রেগরীর পায়ে, দুপায়ে সজোরে লাথি মারল। ঘোরাবস্থা কাটতে না কাটতেই দেখি একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ প্রায় আমাদের পায়ের সামনে দিয়ে ব্যালিস্টিক মিসিলের বেগে বেরিয়ে গেল। গ্রেগরী বলল, ও লর্ড! ও লর্ড! সঙ্গে না আসার জন্য আমি মনে মনে বাগচীবাবুকে গালাগালি করতে লাগলাম। যখন মাচার কাছে পৌঁছলাম, তখনও আলো আছে, তবে বেলা যেতেও খুব দেরী নেই। পাঁঠাটাকে শক্ত করে মাচার কাছ থেকে হাত পনেরো দূরে বেঁধে আমরা মাচায় উঠে বসলাম। বড় কেওড়া গাছ—রীতিমতো ঝাঁকড়া। গাছটির পশ্চিমদিকে বেশ কিছুটা ঘাসের বন—শেষ বিকেলের সোনা-আলোয় ঝলমলাচ্ছে।

আস্তে আস্তে বেলা পড়ে গেল। এত আস্তে আস্তে যে বুঝলাম না—চিল্কার রাজহাঁসও বোধহয় এত আস্তে বালিয়াড়ি ছেড়ে জলে নামে না।—কোন গায়িকাও বোধহয় এত মোলায়েম ভাবে অন্তরা থেকে আভোগে পেঁছয় না। কী করে এল জানিনা, কিন্তু হঠাৎ দেখলাম, রাত এল।

শুক্লপক্ষের রাত। হয় পূর্ণিমা, নয় পূর্ণিমার কাছাকাছি। জোয়ারও একেবারে ভরা। ঘণ্টা তিন চারের মধ্যে বোটে না ফিরতে পারলে কাল সকালের ভাঁটার অপেক্ষায় এই কেওড়া গাছে ব্রহ্মদৈত্যের মতো বসে থাকতে হবে। দেখতে দেখতে চাঁদের আলো সমস্ত চরাচর উদ্ভাসিত করে জলে-জঙ্গলে প্রকাশিত হল! চাঁদটা গলে গলে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কেওড়া গাছেদের ফিনফিনে পাতা বেয়ে সব জায়গায় ছড়িয়ে গেল।

বেশ গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। গ্রেগরী হাতে ৪৫০—৪০০ ডাবল ব্যারেল রাইফেল, আর আমার হাতে একটি সাধারণ দো-নলা শটগান। চুপচাপ বসে

ইতিউতি চাইছি। মনে মনে ভাবছি, এমন রাজকীয় ও রজতশুভ্র পটভূমিতেও যদি বাঘ না আসে? তবে বুঝব বাঘের কোন 'সেন্স অব অনার' নেই। পাঁঠাটা কিন্তু অন্যান্য দশটা বোকা পাঁঠার ইতিহাসে ছাই দিয়ে অত্যন্ত সপ্রতিভ। চাঁদের আলোয় গ্রেগরীর মুখের দিকে তাকালাম। পাঁঠাটাই বেশী ভয় পেয়েছে, না গ্রেগরী, তা বুঝলাম না। নিজের মুখ অবশ্য নিজে দেখতে পাইনি।

এমন সময় শীতের বনের স্বাভাবিক মন্থরতাকে উদ্বেল করে একটা ঝিরঝিরি হাওয়া এল—পাতায় পাতায় সড়্সড়ানি আওয়াজ তুলে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, সেই ধানি ঘাসের বনে একদল চিতল হরিণ এসে নেমেছে। দলপতিটার রঙ পেকে একেবারে কালো হয়ে গেছে। ওদের দেখে পাঁঠাটা নিজের মনে একটু চাপা হাসি হাসল। এবং সেটুকু আওয়াজেই পড়ি-কি-মরি করে হরিণগুলো ঘাস দুলিয়ে পালাল। কিন্তু প্রায় হরিণদের পায়ে পায়ে বাঘ এসে পৌঁছল। কিছুটা দূরে সুঁড়ি পথে মচ্ করে একটুকরো শুকনো কাঠ মাড়ানোর আওয়াজ পেলাম। আমরা অমনি সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ, উন্মুখ এবং যাবতীয় উ—?

পথের বাঁকে বাঘটাকে দেখা গেল, আলো-আঁধারীতে। তখন আমরা নতুন শিকারী। বার বার অভিজ্ঞরা মানা করেছেন, হঠকারিতা করবেন না। অতএব বাঘ কাছে আসুক, পাঁঠার ঘাড় মটকাক, তারপরে ভূরিভোজে লিপ্ত হোক। যখন সেই লিপ্ততার পর বাঘের নির্লিপ্ততা আসবে, তখন পিতৃপুরুষের নাম স্মরণ করে গুম্ গুম্ করে দেগে দাও। তারপর যো হোগা, সো হোগা।

আমার খুব ভয় করতে লাগল—এই আগন্তুক বাঘ কি অতগুলো কাণ্ডজ্ঞান মানবে? গ্রেগরীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম—গ্রেগরী কর্তব্যে অবিচল—মুখের রেখা কঠোর—চোখের পাতা পড়ছে না। রাইফেল বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে। ওর পায়ে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিতেই ও আমার আঙুলটি এমন জোরে টিপে দিল যে কি বলব। হঠাৎ দেখলাম, পাঁঠাটা দড়ির শেষ প্রান্তে এসে থরথর করে কাঁপছে। বাঘটা আর একটু এগোতেই পথ জোড়া পাঁঠার দিকে আচমকা দৃষ্টি পড়ল। পাঁঠার মতো এমন নধরকান্তি সৌম্যদর্শন জীবকে খেতে ইচ্ছে করল না বলে কিনা, জানি না, বাঘ ঐখানেই গুঁড়ি মেরে বসল। বসে পাঁঠার দিকে বিস্ময়-বিভোর দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল। এমন সময় মৃত্যুভয় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে মরণোন্মুখ অজ 'ব্যা' করে চেঁচিয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কুলাঙ্গার ব্যাঘ্র পুঙ্গব "হুপ" বলে এক লাফে একেবারে অ্যাবাউট টার্ণ।

আগে যদি জানতাম যে ব্যাটা এত বড় মহাভীতু, তবে কি আমি আর গ্রেগরী মাচায় বসে এত বেশি ভয় পাই? গ্রেগরী বলল—"নেভার সীন্‌ সাচ্‌ এ ডেয়ার —ডেভিল পাঁঠা।"

অজবর যখন গর্বভরে ডাক দিতে দিতে চন্দ্রালোকিত রাতে আমাদের সঙ্গে বোটে ফিরে গেল, তখন বাগচীবাবু বললেন, "বলেছিলাম ত, সুন্দর বনের বাঘ পাঁঠা কোনদিন দেখেনি। ওরা সব সময় দেখে হরিণ, বাঁদর, শুয়োর আর মানুষ। ভয় পেয়ে বাঘ অন্যায় করেনি। আমি বললাম, কিন্তু এ কথা সে আগেই জানাতে পারত এবং জানালে আমরাও যে কিছুকে ভয় পাই না তাকে দেখাতে পারতাম।

গ্রেগরী আমার দিকে লাল চোখে চেয়ে বলল, "ডোন্ট বী সিলী।"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি যে আমিই

বাস থেকে নেমে, সিগারেট কেনার জন্য পকেটে হাত দিয়েছি অমনি বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠলো। পকেট একেবারে ফাঁকা।

না, পকেটমার নয়। কিছুটা দোষ আমারই। বাসে ওঠার সময় খুচরো পয়সা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, পকেটে ছিল শুধু একখানা দশ টাকার নোট। ট্রামে-বাসে সাধারণত দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে দিতে চায় না। তাই বিনীত ভাবে কণ্ডাক্টরকে বলেছিলাম, খুচরো পয়সা নেই, এই দশ টাকার নোটটা যদি—। কণ্ডাক্টর বিনা বাক্যব্যয়ে নোটটা নিয়ে আঙুলের ফাঁকে গুঁজে বলেছিলেন, টিকিটটা রাখুন, চেঞ্জ পরে দেবো।…

তৎক্ষণাৎ আমি মনে মনে দু'বার বলেছিলাম—ভুললে চলবে না। কণ্ডাক্টরের কাছ থেকে টাকা ফেরত নিতে হবে। ভুললে চলবে না। আমার কি রকম সন্দেহ হয়েছিলো, কণ্ডাক্টর আমার চেয়েও ভুলো-মন। সুতরাং মিনিট পাঁচেক বাদেই আমি বললাম, এই যে দাদা আমার টাকাটা।

কণ্ডাক্টর বরাভয় দিয়ে বললেন, দিচ্ছি দিচ্ছি, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনি এসপ্ল্যানেড অবধি যাবেন তো। এরপর আর চাওয়া যায় না।

তাও আমি ভুলতাম না, যদি বসার জায়গা না পেতাম। ভিড়ের বাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া আর জানালার পাশে বসে যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ। জানালার পাশে বসে আমি তুচ্ছ টাকা পয়সার কথা একেবারে ভুলে গেলাম। দেখতে লাগলাম কল্লোলিনী কলকাতাকে। নরম রোদের বেলা তিনটের দুপুর—এ সময় লম্বা মিছিল, স্কুলের মেয়েদের বাস, ট্রাফিক পুলিশের হাত—সব কিছুই দেখতে ভালো লাগে। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, নিজের স্টপ পেরিয়ে যেতেই হুড়ুস ধাড়ুস করে কন্ডাক্টরের পাশ দিয়েই ঝুপ করে নেমে পড়লাম।

টাকার কথাটা তক্ষুণি মনে পড়ত না হয়তো, কিন্তু সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছিলো বলেই দোকানের সামনে পকেটে হাত দিয়ে চৈতন্য হলো। তখনও বাসটা চোখের আড়ালে যায়নি, আমি চেঁচিয়ে উঠলুম রোককে, রোককে!

কেউ শুনতে পেল না। বাসটা আস্তে আস্তে চলছে, সামনের ট্রাফিকের আলোয় যদি থামে, আমি ছুটে আবার ধরে ফেলতে পারি। ছুটে বাস থেকে যখন কয়েক গজ দূরে পৌঁছেছি, সেই সময়ই সবুজ আলো জ্বললো, বাসটা হুস করে বেরিয়ে গেল। ইস্, এই একটুর জন্য টাকাটা ফসকে যাবে! পরের স্টপে বাসটাকে ধরা যায় না! পরের স্টপ বেশী দূর নয়, ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনসের অফিসের সামনে। অনেক সময় মেয়েরা যদি ওঠে কিংবা নামে, তাহলে এক একটা স্টপে বাস অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। কিন্তু আমাকে ঠকাবার জন্যই ঐ স্টপ থেকে কেউ উঠলো-নামলো না, আমি পৌঁছুবার ঢের আগে বাস ছেড়ে দিল।

তখনও বাসটাকে দেখতে পাচ্ছি। ঐ বাসে আমার টাকা। আমার গোঁ চেপে গেল। যে করেই হোক বাসটাকে ধরতেই হবে। প্রথমেই মনে পড়লো ট্যাক্সির কথা। দরকারের সময় খালি ট্যাক্সি পাওয়া কি রকম অসম্ভব, তা সবাই জানে। দু'তিনটে ট্যাক্সিকে হাত তুলে থামাবার চেষ্টা করলাম, তারা অগ্রাহ্য করে চলে গেল। একটি ট্যাক্সিওয়ালা মুখের কাছে হাত দিয়ে বোঝালো, সে এখন খেতে যাচ্ছে, থামবে না।

তারপর আমার মনে পড়লো, আমি ট্যাক্সি থামাবার চেষ্টা করছি কোন্ সাহসে? আমার কাছে তো আর টাকা নেই। বাস থেকে টাকা নিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া মেটাবো—সেটা গোলমেলে ব্যাপার; যদি কিছু এদিক ওদিক হয়ে যায়। তাহলে আর এক কেলেংকারি হবে।

কিন্তু তখন আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য, খালি মনে হচ্ছে, একটুর জন্য বাসটা চলে যাচ্ছে, ওটাকে ধরতে পারলেই টাকাগুলো ফিরে পাবো—শুধু টাকার

জন্য নয়, কন্ডাক্টরটি যদি আমাকে ঠকাবার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে তাঁর একটু শিক্ষা পাওয়া দরকার।

পুলিশের হাতের সামনে বহু গাড়ি থেমে আছে, আমি তার মধ্যে গিয়ে এক একজনকে অনুনয় করতে লাগলাম, আপনি কি সেণ্ট্রাল এভিনিউ ধরে যাবেন? আমাকে একটা লিফট দেবেন। সুবেশ, ভদ্র, গম্ভীর, অধিকাংশ যাত্রী আমার কথায় কোনো উত্তরই দিল না, দু'একজন হাত নেড়ে কি যেন বললো। সাত-আটজনকে চেষ্টা করার পর যখন প্রায় নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবো ভাবছি তখন একটি ট্যাক্সির যাত্রী আমাকে বললেন, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন!

ভদ্রলোকটি প্রৌঢ়, পোশাক দেখলে উকিল বা ব্যারিস্টার মনে হয়। প্রৌঢ় বলেই হয়তো তিনি মানুষের উপকার করা কিংবা বিপদে সাহায্য করার মতন পুরানো ব্যাপারে এখনো বিশ্বাসী। সস্নেহে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে কি? বাড়িতে কোনো বিপদ-টিপদ? আপনার মুখ দেখে মনে হলো—

আমি বললুম, না, ঐ বাসে…আমার টাকা…একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে যদি ধরতে পারি…

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কি?

আমি ব্যাপারটা আবার খুলে বললুম। তিনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি সেদিকে লক্ষ্য না করে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললুম, থোড়া জলদি চালিয়ে ওহি বাসঠো পাকড় না—!

পাঞ্জাবী ট্যাক্সি-ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে কর্কশভাবে ভাঙা হিন্দীতে যা বললো, তার মানে এই দাঁড়ায়: তোমার দরকার তো আমি তাড়াতাড়ি চালাবো কেন? তোমার জন্য আমি অ্যাকসিডেণ্ট করবো? অতই যদি গরজ, নিজে ট্যাক্সি ভাড়া করলে না কেন?

—ট্যাক্সি খুঁজে পাইনি।

—এই দুপুর বেলা বিশ-পঞ্চাশ খানা ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

হঠাৎ আমার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। এ আমি কি ভুল করেছি। কলকাতায় ট্রাফিকের আলোর সামনে গাড়ি থামলে যত রাজ্যের ভিখিরি, চাঁদা আদায়কারী, ঠক্ জোচ্চোররা এসে ভিড় করে, এরা কি আমাকেও তাদের একজন ভেবেছে? কত প্রতারক বানিয়ে বানিয়ে গল্প কত বলে, আমার ঘটনাও তাই সন্দেহ করেছে? নেহাৎ ক'টা টাকার জন্য একি পাগলামি আমার! আসলে

টাকার জন্যও নয়, টাকা তো মানুষের হারিয়েও যায়, কিন্তু আমার ঝোঁক চেপে গিয়েছিল বলেই…।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার দিকে আগাগোড়া চেয়ে দেখলেন। আমার পোশাক বা চেহারায় কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। অনেক প্রতারকের চেহারা আমার চেয়ে ঢের চিত্তাকর্ষক হয়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, এদিকে কোথায় এসেছিলেন?

—অফিসে যাচ্ছিলাম।

—এই দুপুরবেলা অফিস।

—হ্যাঁ, আমাদের এ রকমই, সিফ্‌ট ডিউটি থাকে—

—কোন্ অফিস?

নাম বললাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু কি ভেবে বললেন—ও আচ্ছা আপনাদের অফিসেই তো ভবতোষ কাজ করে, চেনেন তাকে?

—ভবতোষ কি? কোন সেকশান?

উনি যে নাম বললেন, সে নামের কারুকে আমি চিনি না। বলে দিতে পারতুম, হ্যাঁ চিনি, কিন্তু তারপর যদি আবার জিজ্ঞেস করেন, কি রকম দেখতে বলুন তো? বুঝতেই পারলুম, উনি আমাকে উকিলি জেরা করে যাচাই করে নিতে চান। আমি যে জোচ্চোর নই, আমি যে আমিই এটা কি করে বোঝাবো? একমাত্র উপায় যদি বাসটাকে তাড়াতাড়ি ধরা যায়। কিন্তু হায় ট্যাক্সিওয়ালা আস্তে চালাচ্ছে, কিংবা বাসটা জোর ছুটছে, সেটা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে!

আমি কাচুমাচু ভাবে বললুম, দেখুন, আমাদের অফিসে অনেক লোক, সবাইকে চেনা তো সম্ভব নয়। বিশেষ করে নতুন লোক।

—ভবতোষ অনেকদিন চাকরি করছে।

—কিন্তু আমি নতুন ঢুকেছি!

—ও, তা তো হবেই ইয়াং ম্যান। আচ্ছা, অমুক রায়চৌধুরীকে চেনেন, উনি তো টপ অফিসার।

এবার আমি সোৎসাহে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি। সত্যিই চিনি। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। উনি এই মাস ছয়েক হলো রিটায়ার করেছেন।

—রিটায়ার করেছেন? কই, আমার সঙ্গে গত সপ্তাহে দেখা হলো, কিছু বললেন না তো।

কি মুস্কিল, তিনি যদি জনে জনে ডেকে রিটায়ার করার কথা না শোনান,

সেটা কি আমার দোষ। এদিকে, প্রায় বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত পৌঁছে গেছি, বাসটা তখনো আলেয়ার মতন খানিকটা দূরে। খুবই বোকামি হয়ে গেছে আমার, এ রকমভাবে আসা। আমি বললাম, থাক্, আর বেশী দূরে গিয়ে লাভ নেই। সামান্য কয়েকটা টাকা তো। অফিসেরও দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি বরং এখানেই নেমে পড়ি।

ভদ্রলোক অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বললেন, না, না, এখানে নামবেন কেন? এতদূর এসেছেন যখন, চলুন! চলুন!

সর্বনাশ, ভদ্রলোক কি ভাবছেন, বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত বিনা পয়সায় ট্যাক্সিতে আসাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তাই ঐ গল্পটা বানিয়ে বলেছি! কি ঝামেলায় যে পড়লাম। এত ট্রাফিক জ্যাম হয়! এখন একটা ট্রাফিক জ্যামে বাসটা আটকে যেতে পারে না। ট্যাক্সিওয়ালা, তার সঙ্গী এবং এই প্রৌঢ় সহৃদয় লোকটির কাছে কি করে প্রমাণ করবো, আমি একটা জোচ্চোর বদমাস নই, আমার অন্য কোনো মতলব নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দারুণ অস্বস্তিকর নীরবতা। কি জানি, ওঁরা হয়তো ভাবছেন, আমি যে কোনো মুহূর্তে ছুরি-টুরি বার করতে পারি। আমি আগে ভেবেছিলাম এটা খুবই সামান্য ব্যাপার। ভদ্রলোক হয়তো মুহূর্তের দুর্বলতায় আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে এখন অনুতাপ করছেন।

হঠাৎ তিনি বললেন, কিন্তু আমি তো গ্রে স্ট্রীট দিয়ে ডানদিকে বেঁকবো, ওর মধ্যে যদি আপনার বাস না ধরা যায়—

টাকার চিন্তা তখন আমার চুলোয় গেছে। আমি তখন অবিশ্বাসী দৃষ্টি থেকে ছাড়া পেতে পারলে বাঁচি। বিগলিত ভাবে বললাম, অত্যন্ত ধন্যবাদ আপনাকে, আমি গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে নেমে পড়বো, আর যাবো না—চেষ্টা করেও যখন পাওয়া গেল না।

—না, না বাসের ডিপোতে চলে যান। সত্যিই যদি আপনার টাকা নিয়ে থাকে, তাহলে ছাড়বেন কেন?

সত্যিই যদি? কি সর্বনাশ! এ যে পুরোপুরি অবিশ্বাস! অবিশ্বাস হবেই বা না কেন, সবারই তো ধারণা কলকাতার পথঘাট এখন ঠগ-বদমাসে ভরা।

ঠিক গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে বাসটাকে ধরে ফেললো ট্যাক্সিটা। আমি ভদ্রলোককে দ্রুত ধন্যবাদ জানিয়ে পড়ি-মরি করে ছুটে চলন্ত বাসে উঠে পড়লাম। কণ্ডাক্টর আমাকে দেখে অবাক, হয়তো বিশেষ দোষ নেই তার, তবু খুব চোটপাট করলাম ওর ওপরে।

কণ্ডাক্টর বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে টাকা গুণে দিলেন।

ততক্ষণে বাস আরও দু'স্টপ এগিয়ে গেছে। টাকাগুলো নিয়ে নামতেই দেখি পিছনে সেই ট্যাক্সি, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে। ওঁর না ডান দিকে বেঁকে যাবার কথা ছিল। আমাকে যাচাই করতে এসেছেন।

আমার ওপর বিরাট দায়িত্ব। অনেক কিছু নির্ভর করেছিলো আমার ওপর। ঐ ভদ্রলোকের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার রাস্তায় সবাই প্রতারক জোচ্চোর বদমাইস নয়। এখনও লোকে সত্যিকারের বিপদে পড়ে সাহায্য চায়। বাড়িতে ফিরে ওঁকে "খুব জোর বেঁচে গেছি" ধরনের একটা রোমহর্ষক গল্প বলতে হবে না!

আমি সগর্বে টাকাগুলো প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললাম, এই যে, পেয়েছি! পেয়েছি!—তারপর ঐ ট্যাক্সিওয়ালাকেও শিক্ষা দেবার জন্য উল্টো দিকের আর একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলাম।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নসিরাম
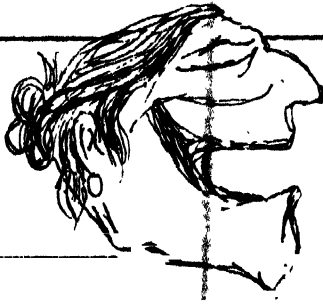
রামতারন লোকটা অভদ্র বটে, কিন্তু ত্যাঁদড় নয়, বুঝলি সতু ?

সতুর কথা বলার মতো অবস্থা নয়। চকবেড়ের হাটে নফরের তামাকপাতার দোকানের পিছন দিকটায় নিরিবিলিতে রোদের দিকে হাঁ করে চোখ বুজে আধশোয়া হয়ে বড়বড় শ্বাস টানছে। একবার শুধু মাথাটা নেড়ে জানাল, কথাটা ন্যায্য।

মরা কুল গাছটায় থিক থিক করছে শুঁয়োপোকা। কাঁচা নর্দমায় পাঁক পচে ফেঁপে উঠেছে। দুপুরের রোদে ঘাঁটা-পড়া নর্দমার কটু একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে কখন থেকে। আর কিছু দেখার নেই লক্ষ্মীছাড়া জায়গাটায়। দুদিকে দু সারি দোকানের পিছন। লোকজনের যাতায়াত নেই, শুধু দোকানীরা মাঝে মাঝে পেচ্ছাপ করতে আসে। মতি সিং-এর শিকলে বাঁধা সাইকেলটার একটা চাকা দেখা যাচ্ছে বেড়ার আড়াল থেকে। যুধিষ্ঠির পালের দোকানের পিছন দিকটায় মস্ত একটা মানকচুর গাছ। লালু মিঞার টেলারিং-এর চালে একটা নধর বেড়াল বসে আছে কখন থেকে, নড়ছেও না চড়ছেও না। গদার চায়ের দোকানের পিছন দিকটায় কানা লক্ষ্মীকান্ত এক নাগাড়ে কয়লা ভেঙে যাচ্ছে।

এসব আলগা চোখে লক্ষ্য করতে করতে বাঁ গালে একবার হাত বোলায় নসিরাম। গালে রুক্ষ দাড়ি খড়খড় করছে। আর দাড়ির নিচে এখনো চিনচিনে ব্যথা। রামতারনের থাবড়াটা তার চোয়াল যে খসিয়ে দেয়নি এই যথেষ্ট।

বুঝলি সতু! নসিরাম গালে হাতখানা চেপে রেখেই বলে, রামতারন থানাপুলিশও করতে পারত। একেবারে জলের মতো কেস।

রামতারনের থাবড়াগুলো খুব অল্পের ওপর দিয়ে যায়নি। সতু এমনিতেও কিছু রোগাভোগা লোক। ক'দিন আগেও ন্যাবা হয়ে চোখ মুখ সব হলুদচোবা হয়ে গিয়েছিল। শেষে বৈরাগী মণ্ডল কাঠির মালা করে দেয়। সে ভারী মজার ব্যাপার। একশ আটখানা কড় প্রমাণ কাঠি সুতোয় বেঁধে চুড়ির মাপের ছোট্ট একখানা মালা ব্রহ্মতালুতে রেখে বলল, হাত দিয়ে চেপে থাকো। সতু তাই থেকেছিল। দেখ না দেখ সেই মালা আপনা থেকেই বড় হতে হতে মাথা গলিয়ে গলায় চলে এল। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সেই মালা বেঢপ বেড়ে নাই-কুণ্ডুলি ছুঁই ছুঁই। সকালে বাসিমুখে চুনের জলে সতুর হাত ধুয়ে দিয়েছিল মণ্ডল। একেবারে হলুদগোলা হয়ে গেল ফটফটে সাদা জলটা। দুপুরের দিকে মালা বেড়ে যখন শরীর গলিয়ে যাওয়ার মতো হল তখন মালা ছাড়ল সতু, দাঁত মাজল, খেল। ন্যাবা সেই বিদেয় হল বটে, কিন্তু শরীরটা এখনো যুতের নেই। রামতারন ভাল খায় দায়। হেৎকাটার এক একটা হাতের ওজনই গোটা সতুর সমান। তার ওপর থাবড়া মারার সময় রামতারন আবার বাঁহাতে সতুর চুলটাও ধরেছিল মুঠো করে। লেগেছে খুব। সতু এখনো দম ফিরে পায়নি, মাথা ঝিমঝিম করছে। তবু নসিরামের কথাটার একটা জবাব দিল সে। বলল, পুলিশ আর এর বেশী কীই বা করত। যা ঝেড়েছে। ওফ!

একথায় নসিরাম একটু লজ্জা পায়। রামতারন দুজনকেই ঝেড়েছে বটে, কিন্তু তার তেমন লাগেনি। চোয়ালের ব্যথাটা দিন দুই থাকবে হয়তো। তবে তেমন কিছু নয়। চোয়ালের হাড় সরে যায়নি, দাঁত ভাঙেনি। গালের মাংসে দাঁত বসে যাওয়ায় ক'ফোঁটা রক্ত পড়েছিল শুধু। সে কথা বলল না, রোঁয়াহীন একটা শালিখের বাচ্চা কোথা থেকে পড়েছে নর্দমার ধারে। কয়েকটা কাক সেটাকে ঠুকরে ঠুকরে শেষ করল এইমাত্র। মা-শালিখটা ধারে কাছে নেই, থাকলে কাককে মজা দেখাত। নসিরাম বুঝতে পারছে রামতারনের পক্ষ নিয়ে কথা বলা তার উচিত নয়। বললে হয়তো সতু ভাববে, মার খেয়ে নসিরামের মাথাটাই গুলিয়ে গেছে।

কিন্তু ঘটনাটা ঠিক ঠিক বিচার করলে রামতারনকে কি দোষ দেওয়া যায়? গাজিপুর থেকে তারা রামতারনের পিছু নিয়েছিল। নেওয়ারই কথা। রামতারন আদায় উশুল করে ফিরছে। গাজিপুরের গোটা বাজারটাই ওর কিনা। মেলা টাকা। একজন পাইকও সঙ্গে ছিল। লহরার ইসমাইল। তার কোমরে চাকু, হাতে লাঠি।

সতু আর নসিরাম সব খবরই নিয়েছিল। বনবিবিতলায় ইসমাইলকে ছেড়ে দেবে রামতারন। কারণ ওখানেই ইসমাইলের দু নম্বর বিবি ওলন থাকে, ওলন ভারী আহ্লাদী মেয়েমানুষ। বুকে দয়ামায়া আছে, ধর্মভয় আছে। বড় একটা এদিক সেদিক করে না। তবে ইসমাইল বা রামতারনের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার দক্ষে আছে। ওলনবিবি দেখতে খারাপ নয়। বালবাচ্চা নেই, শরীরটাও তাই ভাঙেনি।

ইসমাইলকে ছেড়ে রামতারন বনবিবিতলার বড় মাঠে পড়ল। পথও তার বেশী ছিল না! মাইলটাক গেলেই পীরগঞ্জের পাকা সড়ক। ফটফট করছে দুপুরের রোদ। ছাতা মাথায় রামতারন দুলকি চালে হাঁটছিল। আচমকাই সতু আর নসিরাম চড়াও হল তার ওপর। সতুর হাতে ভোজালি, নসিরামের হাতে দেড় ফুট লম্বা গুপ্তি ছোরা।

রামতারণ ভয় খেয়েছিল কিনা বলা শক্ত। তবে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিল ঠিকই। সতু ভোজালিটা আপসাতে আপসাতে বিকট গলায় বলল, জয়কালী, করালবদনী! এবদম চেঁচামেচি করবেনা বলে দিচ্ছি। লাশ ফেলে দিবো। এইখানেই লাশ পড়ে থাকবে, কুকুরে শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে। মালটা দিয়ে দাও ভালোয় ভালোয়। পাশ থেকে গুপ্তির চোখা ডগাটা রামতারনের ভুঁড়িতে ঠেকিয়ে রেখেছিল নসিরাম। তেমন বেগতিক দেখলে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা। তবে সেটা কথাই। সতুও কোনদিন কারো লাশ ফেলেনি, নসিরাম গুপ্তি উঁচিয়ে দেয়নি। তেমন জোরালো কলজে তাদের নেই। কিন্তু রামতারনের তো ভয় খাওয়ার কথা, দু দুটো ঝকঝকে অস্ত্র চোখের সামনে দেখেও শালা ঘাবড়াল না। অ্যাঁ! নসিরাম ঘটনাটা আবার ছবির মতো দেখছিল চোখের সামনে।

সতু চোখ পিটপিট করে দেখছিল নসিরামকে। হঠাৎ অন্তর্যামীর মতো বলে উঠল, শালা ভয় খেল না কেন বলো তো!

নসিরাম বিরক্ত হয়ে বলল, কাজের সময় বেশী কথা কইতে নেই। যারা বেশী কথা কয় তাদের কেউ ভয় খায় না।

সতু ফিসফিস করে বলল, মালটা ছাড়ছিল না যে !

ওর বাপ ছাড়ত। দুটো খোঁচা খেলেই বাপ বাপ বলে ছাড়ত। ভোজালিটা তোমার হাতে ছিল কী জন্যে !

সতু মিইয়ে গেল। ফের হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল চোখ বুজে। দোষটা সতুর ঘাড়ে চাপাল বটে নসিরাম, কিন্তু পুরো দোষটা ওরও নয়। বোধহয় ওর চেহারাটারই দোষ। ল্যাঙপ্যাঙে একটা লোক যদি ভোজালি নিয়ে কেরদানি দেখায় তবে কার না ইচ্ছে করে তাকে একটা থাবড়া বসাতে? তার ওপর সতু হঠাৎ রামতারনের কুচ্ছো গাইতে শুরু করল, তেঘরেতে তোমার বাপের একজন রাখা মেয়েমানুষ আছে। সব ফাঁস করে দেবো। ইসমাইল মিঞার দু নম্বর বিবি গুলনের সঙ্গে তোমার আশনাইয়ের কথাও জানি। হপ্তায় দুদিন গুলনের ঘরে তুমি যাও। ট্যাঁ ফোঁ করেছো কি এসব কথা ঢোল সহবৎ হয়ে যাবে। বুঝেছো?

রামতারন আচমকাই থাবড়াটা কষাল। আর সে কী থাবড়া বাপ। সতুর মুন্ডুটা তখনই ধড় ছেড়ে উড়ে গিয়ে আলের ধারে পড়ার কথা। শব্দটাও হল বোমার মতো। সেই শব্দে কেমন অবশ হয়ে গিয়েছিল নসিরাম। হাতের গুপ্তিটার কথা তখন বেবাক ভুল। সেই অবশ অবস্থাতে রামতারন হঠাৎ ঘুরে তাকেও একটা ওরকম থাবড়া কষাল। মাঠের মধ্যে দিনের আলোয় অন্ধকার দেখতে দেখতে মাটিতে বসে পড়ল নসিরাম। আর রামতারন তখন একহাতে সতুর চুল ধরে তুলে পটাপট কয়েকটা থাবড়া দিয়ে গেল নাগাড়ে। সতু চেঁচাচ্ছিল, আর মেরোনা। ন্যাবা থেকে উঠেছি, শরীর যুতের নয় হে, মরে যাবো।

হোঁৎকা এক কথায় থামল। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞেস করল, তোরা কারা?

সতু মাটিতে পড়ে চষা ক্ষেতের এক চাঙর মাটি আঁকড়ে ধরে দম নেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্ট করছিল। কথা বলার অবস্থা নয়। লুঙ্গি খসে গিয়ে দিগম্বর অবস্থা তার।

নসিরাম টলতে টলতে দাঁড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আমরা হচ্ছি—বলে একটু ভাবতে হল। নাম দুটো স্মরণ হচ্ছিল না ঠিক।

রামরতন ধমক দিল, কারা তোরা?

আমি নসিরাম।

আর ও?

ও তো সতু !

কোন গাঁ

আমি লোহারগঞ্জ, আর ও কালীতলা ।

ঠিকঠাক বলছিস ?

বানানোর মতো কথা মাথাতেই আসছে না । ঠিকঠাক না বলে উপায় কি ? নসিরাম জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শুধু ।

রামতারনের বোধহয় তাড়া ছিল, দুজনের জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে ভেবে চোখ পাকিয়ে বলল, এই দণ্ডে এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাবি । ফের দেখতে পেলে পুঁতে ফেলব । যাঃ যাঃ…

গরু তাড়ানোর মতো তাড়া খেয়ে তারা দুজনে সেই দণ্ডেই মাইলটাক পথ হেঁটে চকবেড়ের খাল পেরিয়ে হাটে এসে সেঁদিয়েছে । ভয়ের চোটে এতক্ষণ গা গতরের ব্যথা তেমন টের পায়নি । এখন পাচ্ছে । তবে গায়ের ব্যথাটা বড় কথা নয় । রামতারন ইচ্ছে করলে পাঁচগঞ্জের থানায় তাদের জমা করতে পারত । আরো বিপদের কথা, ইসমাইলকে লাগাতে পারত পিছনে, ইসমাইলের জমার ঘরে অন্তত পঁচিশটা খুন লেখা আছে । আরো দুটো বাড়লে ক্ষতি ছিল না ।

নফর চেনা লোক । কিন্তু তাদের দেখে খুশি হয়নি মোটেই । দুজনের চেহারা দেখেই বিরস মুখে বলল, কোত্থেকে চোরের ঠেঙানী খেয়ে এসেছো ! ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো । আমি ঝামেলা পছন্দ করি না ।

তা চোরের ঠেঙানীও তারা খেয়েছে বৈকি । নফরের দোষ নেই । এই তো মোটে সেদিন শীতলাদলের বাজারে রামহরির দোকানে মাঝরাতে ঢুকেছিল দুজন । সতু আগে পিছনে নসিরাম । ঢুকেই সতুটা হেঁচে ফেলল । রামহরির ছেলে দোকানে শোয় । তার হাতের কাছেই টর্চ আর লাঠি । "কে রে ?" বলে লাফিয়ে উঠতেই ভাঙা জানালা গলে পালাল দুজন । কিন্তু বাজার বলে কথা । চোখের পলকে চৌকিদার দোকানী আর ব্যাপারী মিলে বিশ-পঁচিশ জন জুটে তাড়া করে খালধারে প্রায় ধরে ফেলল দুজনকে, তবে ভাগ্য ভাল সবাই অত জোরে ছুটতে পারে না । আর তারাও প্রাণের ভয়ে দৌড়চ্ছিল । ধরল এসে জনা চারেক । কিল চড় চাপড় গোটা কয়েক পড়ল বটে, কিন্তু দুজনেই বুদ্ধি করে শীতের রাতে খালের বরফগোলা জলে লাফিয়ে পড়ায় অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যায় । কাজেই নফরের দোষ নেই । তারা যে লোক ভাল নয় একথা সবাই জানে । তবে সুবিধেটা এই যে আজকাল লোক কেউ ভাল

নয়। এই যে নফর দিব্যি তামাকপাতার পাইকারি কারবার খুলে বসে আছে আলটপকা দেখলে মনে হয় ভারী সিধে কারবার। কিন্তু তামাকপাতার আড়াল দিয়ে গুলি, গাঁজা, চরস, ভাঙ, আফিং-এর যে ফলাও কারবার চলছে তার খোঁজ রাখে কজন? নসিরাম আর সতু সবই জানে। তাই চলে যেতে বললেও তারা যায় না। নফরও আর বেশী গাঁইগুঁই করেনি।

বেলাটা পড়ে এল, দোকানের পিছনকার ঘাঁটাপড়া জায়গায় আলোটা বিলিতি বেগুণের রঙ ধরল। নসিরামের মনে হল, যথেষ্ট জিরেন হয়েছে।

ও সতু! উঠবি?

সতু আধশোয়া হয়ে ছিল এতক্ষণ। এখন দেখা গেল, ন্যাড়া মাটির ওপর হাতে মাথা পেতে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। তা ঘুমোবেই। শরীরটা যুতের নেই। ন্যাবার আলিস্যি আছে। রামতারনের ওই অসুরের মারেও তো কম ধকল যায়নি।

নসিরামের কাছে বিড়ি নেই। থাকলে একটা ধরাত। শরীরটা উশখুশ করছে। সতুর কাছেও নেই, সে জানে। বিড়ি নেই, ম্যাচিস নেই পয়সা নেই। নসিরাম উঠল। কারণ, বসে থাকার কোন মানে হয় না। যুধিষ্ঠির পালের দোকানের পিছনে মস্ত মানকচু গাছটা অনেকক্ষণ ধরে তার চোখ টানছে। মাটির ওপরেই কচুর যে মোথাটা উঠে আছে সেটা দেখে মনে হয়, দশ সেরের কম ওজন হবে না। যুধিষ্ঠির কচুগাছের গোড়ায় রোজ এঁটো ভাত, ছাই, গোবর আর কীকী সব ফেলে ফেলে দিব্যি পুরুষ্টু করে তুলেছে জিনিসটিকে।

শীতের শেষ টান। নসিরাম জানে এই হাটে এখনো মানকচু খুব একটা ওঠেনি। অনায়াসে দু তিন টাকায় বিকিয়ে যাবে। টেনে তুলতেও কষ্ট নেই। জল পড়ে পড়ে জায়গাটা এমনিতেই ভুসভুসে হয়ে আছে।

নসিরাম সাবধানে নর্দমাটা পার হয়ে এগিয়ে গেল। চাল থেকে সেই নট নড়ন চড়ন বেড়ালটা হঠাৎ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে।

যুধিষ্ঠিরের দোকানের পিছন দিককার দরজাটা আবজানো। কে খোলা রাখবে বাপ! যা দুর্গন্ধ। কচুটা টেনে তোলার সময় নসিরামের একবার মনে হল, ছিঃ ছিঃ কাজটা ঠিক হচ্ছে না, একটু আগেই বনবিবিতলার মাঠে যার হাতে গুপ্তি ছোরা ছিল এখন সেই কিনা কচু—তুচ্ছ কচু চুরি করছে! লোকে দেখলে বলবে কী?

অবশ্য দেখছে না কেউ। কানা লক্ষ্মীকান্ত কয়লা ভেঙে উঠে গেছে। দেখছে শুধু বেড়ালটা। লালুমিঞার টেলারিং-এর চাল থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে

খুব লক্ষ্য করছে তাকে আর মিহিন মিয়াঁও আওয়াজ ছাড়ছে। তবে বেড়াল বলে রক্ষে। কুকুর হলে এতক্ষণে খাউ খাউ করে দুনিয়াকে জানান দিত।

যত সহজে কচুটাকে তোলা যাবে ভেবেছিল নসিরাম, কার্যকালে ততটা সহজ মনে হচ্ছে না। মাটিটা ভুসভুসে পচা মাটি ঠিকই, কচুটাও নড়বড় করছে বটে। কিন্তু গোলমাল অন্য জায়গায়। সেই সকালে দু গাল পান্তা মেরে বেরিয়েছিল নসিরাম। সেই পান্তা কবে তল হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরেই পেটটা একেবারে বোমভোলা ফাঁকা। মেহনতও বড় কম যায়নি। এখন মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, শরীরটা কাহিল লাগছে! ভারী কচুটা খানিক নাড়িয়ে মাটিটা আরো আলগা করে টান দিতে গিয়েই পাঁজরে খিঁচ ধরে দম বন্ধ হয়ে এল। দু হাতে বুকটা চেপে ধরে উবু হয়ে বসে পড়ল সে। হাতখানেক বেরিয়ে আদা কচুটা আবার নিজের গর্তে বসে গেল। লালুমিঞার চাল থেকে বেড়ালটা পায়ে হেঁটে চলে আসছে যুধিষ্ঠিরের দোকানের চালে। খুব চেল্লাচেল্লি করতে লেগেছে হঠাৎ। নসিরাম একটা ঢেলা কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল। তারপরই বুঝল ভুল হয়েছে। ঢেলাটা বেড়ালের গায়ে লাগল কিনা কে জানে, তবে যুধিষ্ঠিরের টিনের চালে খটাং করে একটা শব্দ হল।

নসিরাম ফেরৎ যাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিল। কপাল খারাপ। বাঁ পায়ে জোর ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে। একেবারে অবশ। উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়তে হল। দোকানঘরের পিছনের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল যুধিষ্ঠির।

এমনিতে দেখলে যুধিষ্ঠিরকে ভয়ের কিছু নেই। রোগাভোগা চেহারা। গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, গায়ে হাফহাতা গেঞ্জি। কিন্তু চেহারা দেখে বিচার করলে খুবই ভুল হবে। যুধিষ্ঠির দেখা দিয়েই মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, কোন শুয়োরের বাচ্চা রে।

আশ্চর্য, নসিরামের রাগ হল না। আজকাল রাগটাগ কমে যাচ্ছে। সে একটু তেজী গলায় বলার চেষ্টা করল, গালমন্দ করছো কেন?

গলায় তেজ তো ফুটলই না, বরং খোনা স্বর বেরোল। উপোসী পেট থেকে আর কত বড় আওয়াজ বেরোবে?

যুধিষ্ঠির তার সাধের কচুটার দিকে তীক্ষ্ন চোখে চেয়ে ছিল। মাটি আলগা, কাদায় চোরের পায়ের ছাপ, চোরও বেকায়দায় পড়ে বসে রয়েছে। সামনে।

যুধিষ্ঠির কোমরে হাত দিয়ে তেজের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বলল, গালমন্দ করবো না তো কি জামাই-আদর করতে হবে নাকি রে ছ্যাঁচড়া হারামজাদা? ওরে ও

পতু, ইদিকে আয়—

পতুর আসা মানে সাড়ে সর্বনাশ। যুধিষ্ঠির রোগাভোগা হলেও তার মেজো ছেলে পতিতপাবন রোগা নয়। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। নসিরামের যা অবস্থা এখন ইঁদুরের লাথি খেলেও সইতে পারবে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, তা আমি কী করে জানবো যে কচুটা তোমার!

আমার নয় তো কি তোর বাবার?

নসিরাম উকিল মোক্তারের মতোই বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, জমিটা তো আর তোমার নয়। সরকারবাবুদের হাট, তাদের জমি।

তাই নাকি রে শুয়োরের পো? তোর এত আইনের জ্ঞান? ওরে পতু—

ঝিঁঝিঁ ছাড়াতে পায়ে থাবড়া মারতে মারতে উঠে দাঁড়াল নসিরাম। বলল, চেঁচাচ্ছ কেন খামোখা? যেতে বলেছো যাচ্ছি।

কখন তোকে যেতে বললাম রে খানকির ছেলে? ওরে পতু! শুনছিস! শীগগীর আয়—

পতু প্রথমটায় শুনতে পায়নি। এবার পেল। বেরিয়ে এসে বলল, কী হয়েছেটা কী?

এই দ্যাখ। চোর ন'সে আমার কচু লিয়ে পালাচ্ছিল। ধর হারামজাদাকে।

নসিরামের ঝিঁঝিঁ ছেড়েছে। সে আচমকাই লাফ দিয়ে নর্দমাটা পেরিয়ে গেল। নফরের দোকানের দিকে জোর কদমে হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এঃ, ভারী তো কচু! পতু যে রেলের মাল নামায়, তার বেলা। চোর আমি একা, না?

একেবারে বেঁচে যাবে এতটা আশা করেনি নসিরাম। পতুও সমান তেজে নর্দমাটা পেরিয়ে তেড়ে এল। দৌড়তে দৌড়তেই নসিরাম গুণে গুণে তিনটে গাঁটটা খেল মাথায়। যেন তিনটে ঝুনো নারকোল ডগা থেকে খসে মাথায় এসে পড়ল। আর কিছু অকথ্য গালাগাল। তবে দোকানে খদ্দেরের ভীড় আছে বলেই বোধ হয় পতু ঝামেলা আর বাড়াল না। তিনটে রামগাঁট্টায় মাথায় তিনটে আলু ফুটিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

ফের চোখে অন্ধকার দেখল নসিরাম। মরা কুলগাছটায় হাতের ভর রেখে অন্ধকারটা ছাড়িয়ে নিল চোখ থেকে। এক রাজ্যের শুঁয়ো লেগে হাতটা চুলকোতে থাকে। তবু অল্পের ওপর দিয়েই গেছে বলতে হবে।

কিন্তু কথাটা সে অন্যায্য বলেনি। যুধিষ্ঠিরের চায়ের দোকান যত ভালই চলুক, তাদের আসল আয় দোকান থেকে নয়। পতু জংশন স্টেশনে রেল থেকে মাল খালাস করার দু নম্বরী ব্যবসায় বহুদিন হল ভিড়ে গেছে। রেলের পুলিশ নিজেরাই ব্যবসাটা ফেঁদেছে। পতুরা কম দামে মাল নামিয়ে আনে। বেশী দামে বেচে দেয়। ধরা পড়ার ভয়টা নেই।

সতু এতক্ষণে উঠে বসেছে। কান্ডটা বোধ হয় দেখেছেও। হাই তুলে বলল, বেশী কথা বলা তোরও দোষ। অত কথা বলতে যাস কেন ?

নসিরাম রাগ করে বলে, খামোখা গালমন্দ করছিল দেখলে না ?

খামোখা করে রে পাগল। তোরও দোষ ছিল। চল রওনা দিই। আজ আর কিছু হওয়ার নয়। দিনটাই খারাপ।

বয়সে সতু নসিরামের চেয়ে বছর কয়েকের বড়। তার বউ আছে, গোটা চারেক বাচ্চা আছে। নসিরামের ওসব নেই। দুজনেই ভুঁইএাদের জমিতে চাষ করত। বর্গা রেজিস্ট্রির সময় মাতব্বররা তাদের বাদ দিয়ে অন্য দুজনের নাম বসাল ! কিছুতেই টলল না। নতুন বর্গাদার ভুঁইএাদের নিজস্ব লোক। মাতব্বরদের টাকা খাইয়ে ওরাই ওই কাজ করে। সেই থেকে সতু কষ্টে আছে। দুজনেই বুদ্ধি পরামর্শ করে চুরি ছ্যাঁচড়ামির লাইন ধরল বটে, কিন্তু আজ অবধি তেমন সুবিধে হল না।

নসিরাম গোঁ ধরে বসে বলল, তুমি যাও। আমি যাব না।

তবে কি এখেনে বসে বসে মশা তাড়াবি ?

তাই তাড়াবো।

তোর বড় তেজ। অত তেজ ভাল নয়। আজ আর লোহারগঞ্জ গিয়ে কাজ নেই, কালীতলাতেই চল। একটা চট পেতে দাওয়ায় পড়ে থাকবি।

অভিমান ভরে নসিরাম বলে, তোমার বউ তোমার জন্য রেঁধে রেখেছে, আমার জন্য তো আর রাখেনি। একথায় সতু হাসল, বলল, রেঁধে রেখেছে তো মেলা। উনুনে নিজের হাত পা গুঁজে দিয়ে নিজের মুন্ডুটা সেদ্ধ করে রেখেছে। চল, নুন দিয়ে মেখে তাই খাবি। তাও নুন যদি মুদির পো ধারে দেয়।

নসিরামের অভিমান যায়নি। বলল, তোমার বউয়ের মুন্ডু তুমি খাওগে।

তোর বড্ড মেজাজ। ঠান্ডা হ তো বাপু। ঠান্ডা মাথায় বসে ভাব। ভাবতে ভাবতে একটা কিছু বেরিয়ে পড়বে।

বিড়ির কী ব্যবস্থা করা যায় বলো তো ?

নফরাকে বল না।

নফরা দিতে বসেছে আর কি।

তবে যা, একটু তামাক পাতা নিয়ে আয়। দুজনে বসে চিবুই।

কিন্তু নসিরাম নড়ল না। গোঁ ধরে বসে রইল। চারদিক ঝেঁপে অন্ধকার নামছে। চকবেড়ের হাটে আলো জ্বলে উঠছে একে একে। কুপি, হ্যাজাক, হ্যারিকেন, কারবাইড। আনমনে দৃশ্যটা দেখছিল নসিরাম। ভারী সুন্দর এই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর লড়াই। আলো ভাল লাগত যদি পেটের খোঁদলটা এমন হাঁ হাঁ না করত।

সতু একটা কোঁক দিয়ে ধীরে ধীরে উঠল। কোমরের গামছাটা খুলে মাথায় জড়াতে জড়াতে বলল, এখন সাঁঝের পর খুব হিম পড়ে। কালীতলায় যদি না যাস তো লোহারগঞ্জেই যা, ঘরে গিয়ে আজকের রাতটা জিরো।

নসিরাম তবু নড়ল না, তার কেমন একটা ভাব এসেছে। রামতারণ তাকে একটা মোটে থাবড়া দিয়েছিল। সতুর ভাগটা ছিল অনেকটাই বেশী। এখন আবার পতুর গাঁট্টা তিনটে খাওয়ার পর নসিরাম আর সতু প্রায় সমান সমান। তার চেয়ে বড় কথা, তিনটে গাঁট্টা তার মাথার ভিতরটা কেমন গুলিয়ে দিয়েছে। চারদিককার এই হাট বাজার, পচা নর্দমার গন্ধ, রৈ-রৈ শব্দ কিছুই যেন তাকে তেমন ছুঁচ্ছে না।

সতু আবার জিজ্ঞেস করল, কী রে যাবি ?

না, তুমি যাও।

সতু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে আবার বসে পড়ল। বলল, তোর হয়েছেটা কী বল তো।

নসিরাম হঠাৎ মুখ তুলে বলল, হবে আবার কী ? এতক্ষণে রামতারনের লাল মাঠের ধারে পড়ে থাকার কথা, তার ওপর মাছি ভন ভন করার কথা। আমাদের দুজনের হাতে দু দুটো অস্ত্র ছিল, তবু তা হল না। লোকটা ভয় পেল না। কেন বলো তো সতু গোঁসাই ? এক গোছা টাকা ট্যাঁকে নিয়ে সে দিব্যি ফিরে গিয়ে এতক্ষণে বউয়ের হাত পাখার নিচে বসে বাতাস খাচ্ছে।

হাতপাখার বাতাস খাওয়ার মতো গরম এখনো পড়েনি, কিন্তু সে কথাটা আর সাহস করে বলতে পারল না সতু। গলাটা উদাস রেখে বলল, প্রথম প্রথম ওরকম হয়। ওকে যে মারতে হয়নি সেটা ভালই হয়েছে। মানুষ মারার অনেক হেপা রে। আমরা তো মারতে চাইনি। টাকাটা চেয়েছিলুম।

আর উল্টে যে ও আমাদের মারল !

তা কী করবি বল। রামতারন শালা খায় দায় ভাল। বোধ হয় ডন বৈঠকও করে। তোর আমার মতো উপোসী পেট তো আর নয়। আমরাও দু দিন ভরপেট খেয়ে নিলে অত সহজে পারত নাকি ! তার ওপর আমার ন্যাবাটা হয়ে…

রাখো তোমার ন্যাবা। নসিরাম খেঁকিয়ে উঠে বলে, আসলে আমরা মরদই নই।

কথাটা অন্যায্য মনে হয় না সতুর। সে চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে ভয়ে ভয়ে বলে, চল, হাটে একটু ঘুরে দরদস্তুর দেখি।

দেখে কী হবে ?

চল না। জিনিসপত্তর দেখলে মনটা অন্যদিকে থাকবে। দরটাও জেনে রাখা ভাল। আমার মুখে থুথু আসছে। একটু তামাক পাতা মুখে না দিলেই নয়।

নসিরাম চোখ পাকিয়ে বলল, কচুটা কি যুধিষ্ঠির শালার বাপের ?

সতু উদাস গলায় বলল, তারই বা কী করবি ? জোর যার মুলুক তার।

এঃ জোর ! আমরা যে আসলে মরদই নই সে কথাটা স্বীকার যাচ্ছো না কেন ?

যাচ্ছি বাপ, স্বীকার যাচ্ছি।

নসিরাম হঠাৎ একটা ঝাঁকি মেরে উঠে সতুকে দু হাতে নাড়া দিয়ে বলল, তাহলে চলো মরদের মতো একটা কিছু করি।

ভয় খেয়ে সতু বলে, কী করবি ?

একটা কিছু করি, নইলে কোন লজ্জায় বাড়ি ফিরবো।

নসিরামের মাথায় যে পতুর তিনটে গাঁট্টা তাড়ীর মতো কাজ করছে তা জানে না সতু।

তবে তার চোখেমুখে হন্যে ভাবটা দেখে সে বুঝল, নসিরাম নিজের বশে নেই। পাগলার বায়ু চড়েছে। সে নসিরামের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, চল তো আগে বেরোই। তারপর দেখা যাবে।

দুজনে বেরোবার মুখে একটা আস্ত তামাক পাতা নফরের চোখের সামনেই তুলে নিল নসিরাম। আস্তটা না নিলেও হত। কুঁড়ো কাঁড়া মেলা পড়ে থাকে। তাই দিয়েই চলে যেত। তবু আস্ত পাতাটাই একটা থাক থেকে তুলে নিল নসিরাম। নফর কিছু বলতে যাচ্ছিল। হয়তো মা-বাপ তুলে একটা খিস্তিই দিত। কিন্তু নসিরাম তার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। কী জানি

কেন, কিছু বলল না নফর।

বাইরে এসে একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে বলা নেই কওয়া নেই চুণের বাটি থেকে এক খাবলা চুণ তুলে নিল নসিরাম। পানের দোকানী হাঁ-হাঁ করে উঠেও শেষ অবধি আর কিছু বলল না।

চুণ দিয়ে ডলা খানিকটা তামাক পাতা ঠোঁটের নিচে গুজবার পর একটু ধাতস্থ হল দুজন।

নসিরাম খানিক থুথু ফেলে বলল, আমাদের কী নেই বলো তো? কেন আমাদের দিয়ে কাজ হচ্ছে না?

সতু মিইয়ে গিয়ে বলে, আমরা লোক ভাল। ভাল লোকদের দেখলেই চেনা যায় কিনা।

তোমার মাথা। ভাল লোককে ধরে তাহলে ঠেঙায়?

ভাল লোক বলতে ঠিক ভাল লোক নয় বটে। আসলে আহম্মক ঠাওরায়।

তাই বলো। আহাম্মক আর ভাল কি এক হল?

অত কথা জানলে তো এতদিন কালীতলা প্রাইমারিতে মাষ্টারি করতুম রে। অত কথা কি জানি?

ভুঁইএঞারা যখন জমিতে নতুন বর্গা লাগালে তখন আমরা যেমন আহাম্মক ছিলুম আজও তেমনি আহাম্মক আছি বলছো?

সতু মাথা নেড়ে বলে, আছিই তো।

তাহলে মরদও নই?

তাও খানিকটা ঠিক। কারো সঙ্গেই আমরা তেমন এঁটে উঠছি না। তবে রোজ একটু একটু অভ্যেস করলে দেখিস হয়ে উঠব একদিন।

তোমার বয়স কতো?

সতু অবাক হয়ে বলে, কত আর। তোর চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড় হবো। তোর কত?

তা জানি না। তবে বেশী নয় খুব একটা, কমও নয়। ভাবছি হয়ে উঠতে আর কদিন লাগবে। ততদিন বুড়ো থুড়ো হয়ে যাবো না তো দুজনে?

সতু খুব হাসে। গামছার ল্যাজে মুখ মুছে বলে, বুড়ো হওয়া তো ভাল কথা রে। বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয় তাহলে। গতিক যা দেখছি, ততদিন বেঁচে থাকাটাই তো দায়।

নসিরাম আর একবার থুথু ফেলে বলে, তাই, তো বলছিলাম, এসব রয়ে সয়ে হয় না। এসো মরদের মতো একটা কিছু করে ফেলি।

মেটে আলুর দর জিজ্ঞেস করতে একটু দাঁড়িয়েছিল সতু। দোকানী

তেরছা একটু চেয়ে দেখল। জবাব দিল না। মাল চেনে। সতুও আর চাপাচাপি করল না। হাঁটতে হাঁটতে বলল, কী বলছিলে?

বলছিলাম অত ভয় খাও কেন? একটা ধুন্ধুমার কিছু লাগিয়ে দিই এসো। যা হোক, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড।

অত উতলা হোস না। রোস ক'দিন।

সেটা আর ক'দিন; ভাল পথ তো আর নেই। খারাপ পথেও ভীড় বাড়ছে। শেষে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন?

কেন, এই তো সেদিন রতন সিং-এর গোরুটা চুরি করলুম দুজনে।

সে আর ক'টা টাকাই বা দিয়েছে! গো-হাটার লোকটা চোরাই গোরু বলে ধরে ফেলল। দিল মাত্র একশটা টাকা। ভাগাভাগি হয়ে তোমার পঞ্চাশ, আমার পঞ্চাশ। ও তো পিচেশপানা। বড় কিছু না করলে বড় দাঁও মারা যায় না, বুঝলে!

বুঝছি রে বাপ, হাড়ে হাড়ে বুঝছি। তুই বড় ছটফট করছিস আজ। এমন তো ছিলি না।

আজ রক্তটা কিছু গরম লাগছে।

আয় তেলেভাজা খাই। পেটে কিছু পড়লেই রক্ত ঠাণ্ডা হবে। আমার কাছে একটা টাকা আছে।

আছে? বলোনি তো এতক্ষণ!

বলার ফাঁক দিলি কই? যা গেল হুজ্জুত। পরশু ব্রজবিলাসের বাড়ি থেকে দুটো কাঁসার থালা সরিয়েছিলাম। তারই তলানী একটা টাকা পড়ে আছে।

তাহলে তেলেভাজা খেতে চাইছো কেন? অত বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়? বরং একটু কুম্মি কলাই আর নুন কিনে বাড়ি যাও। সেদ্ধ করে ছেলেপুলে বউ নিয়ে খাবে।

বলছিস?

বলছি। খিদেটা আছে থাক। শরীরটা গরম লাগছে। চনমনে লাগছে। পেটটা ঠাণ্ডা হলে এই ভাবটা মরে যাবে।

সতু আমতা আমতা করে বলল, তোকে আমার এখন একটু একটু ভয় করছে কেন রে নসু?

নসিরাম হাঃ হাঃ করে খানিক হাসল। মাথায় একটু হাত বোলাল সে। তিনটে আজ ফুটিয়ে দিয়েছে পতু শালা। কেন? না একটা কচু নিয়ে বৃত্তান্ত। দুনিয়াটা যে কী ছোটোলোকই হয়ে গেছে বাপ!

চকবেড়ের সরকারদের এই হাট ভারী রমরমে জায়গা। নামে হাট হলেও আসলে পাকা এবং স্থায়ী বাজার। হপ্তায় দুদিন বাজারের গায়েই হাট বসে। আজ সেই হাটবার। মেলা লোকের আনাগোনা। দুজনে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বিশেষ লক্ষ্য করছে না তাদের।

সতু বলল, কথাটার জবাব দিলি না?

কোন কথাটার?

তোকে দেখে এখন আমার একটু গা ছমছম করছে কেন?

ওঃ, কী যে ছাতামাথা বলো না। আমি কি ভূত যে গা ছমছম করবে?

ভূত নোস। তবে তোর হাবভাব ভাল লাগছে না রে নসু। কী যে একটা মতলব আঁটছিস মনে মনে!

সে তো আঁটছিই। হাবভাব ভাল করার জন্য এ লাইনে নেমেছি নাকি।

তা বটে। তবে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখিস।

রাখা যাচ্ছে না। মাথা ঠাণ্ডা থাকে কখনো? হাতে অস্ত্র নিয়ে হামলা করলুম, তাও রামতারন শালা পুলিশে দিল না। এমন কি ইসমাইলকে পর্যন্ত পিছুতে লাগাল না। তার মানেটা বুঝছো? তার মানে, রামতারন আমাদের মনিষ্যি বলেই জ্ঞান করেনি। ছিঁচকে চোরকেও লোকে এর বেশী খাতির দেয়। তা জানতে চাইছিলুম, আমাদের কী নেই! কিসের অভাব আছে। লোকে ভয় খাচ্ছে না। পাত্তা দিচ্ছে না। রামতারন এমন কিছু ডাকাবুকো লোকও নয়। গেরস্ত মানুষ, পাইক নিয়ে চলে, মেয়েমানুষ করে, তার ভয় ভীতি থাকার কথা। তারপর ধরো, যুধিষ্ঠিরের পো পতু চোর বলে তিনটে গাঁট্টা আর গালাগাল দিয়ে ছেড়ে দিল। লোক জড়ো করল না, তেমন চেঁচামেচি করল না। তার মানেও কিন্তু ওই। মানুষ বলেই ধরছে না।

তোর মাথাটাই বিগড়ে গেছে আজ।

তা বলতে পারো। নাও তামাকটা একটু ডলো। আর একটু চড়াই।

খিদেটা মরেছে?

মরেছে। আর একবার চড়ালে একদম মরে যাবে।

মাসুদের জর্দার দোকানের সামনে একটা আয়না ঝোলানো। ম' ম' করছে গন্ধ। খৈনী ডলতে ডলতে আচমকাই সতু আয়নাটার দিকে চেয়ে চমকে গেল। চেক লুঙ্গি, শার্ট আর সোয়েটার পরা একটা ছিপছিপে লোক পিছু ফিরে আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বোধহয় মুখের ব্রণ টিপছিল। হ্যাজাকের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল মুখখানা। ইসমাইল। হাতে টর্চ ছাড়া আপাতত

কোনো অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর লুঙ্গি বেল্ট-দিয়ে বাঁধা থাকে। সেই বেল্টে ঝোলে চাকুর খাপ। কিন্তু কথা হল, ইসমাইল তাদের খবর রাখে কিনা।

খৈনী ডলতে ডলতে থেমে গিয়ে সতু বলল, নসু, ইসমাইল।

প্রথমটায় নসিরাম বুঝতে পারেনি। হাত বাড়িয়ে খানিকটা খৈনী সতুর হাত থেকে তুলে নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। তারপর আচমকা সেও ইসমাইলকে দেখতে পেল।

দেখতে হয়তো পেত না। কিন্তু ইসমাইল আয়নার ভিতর দিয়ে নিজের মুখ দেখার ছল করে আসলে হাটের লোকজনকে চোখে চোখে রাখছিল। তাদের দুজনকে দেখতে পেয়েই ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। লোকটার সেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোটা চোখে পড়াতেই ইসমাইলকে দেখতে পায় নসিরাম। দেখেই একটা চমক লাগে তার। বুকে একটা চড়াই পাখি কঁকিয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইসমাইলের ধরনটাও ভাল ঠেকে না তার চোখে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, চোয়াল শক্ত, ভ্রু কোঁচকানো, ফর্সা মুখটা একটু রাঙা দেখাচ্ছে।

ইসমাইল তাদের নড়বার সময় দিল না। মাসুদের দোকান থেকে একটা লাফ মেরে রাস্তার মাঝখানে পড়ল।

কি রে শুশোলা! খুব মস্তান হয়েছিস?

রামতারন তাহলে খবর দিয়েছে? অ্যাঁ! রামতারন শালা শেষ অবধি খবর দিয়েছে তাহলে?

সতু কঁকিয়ে উঠে বলল, নসু! দৌড়ো! পালা!

নসিরামেরও বুকের মধ্যে তোলপাড়। তবু সে একটু সত্যিকারের হাসি হেসে বলল, আঃ দাঁড়াও না। রামতারন শেষ অবধি তো মনিষ্যির মানটা দিয়েছে, নাকি?

কী যে বলিস বিপদের সময়ে! দৌড়ো!

তুমি পালাও।

তুই?

জবাবটা দেওয়ার সময় পায়না সতু। ইসমাইল চট করে এসে বাঁ হাতে একটা রদ্দা মারল সতুর ঘাড়ে। সতু পড়ে গেল।

নসিরাম দেখল, ইসমাইল তার ছুরি বের করেনি। খুব রাগ হল তার। দু দুটো লোককে শুধু হাতেই মেরে-ক্ষান্ত হবে নাকি গুণ্ডাটা? সে হাত ছড়িয়ে ইসমাইলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ঢ্যামনার মতো হাত চালাচ্ছো কেন?

আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! ইসমাইল দ্বিতীয়বার হাত তুলতে গিয়েও একটু থমকে গেল। গনগনে গলায় বলল, কত বড় খুনিয়া হয়েছিস রে শালা রেণ্ডির ব্যাটা ? জানিস এটা আমার এলাকা।

জানি। কিন্তু আগে অস্ত্র বের করো, তারপর কথা। অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কিসের হে ! বের কর শালা তোর অস্ত্র।

নিজের গলার স্বরে নসিরাম নিজেই অবাক হয়ে গেল। যেন এক বাঘ এসে কখন সেঁদিয়েছে গলার মধ্যে। খোনা স্বরটা আর পাওয়া যাচ্ছে না তো !

ইসমাইল একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে ! চারদিকে লোকজনও জড়ো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কোমরে জামার তলায় হাত রেখে সে স্থির চেয়ে বলল ফের এই তল্লাটে পা দিয়েছিস তো—

কিন্তু কথাটা শেষ হল না তার। নসিরাম হঠাৎ ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে গেল তার দিকে, রেণ্ডির পুত আমি না তুই রে ? অ্যা ! কাঁচা খেয়ে নেবো তোকে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো শালা ! আয়, আয় শালা…

কী যে হল তার হদিশ পাওয়া মুস্কিল। তবে কেমন যেন ভড়কানো মুখে ইসমাইল পিছু হটতে লাগল।

আয় শালা ! আয় শালা ! বলে এগোতে লাগল নসিরাম। হাতে অস্ত্র নেই। পেটে খোঁদল। গালে রামতারনের থাবড়া এখনো চিন চিন করছে। মাথায় পতুর তোলা তিনটে আলু। তবু শুধু হাতেই সে হঠাৎ বেরালের মতো একটা লাফ মেরে গিয়ে পড়ল ইসমাইলের এক হাতের মধ্যে।

আর পারল না ইসমাইল। বোধহয় জীবনে এই প্রথম সে মুখ ঘুরিয়ে ছুট লাগাল। এক হাট লোকের চোখের সামনে।

নসিরাম নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে। সে লক্ষ্য করল চারপাশে জড়ো হওয়া শয়ে শয়ে লোক তাকে নীরব দেখছে। তাদের চোখে ভয়।

* * *

একটু বেশী রাত করেই ফিরছিল দুজন। সতু আর নসিরাম।

সতু বলল, তোর সঙ্গে এই যে রাত বিরেতে রোজ ফিরি, কোনোদিন ভয় লাগে না। আজ লাগছে। তোকে আজ ভয় খাচ্ছি কেন রে ?

নসিরাম নিজের মাথার তিনটে আলুতে হাত বুলিয়ে বলল, কি জানি কেন, আজ আমার নিজেরই নিজেকে এখন কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শ্বশুর বাড়ির শাল

বড়বাজারের এক ঘুপচি গলির দোকানের দোতলায় শালের আড়ত, সারা ভারতবর্ষের শাল, দোশাল, তুঁষ, মলিদা, এই একেবারে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত ডাঁই হয়ে আছে। স্বয়ং মালিক টেরিকটনের ধুতি পরে দোকানের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু মনে করে, একটু উরু বের করে বসে আছেন। পেছনে একটি মানানসই দশাসই তাকিয়া। বঙ্কিম এখন ক্রেতা। ফিনানসিয়ার তার সম্বন্ধী। শীতে ভগ্নীপতিকে একটি শাল দেবার কথা ছিল। দিচ্ছি দেবো করে হঠাৎ শীত পার করে দিয়েছে। এই থার্ড উইন্টারে বঙ্কিমবাবুর কাঁধে শাল উঠবেই। দোকানটা সম্বন্ধীরই আবিষ্কার। আড়ত থেকে কিনলে দুটো পয়সা সস্তা হবে।

মালিক জংঘাদেশ আয়েস করে চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করলেন : পকেটের খবর কি? সেই অনুসারে মাল ফিট করবেন। পকেট তো সম্বন্ধীর। উত্তরটা সেই দেবে। বঙ্কিম উদাস হয়ে মালিকের থাই দেখতে লাগলো। ছেলেবেলায় ওয়ার্ডবুকে পড়েছিল—শূকরের শুষ্ক লবণাক্ত জংঘা—হ্যাম। কেন জানে না তার এই কথাটাই মনে পড়ল। সম্বন্ধী ইতিমধ্যে টাকার অংক বলে

দিয়েছে, দেড়শো, ম্যাক্সিমাম একশো প'চাত্তর।

ওই দামের শালেরা সব অ্যালুমিনিয়ামের মই বেয়ে বংকিমের সামনে নেমে এল। দেড়শো টাকায় আর কত ভাল জিনিস হবে? হাল্কা একরোখা কাজ। জমি তেমন ভাল নয়। মধ্যবিত্তের শাল এর চেয়ে ভাল হলে মানাবেও না। বংকিম দেখে শুনে একটা সাদা শাল পছন্দ করে নিল।

সম্বন্ধী ফিসফিস করে বললে, দেখ এইটাই নেবে তো? রাখতে পারবে না কিন্তু।

বংকিমের মনে হল সম্বন্ধীর এই কথায় নিশ্চয়ই কোন ইণ্টারেস্ট আছে। সাদা থেকে বংকিমকে তুঁতে রঙেরটায় নামাতে পারলেই, প'চিশ টাকা সেভিংস। বংকিম কানে কানে বললে, তোমার বোনকে যখন রাখতে পেরেছি, শালটাকেও না পারার কোনো কারণ নেই। মেনন্টিন্যান্স ইজ এন আর্ট।

দোকানের মালিক আর্ট শব্দটা শুনতে পেয়ে বললেন-হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ে আর্টিস্ট লোককো লিয়ে হায়। পরের পয়সামে যে লোক টিংচার আইডিন ভী পিতা হায় এ সাদা শাল উঃ আদমী কে লিয়ে।

বংকিম মনে মনে বললে—ধুর ব্যাটা। পরের পয়সা কিরে! হিসেব করে দেখ, সারা জীবন একটা মেয়েকে মেনটেন করার কষ্ট, আর শ্বশুর বাড়ীর সারাজীবনের পাওনা, ইনভার্স রেসিওতে চলে। সবশেষে ওই জামাইষষ্ঠী। তাও বন্ধ হয়ে যায়, ওয়ান জামাই গোজ, অ্যানাদর জামাই কামস। দাঁত পড়া, চুলে পাক ধরা জামাইরা লিস্ট থেকে বাদ পড়ে যায়। আসর দখল করে থাকে ফুল কি, রাঙাজামাই। আদরের ধর্মই হল উজ্জ্বল রংয়ের মত ক্রমশঃ ফেড করে আসে। বিবর্ণ দাম্পত্য জীবন এই শাল দিয়ে চাপা দেওয়া যাবে।

সম্বন্ধীর নাম সূর্যকুমার। বিদেশে কাজ করে। সেখানে সে সুরয কুমার। সুরযকুমার, এক টাকা দাম কমাবার জন্যে কখন ধস্তাধস্তি করছে বংকিম তখন দূর ভবিষ্যতে শালগায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেনারসের গঙ্গার ঘাটে বৃদ্ধ বংকিম। শালটার রং তখন সাদা নয়। পোকায় ফুটো ফুটো করে দিয়েছে। রংটা হয়েছে শনের মত। জায়গায় জায়গায় তেলের ছোপ। পাশে এক গাল তোবড়ানো বুড়ী, বংকিমের স্ত্রী। কয়েকটা লম্বা পাকা চুল জড়িয়ে আছে শালের এখানে ওখানে। অনেক আগে যখন তাদের যৌবন ছিল তখন লেগে থাকত কাঁচা চুল।

এই বুড়িটারই যখন যৌবন ছিল, তখন আকাঙ্ক্ষা ছিল, লোভ ছিল, লালসা ছিল, রক্তে আগুন ছিল। তখনও কাঁধে মাথা রাখতো, এখনও রাখে। তখন

রাখতো, কাজ আদায়ের জন্যে, পাওনা বুঝে নেবার জন্যে। এখন রাখে নির্ভরের জন্যে। দিন তো শেষ হয়ে আসছে। কে আগে যায়, কে যায় পরে। শুরুতে এক—যাবার সময় বিচ্ছিন্ন। বঙ্কিম শালের একটা অংশ বুড়ীর গায়ে জড়িয়ে দিল। বয়েস হয়েছে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। একজনের শীর্ণ হাত অন্যজনের শীর্ণ হাতে ধরা। মৃত্যু হাত বেয়ে উঠে আসছে।

বঙ্কিমের ধ্যান চটকে গেল। সুরেষকুমার কানে কানে বললে, কিছুতেই একটাকাও ছাড়তে রাজী হচ্ছে না। দু কাপ চা আদায় করেছি। আমার নাম সুরেষকুমার। বঙ্কিম এসব উঞ্ছবৃত্তি ভালবাসে না। সে বললে, তুমি চা খেয়ে এস আমি নীচে দাঁড়াই।

সুরেষ কুমার বললে, না না ও ব্যাটার দু কাপ চাই ধ্বংস করে যেতে হবে, চালাকি নাকি। তাকিয়াবাজী করে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে, আর আমরা মরছি গাধার মত খেটে।

বড় এলাচ, ছোট এলাচ, জায়ফল, জৈত্রী দেওয়া চা খেয়ে দু'জনে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে রাস্তায় নেমে এল। শালের মোড়কটা সম্বন্ধীর বগলে। বঙ্কিমের হাতে এখনই দেওয়া যায় না। নানারকম প্রোটোকল আছে। বলা যায় না, সামনে একাধিক বিয়ের লগ্ন, সুরেষকুমার হয়তো শালটাকে বার কতক ব্যবহার করে দামটা খানিক উসুল করে নেবে।

শালের প্রোটোকল হল এক বাকসো ল্যাতা সন্দেশ। চিনির ভাগ বেশী, ছানার ভাগ কম। শালেতে সন্দেশেতে শীতের একটা কুচো তত্ত্ব মত হল। বঙ্কিমের স্ত্রী প্রতিমার তাইতেই কি আনন্দ। কী উঁচু নজর আমার বাপের বাড়ীর।

ওঃ পিওর কাশ্মিরী শাল। আড়ত থেকে কিনেছে তো, তাই একটু সস্তা হয়েছে। বাইরে থেকে কিনলে পাঁচশো টাকার কম নয়।

প্রতিমা শালটা হাতে নিয়ে বললে, যাওনা একবার তোমার বাবাকে দেখিয়ে এস, সন্দেশের কথাটাও বোলো। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বঙ্কিম দোতলায় উঠেছিল সত্যি, তবে পিতা পরমেশ্বরের ঘরে না গিয়ে, তিনতলার ছাদে গিয়ে, শালটাকে একটু হাওয়া খাইয়ে এনেছিল। বলা যায় নাকি—এই যে, এই দেখুন শ্বশুর বাড়ির শাল, কাশ্মীর কি কলি।

শালটা দিন সাতেক একজিবিট নম্বর এক হয়ে বাইরের ঘরে রইল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবাই জেনে গেল বঙ্কিমের একটা শাল হয়েছে। শালা পছন্দ করে কিনে দিয়েছে শালের গুদোম থেকে। বঙ্কিমের একবার মনে

হয়েছিল একটা গ্লাস কেস তৈরী করে, শালটাকে ভরে রেখে দেবে। সকাল সন্ধ্যে ধুনো গঙ্গাজল দেবে। একটা করে ধূপ জ্বেলে দেবে। ওপরে ফুল ছড়িয়ে দেবে গোটা কতক।

বঙ্কিমের শাল গায়ে দিয়ে কাপ্তেনী করার অবসর কোথায়? সে তো মেহনতী জনতারই একজন। সকালে বাজারে গুঁতোগুঁতি। নটার সময় বাসে বাঁদরামি। সাতঘন্টা অফিসে ফাজলামি। ছটায় আবার বাসে বাঁদরামি। এরপর বাড়িতে সংসার নামক শূন্য প্রাঙ্গণে ছেলে মানুষ করার ধাষ্টামি। মহামূল্যবান শাল ন্যাপথলিনের গোল্লা বগলে নিয়ে কাপড়ের আলমারির ভি. আই. পি. কর্ণারে অপেক্ষা করে রইল, কবে আসবে সেদিন যেদিন বাবু বঙ্কিমের কাঁধে চাপবেন তিনি।

অবশেষে সেই দিন এল।

ছোটো সম্বন্ধীর বিয়ে। বরযাত্রী বঙ্কিম, বঙ্কিমের স্ত্রী। ধবধবে সাদা ধুতির ওপর লালচে পাঞ্জাবী। ধুতির রংয়ের সঙ্গে, পাঞ্জাবির রংয়ের উনিশ-বিশ হবেই। সংসারের ধর্মই তাই। কারুর সঙ্গে কারুর মিল হতেই পারে না। সব সময় কনট্রাস্ট। আগে বঙ্কিমের খুঁতখুঁতানি ছিল। এখন এইসব পার্থক্য সে গ্রাহ্যই করে না। শালটা বগলের তলা দিয়ে আড়াআড়ি করে চিত্রতারকাদের মত গায়ে চাপিয়ে নিল। একটু সেন্ট লাগাতে যাচ্ছিল, প্রতিমা হৈ হৈ করে উঠল, কর কি, কর কি? বঙ্কিম যেন খুন করতে যাচ্ছিল। এক্ষুনি দাগ লেগে যাবে। ঘটে কি কোনো বুদ্ধিই নেই। কানের লতিতে লাগাও। বঙ্কিম তাই লাগাল। শালে দাগ লাগে, মানুষের চামড়া সে দিক থেকে নিরাপদ। সহজে দাগ লাগে না। শালের ধাত একমাত্র তার বৌ-ই বোঝে।

বরযাত্রীরা বাসে যাবেন। একে একে সবাই উঠছে। বঙ্কিমও উঠছিল। পেছনেই প্রতিমা। হঠাৎ প্রতিমা চিৎকার করে উঠল, দেখো, দেখো। বঙ্কিম তাড়াতাড়ি যে পা-টা ফুটবোর্ডে রেখেছিল নামিয়ে নিল। কি দেখবো? কেউ বমিটমি করে রেখেছে নাকি? না সে সব নয়। প্রতিমা বললে, শাল গায়ে দিয়ে ওভাবে কেউ হুড়মুড় করে ওঠে নাকি। বাসের চারদিকে পেরেক খোঁচা হয়ে থাকে, এক্ষুনি লাগবে আর ফাঁস করে ছিঁড়ে যাবে।

চলতি বাসের জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। ভেতরে একটা সোয়েটার পরলে ভাল করত। শালটার কোন দাম নেই। শালটা গায়ে দেবার আগে ওভার এস্টিমেট করে ফেলেছে। একে সর্দির ধাত। ভুগতে হবে।

প্রতিমাকে বললে, শালটার তেমন গরম নেই। প্রতিমা বললে, সে কি গো! আমি পাশে বসে গরম পাচ্ছি। মনে হচ্ছে তোলা উনুনের পাশে বসে আছি, তুমি পাচ্ছ না? বঙ্কিমের পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, ও তুমি তো ভুল গায়ে দিয়েছো। ঠাণ্ডার দিকটা ভেতরে দিয়েছো, গরমের দিকটা ওপরে।

বঙ্কিম কিছুক্ষণ হাঁ করে বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, সে কি রে বাবা! শালের আবার গরম পিঠ, ঠাণ্ডা পিঠ আছে নাকি? শোনে নি তো কখনও। নিজে একবার হাত বুলিয়ে দেখল। দুটো পিঠই তো একরকম। বঙ্কিম বললে, এরকম হয় নাকি?

প্রতিমা বিশেষজ্ঞের মত বললে, হয় না? শালের তুমি জান কি? সারা জীবন তো দো-নলা আর ফতুয়া পরে কাটালে। আমার দাদুর একটা শাল ছিল। সে যুগেই তার দাম ছিল হাজার টাকা, বিলিতি শাল, এয়ার কণ্ডিশানড্। একটা দিক গরমকালে গায়ে দিতেন, আর একটা দিক শীতে।

বঙ্কিম ব্যাপারটা হজম করার জন্যে একটু সময় নিল। সংশয়টা তার তখনও কাটে নি। বিলেতে আবার শাল হয় নাকি? বঙ্কিম বললে, উল্টে গায়ে দিলে গরম লাগবে?

নিশ্চয় লাগবে।

তাহলে এই কাজটাও তো উল্টে যাবে।

তাতো যাবেই। ওরা তো ভুল করেছে। আর তুমিও তো তেমনি মূর্খ। দেখে দেখে উল্টোটাই ঠিক কিনে নিয়ে এলে। একটা কাজ যদি তোমাকে দিয়ে ঠিকমত হয়। সমস্ত দোষ বঙ্কিমের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রতিমা খোঁপার ফুল ঠিক করতে লাগল। আর বঙ্কিম নিজের দোষে ঠাণ্ডা শাল গায়ে শীতে হি হি করতে করতে সম্বন্ধীর বিয়ের বরযাত্রী হয়ে নৈহাটী চলল।

বিয়ে বাড়ীর মেয়েদের ভিড়ে মিশে যাবার আগে প্রতিমা সাবধান করে দিয়ে গেল, কাপে যদি চা খাও, বাঁ হাতটা কাপের তলায় ধরে মুখে তুলবে, তা না হলে শালে চায়ের ফোঁটা পড়বে। ভাঁড়ে খেলে দেখে নেবে, ছ্যাঁদা আছে কি না। বরং আর একটা ভাঁড়ের ওপর বসিয়ে নেবে। পান খাবে না। পিক ফেলতে গেলেই ফোঁটা পড়বে।

ফোল্ডিং চেয়ারে বসার সময় পেরেক উঠে আছে কিনা দেখবে। চেয়ারে আলুর দমের ঝোল লেগে থাকে। হলুদ আর লঙ্কার দাগ লাগলে হয়ে গেল, জীবনের মত দাগরাজী। তুমি তো আবার চোখে কম দেখ। যে কোনো লোককে দিয়ে চেক করিয়ে নিও। প্যাণ্ডেলের বাঁশে হেলান দিও না। তুমি

তো আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার না, সব সময় ত্রিভঙ্গ মুরারি। যদি গোলাপের বোকে দিতে আসে নেবে না। কাঁটা আর লাল রং দুই-ই আছে। তোমার মত হুঁশো লোককে আর কত সাবধান করবো বল। সব সময় নজর রাখবে, পেছন থেকে কেউ যেন এসে হাত না মুছে দিয়ে যায়। হাঁ করে মেয়েছেলে দেখো না। তোমার যা স্বভাব। প্রতিমা বলে দিয়ে হুল্লোড়ে মিশে গেল। বঙ্কিমের ইচ্ছে করছিল, শালটাকে পাট করে বগলে নিয়ে বসে থাকে। নেহাত শীত করছে তাই। দরকার নেই শালে। খুব শিক্ষা হয়েছে।

এক সময় খাবার ডাক পড়ল। আবার ফিরতে হবে তো এতটা রাস্তা। বঙ্কিমের ঠিক উল্টো দিকে বসেছে প্রতিমা। প্রতিমার পাশে বসেছেন তার সম্পর্কের মাসি। বঙ্কিমের গায়ের শালটা দেখিয়ে প্রতিমামাসিকে কি যেন বললে। মাসির মুখে হাসি আর ধরে না। ইতিমধ্যে পাতে পড়েছে ফ্রায়েড রাইস আর মাংস। বঙ্কিম খাওয়ায় একেবারে তন্ময়। হঠাৎ সাবধান বাণী। প্রতিমার গলা—সামলে, সামলে। বাঁ কাঁধ থেকে শালটা নেমে আসছে পাতের দিকে। বঙ্কিম হেল্পলেস। ডান হাত জোড়া। প্রতিমা বঙ্কিমের পাশের অপরিচিত ভদ্রলোককে অনুরোধ করল, আপনার বাঁ হাত দিয়ে বেশ করে ওপরে তুলে দিন তো। এক্ষুনি ঝোলে ঝালে মাখামাখি করে বসে থাকবে।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে শালটাকে উঠিয়ে দিতে দিতে বললেন, থাকবে না, আবার এক্ষুণি ঝুলে যাবে, কাঁধে একটা সেফটিফিন লাগিয়ে দিলে ভাল হয়।

প্রতিমাও জানে থাকবে না। ভদ্রলোকের উপদেশ কার্যকরী করার জন্যে সে পাশের মাসিমার কাছেই সেফটিফিন চেয়ে বসল! প্রবীণা মহিলাদের ব্লাউজে বোতাম থাকে না। ঠিক তাই। প্রতিমা মাসীমার ভুঁড়ির কাছে হাত চালিয়ে কাম্য জিনিসটি খুলে নিয়ে এল। ওদিক থেকে এদিকে আসতে গিয়ে গোটাকতক গেলাস ওল্টালো।

যাঁরা দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা সকলেই তখন বঙ্কিমকে দেখছেন। প্রতিমা টান টান করে সেফ্‌টিফিন আটকে দিয়ে গেছে। ডান হাতটা মুখের কাছে পুরোপুরি তুলতে গেলে টান পড়ছে। মুখটাকেই নামিয়ে আনতে হচ্ছে পাতের কাছে হাতের সীমানায়। অনেকটা কুকুরের টেকনিকে খেতে হচ্ছে। প্রতিজ্ঞা, আর যদি সে কখনো শাল গায়ে দিয়েছে। চাটনির সময় প্রতিমার চিৎকার, না না ওখানে নয়। বঙ্কিমের বরাতে প্ল্যাস্টিক চাটনি জুটলো না।

ফেরার সময় প্রতিমার সঙ্গে বাক্যালাপ হল না। মেরুদণ্ড সোজা করে, লগবগ করতে করতে বঙ্কিম ফিরে এল। শীত করছে। শালটা মুড়ি দেবারও উপায় নেই। মাথার তেল লেগে যাবে। বঙ্কিম ঘরে ঢুকেই টান মেরে শালটা খুলে ফেলল। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের মত শালটাকে মাটিতে ফেলে দুপায়ে ঠাসতে লাগল আর বলতে লাগল—শালা, শালার শালের নিকুচি করেছে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিমা বলছে—একি একি পাগল হয়ে গেলে নাকি!

বঙ্কিম জানে পাগল নয়, সে এতক্ষণে সুস্থ হতে চলেছে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গে লোডশেডিং

স্বর্গে ইদানীং প্রচণ্ড লোডশেডিং শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে সারা দিন-রাতে দু-তিন ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকত না। ওই সময়টা দেবতারা মন্দাকিনীর হাওয়া খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে দিনে রাতে কতক্ষণ বিদ্যুৎ থাকবে সেটাই হচ্ছে খবর। স্বর্গের খবরের কাগজগুলি এ নিয়ে প্রতিদিন ফলাও করে খবর ছাপছে আর স্বর্গবাসীকে উত্তেজিত করছে।

দৈনিক স্বর্গলোক লিখছে—দেবরাজ ইন্দ্রের বড় বড় বুকনি ধরা পড়ে গেছে। তিনি যে একজন বাকসর্বস্ব বিদূষক বিপ্লবী তা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ বিদ্যুৎ আর এখন সংকটের পর্যায়ে নেই। এটা এখন কেলেংকারি। স্বর্গবাসী তোমরা জানো, তোমাদের ইজ্জৎ আজ ধুলোয় লুণ্ঠিত। এতদিন স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে লোকের যে কল্পনা ছিল সেই কল্পনার হাঁড়ি যে হাটে ভেঙে যায়।

দেবরাজ ইন্দ্র একটু বিপাকে পড়েছেন। কিন্তু তিনি ধীমান ব্যক্তি। তার উপর তাঁর রবিরেখা খুবই প্রবল। তাই তাঁর কোন ব্যাপারেই বদনাম হয় না। খবরের কাগজ এ নিয়ে রাতদিন প্রচার করলেও স্বর্গলোকের অধিবাসীদের মনে এজন্য খুব বেশী রাগ নেই। কারণ বেশীরভাগ লোকই চাকুরীজীবী।

লোডশেডিং এর ফলে কাজকর্ম কিছুই করতে হচ্ছে না। অথচ মাস গেলেই মাইনে আসছে। তবে কল-কারখানার মালিকেরা চেঁচাচ্ছে এমন অপদার্থ সরকার হবে জানলে মাইরি কে এদের পিছনে এত টাকা পয়সা খরচ করত।

ইন্দ্রদেবের প্রাসাদে লোডশেডিং হয় না, কারণ ওটি জরুরি এলাকা। ইন্দ্রদেব রোজ সকাল সকাল দফতর থেকে বাড়ি চলে এসে বাড়িতেই সরকারী কাজকর্ম সারেন।

সেদিন ইন্দ্রদেব বসে বসে ফাইল দেখছেন, এমন সময় প্রাসাদের বাইরে থেকে শ্লোগানের আওয়াজ ভেসে এলো—চলবে না, চলবে না। ইন্দ্র তাড়াতাড়ি কলিং বেল টিপে একান্ত সচিব-কাম-রাজনৈতিক উপদেষ্টাকে ডাকলেন। উপদেষ্টা এসে বললেন, মহারাজ আজ্ঞা করুন।

ইন্দ্র। বাইরে ওসব কিসের কোলাহল ?

উপদেষ্টা। আজ্ঞে এক অভিনব বিক্ষোভ মিছিল এসেছে মহারাজ। প্রাসাদের দুশো গজ দূরে রক্ষীরা তাদের গতিরোধ করেছে। বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিরা এসে আপনার কাছে এক স্মারক লিপি দিয়ে যেতে চায়।

ইন্দ্র। তাতো বুঝলাম, লোকগুলো কারা ?

উপ। ওরা হল 'নিখিল স্বর্গ সিঁধেল চোর সমিতি'।

ইন্দ্র। মানে ?

উপ। আজ্ঞে যাকে বলে তস্কর। মানে, না বলে যারা পরের দ্রব্য নেয়। ওদের বক্তব্য হল, লোডশেডিং করে আপনি স্বর্গবাসীর জগতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। এর ফলে এ রাজ্যে এখন আর কেউ রাতে ঘুমোয় না। ওদের তাই রুজি রোজগার বন্ধ। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে পাঁচহাজার নৈশ তস্কর পরিবার আজ বিপন্ন।

ইন্দ্র। আমি তো বিদ্যুৎ রেশন করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিফ্‌ট চালু করতে বলেছি। তস্করেরা রাতের শিফ্‌টে কাজ না করে দিনের শিফ্‌টে কাজ করলেই তো পারে। বিশেষ করে বড় কর্ম দিন-দুপুরে করাই তো সুবিধা।

উপ। আমি ওদের সে-কথা বলেছিলাম মহারাজ। ও দিনের শিফ্‌টে কাজ করতে রাজী। কিন্তু নিখিল স্বর্গ জাতীয় ডে-বার্গলার গিল্ড-এতে আপত্তি জানিয়েছে। তারা বলেছে, রাতের লোকদের দিনে কাজ করতে দেখলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

ইন্দ্র। গিল্ড আবার কে ডা ?

উপ। আজ্ঞে ওরা দিনের বেলায় গেরস্তর বাড়িতে চুরি করে।

ইন্দ্র। এত সব ব্যাপার আছে বলে তো জানিনি।

উপ। আগে ছিল না। স্বর্গরাজ্য অসুরদের হাতে চলে যাবার পর এইসব অ্যাশোসিয়েশন ও গিলডের সৃষ্টি হয়েছে। এদের এখন তোলা মুশকিল। কারণ তাহলে তারা বিকল্প চাকরী চাইবে। যা চাকরি আছে তাতে আমাদের অমাত্যদের পোষ্য ও আত্মীয়দের দিয়েই কুলিয়ে উঠতে পারছি না তার উপর বাইরের লোককে চাকরি দিতে গেলেই চিত্তির।

ইন্দ্র। তা তো বুঝলাম, এখন তোমার তস্করদের আর্জিটা কি বলতো?

উপ। বেকার ভাতা, না হয় বিকল্প চাকরি অথবা রাতে বিদ্যুৎ।

ইন্দ্র। তিনটের একটাও দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বর্গরাজ্য অসুরদের দখলে যাবার পর তারা সব শেষ করে দিয়ে গেছে। সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে বসতে আমার সময় লাগবে।

উপ। তাহলে মহারাজ সমূহ বিপদ। এইসব তস্কররা হল যাকে বলে সর্বহারা শ্রেণী। এদের পিছনে এই নারদের উস্কানি আছে। কাজেই এদের জন্য একটা কিছু না করলে আমাদের দেবসভায় মুখ দেখানো মুশকিল হবে। আবার দেবাদিদেব মহেশ্বর তো আপনার সমালোচনার জন্য মুখিয়ে আছেন।

দেবরাজ ইন্দ্র খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন। তুমি স্মারকলিপির কপি নিয়ে ওদের তাড়াতাড়ি বিদেয় কর। কাল সকালে ভাবা যাবে।

ইতিমধ্যে তিনমাস কেটে আছে। স্বর্গরাজ্যের বিদ্যুৎ সংকট-সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে অন্য কোন গ্রহ থেকে বিদ্যুৎ আনা যায় কিনা তা দেখবার জন্য বিভিন্ন ডেলিগেশন বিভিন্ন গ্রহ ঘুরে এসেছেন। কিন্তু বিদ্যুৎ সংকটের কোন সমাধান দেখা যাচ্ছে না। বরং গোটা স্বর্গরাজ্য একটু একটু করে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। রাতে ঘুমোতে না পেরে স্বর্গবাসীর চোখ করমচার মতো লাল হয়ে উঠছে। জল সরবরাহ বন্ধ থাকায় বহু লোকের চুলে জট পড়েছে। গা দিয়ে বোটকা গন্ধ বার হচ্ছে। লোধ্ররেণু ও সুরভিত আরকের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞদের পসার জমছে।

ইন্দ্রদেবের দপ্তর থেকে নানান কেতাব প্রকাশিত হচ্ছে। তাতে বলা হচ্ছে অসুররা সব ধ্বংস করে শুধু একটি জিনিস সৃষ্টি করেছে তা হল বিদ্যুৎ সংকট। এই বিদ্যুৎ সঙ্কটের নাম করে দেবরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ব্যর্থ করুন। অসুররা নিপাত যাক। এই সংকটের পিছনে নারদের হাত

আছে—ইত্যাদি।

ইন্দ্র একদিন বিষাদমগ্ন হয়ে বসে আছেন। এমন সময় তাঁর উপদেষ্টা একটি লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এলো।

উপদেষ্টা বললেন : মহারাজ, আপনি বোধ হয় অবগত আছেন নৈশ তস্করেরা যে তিন মাসের আলটিমেটাম দিয়েছিল তার মেয়াদ কাল শেষ হচ্ছে।

ইন্দ্র। হুম

উপ। পরশু থেকে ওরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকি দিয়েছে। তার মানে পরশু থেকে নৈশ তস্করেরা চুরির বদলে ডাকাতি করবে ঠিক করেছে।

ইন্দ্র। হুম।

উপ। আমি এক উপায় উদ্ভাবন করেছি। সঙ্গের এই ভদ্রলোক আমাদের স্বাস্থ্য অধিকর্তা রাজবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের শিষ্য। এঁর নাম দেবদত্ত। ইনি এক ধরনের ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যা সেবনে স্বর্গবাসীর রাতের ঘুম আবার ফিরে আসবে। দেবদত্তবাবু, হুজুরের কাছে ওষুধের গুণাগুণ বর্ণনা করুন।

দেবদত্ত বললেন : মহারাজ, আমার এই ওষুধের নাম স্লিপোবিন, সাধারণ ঘুমের ওষুধের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য হল এই ওষুধ সেবনে কোন সাইড এফেক্ট হয় না। সেবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও রোগী—সরি পাবলিক, ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েন। এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন তিনি যেন কোন বাতানুকুল ঘরে দুগ্ধফেনানিভ শয্যায় শুয়ে আছেন। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে আবার তাদের ঘুম ভেঙে যায়।

ইন্দ্র বললেন : হুম, তা তো বুঝলাম। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আমাদের এই স্বর্গরাজ্যে এখনও পুরোপুরি স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নি। আমরা লোককে জোর করে কিছু খাওয়ানোর পক্ষপাতী নই, আবার কোন কিছু পান বা ভক্ষণ জোর করে বন্ধ করার নীতিরও বিরোধী।

দেবদত্ত। মহারাজ, আপনাকে জোর করে কিছু প্রবর্তন করা বা বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। আমি বলি কি স্বর্গের পানীয় জল সরবরাহের ট্যাঙ্কগুলিতে এই স্লিপোবিন কয়েক বোতল ঢেলে দিলেই চলবে।

ইন্দ্র। দেখবেন মশাই। ব্যাপারটা আবার নারদের কানে না যায়। সে তাহলে প্রেসে ফাঁস করে দেবে।

উপদেষ্টা বললেন : ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দিন। অবিলম্বে

স্বর্গবাসীকে ঘুম পাড়াবার অত্যন্ত প্রয়োজন। রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েই যত অশান্তি। তা ছাড়া ব্যাপারটির সঙ্গে পাঁচহাজার তস্করের জীবিকার প্রশ্ন জড়িত।

কিছুদিন পরের কথা। স্বর্গরাজ্যে এখন আর কোন বিক্ষোভ নেই। লোডশেডিং চলছে চলবে। কিন্তু স্বর্গবাসীরা খুশি। তাদের রাতের ঘুম আবার ফিরে এসেছে। দিনে লোডশেডিং-এর জন্য কাজকর্ম নেই বলে দিনেও অনেকে ঘুমিয়ে পড়ছেন। পার্কে, ময়দানে, সিনেমা হলে, অফিসে, আদালতে সবাই লোডশেডিং হলেই বসে বসে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। সিঁধেল চুরি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দৈনিক স্বর্গলোক কড়া সম্পাদকীয় লিখছেন। কিন্তু লোডশেডিং-এর জন্য কোটালরা চোর ধরতে পারছেন না। এক একজন আই. ও. তদন্ত করতে গিয়ে আর ফিরে আসছেন না—পথে কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছেন।

নবনীতা দেবসেন

সর্বদাই হু হু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন। বন্ধুকে বন্ধু বলে মনে হয় না, শত্রুকে তেমন শত্রু শত্রু লাগে না। মানুষ মাত্রেই সুন্দর। মোহমুদ্গরই জগতে একমাত্র সত্য—একটু বদলে নিয়ে কা তব কান্ত কা তে কন্যা—কিছুই ভালো লাগে না। মেয়ে যে কেবলই খেলে বেড়াচ্ছে। হয় আগাথা ক্রিস্টি, নয় ব্যাডমিণ্টন, নইলে ঘুম। সারাদিন সারারাত ঘুম। পড়বে কখন? কিছু বলতে গেলেই তার দিম্মা বলেন—আহা, ও বড়ো দুর্বল। ঘুমুতে দে। ঘুমতে ঘুমতে প্রি-টেস্ট হয়ে গেল।

এই সময়ে চার নম্বর অংকের স্যার চাকরি ছেড়ে দিলেন। এইট থেকে টেনের মধ্যে এই নিয়ে চারবার। অসিতবাবুর পর প্রদীপ। প্রদীপের পর শ্যামলবাবু। শ্যামলবাবু বহু চেষ্টা করেছিলেন। হাফ-ইয়ারলির রেজাল্ট বেরুনোর পরই হাসপাতালে গেলেন। পেটে মস্ত বড় আলসার। অপারেশনের পরে আবার সাহস করে পড়াতে এলেন, কিন্তু আমিই সাহস পেলাম না। শ্যামলবাবুর পরে অলোকবাবু। অলোকবাবু একদিন টাকাটা খামসুদ্ধ ফেরৎ দিয়ে বললেন—'ও টাকা আমি আর নিতে পারি না।' আমি তো থ। তিনি

সবিনয়ে খাতা খুলে দেখালেন—এই দেখুন খাতা। এতমাসে একটাও অংক কষাতে পারিনি। প্রত্যেকটা আমি নিজে কষেছি। নিজে অংক কষেছি বলে অন্যের কাছে টাকা নেব কেন? ধরে বেঁধে আধখানা মাত্র নেওয়ানো গেল, বাকিটা টেবিলে রেখে গেলেন।

দেখতে দেখতে টেস্টও হয়ে গেল। স্যারবিহীন ভাবেই। প্রিটেস্টে ইতিহাসে উনতিরিশ ছিল, টেস্টে হল সাতাশ। তার মানে ফাইনালে হওয়া উচিত পঁচিশ, এই রকম নিউমেরিক্যাল প্যাটার্ন অনুযায়ী—মেয়ে জানালো রসিকতা করে—"দুই দুই করে কমছে।"—হাতে ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট।

—"কলেজে উঠলে কক্ষনো হিস্ট্রি নেব না, যা ট্রেচারাস সাবজেক্ট!"

—"কলেজে ওঠ তো আগে?"

—"সে উঠে যাবো।" র‍্যাকেটের ওপরে শাটলককটা শূন্যে নাচাতে নাচাতে ঊর্ধ্ব মুখেই মেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। "উঠে যাবো" বললেই তো হলো না। পড়তে হবে। ইতিহাসের জন্যে এক স্যারের বাড়ীতে ওকে ধরে নিয়ে গেলো আরাধনা। টিউটর পাই কোথায়? টেস্টের পর কেউই নতুন ছাত্র নেন না। শেষটায় আমার এক গুণ্ডা বোনপোকে যিনি পড়িয়ে শায়েস্তা করেছেন, তাঁকেই ধরে আনা হলো। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখি সিলেবাসটা।" মেয়ে বললে, "দাঁড়ান ফোন করে জেনে নিচ্ছি। আমার বন্ধুরা জানে।"

—"তুমি জানো না? লেখা নেই তোমার কাছে?"

—"ছিল তো—হারিয়ে ফেলেছি। ফোন করি?"

—"অংক বইটা দেখি। কে সি নাগটা। ফোন পরে হবে।"

—"টেস্টের সময়ে স্কুলে ফেলে এসেছিলাম, আর পাইনি।"

—"দেখি, কলমটা আর খাতাটা দাও।"

—"বোন স্কুলে নিয়ে গেছে কলমটা। এই যে খাতা!"

—"বাঃ বাঃ বাঃ। বাড়ীতে আর কলম নেই?"

—"থাকতেও পারে। এই নিন পেনসিল।"

—"এতটুকুনি? এতো ধরাই যাবে না।"

—"দাঁড়ান, ম্যানেজ করে দিচ্ছি। পেনসিলটাকে এই ঢাকনিতে ফিট করে নিন, ব্যস তাহলেই ধরা যাবে! এভাবে ছোট পেনসিলও কাজে লাগে।"

—"চমৎকার। একটা জিনিস শিখলুম।"

এমন সময়ে চা ডালমুট এলো।

—এসব কে খাবে ?

—আপনার জন্যে।

—এতো বিষ। চা ডালমুট দুটোই লিভার ড্যামেজ করে। আমি ওসব খাইনা।

—দুধ সন্দেশ খাবেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

—ইয়ার্কি হচ্ছে ?

—সে কি ? ইয়ার্কি হবে কেন ? এই তো ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ওটা খাবেন না এটা খাবেন তা তো মা জানেন না ? আগের স্যার চা ডালমুট ভালোবাসতেন।

নতুন স্যার বললেন, "আপনার মেয়ে তো যত্নআত্তি খুব করে, বুদ্ধি-শুদ্ধিও আছে। কিন্তু মহা ফাঁকিবাজ। আর আপনিও হয়েছেন যেমন, দিনরাত্তির লেখালেখি পদ্যফদ্য নিয়েই আছেন। অমন মেয়েকে নিজে না পড়ালে হয় ?"

মরমে মরে গিয়ে মনস্থির করলুম। ইংরাজি বাংলা ছাড়া আমার কিছুই পড়ানোর ধৈর্য নেই। বললুম, বাংলা বই নিয়ায়।

—টাকা দাও।

—টাকা কেন ?

—বই তো দোকানে।

—এটাও হারিয়েছিস ?

—হারাবো কেন ? কেনাই হয়নি এ বছরে।

—হয়েছিল না ?

—সে তো নাইনে কিনে দিয়েছিলে।

—সেটাই তো টেনের টেক্সট।

—নাইনের বই টেনে থাকে ? তুমি যে কী !

বই কিনে এনে, ফোন।

—হ্যালো, আরাধনা ? বাংলার সিলেবাসটা কি রে ? মা জিজ্ঞেস করছেন। হ্যাঁ মার সঙ্গেই কথা বল। খানিক পরে—হ্যালো ভাস্কর ? অংকের পুরো সিলেবাসটা কী রে ?

—আরাধনাকেই তো জিজ্ঞেস করতে পারতিস। দুবার দুটো ফোন করার কী দরকার ছিল ?

—সে তুমি বুঝবে না। আরাধনা কী ভাবতো ? আমি কোন সিলেবাসই

জানি না মনে করতো।

—সে তো জানিসই না।

—জানতুম তো। এখন না হয় ভুলে গেছি। দু'বছর ধরে কখনো মনে থাকে ? তুমিই বলো ?

পড়ানো চলছে। এপ্রিলে পরীক্ষা। আমার এক প্রিয় ছাত্রীকে টিউটর রাখলুম ফেব্রুয়ারী মাসে। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়িয়ে দিতে। একটা ছোট-ভাই ফিজিওলজির ভালো ছাত্র ছিল। তাকে বললুম বায়োলজিটা দেখিয়ে দিতে। ছাত্রীটির সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গেল মেয়ের। আড্ডা, গল্পের বই এক্সচেঞ্জ, পরচর্চা। একটু একটু পড়াও দিব্যি চলতে লাগলো ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু এই মামা বেচারীর সঙ্গে তার পিঠোপিঠির মতো সম্পর্ক—নিত্যই যুদ্ধ। বই নিয়ে বসাই হলো না। দুপক্ষ থেকেই অনবরত নালিশ। তবে দীপুমামা বাঁশীটা বাজায় ভালো। বায়োলজি শেখা না হোক ; টেস্টের পরই মেয়ে "এ আর এমন কি" বলে হঠাৎ আঁড়বাঁশী বাজানো রপ্ত করে ফেললো। দিবারাত্রি বাঁশী বাজছে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে। নীরোর বেহালার মতো। কিছু বললেই বলে—"একটু রিল্যাক্স করছি।"

• ইতিমধ্যে একদিন একটি বাউল আমার কাছে তার দোতারাটি বিক্রি করে গেল একশো টাকায়। আর যাবে কোথায়। কোথায় অংক, কোথায় ইতিহাস—দোতারা নিয়ে পড়লেন মেয়ে। দুদিনের মধ্যেই বাউলের দোতারাতে "হোয়্যার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ার্স গন লং টাইম পাসিং" বাজাতে লাগলো। ঠিক গীটারের স্টাইলে। সঙ্গে ছোট বোন গান গাইতে লাগলো। এবং মামার বাঁশী। সুন্দর একটা ফ্যামিলি কনসার্ট গ্রুপ তৈরী হয়ে গেল। অগত্যা দোতারা এবং বাঁশী নিয়ে মূর্তিমতী শিল্পশত্রুর মতো আলমারীতে তালাচাবি দিয়ে রাখলুম।

মেয়ে খুব সিভিলাইজড, নিয়মিত তিনখানা কাগজ পড়ে। ইন্দিরা, মোরারজী, চরণ বিষয়ে গভীর জ্ঞানী। ভুট্টোকে নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। পরীক্ষার দিন সকালে বিশেষত টেস্টের সময়ে রেগুলারলি দেখেছি। ইদানিং দেখছি খবরের কাগজ খুলে শিস দিতে দিতে কেমন অন্য-মনস্ক হয়ে যায়।—যাক্ তবু পরীক্ষার ভাবনাটা মাথায় ঢুকেছে। এমন সময়ে মেয়ে একদিন কথা কয়ে উঠলো—"আজকাল বেড়াল ছানারা আর ছানা নেই মা। ওদের দুধ-টা কমিয়ে মাছটা বাড়াতে হবে। নইলে ওদের গ্রোথ হবে না ঠিক মতন।"

—ও, তুমি শিস দিতে দিতে বেড়ালের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিলে। নিজের নয় ?

—নিজের ? নিজের কি চিন্তা ?

—কোনো চিন্তা নেই ?

—না, মানে কোন স্পেসিফিক চিন্তাটার কথা বলছ ?

—পরীক্ষাটা—হার মানা গলায় বলি।

—সে-তো আছেই ! জানো মা, বন্যা আর বিদ্যুৎসঙ্কট essay আছে।

সেই জন্যে বিদ্যুৎসঙ্কট নিয়ে গভীর ভাবনা হয়েছে মেয়ের। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা ভাবছে। আলো নিবলেই ভাবতে শুরু করে—সকাল ২টা পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র ভাবনা। মাঝে শতবার আলো ফিরলেও ডেকে তোলা যায় না।

সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছেন আমার কাছে। কলকাতার বাইরে একটা সাহিত্য উৎসবে নিয়ে যেতে চান ১লা বৈশাখে। মেয়েরা পাশে এসে যথারীতি বসে আছে। চোখ গোলগোল করে শুনছে—তিনি কত যত্ন করে নিয়ে যাবেন টানা মোটরে, ওখানে কী কী দ্রষ্টব্য স্থান। যেই বললুম—"এখন তো যাওয়া অসম্ভব, পরীক্ষাটা হয়ে যাক্—" অমনি মেয়ে বাধা দিয়ে ওঠে—"চল না মা, চল না ? কি সুন্দর ! খুব ভালো লাগবে, চল না মা"—

—"আরে ! পরীক্ষা না তখন ?" আমি তো তাজ্জব !

—"কী পরীক্ষা ? ও তখন এম-এ চলবে বুঝি ?" একেবারেই সরল চোখ। অসহ্য রাগ হয়। রাগ চেপে রাখা আমার স্বভাব নয়। তবু যথাসাধ্য দাঁতে দাঁত চেপে বলি—"কী পরীক্ষা ? জানো না—পয়লা বৈশাখ মানে চৌদ্দই এপ্রিল। সতেরোই এপ্রিল থেকে কার পরীক্ষা ?"

—"সতেরোই……? ওঃ হো ! স্যরি স্যরি বুঝেছি।" লজ্জায় একগাল হেসে ফেলে বলে "স্কুল ফাইনাল ! আমাদের তো ?"

আমি মরিয়া হয়ে বলি—"এটা মার্চ মাসের সাত তারিখ—একমাস দশদিন মাত্র বাকী। এখনও জিজ্ঞেস করছো, 'কার পরীক্ষা মা ?' আমি কি বিষ খেয়ে মরব ?"

সভ্যতাভব্যতা বিস্মৃত হয়ে জনসমক্ষে ইতরজনের মতো কাতরে উঠি। বেগতিক দেখে ভদ্রলোক—"আচ্ছা নমস্কার। এবার তাহলে থাক। বরং সামনের বছরে—" বলে ছুটে পালিয়ে যান। খুব অপ্রস্তুত মুখে মেয়ে গিয়ে পড়তে বসে। বাঁহাত কুকুরের মাথায় বোলাতে বোলাতে। তাতে পড়া ভাল হয়।

লক্ষ্মী এসে নালিশ করে—"বড়দিমণি রোজ রোজ নিজের দুধ আর সন্দেশটা মাস্টারমশাইকে খাইয়ে দিয়ে, নিজে চা ডালমুট খাচ্ছেন।"

—সে কি কথা ?

—আমি রোজ দেখতে পাই বড়দিমণি পড়তে পড়তে ডালমুট চিবোচ্ছেন, আর মাস্টারমশাই-এর গোঁফে সর।'

—অ। কাল থেকে দুজনকেই দুধ-সন্দেশ। চা-ডালমুট মোটে টেবিলে দিবি না।

তিনমাস আমি কোনো নেমতন্ন যাই না, সভা-সমিতিতে যাই না, লৌকিকতা বন্ধ। মেয়ে এদিকে শনি, রবিবার নিয়মিত টিভিতে সিনেমা দেখে, বেস্পতিবার চিত্রমালা দেখে, বন্ধুদের জন্মদিনে কার্ড আঁকে, দীর্ঘ দীর্ঘ ফোন করে। বুকফেয়ার গেলে সময় নষ্ট হবে বলে আমি সন্ধ্যেবেলায় না গিয়ে দুপুরবেলায় নিয়মরক্ষে ঘুরে এলুম। মেয়ে কিন্তু তিনদিন পরপর মাসি-পিসিদের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় রাত দশটা পর্যন্ত বুকফেয়ারে বেড়িয়ে ঘুগনি খেয়ে এল। আমি উদ্বেগে অস্থির। আমার শুভার্থীরা আমার থেকেও বেশী অস্থির। সবাই আমাকে বকছেন। আমার মেয়ের জন্য সবার চিন্তার শেষ নেই।—"কেবল হিল্লিদিল্লি লেকচার মেরে বেড়ালে আর গল্পো কবিতা লিখলে কারুর ছেলেপিলে মানুষ হয় ? কেবল নিজের পড়া আর নিজের লেখা নিয়েই মত্ত। তার ওপরে আজ হাঁপানি, কাল হার্টের রোগ, পরশু হাইপ্রেসার, অসময়ে যত ঝামেলা বাধিয়ে তুই-ই বরং ওকে আরো ডিসটার্ব করিস। মেয়েটা পড়বে কখন ?"

সবই সত্যি। মেয়েটা সত্যি খুব সেবা করে। অবোলা কুকুর, বেড়াল, রুগ্ন মা, ছেলেমানুষ বোন, বুড়োমানুষ দিম্মা, প্রত্যেকের। আবার এও সত্যি যে সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টা ওর পেছনেই আছি। ভোরে পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে উঠি। উঠে মেয়েকে তুলে দিই। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। সাড়ে পাঁচটায় আবার উঠি। আবার মেয়েকে তুলে দিই। আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ফাইনালি ৬টায় উঠে, চা খেয়ে গায়ে জোর পেয়ে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করি। এবার মেয়ে ওঠেন। গজগজ করতে করতে পড়তে বসেন। আশ্চর্য পড়ে প্রধানত Test Papersটা, কেবলই মন দিয়ে প্রশ্নগুলো পড়ে আর হিসেব কষে। তার পড়ার ঘর থেকে টেবিল নামিয়ে এনে আমার ঘরে পেতেছি। দিনরাত প্রশ্ন ধরে আনছি আর টুকছি। প্রশ্ন ধরা মানে মেয়ের বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খাতা চেয়ে আনছি, স্কুলে সাজেস্টেড প্রশ্নগুলো (আমার মেয়ে ওসব টোকে না, যদিও রোজই ক্লাসে উপস্থিত থাকে, শুনতে শুনতে নাকি লিখতে পারে না) টুকে নিচ্ছি। মায়েতে আর ছোটবোনেতে খাতার পর

খাতা ভরে ফেলছি—উত্তর না জানা প্রশ্নের মালায়। What is hydro-static Paradox ? What is blood ? What is mitosis ? What is Sannyasi Bidroha ? What is $K_2Cr_2O_7$? এরপর বই দেখে দেখে উত্তরগুলোও লিখতে হবে। যদি মেয়ে না লেখে। উপায় কি ?

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি বিহারী দত্তকে ; তাঁর সেই জাহাজে আমিও ভেসে যাচ্ছি। আমার শুভার্থী বন্ধুরা কী এসব ঘটনা জানেন ? বিহারী দত্তের সমুদ্র যাত্রা ? আমাকে উত্তর লিখতে হয়। আমাকে জানতে হয়, What did the selfish Giant see ? How was Tenner rewarded ?

আমাকে পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বোরিকতুলো, কাঁচি ডেটল, ব্যাণ্ডেজ আরো পঞ্চাশ রকম টুকিটাকি কিনে আনতে হয়, একটা ভালো দেখে বাক্স যোগাড় করে তাতে সাদা ধপধপে কাগজ আঠা দিয়ে আঁটতে হয়, তাতে লাল কাগজে রেডক্রশ কেটে লাগিয়ে First Aid Box তৈরী করে দিতে হয়। এই বাক্সের জন্য দশ নম্বর মাত্র বরাদ্দ। আমাকে প্রত্যেকটা Practical খাতা (ভাস্করের খাতা দেখে দেখে) এঁকে দিতে হয়। আমি বিছানায় শুয়ে চোখ বুঝলেই কত রকম প্যাটার্ন দেখতে পাই—ককরোচ-এর এ্যালিমেণ্টারি সিসটেম, ফ্রগ-এর ইউরিনো-জেনিটাল সিস্টেম—ফীমেল টোড-এর রিপ্রোডাকটিভ্ সিস্টেম। এত কষ্টের মূল্য নাকি মাত্র দুনম্বর। তাছাড়া কিছুদিন হোলো মেয়েকে ভাত খাইয়ে দিতে হচ্ছে। তার হাতটা জ্বলে গেছে। কেননা ওয়ার্ক এডুকেশনে সাবান তৈরী করেছেন তিনি। সে সাবানের সোজা পোটেন্সি ? একটা কাঠের ট্রেতে রাখা ছিলো। তাতেই ট্রে-টাতে ঠিক শ্বেতির মতো ছোপ ধরে গেছে। এ সাবান কিন্তু গায়ে মাথার জন্যে। নীল, হলুদ, গোলাপী, লোভনীয় স্বপ্নিল প্যাস্টেল রংয়ে ফ্রী পাওয়া যায়। আমাদের বাড়ীতে। এখনও গোটা দশেক আছে। চাই ?

ওয়ার্ক এডুকেশনের জন্যে মেয়েরা না হোক আমাদের হোল ফ্যামিলির যেমন ওয়ার্ক তেমনি এডুকেশন হলো। মাটি মাখা, মাটি ছানা, মূর্তি গড়া কত কিছু আমি করতে পারি এখনও! সেই মূর্তি থেকে প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচটা শিবুই বানিয়ে দিয়েছে অবশ্য। সেই ছাঁচে ফেলে final মূর্তিটা বের করেছে মেয়ে নিজেই। দীপু ওটাকে স্প্রে-পেণ্টিং করে দিয়েছে টুথপেস্ট-টুথব্রাশের ছিটে মেরে। ভাস্করের ইনস্ট্রাকশনে। মেয়ে বলছে, "চলবে"।

পিঠে একটা বিশাল নম্বর আঁটা, ওর final পরীক্ষায় ছাপানো রোল নম্বর।

—কিরে ? হয়ে গেল ?

—কথা বোলো না। সময় নেই। স্কুল পারফরম্যান্স খাতা লাগবে এক্ষুনি—কেউ কি দেখেছো খাতাটা কোথায় ?

মেজাজ একেবারে মিলিটারি। যেহেতু সবগুলো খাতায় সযত্নে বাহারী মলাট লাগানো আমারই বৈধ-কর্তব্য, আমি তক্ষুনি মনে করতে পারলুম স্কুল পারফরম্যান্স খাতাটা কোথায় দেখেছি—এবং খাতা বগলে "থ্যাংকিউ" বলেই মেয়ে ছুটলো। রিক্সার পেছন পেছন ছুটতে লাগলো বোনটি এবং মামাটি। রিক্সা দাঁড়ালো না। বিকেলে ফিরে শুনলুম তারা ছুটতে ছুটতে ইস্কুল অবধিই গিয়েছিল।—"ঢুকেই শুনি ঠিক দিদিরই রোল নম্বরটা ডাকা হচ্ছে। পিটি পরীক্ষার জন্য। দিদি তক্ষুনি দৌড়োতে দৌড়োতে হলে ঢুকে গেল। বগলে খাতা। আমাদের দিকে তাকালোই না।"

—"অমন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কেমন পিটির কায়দা দেখিয়েছে কে জানে।"

পরীক্ষার তিনদিন বাকি। মেয়ে এসে বললে—জানো মা, আরাধনাটা এমন অন্যমনস্ক—অ্যাডমিট কার্ডটাই হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য এখন খুঁজে পেয়েছে।

—তোরটা আছে তো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আছে। জানো মা, অলকা লাহিড়ীর ব্যাপারটা আরো খারাপ।

—ধোপার বাড়িতে চলে গিয়েছিলো, কুড়মুড়ে হয়ে ফিরে এসেছে। কী হবে ?

—তোরটা কই ? বের কর তো ?

—কী হবে বের করে ? এই তো ড্রয়ারে।

—তবু, একবার দেখানা ?

—এই দ্যাখো, বাবা দ্যাখো।—খুব কনফিডেন্টলি ড্রয়ার খুলেই মুখ শুকিয়ে এতটুকুনি। তারপরেই ড্রয়ার তোলপাড়। তারপর সারা বাড়ি তোলপাড়। মুহূর্তেই মাস্ মোবিলাইজেশন ঘটে যায়। বাড়িশুদ্ধ প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা আনাচকানাচ, বাক্স ড্রয়ার তন্ন তন্ন করে ঘাঁটছি। ঘাঁটতে ঘাঁটতে যে যা খুঁজে পাচ্ছি নিয়ে নিচ্ছি। ছোট মেয়ে নিল একটা শক্ত ইরেজার আমি পেলুম মর্চেপড়া কাঁচিটা, মা পেলেন একটা জর্দার ডিবে, শিবু পেল স্ক্রু ড্রাইভারটা। —শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজের ডাঁই থেকে বেরিয়ে পড়লো মেয়ের অ্যাডমিট কার্ড, আর হারিয়ে যাওয়া মাইনের চেকটা। পরীক্ষার ডামাডোলে খুঁজে পাচ্ছিলুম না, গতমাস থেকেই। কাউকে বলিনি। এখন

কে কাকে বকবে ? ডবল কেলেঙ্কারী। আমি দুটোই চটপট আলমারিতে তুলে ফেলি। মেয়েকে যেই বলেছি—"অ্যাডমিট কার্ডটা না পেলে তুই কী করতিস ?" অমনি আমার মা জবাব দেন—"বোর্ডে গিয়ে তোমাকেই ডুপ্লিকেট নিয়ে আসতে হতো। কিন্তু চেক না পেলে তুমি কী করতে ?"

হোলনাইট প্রোগ্রামগুলো আমাদের মা-মেয়ের এখন যুগলবন্দি হয়ে গেছে। ঠিক লুচিভাজার প্রসেসে কাজ দ্রুত এগুচ্ছে। বেলা, ভাজা, খাওয়া। লুজশীটে আমি একটা একটা প্রশ্নের গরম গরম উত্তর লিখে এগিয়ে দিচ্ছি; আর মেয়ে লুফে নিয়ে একটা একটা প্রশ্নোত্তর কপাকপ গিলে ফেলছে। হ্যাঁ। এগুলো সব আগেও লিখে দিয়েছিলুম। প্রিটেস্টের আগে। টেস্টের আগেও খাতাতেই। কিন্তু সেই সব খাতা এখন আর নেই। জন্মের শোধ কিছু হারিয়ে গেলে আমার মেয়ে বলে—"কোথাও মিসপ্লেসড্ হয়েছে।" মেয়ের শরীরে উদ্বেগ নেই। সত্যি 'স্থিতধী' প্রাণী। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বীতস্পৃহ। মন্দ রেজাল্টেও ভীত নয়, ভাল রেজাল্টেও স্পৃহা নেই।

পরীক্ষার আগের দিন বাড়িতে বিজয়ার মত জনসমাগম—ফোনের পরে ফোনে শুভেচ্ছা আসছে—প্রণাম, মিষ্টান্ন, উপদেশ, স্মৃতিচারণ, অ্যাডভান্স সান্ত্বনা, আগাম সহানুভূতি, ফ্রী লাস্ট মোমেন্ট সাজেশ্যনস, পুরো দিনটাই গেল। অত শুভেচ্ছার শেষ মুহূর্তে মেয়ের অমন লোহার নার্ভও ফেল করলো। মোটা মোটা চশমার কাঁচের পেছনে ভীতু জল চক্‌চক্ করে উঠলো। সদ্য পঞ্চদশী হয়েছেন, ঠিক টেস্টের আগেই। খুবই গ্রোন-আপ ভাবছিলেন নিজেকে। এমন সময়ে দিম্মা কোলে নিয়ে বললেন—"ভয় কিরে ? তোর মা আরো ফাঁকিবাজ ছিল। ঘাবড়াসনি তুই।"

মেয়ের মন ভালো করতে একটা নতুন ক্লিপবোর্ড কিনে তাতে নাম লিখে দিলুম। ওপরে শ্রীশ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ লিখতে গিয়ে কী রকম একটু লজ্জা করলো। লিখলুম, "জয় বাবা ফেলুনাথ।" ফেলুদের নাথ তিনিই। মা সরস্বতীকে কেন আর কষ্ট দেওয়া ?

পরীক্ষার দিন। ভোর চারটেয় উঠেছি; মেয়েও চারটেয় উঠেছে। আমি এখনও দ্রুত উত্তর লিখছি—কালকের সাজেস্টেড প্রশ্নের। মেয়ে অলস চোখ বোলাচ্ছে। বোরড মুখে। তুমি কার কে তোমার। বোনও চারটেয় উঠেছে। কলমে কালি ভরছে, পেন্সিল কাটছে; ইরেজার, রুলার, মোজা, রুমাল এইসব গুছিয়ে রাখছে—জুতো পালিশ করছে, বোতলে জল ভরছে। দিম্মাও চারটেয় উঠেছেন। পরীক্ষার ভাত রেডি হচ্ছে, টিফিন তৈরী হচ্ছে। পোষাক

প্রস্তুত। র‍্যাশন কার্ডের খাপ থেকে কার্ড বের করে ফেলে দিয়ে অ্যাডমিট কার্ড ভরে দিলুম। যাতে ছিঁড়ে না যায়। মেয়ে চান করতে গেল। যেন গায়ে হলুদের সকাল। বাড়িময় এমন তাড়া লেগেছে ভোররাত্তির থেকে। মেয়ের চান হতে হতে মায়েরও চান হয়ে গেল—মেয়ের সঙ্গে মাও গরম গরম ভাত খেয়ে রেডি—পৌঁছুতে যেতে হবে তো? মায়ের গাড়ি যখন-তখন বিগড়ে যায়, তাই বিশ্বস্ত গাড়ি এসে গেছে অনেকক্ষণ, গাড়িতে আরেকপ্রস্ত টিফিন, এবং মামীমা বসে। কিন্তু মেয়ে কোথায়? রান্নাঘরে। কুকুর-বেড়ালের লাঞ্চ বেড়ে দিতে গেছেন। ধরে এনে দিম্মাকে প্রণাম করাতেই তিনি যাত্রা করার মন্ত্র জপ করে দিলেন নাতনীর মাথায় হাত রেখে। মেয়ে এবার আমাকেও প্রণাম করলো। তারপরেই ছোট বোনকে—"ও-কি দিদি? ও কী করছো?" বোনটি কুলকুলিয়ে হেসে ফেলে। —"ওঃ স্যরি।" গাম্ভীর্য একটুও না হারিয়ে স্থিতধী দিদি বলেন—"লাইনে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? স্টুপিড?" দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, হঠাৎ আমি দৌড়ে আবার ওপরে উঠতে থাকি।

—আবার কোথায় যাচ্ছ মা?

—যাই, মাকে প্রণামটা করে আসি?

—"তুমি?" মেয়ে এবার গাম্ভীর্য হারিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—"তুমি প্রণাম করবে? তোমার কি পরীক্ষা? পরীক্ষা তো আমার!"

অট্টহাসির রোলের মধ্যে তো দুগ্গা বলে রওনা হলুম। গেটে দু-চারজন হাত নাড়তে লাগলো—মেয়ে যেন বিলেত যাচ্ছে।

পরীক্ষার হলে মেয়েকে পৌঁছে দেওয়া আরেক পর্ব। জগৎ পারাবারের তীরে মায়েরা করে খেলা। কিছু কিছু বাবাও আছেন। আমরাও তো এক দিন পরীক্ষা দিয়েছি, মা তো ধারে কাছেও যেতেন না? বন্ধুরা বন্ধুরা মিলে চলে যেতুম, টিফিনবাক্স সঙ্গে নিয়ে।—আজকালকার ছেলেমেয়েরা বেশি বেশি আদুরে হয়েছে। তারা বাপ-মার কথা যত কম শোনে, আদর-অহ্লাদ তত বেশি পায়। আমাদের কালে টিউটর থাকতেন একজন (যদি অ্যাটঅল থাকতেন) এখন প্রতি সাবজেক্টে অন্তত একজন। যেসব ছেলেমেয়েরা একা একা বটানিকালে ডায়মণ্ডহারবারে চলে যেতে পারে, পরীক্ষা হলে তাদের কিন্তু প্রত্যেকদিন বাপ-মাকে পৌঁছে দিতে হবে। ফের দুপুরবেলায় অঞ্জলিতে টিফিন নিয়ে মা-বাবারা অফিস কামাই করে হত্যে দেন ইস্কুলের গেটে। বিকেলে ছুটতে ছুটতে পুনরায় হাজির, নীলমণিদের ফেরৎ নিতে। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক। বাপ-মায়ের

এই পুণ্যে যদি ছেলেমেয়েরা তরে যায়। যাক, শুরু হয়ে গেল বড় মেলা।

পরের দিন সকালে, আজ অফ ডে। মেয়ে দরজা বন্ধ করে ফোন করছে। আমাদের বাড়িতে এটার চল নেই। আমি তো জোর করে ঢুকবোই ঢুকবো—গোপন ফোন চলবে না, চলবে না! —অন্তত ষোল বছর তো হোক? মেয়ে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়ে ফোনে ফিরে গেল।

—আছে? কী দেখলি? আছে তো? এই প্লীজ একটু দয়ে যাবি? আচ্ছা, থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। দশটার মধ্যে। কেমন? ফোন খতম।

—কী ব্যাপার রে?

—কিছু না। বায়োলজির বইটা। আরাধনার কাছে ছিল।

—কালই তো ইংরেজি আর বায়োলজি? কবে থেকে তোর বই ওখানে আছে?

—টেস্টের পর থেকেই। আচ্ছা মা, আমাকে তো ও কতবার কতো খাতা ধার দিয়েছে। দেব না বই?

—এত দিন কী দিয়ে পড়লি?

—কেন খাতা? অন্য অন্য সব বই—কত তো বই আছে।

—কিন্তু ওটাই তো টেক্সট বইটা!

—ও কিছু না।

তিনদিন পরে।

—"সকালে ফিজিক্যাল সায়েন্স, বিকেলে সংস্কৃত। এই সংস্কৃত খাতাগুলো টিফিনের সময়ে নিয়ে যেও ঠিক মা।" মনে করিয়ে দিলে মেয়ে বেরুনোর সময়ে। গাড়ি থেকে নামতে নামতে দেখলুম ইস্কুলের সামনে আরাধনা দুলে দুলে সংস্কৃত পড়ছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে।—"ও কি রে?" আমার মেয়ে যেচে জ্ঞান দিলেন—"এখনই সংস্কৃত পড়ছিস? এখন যেটা পরীক্ষা সেইটে পড়বি তো?" আরাধনা অবাক হয়ে তাকায়।

—"সেইটেই তো পড়ছি। এখন স্যান্সক্রিট না?"

—"কী?" আমি বিষম খাই। "এখন স্যান্সক্রিট? তবে যে বললে এখন ফিজিক্যাল সায়েন্স? সংস্কৃত বিকেলে?"

—"আবা-র?" আরাধনা আর্তনাদ করে ওঠে। "আবার তুই টেস্টের মতো করলি?" আমিও আর্তনাদে জয়েন করি। এবার স্থিতধী কন্যা আমাদের প্রতি সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করেন—"যাগগে মা—ওবেলা না-হয় এবেলায়।

কী এসে যায় ? দিনটা তো ঠিকই, স্যান্সক্রিট খাতাপত্তর আর আনতে হবে না।"
শিখণ্ডী নাচতে নাচতে ভেতরে চলে যান। আমরা ব্যাকুল মা-বাপেরা ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষায় হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময়ে শূন্যি শূন্য থেকে দৈববাণী হচ্ছে "মা ! মা ! এই দ্যাখো আমরা কোথায় ?" ভীষণ রোদে ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ উঁচিয়ে দেখতে পাই—ঠাঠা রোদ্দুরে চিলের ছাদে দু-তিনটে ইউনিফরম পরা ঝাঁকড়া চুলো মূর্তি—একগাল হাসতে হাসতে হাত নাড়ছে, যেন এভারেস্টের চুড়োয় তেনজিং ইত্যাদি।

উপসংহার ঃ

এরপর নিশ্চয় স্কোর বোর্ডটা দেখতে চান ? যেমন খেলোয়াড়, যেমন পিচ তেমনি খেলা ; আর তেমনিই রেজাল্ট। হোলফ্যামিলির অসামান্য টীমওয়ার্কের টোটাল স্কোরিং সাড়ে তিয়াত্তর পার্সেন্ট। দুটো মাত্র লেটার। তার একটা আবার বায়োলজিতেই। ঘরময় দৌড়ে দৌড়ে ধপাধপ শব্দে একটা বল বাউন্স করতে করতে মেয়ে বলল—

—"মা, তোমাদের সত্তর, আমার সাড়ে তিন—এফর্ট-ওয়াইজ। দিম্মাকে সেই প্রমাণটা তুমি যদি করতে, স্টারই পেয়ে যেতুম নির্ঘাৎ।"